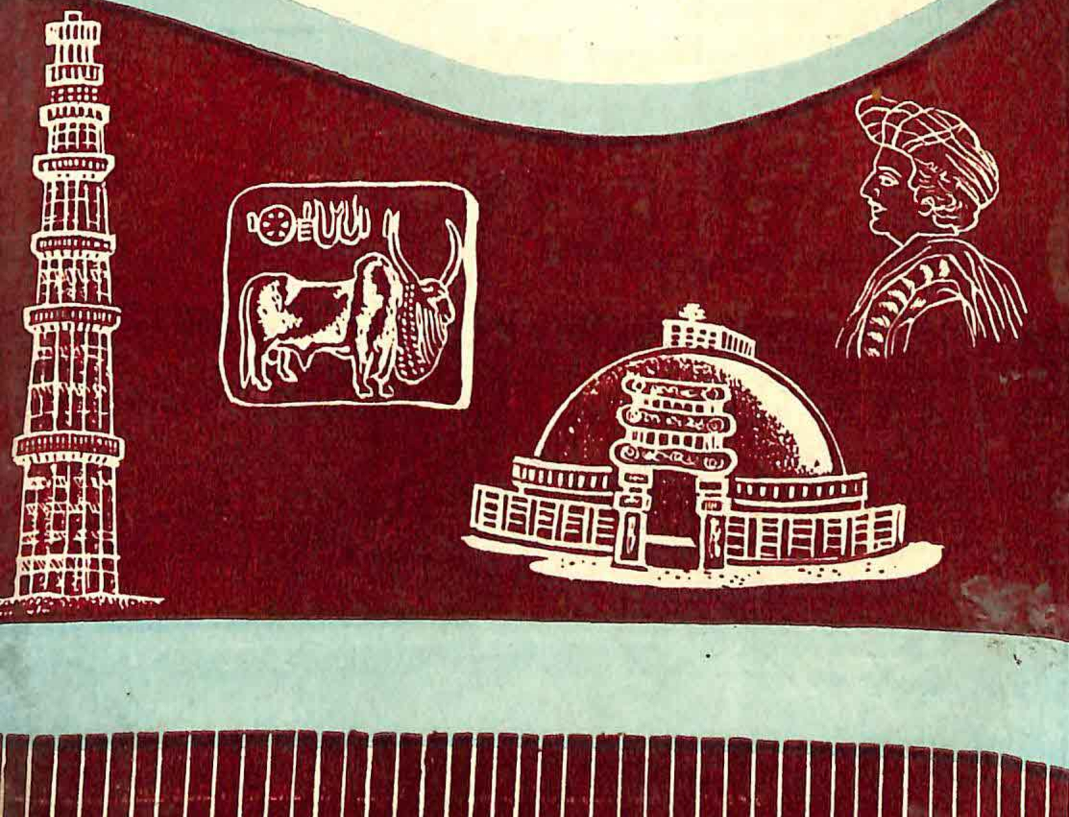
যুগে যুগে ভারত



Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education
as a Text Book on HISTORY for class IX. Vide Board's
T. B. No. Syll/H/IX/87/35 dt. 13.11.87.

যুগে যুগে ভারত

[History]

(নবম শ্রেণীর পাঠ্য)

অধ্যাপক শ্রী হীরেন দে, এম. এ (ট্রিপল). বি. টি.
ইতিহাসের অধ্যাপক, কালনা কলেজ (শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ) ;
ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপক, হুগলী গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিং
কলেজ ; রিসার্চ স্কলার (এন. সি. ই. আর. টি) ;
'আধুনিক যুগের ভারত', 'মানব সভ্যতার
ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।

এবং

শ্রীমতী দীপিকা দে, এম. এ (ডবল). পি. জি. বি. টি.
ইতিহাসের শিক্ষিকা, বিজয়গড় শিক্ষা নিকেতন (বালিকা) ;
'মানব সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থ প্রণেত্রী।

প্রাপ্তিস্থান
টিচার্স বুক স্টল,
৬/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক,
শ্রীশ্যামল বেরা
টিচার্স বুক স্টল
৬/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৮৭

মূল্য ঃ ২৫·০০ টাকা

মুদ্রক,
এস. বি. প্রিণ্টস্
৯/১এ, সরকার বাই লেন
কলিকাতা-৭

আমাদের কথা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রবর্তিত নূতন ইতিহাস পাঠ্যক্রম যথাযথ অনুসরণ করে নবম শ্রেণীর জন্য **'যুগে যুগে ভারত'** রচিত হল। নামকরণে আমরা বুঝেছি যুগ বৈশিষ্ট্য দিয়ে যুগে যুগে ভারতের জনগণের সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল জীবন-যাত্রার চলমান কাহিনীকে, ধর্ম বা সম্প্রদায় দিয়ে নয়।

যে কোন দেশের প্রকৃত ইতিহাস সে দেশের জনগণেরই ইতিহাস। সুখের কথা পর্ষদ নির্দিষ্ট বর্তমান ইতিহাস পাঠ্যক্রমে জনগণের জন্য বেশ কিছুটা স্থান রাখা হয়েছে।

গ্রন্থ রচনাকালে শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ও প্রামাণ্য পুস্তক বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। তাঁদের প্রতি আমাদের ঋণ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি। সহকর্মী অধ্যাপক বিমল ঘোষ মহাশয়ের সুচিন্তিত পরামর্শ আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছে।

পড়া ও পড়ানোর লক্ষ্যে বিষয়বস্তুর নানা দিক বারংবার অনুশীলন করবার জন্য অনুশীলনীতে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় অনুসন্ধিৎসামূলক প্রশ্নপত্রের ধরনের সাথে অভিক্ষণধর্মী বেশ কিছু হ্রস্ব ও দীর্ঘ প্রশ্নাবলীর অবতারণা করেছি।

পুস্তক প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে প্রকাশক শ্রী শ্যামল বেরা মহাশয় আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালে 'টিচার্স বুক ষ্টল'-এর শ্রী দণ্ডীরাম বাগ মহাশয় যে তৎপরতার সাথে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও ক্লান্তিহীন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তা'তে আমরা অভিভূত।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যার্থী সমাজের সামান্য উপকার আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

২২শে নভেম্বর, ১৯৮৭ সাল

বিনীত
হীরেন দে
দীপিকা দে

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় ঃ	
ভূগোল ও ইতিহাস (Geography & History) ঃ	১—৮
ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জাতিগত উপাদান ; ইতিহাস সৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব ; বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবোধ ; প্রাচীন যুগের ভারত ইতিহাসের উপাদান।	
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	
ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ (Dawn of Indian Civilization) ঃ	৯—১৬
সংস্কৃতির পুরানো, মধ্য ও নব্য প্রস্তরযুগ ; হরপ্পা সভ্যতা (তাম্রপ্রস্তর) ; প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ—প্রাচীনত্ব, ব্যাপ্তি, নাগরিক জীবন, নগর বিন্যাস এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন ; বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক। হরপ্পা সভ্যতার তাৎপর্য ও প্রভাব, গুরুত্ব, সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের কারণ।	
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	
বৈদিক যুগ (The Vedic Age) ঃ	১৭—২৪
আর্য জাতির পরিচয় ও আদি বাসস্থান ; প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি—ঋগ্বেদ ; আদি বৈদিক যুগে বৈদিক সাহিত্য ও শেষ বা পরবর্তী বৈদিক যুগে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও সূত্রসমূহ ; বৈদিক সাহিত্যে আর্যদের জীবনযাত্রা—রাষ্ট্রকাঠামো, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবন ; বৈদিক যুগের সম্প্রসারণ—উপমহাদেশে বৈদিক সভ্যতার প্রসার, লৌহ যুগের সূচনা।	
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	
প্রতিবাদী আন্দোলন (Protest Movement) ঃ	২৫—৩২
বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সমূহের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণ ; মহাবীর ও জৈনধর্ম ; গৌতমবুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম।	
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	
সাম্রাজ্যবাদের যুগ ও রাজনৈতিক ঐক্য (The Age of Imperialism and Political Unification) ঃ	৩৩—৬৫
ষোড়শ মহাজনপদ, মগধের উত্থান, মৌর্য সাম্রাজ্য, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য—মেগাস্থিনিস্ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত মৌর্য যুগের শাসন-ব্যবস্থা,	

বিষয় পৃষ্ঠা

অশোক, অশোকের প্রজাহিতৈষী কার্যাবলী, ধর্মপ্রচার, বহির্বিশ্বের সাথে সংযোগস্থাপন, ইতিহাসে অশোকের স্থান। ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ, ভারতীয় উপমহাদেশের কোন কোন অংশে পারসিক আক্রমণ, গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ও ফলাফল ; মৌর্যোত্তর যুগে ব্যাকট্রিয় গ্রীক, শক ও পহ্লবদের অনুপ্রবেশ ও শাসন ; সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, মৌর্য শিল্প ; কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহাস ; কণিষ্ক ও বৌদ্ধধর্ম, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কণিষ্কের অবদান, কুষাণ যুগে বহির্বিশ্বের সাথে ভারতের যোগাযোগ, ভারতের ইতিহাসে কুষাণ বংশের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ; সাতবাহন সাম্রাজ্য—উদ্ভব ও বিস্তৃতি। সাতবাহন শাসনের গুরুত্ব ; গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস, ফা-হিয়েনের বিবরণ, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ, গুপ্ত সংস্কৃতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ, স্বর্ণযুগ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

প্রাধান্যের জন্য সংগ্রাম (Struggle for Domination) ঃ ৬৬—৮৪

উত্তর ভারতের কথা ; হুন আক্রমণ ও যশোধর্মন, শশাঙ্কের নেতৃত্বে গৌড়ের উত্থান, কামরূপের ভাস্করবর্মণ ও থানেশ্বর-কণৌজের হর্ষবর্ধনের সাথে সম্পর্ক, শশাঙ্কের কৃতিত্ব ; হর্ষবর্ধন, হিউয়েনসাঙ্-এর বিবরণ, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, হর্ষের কৃতিত্ব ; প্রতিহার-পাল সাম্রাজ্যের উত্থান : কণৌজের জন্য ত্রিকোণ দ্বন্দ্ব ও ফলাফল ; পালবংশ ও সেনবংশ। দাক্ষিণাত্যের কথা ; বাদামীর চালুক্য বংশ, দ্বিতীয় পুলকেশীর কৃতিত্ব ; রাষ্ট্রকুট বংশ—তৃতীয় গোবিন্দ ও তৃতীয় কৃষ্ণদেবের কৃতিত্ব ; কল্যাণের পরবর্তী চালুক্য বংশ—ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের কৃতিত্ব ; সুদূর দক্ষিণ ভারত —কাঞ্চীর পল্লব বংশ, পল্লব বংশের কৃতিত্ব ; চোল সাম্রাজ্য—প্রথম রাজরাজ ও প্রথম রাজেন্দ্রের কৃতিত্ব, দুর্ধর্ষ সামুদ্রিক অভিযান। চোল শাসনব্যবস্থা, চোলদের পতন।

সপ্তম অধ্যায় ঃ

সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি (সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী)
Social, economic and cultural life (7th to 12th century A. D.) ঃ ৮৫—১০৫

পাল-সেন যুগ, চালুক্য যুগ, রাষ্ট্রকুট যুগ, চন্দেল্ল যুগ, সুদূর দাক্ষিণাত্যের পল্লব ও চোল যুগ ; উড়িষ্যার গঙ্গ যুগ, বহির্বিশ্বের সাথে ভারতের

বিষয় পৃষ্ঠা

বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ; স্থচনা ; মধ্যএশিয়া, চীন, তিব্বত ও দূরপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, স্থবর্ণভূমি, কম্বোজ রাজ্য, চম্পারাজ্য, শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য, বহির্বিশ্বের সাথে ভারতের অভিনব যোগাযোগ।

অষ্টম অধ্যায় ঃ

মধ্য যুগে ভারত (Medieval India) ঃ ১০৬—১৫৩

ভারতে মধ্যবর্তীকালের ইতিহাসকে মুসলিম যুগে ভারত না বলে কেন মধ্যযুগে ভারত বলা যুক্তিযুক্ত? স্থলতানী যুগের ইতিহাস রচনার নানাবিধ উপাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ইসলামের ভারতে আগমন, ভারতে মুসলমান শাসনের স্থচনা—স্থলতান মামুদের ভারত আক্রমণ ও ফলাফল ; ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে অল্‌বিরূণির অভিমত ; অভিযান থেকে সাম্রাজ্য গঠন ; দিল্লী স্থলতানির প্রতিষ্ঠা, মহম্মদ ঘোরী, কুতুবউদ্দিন আইবক ও অন্যান্য স্থলতানগণ ; খলজী সাম্রাজ্যবাদ, মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন, তৈমুরলঙের ভারত আক্রমণ, সৈয়দ বংশ, লোদি বংশ, দিল্লীর স্থলতানি শাসনের অবসান ; স্বাধীন সত্তা নিয়ে কতিপয় রাজ্যের উত্থান ; ইলিয়াস শাহের অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে বাংলার অবস্থা—ইলিয়াসশাহী যুগে বাংলার সংস্কৃতিক সাফল্য ; বাহমণি রাজ ; বিজয়নগর ; বিজয়নগর-বাহমণি সংঘর্ষের প্রকৃতি, বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা। অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি, বিজয়নগরের গৌরব ; স্থলতানী যুগে ভারতে ইসলাম সভ্যতার প্রভাব—ভক্তিবাদী ও স্থফীবাদী আন্দোলন, ধর্ম-সংস্কারকগণ, উর্দু-ভাষার উদ্ভব।

নবম অধ্যায় ঃ

মুঘল যুগ (The Mughal Age) ঃ ১৫৩—১৮৪

মুঘল যুগের বিভিন্ন উৎসসূত্রের-সংক্ষিপ্ত বিবরণ, মুঘলদের উৎপত্তি, বাবর কর্তৃক মুঘল বাদশাহীর প্রতিষ্ঠা, 'বাবরের স্মৃতি কথা', মুঘল আফগান সংঘর্ষ, শেরশাহ—শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থা—অবদান ; মুঘল শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ; আকবর ও মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং সুদৃঢ়করণ ; মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত নির্মাতারূপে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাসকরূপে জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, শাসকরূপে শাহজাহান, আওরঙ্গজেব ; উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিদ্রোহ ; দাক্ষিণাত্য নীতি ; মারাঠা নায়ক শিবাজী, মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ, শাসকরূপে শিবাজীর মূল্যায়ন,

বিষয় পৃষ্ঠা

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের সমালোচনা—আওরঙ্গজেবের শাসন-ব্যবস্থা, আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতি ; কূটনীতিবিদ ও শাসকরূপে আওরঙ্গজেব ; ভারতে বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক সংস্থাগুলোর কার্যাবলী, মুঘল যুগে ভারত ; রাষ্ট্রীয় ঐক্য, মুঘল শাসন-ব্যবস্থায় জায়গীর, মুঘল রাজস্ব-ব্যবস্থা, সমাজ, অর্থনীতি এবং শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি, বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী, ইতিহাস লিখন, সঙ্গীত ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধি।

দশম অধ্যায় ঃ

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন (Decline of the Mughal Empire) ঃ ১৮৫—২৭৪

মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ভাঙনের পটভূমি ; আওরঙ্গজেব ও পরবর্তী দুর্বল মুঘল সম্রাটগণ ; মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের উপর খণ্ড খণ্ড রাজ্যের উত্থান ; শিখ শক্তির উত্থান ; মারাঠা শক্তির উত্থান ও পতন ; পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ; ইউরোপীয় বাণিজ্যের ক্রমবৃদ্ধি ও বিভিন্ন বণিক সংস্থার মধ্যে সংঘর্ষ, ইংরেজদের ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ; ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ, কর্ণাট যুদ্ধ, ফরাসী শক্তির ব্যর্থতার কারণ ; বাংলাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যবিস্তার ও শক্তি বৃদ্ধি, ১৭১৭ সনের বাদশাহী ফারমান, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজ শক্তির সম্প্রসারণ ; মহীশূর, মারাঠা ও শিখ শক্তির পতন, সিন্ধু, নেপাল ও ভুটানের বিপর্যয় ; বৃটিশ রাজশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রকৃতি, দ্বৈতশাসন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্য, ভারতীয় সম্পদের বহির্গমন, সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট ; দেশজ শিক্ষার স্থলে নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও নবজাগরণ, ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও সংস্কারকগণ, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও সংগ্রাম ; ফরাজী ও ওয়াহাবী আন্দোলন ; উপজাতি আন্দোলন ঃ কোল, সাঁওতাল ; ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ—কারণ, ব্যাপ্তি, নেতৃত্ব, প্রকৃতি ও ব্যর্থতার কারণ ; কোম্পানী শাসনের অবসান ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র (Queen's Proclamation) ; ভারতের ইতিহাসে নব যুগের সূচনা।

আদর্শ প্রশ্নাবলী ২৭৫

যুগে যুগে ভারত

প্রথম অধ্যায়

ভূগোল ও ইতিহাস

Geography & History

মানবজীবনের যা'কিছু বাস্তব সত্য সে সব কিছু নিয়েই যে জীবন কথা তার অগ্রগতির ধারাবাহিক বিবরণই ইতিহাস। ইতিহাসের ঘটনা মাত্রই দেশ, স্থান ও পরিবেশের সাথে সম্পর্কের সূত্রে বিশিষ্টতা লাভ করে। তাই ভূগোলের জ্ঞান ব্যতিরেকে ইতিহাস পাঠ সম্পূর্ণ হয় না। আবার ইতিহাসে যেমন একদিকে থাকে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কালানুক্রমিকতা বা সময়জ্ঞান তেমনি অপরদিকে থাকে ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে তা থেকে স্থানজ্ঞান। এইভাবে ভূগোল ও ইতিহাস একে অপরের শূন্যতাকে পূর্ণ করে। ভূগোল ও ইতিহাসের এই নিবিড় সম্পর্কের সূত্র ধরেই কালানুক্রমিকতা ও ভূগোলকে ইতিহাসের "দুই চোখ" বলা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ ভূগোল যেমন স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে মানবজীবনের বিশিষ্টতার পরিমাপ, ইতিহাস তেমনি সময়ের মানদণ্ডে মানবসমাজের অগ্রগতির বিশ্লেষণ।

(ক) ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জাতিগত উপাদান ঃ

ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও আয়তনের বিশালতার বিচারে ভারতকে একটি উপমহাদেশ বলা হয়। এই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

> "নীল সিন্ধু জল ধৌত চরণতল অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল
> অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল শুভ্র তুষার কিরীটিনী।"

ভারতবর্ষের আয়তন বিশাল। উত্তর-দক্ষিণে ইহার বিস্তৃতি প্রায় ৩২০০ কি. মি. এবং পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ৩০০০ কি. মি.। এই বিশাল দেশের আয়তন প্রায় আঠারো লক্ষ বর্গমাইল অর্থাৎ রাশিয়াকে বাদ দিলে ইউরোপের যে আয়তন, ভারতীয় উপমহাদেশ তার চেয়েও বড়।

ভারতের ভৌগোলিক সীমা ঃ ভারতের উত্তর সীমায় বিশাল হিমালয় পর্বতমালা প্রাচীরের মত থেকে এশিয়া মহাদেশ হতে ভারতীয় ভূখণ্ডকে আলাদা করেছে। উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বতমালা ভারতবর্ষকে আফগানিস্থান এবং উত্তর-পূর্বে আরাকান পর্বতমালা ভারতবর্ষকে ব্রহ্মদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করেছে। ভারতের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও সর্ব দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পশ্চিমে আরব সাগর তিন দিক থেকে ঘিরে ভারতবর্ষকে একটি উপদ্বীপে পরিণত করেছে।

ভৌগোলিক বিশেষজ্ঞগণ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশকে পাঁচটি প্রধানভাগে ভাগ করেছেন। যথা—(ক) হিমালয় সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চল—কাশ্মীর, কাংড়া, সিকিম, তরাই প্রভৃতি অঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত। (খ) সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত আর্যাবর্তের সমভূমি—আসাম হতে পাঞ্জাব, আর দক্ষিণে মধ্য ভারত পর্যন্ত এই

সমভূমি বিশ্বের প্রধান উর্বর অঞ্চলগুলির অন্যতম। (গ) মধ্যভারতের মালভূমি—আর্যাবর্তের সমভূমির দক্ষিণে এবং বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতরাজির উত্তরে ইহা অবস্থিত। (ঘ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি—উত্তরে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতরাজি এবং দক্ষিণে কৃষ্ণা



ভারতের মানচিত্র

ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ নিয়ে এই অঞ্চল। (ঙ) সুদূর দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল—কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ হতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। তামিলনাড়ু, কেরল, ত্রিবাঙ্কুর, কোচীন এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম লীলাভূমি এই ভারতভূমি। যুগে যুগে বৈদেশিক আক্রমণকারী ও বহিরাগত জাতিগুলি ভারতবর্ষে এসে শেষ পর্যন্ত এখানকার আদি-বাসিন্দাদের মধ্যে মিশে গিয়ে হয়ে গিয়েছিলেন 'ভারতীয়'। তাই আমরা আর্যসন্তান—এই বলে জাতিগর্ব প্রচার করা ইতিহাসের দিক থেকে অসত্য।

ভারতীয় জনগোষ্ঠীর আদি পরিচয় ঃ

ভারতবর্ষে বহুজাতির বাস। তাদের আদি পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ দেহের গঠন ও ভাষার ভিত্তিতে ভারতের জনগোষ্ঠীকে জাতিগত চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন ; যথা—আর্য, দ্রাবিড়, আদিম অধিবাসী এবং মোঙ্গোলীয়।

প্রথমতঃ আর্য বা ভারতীয় আর্যজাতি নর্ডিকগোষ্ঠীর লোক। এরা ছিলেন দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ ও উন্নত নাসিকাযুক্ত। ঋক্‌বেদে ব্যবহৃত এদের ভাষা সংস্কৃত ভাষার আদিরূপ বলে বলা হয়। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে আর্যগোষ্ঠীর লোকের সংখ্যা বেশী দেখা যায়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও গুজরাটে ব্রাকিসিকেলাস জাতির লোকদের বসবাস।

দ্বিতীয়তঃ ভারতের জনগোষ্ঠীর অপর প্রধান অংশ হল দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক। এরা ছিলেন কৃষ্ণকায় এবং মাথার চুল কোঁকড়ানো। দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় প্রাধান্য দেখা যায়। এদের ভাষা হল তামিল, তেলেগু, মালয়ালী ও কানাড়ী। প্রাক্-আর্যযুগে ভারতের প্রাচীন অধিবাসী বলে এদের মনে করা হয়।

তৃতীয়তঃ ভারতের জনগোষ্ঠীর অপর প্রধান অংশ হল আদিম অধিবাসীগণ। এরা ছিলেন কোল, ভীল, মুণ্ডা, হো, শবর প্রভৃতি উপজাতির মানুষ। এরা খর্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ও নীচু নাসিকাযুক্ত। এদের ভাষাকে অষ্ট্রিক ভাষা বলা হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকলেও মধ্যপ্রদেশের অরণ্যাঞ্চল এদের প্রধান বাসভূমি।

চতুর্থতঃ ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মোঙ্গোলীয় জাতির অস্তিত্বও দেখা যায়। এদের গায়ের রং উজ্জ্বল, নাক চ্যাপ্টা, চোখ ছোট ও একটু বেঁটে। হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলের গুর্খা, আসামের খাসিয়া, ভুটিয়া, ল্যাপ্‌চা প্রভৃতি এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত।

নৃতত্ত্বের চুলচেরা বিশ্লেষণ ছাড়া ইতিহাসের তথ্যেই পাই, দক্ষিণভারতে মূলতঃ দ্রাবিড় ; পূর্ব ভারতে মোঙ্গোলীয় ; উত্তর ভারতের উচ্চবর্ণ এবং ভারতের সর্বত্র ছড়ানো আদিবাসী উপজাতি।

উপরোক্ত চারটি প্রধান জাতিগোষ্ঠী ছাড়া প্রাচীনযুগে বাহ্লীক, শক, পহ্লব, কুষাণ, হূন প্রভৃতি জাতি এবং মধ্যযুগে তুর্কি, পারসিক প্রভৃতি জাতি ও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিলে মিশে গেছেন। বিচিত্র এই জনগোষ্ঠীর আবাসভূমি ভারতবর্ষকে ঐতিহাসিক স্মিথ জাতিতত্ত্বের এক বিরাট যাদুঘর (ethnological museum) বলে অভিহিত করেছেন। এভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক মিশ্রিত আকারে গড়ে উঠেছে ; ফলে বিভিন্ন জাতির মিলনে ভারতবাসী এক মহাজাতিতে পরিণত হয়েছে।

(খ) ইতিহাস সৃষ্টিতে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব ঃ

যে কোন দেশের জনগণের কাহিনী, সে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা কমবেশী বা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। বিশেষ পরিবেশ জীবনকে দেয় বিশিষ্টতা। মানুষের ক্রমবিবর্তনের ধাপে ধাপে প্রকৃতির উপর প্রভুত্বের ফলেই ঘটেছে সভ্যতার অগ্রগতি। আবার প্রকৃতিও প্রভাব ফেলেছে মানুষের জীবনে। তাই সমুদ্রে ঘেরা দেশ আর স্থলবেষ্টিত দেশ কিংবা উর্বর দেশ আর অনুর্বর দেশের ইতিহাস হয়েছে

আলাদা বিশিষ্টতায় ভিন্নরূপের। সুতরাং একটি গোষ্ঠী বা জাতির আচার বিচার, বেশভূষা, খাদ্য, জীবনযাত্রা প্রভৃতি ভৌগোলিক প্রভাবের ফলেই বিশেষ ধাঁচে গড়ে ওঠে। যেমন মরুভূমি আর শস্য-শ্যামল অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা কখনই একরূপ হতে পারে না। ফলে স্থানভেদে হয়েছে সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে অসম বিকাশ।

ভারতের ভূগোল ভারতের ইতিহাসের উপর যে ছাপ ফেলেছে তা' খুবই স্পষ্ট। ভারতের পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী ও সমুদ্র ভারতের ইতিহাসকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। ভারতের উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় উঁচু পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে মৌসুমী বায়ু থেকে জল ঝরিয়ে উত্তর ভারতের বড় বড় নদীগুলোর উৎসস্থল হয়েছে। হিমালয়ের পঞ্চনদ আর গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র উত্তর ভারতকে করেছে স্বর্ণপ্রসূ। নদীমাতৃক এই অঞ্চলে বাণিজ্য হয়েছে অবাধে। বাইরে থেকে আগন্তুকরাও প্রকৃতির অকৃপণদানে পুষ্ট এই অঞ্চলে আকৃষ্ট হয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করেছেন। এখানকার মানুষ অন্নচিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে শিল্প-ধর্ম ও জ্ঞান সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছেন। কিন্তু এই স্বস্তির সাথে সাথে যে আত্মতৃপ্তি এল তা থেকে বহিরাগতদের দুর্বার আক্রমণ অপ্রতিরোধনীয় হয়েছে। অবশ্য পরিণামে তারা একদেহে লীন হয়ে এদেশকে মহামানবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত করেছেন।

উত্তর ভারতে যখন সামাজিক ও ধর্মীয় উত্থান পতন চলেছে তখন বিন্ধ্য পর্বতই আড়াল দিয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে দাক্ষিণাত্যে আপন গতিতে বয়ে চলতে। এছাড়া সমুদ্রবেষ্টিত দক্ষিণ ভারত সামুদ্রিক বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিস্তার ঘটিয়েছে। এইভাবে ভারতের মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ে মিলে ভারতের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

(গ) **বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবোধ**ঃ বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলনই ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির মূল সত্য। কবি তা উপলব্ধি করে বলেছেন—

> "নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান
> বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।"

আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র পৃথিবী স্বরূপ (Epitome of the world) ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের যেন শেষ নেই। এই ভৌগোলিক বৈচিত্র্যে অর্থাৎ জলবায়ু ও আবহাওয়ার পার্থক্য হেতু এদেশের জনজীবনযাত্রায় যথা আচার-বিচার, রীতি-নীতি, বেশ-ভূষা, খাদ্য প্রভৃতি নানাদিকে বিভিন্নতা ঘটিয়েছে। কোথাও প্রচুর বৃষ্টিপাত যেমন কোন অঞ্চলকে শস্যশ্যামলা করেছে অপরদিকে বৃষ্টিপাতহীন অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে মরুভূমি।

ভারতীয় জনতার আদি পরিচয়ে রয়েছে জাতিগত উপাদানের বৈচিত্র্য। প্রাক্-আর্য যুগে ভারতের আদিম অধিবাসী ছাড়া, আর্য ও আর্যোত্তর যুগে ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর মত বিভিন্ন বৈদেশিক জাতি ভারতে এসেছেন। এদেশে থেকে তারা পরে অবশ্য হয়ে গেছেন ভারতীয়। কবিগুরুর কথায়—

> 'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
> শক-হূনদল পাঠান-মুঘল একদেহে হল লীন,

বিভিন্ন জাতির মিলনে ভারতবাসী এক মহাজাতিতে পরিণত হয়েছে একথাটি

ইতিহাসের পক্ষে সত্য হলেও বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্যগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ বিলীন হয়নি। বিভিন্ন বিশিষ্টতার ছাপ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে নানা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। সুপ্রাচীন কাল থেকে এদেশ নানা ধর্মের লীলাস্থল হয়েছে। যেমন.—প্রাক্-আর্য আদিবাসীদের ধর্ম, আর্যদের বৈদিক হিন্দু ধর্ম, জৈন, বৌদ্ধ, ইসলাম ও সর্বশেষে খ্রীষ্টান ধর্মের।

ভাষার দিক থেকেও বিবিধ বৈচিত্র্য রয়েছে। ১৫টি প্রধান ভাষা হলেও সবরকমের ভাষার সংখ্যা প্রায় দু'শতাধিক। এভাবে নানাবিধ বৈষম্যের ফলে প্রাচীনকাল থেকেই আঞ্চলিক বিশিষ্টতা রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ে অনেক স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

উপরোক্ত নানা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একতার লক্ষ্যে পৌছনোই ছিল ভারতবাসীর ঐকান্তিক কামনা। ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা এদেশে এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়ে উঠতে সুযোগ দিয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবাসীর চিন্তায় সর্বভারতীয় ঐক্যের চেতনা দানা বাঁধে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে ভারতবর্ষ নামের উল্লেখ এবং সে ভারতবর্ষের মানুষের নাম 'ভারত সন্ততি' বা ভারতের উত্তর-পুরুষ।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই বহুবিধ ধর্মের মিলনস্থল এই ভারতবর্ষ। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বী। বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের আবেদন হয়েছে সর্বভারতীয়। হিন্দুদের পবিত্র সপ্তনদী ও সপ্ততীর্থের চেতনায় রয়েছে একাত্মতার ছোঁয়া। রাজস্থানের আজমীর শরিফ ধর্মনির্বিশেষে সবাইকে আকর্ষণ করে। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন-প্রয়াসী মুঘল বাদশাহ আকবর পেয়েছেন জাতীয় সম্রাটের মর্যাদা। এছাড়া হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির যুক্ত প্রভাবের ফলেই ভক্তিবাদ ও ভক্তি-ধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এভাবে ভারতে মুসলিম সংস্কৃতি ভারতীয়রূপ ধারণ করে বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে আলাদা চরিত্র গ্রহণ করেছে।

ভাষার সূত্রে মূলতঃ ঐক্য এলেও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সুর কখনও বড় হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে দেশের প্রধান ভাষা ছিল প্রাকৃত। অশোকের প্রত্নলিপিগুলি লেখা হয়েছিল এভাষায়। পরবর্তীকালে সংস্কৃত, এবং তারপর ফার্সি হয়েছে সর্বভারতীয় ভাষা। উর্দু ভাষাও ভারতকে বেঁধেছে ঐক্যের বন্ধনে। রাষ্ট্রভাষা হিন্দি সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ তা অনেকটা বুঝতে পারে। তাই ভাষাগত বিভেদের মধ্যেও বিভিন্ন ভাষার মধ্যে আছে মৌলিক যোগাযোগ। এছাড়া ভারতীয় সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকদের রচনার নানা ভাষায় অনুবাদ ভাবগত ঐক্যের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যকে দৃঢ় করেছে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদও সর্বভারতীয় ঐক্যবোধেরই ফসল। এই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করেছে। স্বাধীনোত্তর ভারতে জাতীয় অভিবাদনরূপে 'জয়হিন্দ' এবং জাতীয় সঙ্গীত-রূপে 'জন-গণ-মন' ভারতবাসী মাত্রকেই 'ভারত চেতনা'য় উদ্বুদ্ধ করে।

'বিবিধের মাঝে মহান মিলনে'র কথা মনে রেখেই ভারতের ইতিহাস বুঝতে হবে। আজ জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে একদিকে যেমন আঞ্চলিক বিশিষ্টতাকে মর্যাদা দিতে হবে অপরদিকে তেমনি যুগযুগান্তরের ঐক্যের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই জাতীয় সংহতির পথ সুগম হবে।

(ঘ) ভারতের ইতিহাসে প্রাচীন যুগের উপাদান ঃ

আজ আমরা (ভারতবাসী) যা হয়েছি তা' হতে শুরু হয়েছিল পাঁচ হাজার বছরেরও আগে, অর্থাৎ ভারতের ইতিহাসে গোড়ার দিকে। এই গোড়ার দিকটিই হল ভারত ইতিহাসে প্রাচীন যুগ। প্রশ্ন জাগে এত আগেকার ইতিহাস আমরা জেনেছি কি করে ? আজকের ঐতিহাসিকরা তো সশরীরে অতীতে ফিরে যেতে পারেন না। তবু এঁরা অতীতকে দেখেছেন এজন্য যে অতীত নিজের সাক্ষ্য রেখে গেছে বর্তমানের কাছে। বিভিন্নভাবে রক্ষিত এই সাক্ষ্যই ইতিহাসের উপাদান। অনলস পরিশ্রমের মাধ্যমে ঐতিহাসিকগণ উপাদান বা নিদর্শন সংগ্রহ করে ইতিহাস রচনা করেন। প্রাচীন যুগের ইতিহাসের সময়টিকে কাজের সুবিধার জন্য দু'টি অধ্যায়ে ভাগ করা হয় ; যথা—(ক) প্রাক্-ঐতিহাসিক ও (খ) ঐতিহাসিক।

(ক) প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে মানুষকে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়াই করতে হয়েছে। সে যুগের লিখিত উপাদান কিছু নেই। তবে কিছু তৈজসপত্র, মৃৎপাত্র, দেয়াল কিংবা গুহাচিত্র, নরকঙ্কাল এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ভগ্নাবশেষ (যেমন হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদাড়ো) প্রভৃতি সে সময়কার মানুষের কথা জানতে সাহায্য করে।

(খ) আর্যদের ভারতে আগমন এবং বৈদিক সভ্যতার জন্মকাল (প্রায় ১৫০০—১৪০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) হতে ভারতের ঐতিহাসিক যুগের শুরু। এ যুগে লিখিত উপাদানের সাহায্যে ইতিহাস লেখা সম্ভব হয়েছে। এভাবে প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ হতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী বিজয় ভারত ইতিহাসের প্রাচীন যুগ বলে চিহ্নিত। এ যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদানগুলিকে নিম্নরূপ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ; প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র ; প্রাচীন ঐতিহাসিক রচনা ; বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী।

১। **প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ঃ** ইহা আবার চার ভাগে বিভক্ত। যথা—

(ক **প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ঃ** প্রাচীন আমলের বসতিগুলিকে ঘিরে সেখানে খনন কার্যের ফলে মাটির তলায় চাপা পড়া অবস্থায় ব্যবহৃত জিনিসপত্রের উদ্ধার করা হয়েছে (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হরপ্পা সভ্যতা দ্রষ্টব্য)। সিন্ধু উপত্যকা ছাড়াও বালুচ, লোথাল, নর্মদা উপত্যকায় সভ্যতার পরিচয়বাহী প্রচুর উপাদান পাওয়া গেছে। ভারতের বাইরে মধ্যএশিয়ার খোটান অঞ্চলে বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

(খ) **প্রাচীন যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঃ** ভারতের প্রাচীন যুগের স্থাপত্যের নিদর্শনরূপে খাজুরাহো মন্দির, সাঁচীর স্তূপ, সারনাথের বৌদ্ধ বিহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর্যের নিদর্শনরূপে অজন্তা, ইলোরার গুহাচিত্র, দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলোর শিল্পরীতি প্রাচীন যুগের শিল্পীদের হাতের সূক্ষ্মকাজের ছোঁয়ায় ভাস্বর। এছাড়া পাঞ্জাব ও কান্দাহার অঞ্চলে প্রাপ্ত মূর্তিগুলো ইন্দো-গ্রীক শিল্পরীতির সমন্বয়ে সৃষ্ট **গান্ধার শিল্প** নামে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পরীতির নিদর্শন। এই স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন থেকে আমরা সে যুগের সমাজের আর্থিক অবস্থা ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি।

(গ) **শিলালিপি ঃ** প্রাচীন যুগে অনেক রাজা সন, তারিখ, রাজার নাম কীর্তি-কাহিনী, পাথর, তামা বা ধাতুফলককে খোদাই করে রাখতেন। অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি, সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধে হরিষেণের প্রশস্তি, খারবেলের হাতিগুম্ফা লিপি, রুদ্রদামনের

গিরনার লিপি এবং বাংলার পাল রাজাদের সম্বন্ধে খালিমপুরের তাম্রলিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত, পালি, তামিল প্রভৃতি ভাষায় উৎকীর্ণ লিপিগুলি ইতিহাসের উপাদান হিসাবেও বেশ নির্ভরযোগ্য।

(ঘ) **প্রাচীনমুদ্রা**ঃ ভারতে প্রাচীন যুগে প্রাপ্ত তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রায় অঙ্কিত রাজাদের নাম সিংহাসনে বসবার সময়, রাজত্বকাল ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে জানা যায়। আবার মুদ্রায় অঙ্কিত দেবদেবীর মূর্তি থেকে ধর্মবিশ্বাস, মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতুর উৎকর্ষ-অপকর্ষ,—থেকে আর্থিক অবস্থা জানা যায়। এছাড়া মুদ্রার গড়ন এবং কারুকার্য থেকে শিল্পনৈপুণ্য বোঝা যায়। প্রাচীন যুগে ইন্দো-গ্রীক, শক, পহ্লব ও কুষাণ যুগের ইতিহাস প্রধানতঃ মুদ্রার সাহায্যে রচিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত রোমকমুদ্রা থেকে অনুমিত হয় যে, সেখান থেকে সমুদ্রপথে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য প্রচলিত ছিল।

২। **প্রাচীন সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র**ঃ ভারতের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র যথাঃ—বেদ, উপনিষদ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলিতে ইতিহাসের বহু উপাদান ছড়িয়ে আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মুদ্রারাক্ষস নাটক হতে মৌর্য যুগের সমাজ, অর্থনীতি ও নানা ঘটনা জানা যায়। বিশ্ববন্দিত সাহিত্য রচয়িতা কালিদাসের কাব্যেও গুপ্তযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিফলন দেখা যায়। সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়াও তামিল সাহিত্যিক উপাদান 'সঙ্গম' (কবি সমাবেশ বা সঙ্গম) সাহিত্য তামিলনাড়ুর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে সমৃদ্ধ।

৩। **প্রাচীন ঐতিহাসিক রচনাবলী**ঃ পুরাণে বর্ণিত রাজবংশতালিকা ও ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। সে যুগের কবিদের রচিত জীবনচরিতগুলো যথা-বাণভট্টের হর্ষচরিত, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, পালরাজা রাম পাল ও কৈবর্ত চাষীদের মধ্যেকার যুদ্ধকাহিনী, বিহ্‌লনের বিক্রমাঙ্ক দেব চরিত, কল্যাণের চালুক্য নৃপতি ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সাফল্যের কথা, কাশ্মীরের কবি কহ্‌লনের রাজতরঙ্গিণী (কাশ্মীরের বিভিন্ন রাজার জীবনীর সংকলন) ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ। দক্ষিণ ভারতের তামিল ইতিহাস নান্দি কলম্বকম্ বিখ্যাত ঐতিহাসিক রচনা।

৪। **বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী**ঃ আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের পর গ্রীকরাজ সেলুকসের দূত মেগাস্থিনিস মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় আসেন। তাঁর রচিত 'ইণ্ডিকা'-র প্রাপ্ত অংশে মৌর্য শাসন ব্যবস্থাও সে যুগের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপের বর্ণনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ ও বাণিজ্যের উপাদান হিসাবে দুটি গ্রীক গ্রন্থ অত্যন্ত মূল্যবানঃ একটি **দি পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি'** (The Periplus of the Erythrean Sea) এবং অপরটি **টলেমির** (Ptolemy) **জিওগ্রাফি** (Geography)। ভারত-ইতালীর বাণিজ্যিক অপর একটি নির্ভরযোগ্য দলিল হল ল্যাটিন ভাষায় লেখা **'প্লিনির ন্যাচারালিস হিস্টোরিয়া'**।

চৈনিক পরিব্রাজক গুপ্তযুগে ফাহিয়েন, হর্ষবর্ধনের সময় হিউয়েন-সাঙ্ এবং পরে ইৎসিঙ্, তিব্বতী পণ্ডিত তারানাথ ভারত সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিবরণ রেখে গেছেন। এরপর প্রাচীন যুগের প্রায় শেষ দিকে অল্‌বিরূণী, সুলেমান, আল্‌মাসুদি প্রভৃতি আরবীয় পণ্ডিতদের ভারত বিবরণ উপাদান হিসেবে অমূল্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ

Dawn of Indian Civilization

(ক) সংস্কৃতির পুরানো, মধ্য ও নব্য প্রস্তর স্তর ঃ

কোটি কোটি বছর আগে এ পৃথিবী সৃষ্টি হলেও মানুষ সৃষ্টি হয়েছে এখন থেকে কয়েক লক্ষ বছর আগে। খ্রীষ্টের জন্মের ৫০০,০০০ বছর আগে থেকে ভারতবর্ষে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সে সময় গাছের ফলমূল, জলের মাছ এবং পশুর কাঁচা মাংস খেয়েই মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। এই সময়টাকে বলে আদিম মানবের যুগ।

তারপর খাদ্য সংগ্রহের নিরন্তর সংগ্রাম এবং জীবনধারণের নানাবিধ সমস্যার তাড়নায় নিজের চেষ্টাতেই মানুষ আগুন জেলেছে, দলবদ্ধ হয়েছে, পাথরের হাতিয়ার বানিয়েছে—যদিও এগুলো না ছিল মসৃণ, না ছিল সুন্দর। ঐতিহাসিকগণ এ যুগকে পুরানো প্রস্তর (Palaeolithic) যুগ বলেছেন। কারণ এ-যুগের মানুষদের জীবনযাত্রার প্রধান উপকরণ ছিল প্রস্তর। এই পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির সূচনা হয় প্রায় চার পাঁচ লক্ষ



পুরাতন প্রস্তর যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র

বছর আগে। ভারতে পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির চিহ্ন পাওয়া গেছে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, গুজরাট রাজস্থান ও দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে বিশেষ করে নদী উপত্যকা অঞ্চলে। এই যুগ সম্বন্ধে কোন লিখিত প্রমাণ নেই বলে একে বলা হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগ। তবে তখনকার মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্রই তাদের সম্বন্ধে ধারণা করার একমাত্র উপায়। দশ হাজার বছর আগেও পৃথিবীতে পুরাতন প্রস্তর যুগ বর্তমান ছিল। তারপর আরও অনেক বছরের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ মাঠে ঘাটে পাওয়া শস্য কুড়িয়ে এনেছে এবং সে শস্যদানা খেতে শিখেছে যদিও তখনও নিজেই শস্য ফলাতে পারেনি।

প্রস্তরযুগের ইতিহাসে যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল তার নাম মধ্যপ্রস্তর (Mesolithic) যুগ। এযুগের আবির্ভাব হয়েছিল পুরাতন ও নূতন প্রস্তর যুগের মাঝামাঝি। ভারতবর্ষে এযুগ শুরু হয়েছিল খৃষ্টের জন্মের ৮০০০ বছর আগে এবং স্থায়ী হয়েছিল ৪০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। প্রস্তর যুগের এই



মধ্য প্রস্তর যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র

মধ্যবর্তী স্তরে মানুষ মূলত শিকারজীবি হলেও হাতিয়ারের ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই হাতিয়ারগুলো ছিল আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু সূঁচালো শিলাখণ্ডে তৈরী বলে আগের চেয়ে বেশী কার্যকরী। এছাড়া দূর থেকে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানবার হাতিয়াররূপে ধনুর্বাণের উদ্ভবের ফলে এযুগে শিকার হয়েছে আরও সহজ। উত্তর কর্ণাটকের ব্রহ্মগিরি এবং গুজরাটের লংঘনাজে এদের ব্যবহৃত হাতিয়ারের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব হাজার দশেক বছর আগে পর্যন্ত দীর্ঘ পুরাতন প্রস্তর যুগ ও হ্রস্ব মধ্যপ্রস্তর যুগের (এখন থেকে প্রায় হাজার দশেক বছর আগে) পর ভারতে নব প্রস্তর (Neolithic)



নব প্রস্তর যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র

যুগের সূচনা হয়েছিল। নব প্রস্তর নামটি এসেছে নতুন ও মসৃণ পাথুরে হাতিয়ার কুড়ুল থেকে এবং ধার দেওয়ার প্রণালীর নতুনত্বে। হাতিয়ারের কার্যকারিতা অনেক বেশী বেড়ে যাওয়ার ফলে মানবসভ্যতার ইতিহাসে এযুগে একটি বিরাট গুণগত পরিবর্তন সূচিত হল।

এই সংস্কৃতির যুগে কৃষি আবিষ্কারের ফলে খাদ্য সংগ্রাহকের অবস্থা থেকে মানুষের খাদ্য-উৎপাদকের পর্যায়ে উত্তরণ নিঃসন্দেহে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এল। তখন থেকে মানুষের জীবনে এল অনেকটা স্থায়িত্ব। তাঁরা স্থায়িভাবে ঘর বাঁধার ফলে গ্রাম গড়লেন। ধীরে ধীরে সামাজিক নিয়ম কানুন চালু করে মানুষ সামাজিক জীবনে নিয়ে এলেন খানিকটা শৃঙ্খলা। এ থেকেই মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির স্ফুরণ হতে থাকে। চাকার আবিষ্কার হওয়ায় বাসনপত্র তৈরীতে কুমোরের কাজ হয়েছে সহজ। ক্রমে ক্রমে বয়নশিল্পেও নানারূপ কারিগরী কৌশল তাঁরা আয়ত্ত করেছেন। তারপর কৌশলে ভাব প্রকাশের বাহনরূপে ভাষার ব্যবহার এল। অতিরিক্ত ফসল ও উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী নিয়ে শুরু হয় ব্যবসা বাণিজ্য। এসময় থেকে মানুষ ক্ষুধা নিবৃত্ত করে অবসর সময়ে মনের প্রয়োজন মেটাতে শেখেন সাহিত্য, শিল্পকলা। আর এগুলোকে বড় করে তুলবার প্রয়াসের মধ্য দিয়েই সভ্যতার 'যাত্রা হল শুরু'।

(খ) হরপ্পা সভ্যতা (তাম্র-ব্রোঞ্জ সংস্কৃতির যুগ) ঃ

নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির শেষভাগে অস্ত্রশস্ত্র ও জীবন যাপনের উপকরণে তামা বা ব্রোঞ্জের (তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে) ব্যবহার দেখা দেয়। এই নতুন ধাতুর পাশাপাশি পাথরের উন্নত হাতিয়ারও কাজ করছিল। এই কারণেই নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির পরবর্তী পর্যায়কে তাম্র-প্রস্তর (Chalcolithic) সংস্কৃতি বলা হয়। এই সংস্কৃতিগুলিকেই আদি ঐতিহাসিক (Proto-historic) সভ্যতা বলা হয়। ইহা প্রাক-লৌহ যুগীয় সভ্যতার স্তর। ভারতবর্ষে এইযুগেই কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির কেন্দ্ররূপে নদী উপত্যকা অঞ্চলের সভ্যতার আদি লীলাভূমি-রূপে গড়ে ওঠে। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরে যেমন নীল নদ, মেসোপটেমিয়ায় ইউফ্রেতিস নদী, ভারতবর্ষেও তেমনি সিন্ধুনদের অববাহিকা ও আরও বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে হরপ্পা সভ্যতা। ইহা ছিল একটি উন্নত তাম্র-ব্রোঞ্জ সংস্কৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ গর্ডন চাইল্ড-এর মতে খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে আদি ঐতিহাসিক (Proto-historic) যুগের মানুষ কৃষিকার্য, তামার ব্যবহার, দ্রব্যের বিনিময় ব্যবস্থা এবং নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতবর্ষের হরপ্পা সভ্যতা ছিল এই নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র।



হরপ্পা সভ্যতা

ভারতে প্রাচীন সভ্যতার যে সব চিহ্ন মাটির তলায় আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সিন্ধুপ্রদেশে লারকানা জেলার মহেঞ্জোদাড়ো এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে মুলতান জেলার হরপ্পা (দুটি জায়গাই এখন পাকিস্থানে) সব চাইতে পুরনো বলে স্বীকৃত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মহেঞ্জোদাড়ো' এবং পরের বছর দয়ারাম

সাহানী কর্তৃক হরপ্পায় খনন কার্যের ফলে এই প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। মহেঞ্জোদড়ো স্থানটি সিন্ধুর বাগান (নখলিস্থান) বলে পরিচিত। মহেঞ্জোদড়ো শব্দটির অর্থ মৃতের স্তূপ। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় প্রমাণিত হয় যে, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো একই সভ্যতার অন্তর্গত। সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে এই সভ্যতার উদ্ভব বলে স্থানের নামানুসারে সেই সভ্যতার নামকরণ হয় সিন্ধুসভ্যতা।

এরপর ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই সভ্যতা সম্পর্কে অধিকতর তথ্য জানবার জন্য সিন্ধু ও বালুচিস্তানে ব্যাপক খনন কার্য চলে। হরপ্পা সংস্কৃতির আরও নিদর্শন পরে আবিষ্কৃত হয়।

হরপ্পা সভ্যতার ব্যাপ্তি ও প্রাচীনত্ব ঃ

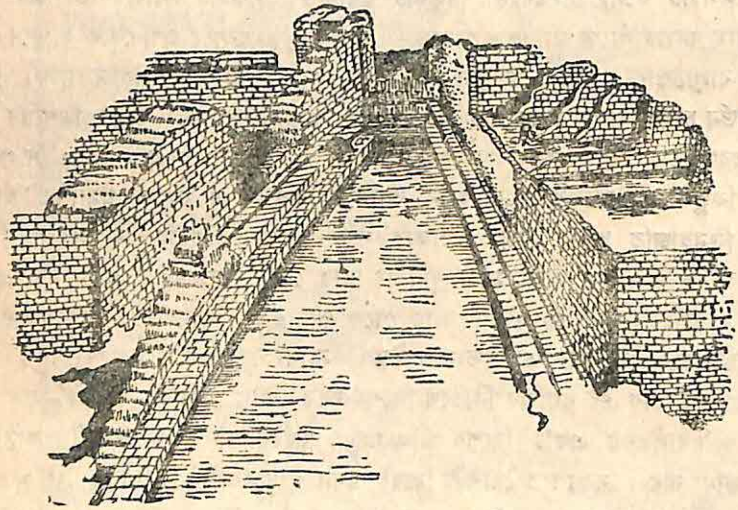
১৯৪৭ সনে হরপ্পা সভ্যতার জানা কেন্দ্রগুলি পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভারতীয় এলাকায় ঐ সভ্যতার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা, তা জানবার জন্য উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের বিরাট জায়গা নিয়ে মাটি খোঁড়া হয়। ফলে পাঞ্জাবের আম্বালা জেলার অন্তর্গত রূপার, মিরাট জিলার আলমগীরপুর, উত্তর রাজস্থানের কালিবঙ্গান, গুজরাটের রংপুর, ক্যাম্বে উপসাগরের অনতিদূরে লোথাল প্রভৃতি অনেক অঞ্চলে হরপ্পা সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ২৫০টি সভ্যতার কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে অবশ্য মাত্র ছ'টিকে নগর বলে চিহ্নিত করা হয়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো ছাড়া তৃতীয় নগরটি হলো চানহুদড়ো, চতুর্থটি লোথালে, পঞ্চমটি কালিবঙ্গানে এবং ষষ্ঠটি হরিয়ানার বনওয়ালীতে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সভ্যতা উত্তরে জম্মু থেকে দক্ষিণে নর্মদা, পশ্চিমে বালুচিস্থানের মাক্রান উপকূল থেকে উত্তর-পূর্বে মিরাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৯৫৪ সালে গর্ডন চাইল্ড বলেন হরপ্পা সভ্যতার বিস্তৃতি 'প্রাচীন সাম্রাজ্য' যুগের মিশরের প্রায় দ্বিগুণ এবং সুমের ও আক্কাদ সভ্যতার চারগুণ। এছাড়া হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলগুলির অনুরূপ কিছু সীল ইরাকের কয়েকস্থানে আবিষ্কৃত হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে খৃষ্টপূর্ব তিনহাজার অব্দে হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার যোগাযোগ ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ ও ২০০০ অব্দের মধ্যে পৃথিবীর আর কোন সভ্যতা হরপ্পার মত সুবৃহৎ ছিল না। সেই হিসাবে এই সভ্যতা আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছরেরও পূর্বেকার সভ্যতা। তাই প্রাচীনত্বের দিক থেকে এই সভ্যতার উদ্ভব অন্যান্য সভ্যতার অনেক আগের।

হরপ্পা সভ্যতার এই ব্যাপ্তির নিরিখে বিশেষ করে প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে সেই স্থানের অধিবাসীদের একটি বিশেষ জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিচয় জানা যায়। সভ্যতার বৈশিষ্ট্য দিয়েই এখন আধুনিক ঐতিহাসিকরা এই সভ্যতার নাম দিচ্ছেন হরপ্পা সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার বাইরেও ছিল এই সভ্যতার অস্তিত্ব। কাজেই একে সিন্ধু সভ্যতা না বলে বলা হয় হরপ্পা সভ্যতা।

হরপ্পা সভ্যতা কত পুরানো, এই প্রশ্নটি পণ্ডিতদের বেশ ভাবিয়েছে। তবে ইরাকে প্রাপ্ত তিরিশটি হরপ্পীয় সীল সে দেশের সঙ্গে হরপ্পীয়দের বাণিজ্য সম্পর্ক সূচিত করে। এই সীলগুলিই আবার হরপ্পা সভ্যতার কালনির্ণয়ের প্রধান উপকরণ। ইরানীয় প্রত্নতত্ত্বের হিসাবে উল্লেখিত সীলগুলি আক্কাদ নৃপতি সারগণের সমসাময়িক অর্থাৎ আনুমানিক ২৩৫০ খৃঃ পূঃ কাছাকাছি। হরপ্পা সভ্যতার আয়ুষ্কাল খৃঃ পূঃ ২৫০০ থেকে

১৫০০ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত ধরা হয়। পণ্ডিতদের মতে আর্যদের বেদ রচনা হয়েছিল খৃঃ পূঃ প্রায় দু'হাজার বছরেরও কিছু আগে। তাই একথা বলা যেতে পারে যে হরপ্পা সভ্যতা আর্য সভ্যতার চেয়েও পুরানো। এছাড়া দু'সভ্যতার মধ্যে তুলনা করেও একথা বলা যায়ঃ হরপ্পা সভ্যতায় তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার ছিল, লোহার ব্যবহার ছিল না। বস্তুতঃ উভয় সভ্যতা একই সভ্যতার দুটি পর্যায় নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বেশ আগে ও পরে গড়ে উঠেছিল। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের কাল আনুমানিক ১৭৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে।

হরপ্পা সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ: হরপ্পা সভ্যতা একটি নাগরিক সভ্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই সভ্যতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল নগর পরিকল্পনা। মহেঞ্জোদড়ো শহরটি পরপর সাতবার নির্মিত হয়েছিল এবং হরপ্পা আটবার। একটি শহরের ধ্বংসস্তূপের উপর পরবর্তী যুগে আবার একটি শহর গড়ে ওঠে। প্রতিবারই একই প্রণালীতে নগরবিন্যাস হয়েছিল। হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়োতে একটি করে নগরদুর্গ তৈরী হয়েছিল। সম্ভবত শহরের শাসক শ্রেণী এই দুর্গে বাস করতেন। নগর দুর্গের ঠিক নীচে দু'টি শহরেই ছিল ছোট উপ-নগরী। দু'টি নগরই ছিল সুবিন্যস্ত, পথগুলি ছিল সোজাসুজি। কোন কোন রাস্তা ছিল ৩৪ ফুট চওড়া এবং পথ চলতে সরু রাস্তা ছিল ৯ ফুট চওড়া। প্রত্যেক বাড়ীতেই ছিল পাকাকূপ এবং স্নানাগার। জলনিকাশের জন্য ছিল সুপরিকল্পিত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা।



মহেঞ্জোদড়োর পয়ঃপ্রণালী

বাড়ী থেকে জল নির্গত হয়ে এসে পড়ত রাস্তার নর্দমায়। কখনও ইট বা পাথরের চাঁই দিয়ে নর্দমাগুলি ঢাকা থাকত। অন্য কোন সমসাময়িক সভ্যতা স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পা সভ্যতার মত এতটা নজর দেয় নি।

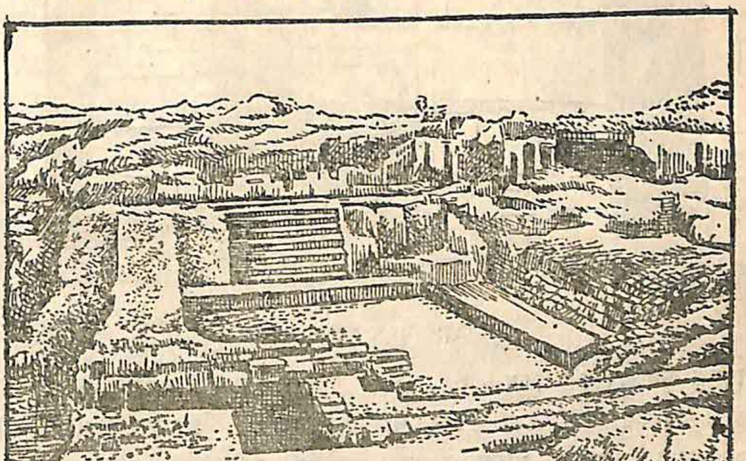
মহেঞ্জোদড়োর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকীর্তি ছিল এর বৃহৎ স্নানাগার। ইটের কাজের অভিনব দক্ষতার এটি একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। এই স্নানাগারটি নগর দুর্গের শীর্ষদেশে অবস্থিত ছিল। ইহার উভয় প্রান্তে ওঠা-নামার জন্য সিঁড়ি রয়েছে।

স্নানের জায়গার পাশেই কয়েকটি ছোট ছোট জামা কাপড় বদলাবার ঘর তৈরী করা ছিল। স্নানাগার থেকে জল বেরিয়ে যেত ছোট নালী বেয়ে।

মহেঞ্জোদড়োর সর্ববৃহৎ দালানটি একটি শস্যগোলার। হরপ্পার দুর্গাভ্যন্তরে ছয়টি শস্যগোলার সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানকার শস্যগোলাগুলির দক্ষিণে গোলাকৃতি ইটের তৈরী একখানি মঞ্চ পাওয়া গিয়েছে। মেঝের খাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা গম ও বার্লির দানা থেকে মনে করা হয় এই মঞ্চগুলিতে শস্য ঝাড়াই করা হত।

এই সভ্যতার নগর পরিকল্পনায় পোড়া ইটের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। কারণ সমকালীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশরে বাড়ীঘর নির্মিত হত রৌদ্রে পোড়া ইটের সাহায্যে। বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ী ছাড়াও হরপ্পায় একটি বৃহৎ অট্টালিকার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবতঃ উহা ছিল নগরবাসীর অভিনব পৌরসভা।

হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল উন্নত নাগরিকতার ছাপ। মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার নগর গঠনের ধরণ দেখে মনে হয় যে নাগরিকগণের আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। তাদের জীবন ছিল একদিকে আরামদায়ক ও অপরদিকে কর্মমুখর। বড় বড় বাড়ীগুলি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ব্যারাকের মত সারি দেওয়া ছোট ছোট বাড়ীর অস্তিত্ব ছিল। সম্ভবতঃ এসব বাড়ীগুলি ছিল শ্রমিক বা দাসশ্রেণীর লোকদের বাসস্থান। ধনী ও

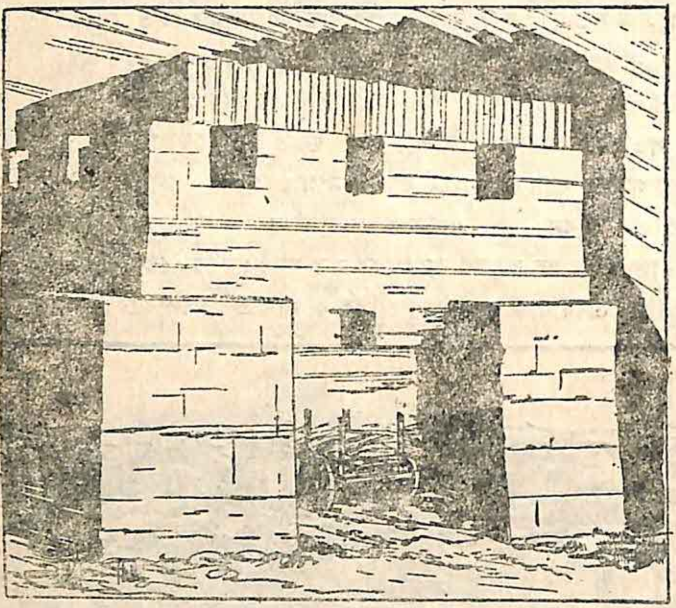


মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগার

দরিদ্রের বাসস্থানের তারতম্য লক্ষ্য করে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে তখনকার সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রেণীগত পার্থক্য ছিল। ধনী-বুর্জোয়া শ্রেণী সবরকম সুযোগ সুবিধে ভোগ করতেন, আর দরিদ্র শ্রেণী শোষিত হত। তাঁদের রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতদের মতে শহরগুলিতে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। বিভিন্ন প্রমাণাদি থেকে একথা আমরা বলতে পারি যে হরপ্পা সভ্যতা ছিল একটা উন্নত ধরণের নাগরিক সভ্যতা।

অর্থ নৈতিক জীবন ঃ কৃষিকার্য, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ

সিন্ধু উপত্যকার সমৃদ্ধ গ্রাম ও শহর দেখে মনে হয় প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের জমি অত্যন্ত উর্বর ছিল। বনভূমির প্রাচুর্য হেতু সে সময় বৃষ্টিপাতের পরিমাণও ছিল বেশী। তবে সিন্ধুনদে বাৎসরিক প্লাবনই ছিল এই অঞ্চলের উর্বরতার প্রধান কারণ। মিশরের নীলনদের তুলনায় ভারতের সিন্ধুনদ অনেক বেশী পলিমাটি বহন করে আনতো। ফসলের মধ্যে প্রধান ছিল গম ও বার্লি। জমি চাষ করার উপকরণ যেমন লাঙ্গলের ফলা বা



হরপ্পার বৃহৎ শস্যভাণ্ডার

নিড়ানী সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া না গেলেও রাজস্থানের কালিবঙ্গানে হরপ্পা-সভ্যতার সময়ে জমি চাষ করা হত এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণ শস্য উৎপাদন হলেও শহরের মানুষদের যেমন শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের খাদ্য যোগান দিতে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হত। গম, বার্লি, রাই ও মটর প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হত। এছাড়া তাঁরা তিল ও সর্ষে উৎপন্ন করতো। পৃথিবীর মধ্যে সিন্ধুবাসীই প্রথম তুলা উৎপন্ন করেছিল। সিন্ধু অঞ্চলে তুলা উৎপন্ন হত বলে গ্রীকেরা এর নাম দিয়েছিল সিণ্ডন।

হরপ্পাবাসীরা প্রধানত কৃষিজীবী হলেও ব্যাপকহারে তারা পশু পালনও করতো। বলদ, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও শূকর ছিল গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে প্রধান। লোথালে টেরাকোটা মূর্তিতে একটী অশ্বের উপস্থিতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব দুই হাজার অব্দে এখানে অশ্ব একটি পরিচিত প্রাণী ছিল।

হরপ্পাসভ্যতার অধিবাসীরা আমিষ ও নিরামিষভোজী ছিলেন। গম ও যব ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। এছাড়া মাছ, মাংস, খেজুর, দুধ প্রভৃতি খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হত।

এখানকার অধিবাসিগণের পোশাক সুতো ও পশম দিয়ে তৈরী হত। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কেশ ছিল দীর্ঘ। স্ত্রীলোকগণ সোনা, রূপা ও দামী পাথরের অলঙ্কার ব্যবহার



হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত সীল ও অলঙ্কারাদি

করতেন। পুরুষরাও অলঙ্কার ধারণ করতেন। স্ত্রীলোকেরা নানা প্রকারের প্রসাধন দ্রব্যও ব্যবহার করতেন।

কৃষি, পশুপালন ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল সিন্ধুবাসীদের অন্যতম প্রধান জীবিকা এখানকার অধিবাসিগণ তামা, হাতির দাঁত, সুতী কাপড়, ময়ূর প্রভৃতি রপ্তানি করতেন। কয়েকটি সীলমোহরে নৌকার চিত্র দেখে অনুমান হয় যে নৌবিদ্যা তাদের অজানা ছিল না। সীলমোহরে উটের কঙ্কাল থেকে অনুমান হয় যে অন্যান্য বাইরের দেশের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সম্ভবতঃ হরপ্পার শাসকশ্রেণী যুদ্ধের চেয়ে বাণিজ্যে বেশী আগ্রহী ছিলেন। মনে হয় বণিকশ্রেণী ছিলেন এই সভ্যতার সর্বনিয়ন্তা।

এই সভ্যতার সামাজিক জীবন গঠিত ছিল পেশাগত দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ নিয়ে—যেমন, অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ, পুরোহিত, বণিক, স্থপতি, কর্মকার সূত্রকার, কুম্ভকার, সীলমোহর খোদাইকার প্রভৃতি নিয়ে। এ থেকে মনে হয় এখানকার শিল্প-ব্যবস্থা উন্নতমানের ছিল। মেসোপটেমিয়ার মত হরপ্পায় যাজকশ্রেণীর প্রাধান্য ছিল না। কারিগররা ছিলেন বেশ দক্ষ। তারা ধাতু গালাই এবং ঢালাই করতেন, যদিও লোহা ব্যবহারের কোন প্রমাণ নেই।

ধর্মীয় জীবন ঃ হরপ্পায় অসংখ্য মূর্তি এবং সীলমোহরের উপর অঙ্কিত চিত্র দেখে অনেকে বলেন এরা শিবলিঙ্গ, পশুপতি শিব ও ভগবতীর পূজা করতেন। মিশরের অধিবাসীরা যেমন দেবী ইসিস (Isis)-এর আরাধনা করতেন, অনেকটা তেমনি হরপ্পা-বাসী পূজা করতেন পৃথিবীর দেবীকে। একটি সীলমোহরে একটি পুরুষ দেবতার ছবি পাওয়া গিয়েছে। এই দেবতার তিনটি হাত এবং মাথায় সিং, যোগীর আসনে তিনি বসে আছেন। সীল মোহরটি দেখে আমাদের পশুপতি মহাদেবের কথা মনে পড়ে। এছাড়া কতকগুলি গাছ, কুমীর, সাপ প্রভৃতিকেও এরা পবিত্র বলে মনে করতেন।

হরপ্পা সভ্যতার তাৎপর্য ও প্রভাব ঃ হরপ্পা সভ্যতা খৃষ্টজন্মের আনুমানিক দেড় হাজার বছর আগে ধ্বংস হয়েছে। হরপ্পার পরেই আসে আর্যসভ্যতা। কিন্তু হরপ্পা সভ্যতা আমাদের পোষাক, পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, তৈজসপত্র-শিল্পকলা, ধর্মচেতনা প্রভৃতির উপর প্রভাব ফেলেছে। আর্যসভ্যতাই যে ভারতের আদি সভ্যতা নয় একথা হরপ্পা-সভ্যতাই প্রমাণ করেছে। হরপ্পা সভ্যতা প্রাক-আর্যসভ্যতা প্রভৃতি সভ্যতার ধারার তুলনায় আর্যসভ্যতাই বেশী বেগবতী হয়েসারা ভারতে ছড়িয়েপড়েছে। আর্যসভ্যতা এভাবে নিজের সাথে অন্য সব সভ্যতার ধারাকে মিলিয়ে মিশিয়ে সৃষ্টি করেছে ভারতীয় সভ্যতা।

হরপ্পা সভ্যতার গুরুত্ব ঃ হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে সুদূর প্রাক্ ও আদি ঐতিহাসিক প্রস্তর যুগ থেকে তাম্র প্রস্তর যুগের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার মধ্য দিয়ে আর্যযুগ পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের নিজস্ব ধারাটি আজ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। হরপ্পা সভ্যতার ভারতীয় বৈশিষ্ট্য মিশরীয় কিম্বা সুমেরীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য থেকে কম উন্নত ছিল না। এইভাবে সভ্যতার প্রাচীনত্বের দিক থেকে বিশ্ব সভ্যতার দরবারে ভারতের আসনটি হয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ ঃ সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস হয় খৃষ্টজন্মের আনুমানিক দেড় থেকে দু' হাজার বছর আগে। কিন্তু এই সুমহান সভ্যতার ধ্বংস এলো কি করে? নানা কারণেই ধ্বংস হয়ে থাকতে পারে। সিন্ধু উপত্যকায় বৃষ্টিপাত কমে গেলে পানীয় জল ও কৃষিকার্যের জন্যে জলের অভাব দেখা দেয়। হয়তো গৃহনির্মাণের ইট তৈরীতে জ্বালানী হিসাবে গাছপালা বেহিসাবিভাবে কাটার ফলে বৃষ্টিপাত কমে গেলে পাশের অঞ্চলের মরুভূমি বিস্তৃত অঞ্চলকে গ্রাস করে নেয়। হয়তো বালুর তলানিতে সিন্ধুনদ ভরাট হয়ে গেলে হঠাৎ সামুদ্রিক বাণে দুকূল ভাসিয়ে বন্যা দেখা দেয় এবং নোনাজলের প্রভাবে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। ভূমিকম্পের ফলেও ধ্বংস হওয়া বিচিত্র নয়। এখানকার সভ্যতা অনেকটা উঁচুতে উঠে অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল এবং যার ফলে বাইরে থেকে আক্রমণ হয়ে থাকলে সে আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা উপত্যকার অধিবাসীরা হারিয়ে ফেলেছিলেন। মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া নরকঙ্কালগুলির উপর ধারালো অস্ত্রের এমনসব চিহ্ন পাওয়া গেছে যা থেকে মনে হয় আক্রমণকারীদের অস্ত্রে এরা নিহত হন। আর্যরাই হয়তো ছিলেন এই আক্রমণকারী।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদিক যুগ

(ক) আর্যজাতির পরিচয় ও আদি বাসস্থান : ভারতে তাদের সর্বপ্রথম সাহিত্যসৃষ্টি—ঋগ্বেদ।

হরপ্পা সভ্যতার পরবর্তী যুগে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৮০০ অব্দ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ হয়। ভারতের ইতিহাসে এই সভ্যতা আর্য সভ্যতা নামে পরিচিত। আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদের নামানুসারে এই সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা নামেও পরিচিত। এই সভ্যতার মানুষেরা অর্থাৎ আর্যেরা বহু বছর ধরে এক বিচিত্র সাহিত্য-সম্ভার রচনা করেছিলেন যা' বৈদিক সাহিত্য নামে পরিচিত। তাদের ভাষা ছিল প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা।

আর্যপরিচিতি—আর্য বলতে কোন বিশেষ জাতি বোঝায় না। সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, পারসিক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলি ছিল একই পরিবারভুক্ত। সম্ভবতঃ একই মূল ভাষা থেকে এই সব ভাষার উদ্ভব হয়েছে। যাঁরা সেই মূল ভাষা ব্যবহার করতেন, তাঁদেরই বলা হয় আর্য।

আর্যদের আদিবাস সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে আর্যরা উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এখন যেখানে চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রিয়া সেখানেই ছিল ভারতে আসার আগে আর্যদের আদি বাসভূমি। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে আর্যরা মধ্য এশিয়া মাইনরের নিকটবর্তী কাপাডোসিয়ায় বসবাস করতেন। এই মতের পক্ষে যুক্তি হল যে কাপাডোসিয়া অঞ্চলে বোঘাজকুই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে দুই বিবদমান পক্ষ যুদ্ধ বিরতির সময়ে যে সন্ধিপত্র রচনা করেছিলেন তা'তে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মরুৎ প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ রয়েছে।

এই থেকেই পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে মধ্য এশিয়া থেকে আর্যদের একটি শাখা ইরাণে ও অপরটি ভারতে প্রবেশ করে।

ঋগ্বেদ : ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে আর্যভাষায় রচিত বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ঋগ্বেদ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এদেশে আর্যদের কথা আমরা ঋগ্বেদ থেকে জানতে পেরেছি। তাঁদের ভাষা ছিল প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা। ঋগ্বেদ অগ্নি মিত্র, বরুণ এবং অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত প্রার্থনা মন্ত্রের সংকলন। ঋগ্বেদের একটি প্রচলিত প্রার্থনা হল,—'আমাদের মিথ্যা থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোয় এবং মৃত্যু থেকে অমরত্বে উত্তীর্ণ কর'।

ঋগ্বেদে যে মন্ত্র সন্নিবেশ আছে তা প্রকৃতপক্ষে ঋক্-এর সমষ্টি। ঋক্‌বেদ হল ঋক্-এর সংকলন। ঋক্ কি? বেদ মন্ত্রের মধ্যে যেগুলি পাদ বা চরণবদ্ধ, ছন্দোনিবদ্ধ এবং এক

একটি পূর্ণ অর্থের প্রকাশক সেগুলিকে ঋক্ বলা হয়।[১] মোট ১০২৮টি অধ্যায় বা সূক্ত ঋগ্বেদে সংকলিত হয়েছে। এই অধ্যায়গুলি বিন্যস্ত হয়েছে ১০টি খণ্ডে। এগুলিতে আছে দশ হাজারেরও বেশী শ্লোক।

ঋগ্বেদের সঙ্গে ইরাণীয় ভাষার আদিগ্রন্থ আভেস্তার অনেকদিকে মিল আছে। আর্যরা যেমন কয়েকজন দেবতা সূর্য, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতির কল্পনা করেছেন—ইরাণীরাও তেমনি করেছিলেন। ঋগ্বেদে দস্যু বলে যাদের বর্ণনা করা হয়েছে সম্ভবতঃ তাঁরাই ছিলেন ভারতের আদি অধিবাসী।

বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সমস্ত রচনাতেই ঋগ্বেদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। ঋগ্বেদের রচনা কাল ছিল প্রায় খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ হতে খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দের মধ্যে। ইংরেজ পণ্ডিত হুইটনের মতে হিন্দুধর্ম ও রাষ্ট্রনীতির সকল বীজ ঋগ্বেদের মধ্যে নিহিত আছে।[২]

(খ) বৈদিক সাহিত্যঃ

বেদ ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উৎসমুখ। বেদ থেকেই বৈদিক সাহিত্যের সূচনা, বৈদিক সাহিত্য প্রায় শতাধিক গ্রন্থের সমষ্টি। এসবের মধ্যে যে ধ্যানধারণার সূত্র ছিল তা থেকেই ক্রমে ক্রমে হয়েছে জ্ঞানের প্রসার। সৃষ্টি হয়েছে অনেক রকমের শাস্ত্র।

বেদ হিন্দুদের পবিত্রগ্রন্থ। অনেকের বিশ্বাস ঋষিরা যখন ধ্যানে বসতেন তখন স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ থেকে বেদের বাণী শুনতেন। তাই বৈদিক সাহিত্যকে "শ্রুতি" বলা হয়। বেদ প্রথমে লিখিত ছিলনা। বংশ পরম্পরায় আবৃত্তির মাধ্যমে মুখে মুখে চলে আসে। পরবর্তীকালে বেদ লিখিত হয়।

বৈদিক সাহিত্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা বেদ ও বেদাঙ্গ। বৈদিক সাহিত্যের প্রথমদিকে বেদ ও পরবর্তীকালে বেদাঙ্গ রচিত হয়। বেদ চারটি—ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব। ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলি ছন্দাকারে, স্বরলিপির মত রচিত হয়েছে সামবেদে। যজ্ঞের সময় ঋক্‌গুলিতে সুর প্রয়োগ করে গানের মত গাওয়া হত। যজুর্বেদ পদ্যে ও গদ্যে রচিত। যাগযজ্ঞ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের রীতিনীতি যজুর্বেদে পাওয়া যায়। অথর্ববেদ অনেক পরে রচিত হয়। ইহাতে চিকিৎসাবিদ্যা, যাদুবিদ্যা, তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

প্রতিটি বেদের দুটি ভাগ আছে। একভাগে আছে স্তোত্র বা মন্ত্র। একে বলে **সংহিতা**। অপরভাগে আছে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং যাগযজ্ঞ কি করে করতে হয় তার বিধিবিধান। একে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে সুবিশাল সাহিত্য—**ব্রাহ্মণ**। গার্হস্থ্য জীবনে ব্রাহ্মণ পাঠ এবং ব্রাহ্মণোক্ত যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করতে হত। বৈদিক সাহিত্যের আরণ্যকভাগ ব্রাহ্মণ ভাগের পরিশিষ্টমাত্র। যাঁরা বৃদ্ধ বয়সে সংসার পরিত্যাগ করে অরণ্যবাসী হতেন তাঁদের

১। ডঃ রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদ অনুযায়ী ঋগ্বেদে সংকলিত প্রথম ঋক্। 'অগ্নিযজ্ঞের পুরোহিত ও দীপ্তিমান ; অগ্নিদেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূত রত্নধারী ; আমি অগ্নির স্তুতি করি ॥'

২। "The Rig Veda Contains the germs of the whole development of Indian religion and polity."

ধর্মজীবন যাপনের পথ দেখানোই আরণ্যক রচনার উদ্দেশ্য ছিল। চার বেদের এক একটিকে ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে এক এক গুচ্ছ করে উপনিষদ ও সূত্র। ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় উপনিষদ। অনেকগুলির মধ্যে কয়েকটির নাম যথা—ঐতরেয়, তৈত্তেরীয়, মুণ্ডক প্রভৃতি। আর্যগণের দার্শনিক চিন্তার পরিণত রূপ উপনিষদে পাওয়া যায়।

উপনিষদগুলি সমগ্রভাবে বেদান্ত নামে পরিচিত, কারণ এগুলিতে বৈদিক চিন্তাধারার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। তাই এগুলো বেদের অন্ত বা উপসংহার। সৃষ্টি হল বেদাঙ্গ, অর্থাৎ শিক্ষা (ধ্বনি বিজ্ঞান), কল্প (যজ্ঞের বিধান)। ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দার্থ বিদ্যা, ছন্দ এবং জ্যোতিষ)। সৃষ্টি হল 'সূত্র সাহিত্য'—গৃহ্য সূত্র (পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাত্রাবিধি), শ্রৌত সূত্র (যাগযজ্ঞের বিধি), ধর্মসূত্র ইত্যাদি।

বৈদিক সাহিত্যের আর একটি বিশিষ্ট অংশ হলো হিন্দুদের ছ'খানি দর্শন। কপিলমুনির সাংখ্য, পতঞ্জলীর যোগ, গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, জৈমিনীর পূর্ব মীমাংসা ও ব্যাসের উত্তর মীমাংসা।

এছাড়া বৈদিক সাহিত্যে আর্যবীরদের উদ্দেশ্যে বহু গাথা ও স্তুতির উল্লেখ রয়েছে। ভারতে আর্য প্রভুত্ব বিস্তারে বিভিন্ন আর্যগোষ্ঠী সম্ভূত বহু আর্যবীরের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল বীর প্রশস্তি। এগুলি কাব্য সাহিত্যে পরিণতি লাভ করে। এভাবে কাব্য সাহিত্যের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যাদের পরিণত রূপ হিসাবে দেখতে পাওয়া যায় দু'খানি মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত।

(গ) বৈদিক সাহিত্যে আর্যদের জীবনযাত্রা—ঋগ্বেদে পাওয়া আর্যদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, ধর্মচেতনা ও সামাজিক জীবন-যাত্রার বর্ণনা নিম্নরূপ।

রাষ্ট্রকাঠামো—আর্যপরিবারে পিতাই ছিলেন প্রধান। কতকগুলি পরিবারের সমষ্টিতে গঠিত গ্রামের প্রধান ছিলেন গ্রামণী। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে গঠিত বিশের প্রধান ছিলেন বিশপতি। বিশের সমবায়ে সৃষ্টি হত 'জনপদ'। জনপদের প্রধান ছিলেন রাজা। রাজা ছিলেন তার গোষ্ঠীভুক্ত সকলের রক্ষক। রাজসিংহাসন ছিল বংশগত। কখনও নির্বাচনের ব্যবস্থাও ছিল। তাছাড়া ছিল গণশাসিত প্রজাতন্ত্র। রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল না, বিভিন্ন গোষ্ঠী সংগঠন তাকে সংযত রাখতেন। রাজাকে সাহায্য করতেন কিছু পরামর্শদাতা নিয়ে গঠিত 'সভা'। সর্বসাধারণের, 'সমিতি'ও মাঝে মাঝে ডাকা হত। রাজার হাতে ছিল সেনা, রথী ও অশ্বারোহী বাহিনী। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় তিনি প্রত্যক্ষভাবে সৈন্যবাহিনীর তত্ত্বাবধান করতেন। রাজ পরিবার ও রাজকর্মচারীদের পোষণের জন্য প্রজারা রাজভাণ্ডারে 'বলি' (কর, রাজস্ব ইত্যাদি) উপহার দিতেন।

প্রশাসনিক—আর্যদের প্রশাসনের কেন্দ্রে ছিলেন গোষ্ঠীপতি। যুদ্ধে সাফল্য অর্জনের জন্য গোষ্ঠীপতিকে এই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করা হত। তাকে বলা হত রাজন্। যে সভা বা সংগঠন রাজা নির্বাচন করতেন তাকে বলা হত সমিতি। গোষ্ঠীর মুখপাত্র হিসাবে তিনি গবাদি পশু সংরক্ষণ করতেন ও যুদ্ধ করতেন।

ঋক্ বেদে সভা, সমিতি, বিদ্যার্থী, গণ ইত্যাদি বিভিন্ন গোষ্ঠী সংগঠনের উল্লেখ আছে। এই সভাগুলি অধিবেশন আহ্বান করতো এবং সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করতো। এমনকি মহিলারাও এই সব সভা সমিতির কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করতেন।

দৈনন্দিন শাসনকার্যে রাজা সহায়তা নিতেন কয়েকজন কর্মচারীর। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন পুরোহিত। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীদের নাম ছিল সেনানী। যাদের কাজ ছিল অস্ত্রাদির ব্যবহার। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন কর্মচারী ছিলেন না। সম্ভবত রাজারা মানুষের কাছ থেকে স্বতস্ফূর্ত দান গ্রহণ করতেন। এই দানকে বলা হতো বলি বা বালি। যুদ্ধ-জয়ের উপঢৌকন ও অন্যান্য জিনিষ গোষ্ঠীর সংগঠনগুলির মাধ্যমে বিতরণ করা হতো। বিচারকার্য নির্বাহকারী কোন কর্মচারীর উল্লেখ ঋক্ বেদে নেই। তা বলে সমাজে চুরি, ডাকাতি বিশেষত গরু চুরির ঘটনা কম ছিল না। এই অসামাজিক কাজকর্মের উপর নজর রাখার জন্য গুপ্তচরদের নিয়োগ করা হয়েছিল।

পশুচারণ ভূমি যে কর্মচারীর অধীনে থাকতো তার উপাধি ছিল ব্রজপতি। পরিবার প্রধান বা কুলপ এবং সৈন্যবাহিনী বা গ্রামবাসীদের নেতৃত্ব দিতেন এই ব্রজপতি। মোটামুটিভাবে প্রশাসনের চরিত্র ছিল উপজাতীয় এবং সামরিক বাহিনী ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থ নৈতিক জীবন—ঋগ্বেদের যুগে অর্থনীতি ছিল প্রধানতঃ পশুপালন নির্ভর। কৃষিও ছিল অন্যতম প্রধান বৃত্তি। গাভী ছিল তাঁদের প্রধান সম্পদ। গাভীর অধিকার নিয়ে অনেক যুদ্ধবিগ্রহও ঘটতো। প্রথমদিকে গরুর সংখ্যা দিয়ে ঐশ্বর্যের হিসেব করা হতো। কৃষিকার্যে সাহায্যের জন্য কামার, কুমোর, ছুতোরের পেশার সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া তাঁতী, স্বর্ণকার, চর্মকার প্রভৃতি বৃত্তিধারী ব্যক্তিদের উল্লেখ রয়েছে।

একেবারে গোড়ার দিকে জমিতে অধিকার হয়তো ছিল যৌথভাবে সারা গ্রামের। পল্লীসমাজ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আত্মনির্ভর। ধীরে ধীরে জমি ও অন্যান্য সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যবসা বাণিজ্য বেড়ে ওঠে। এর স্বার্থে তাঁরা সমুদ্রযাত্রাও করতেন। বণিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠী শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ছিল আর্যদের প্রিয় খাদ্য। নিরামিষ পছন্দ করলেও যজ্ঞে পশুবলির পর মাংসও তাঁরা খেতেন। যজ্ঞ ও উৎসবে তাঁরা সোমরস (গুল্ম থেকে) পান করতেন।

আর্যরা সুতো ও পশমের পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন, মূল্যবান অলঙ্কারও অঙ্গে ধারণ করতেন। অবসর বিনোদনের সময় নানারূপ আমোদ প্রমোদ বিশেষ করে মৃগয়া, ঘোড়দৌড়, নাচগান, পাশাখেলা প্রভৃতি ছিল অঙ্গ।

আর্যরা ছিলেন বহু দেবদেবীর উপাসক। বৈদিক সমাজের পুরুষ প্রাধান্য, ধর্মীয় চিন্তা চেতনাতেও প্রভাব ঘটিয়েছে যেমন—ঋগ্বেদে দেবীদের তুলনায় দেবতাদের প্রাধান্য। স্ত্রী দেবতার মধ্যে ঊষা, অদিতি প্রভৃতির নাম পাওয়া গেলেও আর্যদের মধ্যে তাঁদের বিশেষ প্রচলন ছিলনা। কৃষিজীবনযাত্রার সাথে বাস্তববোধ আর্যদের ধর্ম চেতনাকে

বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে ; যেমন সূর্যের আলো, মেঘ, জল, বাতাস প্রভৃতির গুরুত্ব তাঁরা বুঝতেন। আবার ঝড়, বন্যা, বজ্র, রোগব্যাধির বিপদও বুঝতেন। তাই এসবের পিছনে বিশেষ বিশেষ শক্তির কল্পনা করে তাঁরা যেমন সূর্য, বরুণ, ইন্দ্র, মারুৎ (বায়ু) প্রভৃতি দেবতার আরাধনা করতেন তেমনি যম, নাসত্য প্রভৃতি দেবতারও আরাধনা করতেন। যজ্ঞানুষ্ঠানে মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশুবলি দিতেন।

আর্যরা ক্রমে ক্রমে বহু দেবতার স্থানে কয়েকজন প্রধান দেবতার কল্পনা করেছেন। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি। সিন্ধু সভ্যতায় ছিল শিবের পূজা। আর্যরা তাকে প্রধান দেবতা বলে গ্রহণ করেছেন। আর্য-অনার্য ধর্ম ও শিল্প সংস্কৃতির ধারা একে অপরের সাথে মিশে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি। সৃষ্টির রহস্য খুঁজতে গিয়ে শেষে দার্শনিক আর্যঋষিরা প্রধান দেবতাদের বদলে একজন পরম স্রষ্টার কল্পনা করেছেন।

সামাজিক জীবন ঃ কুলপতি বা গৃহপতিরা ছিল পরিবার ভিত্তিক সমাজের প্রধান। সমাজে পুরুষরা প্রধান থাকলেও নারীরা অবজ্ঞার পাত্রী ছিলেন না। শিক্ষা দীক্ষা এমনকি বেদের স্তোত্র রচনায় তাঁরা অংশ গ্রহণ করতেন। মেয়েদের স্থান অন্তঃপুরে হলেও সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁরা যোগ দিতেন। ঘোষা, অপলা, লোপামুদ্রার মত বিদুষী মহিলা তখন জন্মেছিলেন। শাস্ত্রালোচনায় গার্গী ও মৈত্রেয়ী আসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তখন স্ত্রী জাতির অবাধ স্বাধীনতা ছিল। দৈহিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম, ক্রীড়া ইত্যাদিতেও তাঁরা অংশ গ্রহণ করতেন। তখন স্ত্রীলোকের পক্ষে অবিবাহিত থাকা শোচনীয় ছিল না। একবিবাহ সাধারণত প্রচলিত থাকলেও বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। পরিণত বয়সে বিবাহ, কন্যার বাড়ীতে বিবাহ এবং স্বেচ্ছা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। মেয়েদের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ সাধারণতঃ ছিল না। স্বয়ম্বর প্রথাও চালু ছিল। তবে সবচেয়ে বড় কথা এই যে ঐ সময়ে সমাজে মোটেই ব্যভিচার ছিল না। মেয়েরা সোনা ও রূপোর গহনা পরত। দীর্ঘকেশ (পুরুষ ও মেয়ে) রাখাও প্রচলিত ছিল।

সমাজে গোষ্ঠী-বিভাগ ছিল। চারটি ভাগে সমাজের বিভাগকেই বলে **বর্ণাশ্রম**। আর্যরা নিজেদের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য বর্ণ বা গায়ের রংয়ের ভিত্তিতে জাতি বিভাগ করে। পুরোহিত ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত এবং রাজারা ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত ছিল। বাকীরা বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত ছিল। এরা বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি অর্থ নৈতিক কার্যাদিতে পারদর্শী ছিল। আর বিজিত আদিম অধিবাসীরা শূদ্রনামে আর্য সমাজে স্থান লাভ করে। ঋগ্বেদের যুগে সমাজ বর্ণের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যায়। আর্য ঋষিরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চার বর্ণে সমাজকে ভাগ করেছিলেন। তবে মনে রাখতে হবে যে ঋগ্বেদের যুগে এই বর্ণভেদ খুব কঠোর ছিল না অনেকটা গুণভেদ ও বর্ণভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। গীতাতেও বলা হয়েছে গুণ ও কাজের ভিত্তিতে হবে বর্ণ বিভাগ।

চতুরাশ্রম ঃ চতুরাশ্রমই ছিল আর্যসমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আর্য-সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকে শৈশবে উপবীত ধারণের পর গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালনের সঙ্গে শাস্ত্রশিক্ষা করতে হত। জীবনের ঐ সময়টাকে বলা হত **ব্রহ্মচর্যাশ্রম**।

শিক্ষান্তে জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়—**গার্হস্থ্যাশ্রম**। ভগবানে মতি রেখে বিবাহিত, সংযত জীবনযাপন করাই ছিল এই আশ্রমের কর্তব্য। প্রৌঢ় বয়সে ছিল **বানপ্রস্থ** গ্রহণের রীতি। এই সময় **সন্ন্যাস** গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে হত। চতুর্থ পর্যায়ে সংসার ত্যাগ এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করে সন্ন্যাসীর ন্যায় জপ-তপে জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করতে হত। এর নামই **চতুরাশ্রম ধর্ম**।

(ঘ) বৈদিক যুগের সম্প্রসারণ বা প্রসার ঃ

বহুদিন ধরে চলেছিল বৈদিক যুগ। এই দীর্ঘ সময়ে আর্যদের সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম-জীবনে অনেক পরিবর্তনও এসেছে। তাই বৈদিক যুগকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় যথা—আদি বৈদিক যুগ ও শেষ বৈদিক যুগ।

বৈদিক যুগের প্রথম দিকের জীবনযাত্রা ছিল সরল আর শেষ বৈদিক যুগের জীবনযাত্রা ছিল অনেকটা জটিল। আগেকার ছোট ছোট গোষ্ঠী আর ছোট ছোট রাজার বদলে এসময়ে সৃষ্টি হল বড় বড় রাজা এবং শক্তিশালী রাজা তথা কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির উদ্ভব। তাই পরবর্তী বৈদিক যুগে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে পরিবর্তন ঘটেছে অনেক এবং সামাজিক যুগের পটভূমি তৈরী হয়েছে।

বৈদিক যুগের প্রথমদিকে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় খুব কড়াকড়ি ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বর্ণাশ্রমে আসে খুবই কঠোরতা। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন সুবিধাভোগী। আর বৈশ্যরা সমাজে তেমন আসন পেতেন না সবচেয়ে নিম্নস্তরে স্থান ছিল শূদ্রদের। সমাজে নারীর অধিকার অনেকটা খর্ব হয়।

বৈদিক যুগের শেষের দিকে আর্যদের জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাও খুব বেড়ে যায়। আগে তিনখানি বেদেরই কেবল প্রাধান্য ছিল। অথর্ব বেদ অনেক পরে সংকলিত হয়। তাছাড়াও সৃষ্টি হয় আরও নানা ধরনের শাস্ত্র। সৃষ্টি হল ষড় বেদাঙ্গ এবং ব্রাহ্মণ, আরণ্যক সূত্র নামে বিপুল সাহিত্য। শাস্ত্র ছাড়াও ভিন্ন ধরনের সাহিত্যও রচিত হল। এগুলোর মধ্যে প্রধান হল রামায়ণ, মহাভারত ও গীতা। জীবনের ধর্মচিন্তায় অনেক পরিবর্তন দেখা গেল, আগেকার বহু দেবতার বদলে এসময় তাঁরা কল্পনা করলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, শিব প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান দেবতা। সবার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলেন স্রষ্টা প্রজাপতি।

অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এতেও অস্বস্তি বোধ করে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ও পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য জানার সাধনায় ব্রতী হয়ে এক পরম স্রষ্টা তথা পরমব্রহ্মের কল্পনা করেছেন। দার্শনিক চিন্তাধারাই ঋষিদের প্রভাবিত করেছে সংসার ধর্মের বদলে তপোবন জীবনের শান্তিনিকেতনে। তাঁদের সাধনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে উপনিষদ। উপনিষদেই বৈদিক সাহিত্য পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই উপনিষদকে বলা হয় বেদান্ত।

সাধারণ সমাজে অবশ্য উপনিষদের গভীর তত্ত্বের প্রভাব তেমন পড়েনি, তার পরিবর্তে সমাজের শীর্ষে ব্রাহ্মণদের উদ্যোগে পূজা-পার্বন, যাগ-যজ্ঞ, ভোগবলি প্রভৃতি আড়ম্বর অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এই ধর্মানুষ্ঠানের অধিকার থেকে শূদ্ররা ছিলেন বঞ্চিত। ব্রাহ্মণদের সর্বাত্মক প্রাধান্যের ফলে সমাজের মধ্যে এল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ-শূদ্রের নানা

জটিলতা। ধর্মের সংস্কার হয়ে পড়ল একান্ত জরুরী। সংস্কারমূলক প্রতিবাদী ধর্মরূপে জন্ম হল জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম।

উপমহাদেশে বৈদিক সভ্যতার প্রসার ঃ

নাসিকের কাছে দণ্ডক রাজ্য এবং গোদাবরীর তীরে আর্মক রাজ্যের মত আরও অনেক জায়গায় আর্য আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ে। খৃষ্টের জন্মের আনুমানিক দেড়হাজার বছর আগে আর্যজাতি ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। আর্যরা প্রথমে আফগানিস্থান হতে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে বসতিস্থাপন করেন। এই অঞ্চলটিকেই এক কথায় সপ্তনদী (সিন্ধু ইত্যাদি সাতটি নদীর উপকূলবর্তী স্থান) বলা হয়। ক্রমে আর্যরা গঙ্গা নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বসতি বিস্তার করেন। এরপর পূর্বদিকে মধ্যদেশ অর্থাৎ বর্তমান দিল্লী, উত্তর প্রদেশ ও বিহারের পশ্চিমদিকের অংশে বসতি বিস্তার করেন। প্রায় খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দ নাগাদ বৈদিক মানুষ পূর্ব দিকে উত্তর বিহারের বিদেহ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বৈদিকযুগের শেষের দিকে বাংলাদেশ ও আসামে আর্য উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে আর্য সভ্যতা দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করে অগস্ত্য (আর্য-অনার্যের সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণ ভারতীয় সমন্বয় সভ্যতা) যাত্রার কাহিনী দাক্ষিণাত্যে আর্য প্রভাবের ইঙ্গিত বহন করে। তবে সুদূর দক্ষিণে তামিল, কানাড়ী, মালোয়ালী প্রভৃতি আর্য-অনার্যের সংঘর্ষ ও সংমিশ্রণে উদ্ভূত ভারতীয় সমন্বয়ী সভ্যতা ও আদিম অধিবাসীদের ক্ষমতা, আর্যরা সম্পূর্ণ খর্ব করতে পারেননি।

আর্যরা এদেশে তাঁদের বসতি গড়তে লড়াই করেছেন প্রাচীন বাসিন্দাদের সঙ্গে। আর্যরা এদের দাস বা দস্যু বলে বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর লড়াই হয়েছে আর্যদেরই মধ্যে যারা আগে পরে এসেছেন তাঁদের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষ। পরাজিত আদিবাসীদেরও তাঁরা নিজ নিজ পতাকা তলে টেনেছেন। দু'দলেই ছিলেন আর্য ও অনার্য। সে সংঘর্ষ হয়েছে বড় ধরনের। এমনই একটি যুদ্ধ 'দশ রাজার যুদ্ধ' নামে খ্যাত। ভারত নামে আর্য শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাঁচ আর্য ও পাঁচ অনার্য এই দশ রাজার মিলিত যুদ্ধকেই বলে 'দশ রাজার যুদ্ধ'। যুদ্ধে জয়ের ফলে ভারত-গোষ্ঠীর প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। ঋগ্বেদে উল্লেখিত ভারত নাম থেকেই আমাদের দেশের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ।

আর্যরা ক্ষিপ্রগতি ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে শাণিত লোহার অস্ত্র হাতে নিয়ে অনার্যদের যুদ্ধে পরাজিত করে আর্য সভ্যতা বিস্তার করেন। গৌরবর্ণের আর্যদের মধ্যে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা ছিল। প্রথমে তাঁরা কৃষ্ণকায় আদিবাসীদের অবজ্ঞা করে তাঁদের দস্যু, রাক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত করতেন। কিন্তু কালক্রমে নিজ জাতির রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পারেন নি। আর্যদের সাথে নানাভাবে সংমিশ্রণের ফলে তাঁদের জাতিগত স্বকীয়তা লোপ পায়।

রামায়ণ ও মহাভারত

আর্য মনীষীদের অন্যতম প্রধান সৃষ্টি হল ভারতের দুই মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত। বৈদিক যুগের শেষ দিকেই মহাকাব্যের কাহিনী প্রচলিত ছিল। এই মহাকাব্য

দুটির সাথে প্রাচীন গ্রীসের ইলিয়াড ও ওডেসি নামে মহাকাব্য দুটির বেশ মিল দেখা যায়। ইউলিসিসের ধনুর সাথে রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গের বীরত্বের মধ্যে সাদৃশ্যতা আছে। রামায়ণের রচয়িতা হিসেবে মহাকবি বাল্মিকী ও মহাভারতের রচয়িতা ঋষি বেদব্যাসের নাম জানা যায়। মহাভারতের প্রধান বিষয় হল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। ইহাকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। ডঃ মজুমদারের মতে এই যুদ্ধ ১১০০-১০০০ খৃঃ পূর্বাব্দে সংঘটিত হয়। ডঃ সুনীতিকুমারের মতে রামায়ণের কাহিনী ৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দে রচিত হয়। এতে আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁদের জীবনাদর্শ ও নীতি বোধের কথাও মহাকাব্য থেকে জানা যায়।

(ঙ) লৌহযুগের সূচনা ঃ

তাম্র প্রস্তর বা ব্রোঞ্জ যুগের হাতিয়ার ও নানাবিধ উপকরণ মানুষের সভ্যতাকে বেশ কিছুটা এগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যে ধাতুকে কেন্দ্র করে মানব সভ্যতার বিরাট পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে তা হল আকরিক লৌহ ও তা' গলাবার পদ্ধতি আবিষ্কার। লোহার চাইতে অনেক মূল্যবান ধাতু আবিষ্কৃত হলেও আজ পর্যন্ত মানুষের ব্যবহার্য লোহার হাতিয়ার ও সাজসরঞ্জামের সাথে অন্য কোন ধাতুর তুলনা হয় না। তাই লোহার প্রচলন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পুরো যুগটাই লৌহ যুগ।

আর্য সভ্যতার বিশিষ্ট অবদান হল লৌহ ধাতুর ব্যবহার। সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার মানুষদের লৌহ অস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। হরপ্পা ও মহেঞ্জদাড়োয় প্রাপ্ত কিছু কিছু নরকঙ্কাল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তাঁদের উপরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন বহিরাগত আর্যগণ নতুন ধরনের অস্ত্রগুলি নিয়ে সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চল আক্রমণ করেছিলেন এবং তাদের আক্রমণের ফলেই উপরোক্ত সভ্যতার পতন ঘটে।

আর্যযুগে লৌহাস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আর্যরা দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়ায় চড়ে শাণিত লৌহ অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতেন। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির মধ্যে কোথাও অস্ত্র ও লৌহের ব্যবহার পাওয়া যায় নি। তাই ভারতে আর্যযুগেই সর্ব প্রথমে লৌহ ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল। লৌহ যুগেই ভারতবর্ষে সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে ক্রমে ক্রমে বড় বড় রাজ্য এবং কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির উদ্ভব ঘটে।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রতিবাদী আন্দোলন ঃ

(ক) বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণ সমূহ ঃ

বৈদিক যুগের শেষভাগে বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম কতকগুলি জটিল প্রাণহীন যাগযজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছিল। পশুবলি অর্থাৎ জীবহিংসা এবং সমাজে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত শ্রেণীর সর্বাত্মক প্রাধান্য সাধারণ মানুষকে অসন্তুষ্ট করে তোলে। কিন্তু মানুষের ধর্মজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি এবং বিশেষ করে উপনিষদের ধর্মবিষয়ে স্বাধীন চিন্তার প্রেরণা খৃষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দের মধ্যে এক প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের জন্ম দেয়। এই সময় গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে অসংখ্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম। অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি কালের গতিতে লুপ্ত হলেও বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়।

প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে উঠার পিছনে নানা কারণ ছিল। **প্রথমতঃ** বৈদিক যুগের শেষভাগে সুস্পষ্ট চারটি বর্ণের মধ্যে সমাজ বিভক্ত হয়ে যায়। এই চারটি বর্ণ হল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণরাই ছিলেন সামাজিক মর্যাদায় সবচেয়ে উঁচুতে। তাঁরা বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন এবং তাদের রাজস্ব দিতে হতনা। স্বভাবতই এই বর্ণ বিভক্ত সমাজ অশান্তি থেকে মুক্ত ছিলনা। ক্ষত্রিয়রা যারা ছিলেন শাসক শ্রেণীর ও যুদ্ধই ছিল যাঁদের পেশা, তাঁরা সমাজে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্যের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ক্ষত্রিয়দের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনের জন্মের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। লক্ষ্যণীয় যে জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধ উভয়েই ক্ষত্রিয় ছিলেন। **দ্বিতীয়তঃ** অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে এই সময় উত্তর-পূর্ব ভারতে এক নতুন ধরণের কৃষি-অর্থনীতির উদ্ভব ঘটে। লোহার ব্যবহার শুরু হওয়ার ফলে কৃষির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে এবং কৃষির জন্যই পশুপালন যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। বৈদিক রীতি অনুযায়ী পশুবলি স্বাভাবিকভাবেই নতুন কৃষিকার্যের সহায়ক ছিল না। বরং অনবরত পশুবলির ফলে পশুসম্পদ ক্রমশঃ কমে আসছিল। কাজেই পশু হত্যা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনগুলি সবই পশুহত্যার বিরোধী ছিল। অহিংসা ছিল বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মেরই মর্মবাণী। **তৃতীয়তঃ** উত্তর ভারতে এই সময়ে অনেক নগর গড়ে উঠে—যেমন, বারাণসী, কৌশাম্বী, রাজগৃহ, বৈশালী ইত্যাদি। এই নগরগুলিতে অসংখ্য কারিগর ও ব্যবসায়ীর সমাবেশ ঘটেছিল। এই নগরগুলিতেই সর্বপ্রথম মুদ্রার ব্যবহার শুরু হয়। মুদ্রার ব্যবহার শুরু হওয়ার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে এবং বৈশ্যদের, যাদের হাতে ছিল ব্যবসা বাণিজ্য, তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ব্রাহ্মণ প্রভাবাধীন সমাজে বৈশ্যদের স্থান ছিল নীচুতে। স্বাভাবিকভাবেই বৈশ্যরা এমন একটি ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন যা তাদের সামাজিক মর্যাদা এনে দেবে।

সেই কারণেই মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ উভয়কেই শ্রেষ্ঠীরা (যারা ছিল বৈশ্য) অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জন্য রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধের অবসানও অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। ফলে অহিংসা যে ধর্মের মূলকথা এমন একটি ধর্মমতের উদ্ভব বৈশ্যদের কাম্য ছিল।

চতুর্থতঃ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যাগযজ্ঞ, পশুবলি ও জটিল আচার অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষকে ধর্ম থেকে ক্রমশঃ দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বিলাসবহুল জীবনযাত্রা সমাজে যেমন বৈষম্যের সৃষ্টি করেছিল তেমনি সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা বেড়ে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষ সহজ, সরল, অনাড়ম্বর আগেকার জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে চেয়েছিল।

এইভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়ও সাংস্কৃতিক নানা কারণের সমন্বয়ে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

(খ) **মহাবীর ও জৈনধর্ম ঃ** জৈন কিংবদন্তী অনুসারে পরপর চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর জৈন ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারক। সর্বপ্রথম তীর্থঙ্কর ছিলেন ঋষভদেব। ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ এবং মহাবীর ছিলেন শেষ তীর্থঙ্কর। মহাবীরের জন্ম ৫৪০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ ছিলেন এক ক্ষত্রিয় দলপতি ও মাতা ত্রিশলা ছিলেন লিচ্ছবি বংশের রাজকুমারী। মগধ রাজবংশের সঙ্গেও তাঁদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করে সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নেন। দীর্ঘ বার বৎসর কঠোর তপস্যার পর তিনি 'কৈবল্য' বা চরম অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করেন। তিনি 'কেবলীন' অর্থাৎ সর্বজ্ঞ এবং ইন্দ্রিয় জয় করে 'জিতেন্দ্রিয়' বা জিন নামে পরিচিত হন। এইজন্য পরবর্তীকালে তাঁর প্রচারিত ধর্মমত জৈনধর্ম নামে পরিচিত হয়। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর মগধ, মিথিলা, অঙ্গ, কোশল প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচারের পর ৭২ বৎসর বয়সে মহাবীর পাবাপুরীতে (বিহারের রাজগীরের নিকট) দেহত্যাগ করেন।

জৈন ধর্মের মূল প্রবর্তক **পার্শ্বনাথ** এই ধর্মের চারটি মূল নীতি প্রচার করেছিলেন। এইগুলি হল—অহিংসা, সত্যবাদিতা, চুরি না করা এবং অনাসক্তি। মহাবীর ঐ চারটি নীতির সঙ্গে যোগ করেন ব্রহ্মচর্যনীতি। মহাবীর তাঁর শিষ্যদের সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পার্থিব সমস্ত কিছু ত্যাগের এমনকি পুরোপুরি পোষাক বর্জনের, তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। এইজন্য তাঁর ধর্মের অনুগামীদের 'দিগম্বর' জৈন বলা হয়। যারা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করতেন তাদের বলা হয় শ্বেতাম্বর।

জৈনরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না এবং পশুবলি ও যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে তাঁরা মহাপাপ বলে মনে করেন। সকল বস্তুর মধ্যে প্রাণের অধিষ্ঠানে তাঁরা বিশ্বাসী। কর্মফল ও পুনর্জন্মে তাঁরা হিন্দুদের মতই বিশ্বাসী। সৎকাজ, সৎজ্ঞান ও সৎব্যবহারের দ্বারা আত্মার উন্নতিসাধন ও শেষ পর্যন্ত পুনর্জন্ম থেকে নিষ্কৃতি বা 'নির্বাণ' জৈনদের চরম আদর্শ।

জৈনধর্ম প্রথমে দক্ষিণ বিহারে বিস্তৃতি লাভ করে। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যও জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। পরে এই ধর্ম পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতেও প্রসারিত হয়। মহাবীরের মূল

উপদেশগুলি চৌদ্দটি খণ্ডে সংকলিত হয়। এগুলি 'পর্ব' নামে পরিচিত। জৈনধর্ম রাষ্ট্রশক্তির আনুকূল্য লাভ না করলেও এই ধর্ম আজও ভারতে প্রচলিত রয়েছে।



মহাবীর



সিদ্ধার্থ

গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম—বুদ্ধদেবের নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তিনি সম্ভবতঃ ৫৬৬ খ্রীঃপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল কপিলাবস্তু নগরের কাছে লুম্বিনি নামক উদ্যানে, (বর্তমান নেপালে অবস্থিত)। সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম শুদ্ধোদন। বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর ও বস্তী জেলা এবং নেপালের সামান্য অংশ নিয়ে ছিল তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্য। সিদ্ধার্থের জন্ম হবার পরই তাঁর মাতা মায়াদেবী দেহত্যাগ করেন। বাল্যে সিদ্ধার্থকে তাঁর বিমাতা ও মাতৃস্বসা মহাপ্রজাবতী গৌতমী লালন পালন করেন। ১৬ বৎসর বয়সে যশোধরার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। একদিন রথে চেপে বেড়াতে গিয়ে তিনি রাজপথের ধারে ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর ছবি দেখেন। তখন থেকে তাঁর মনে জীবনের দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তির উপায় সম্বন্ধে তীব্র অনুসন্ধিৎসা জাগে। তারপর যখন তাঁর বয়স ২৯ বৎসর তখন যশোধরার (বা গোপার) একটি পুত্রসন্তান জন্মে। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল রাহুল। পুত্রের জন্মের পর সংসারের প্রতি মায়ার বন্ধন আরও দৃঢ়তর হবে ভেবে সিদ্ধার্থ একদিন রাত্রে রাজ্য, পিতা, পত্নী ও পুত্র ত্যাগ করে মুক্তির সন্ধানে বের হয়ে পড়লেন।

সংসার ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ প্রায় ৬ বৎসর কাল ব্রাহ্মণ শিক্ষকদের কাছে সংসারের দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার পথ অনুসন্ধান করেছিলেন। এ সময়ে তিনি রাজগৃহ বা রাজগীর নামক স্থানে কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে তিনি শান্তিলাভ করতে পারলেন না। তারপর তিনি বর্তমান গয়া জেলার অন্তর্গত উরুবিল্ব গ্রামে নদীতে স্নান করে একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে ধ্যানস্থ হন। এখানেই

সিদ্ধার্থ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করলেন। তিনি 'তথাগত' হলেন। যে সত্যের সন্ধানে এতদিন ঘুরছিলেন, এইবার তিনি সে সত্য লাভ করলেন। এর পর সিদ্ধার্থ 'গৌতম বুদ্ধ' নামে পরিচিত হলেন এবং কাশীর কাছে সারনাথ নামক স্থানে তাঁর ধর্মপ্রচার আরম্ভ করলেন।

লুম্বিনি উদ্যানে প্রায় ৩০০ বৎসর পরে সম্রাট্ অশোক একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। স্তম্ভের গায়ে লেখা ছিল, "এইখানে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেছেন।" সারনাথের অশোকস্তূপ এখনও বর্তমান। আড়াই হাজার বৎসর পরে আজও স্তূপটি সারনাথে বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচারের পরিচয় দেয়।

সারনাথের পর বুদ্ধদেব প্রায় ৪৫ বৎসর কাল বর্তমান অযোধ্যা, বিহার ও নিকটবর্তী স্থানে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। রাজা ও প্রজা, ধনী ও দরিদ্র, সকলেই বুদ্ধদেবের বাণী শুনতে আসতেন। বুদ্ধদেব তাঁর বাণী প্রচার করতেন দেবভাষা সংস্কৃতে নহে, মাগধী ভাষাতে। জনসাধারণ এই সরল ও লোক প্রচলিত ভাষায় তাঁর বাণী সহজে বুঝতে পারত। তাঁর শিষ্য-সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। ৪৫ বৎসর এইভাবে প্রচার করে বুদ্ধদেব ৮০ বছর বয়সে বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় অবস্থিত কুশীনগর গ্রামে মহানির্বাণ লাভ করেন (সম্ভবতঃ ৪৮৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে)।

বুদ্ধের বাণীঃ—সংসারে মানুষের জীবন দুঃখময়। এই দুঃখময় জীবন থেকে উদ্ধার পাবার উপায় গৌতম বুদ্ধ জগতকে দেখিয়েছেন। তিনি হিন্দুধর্মের কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ, দুইই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মৃত্যুতেই মানুষের জীবনের শেষ হয় না। মানুষ জন্মজন্মান্তর নিজের কর্মফল ভোগ করে। বুদ্ধদেব বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন নাই এবং তিনি বৈদিক যাগযজ্ঞের ও পশুবলির বিরোধী ছিলেন। কামনা-বাসনা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য হিন্দু-শাস্ত্রবিদ্‌গণ কঠোর তপস্যার ব্যবস্থা করেছিলেন। বুদ্ধ নিজে কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে তিনি শান্তি পান নাই। তাই তিনি 'মধ্যপন্থা'র প্রচার করেছিলেন। মানুষের কামনা বাসনাতে মগ্ন থাকাও কর্তব্য নহে, আবার কঠোর তপস্যা করাতেও শান্তি বা মুক্তি পাওয়া যায় না—এই ছিল বুদ্ধদেবের মত। বুদ্ধদেব মুক্তির জন্য 'অষ্টপন্থা'র বা অষ্টবিধ উপায়ের প্রচার করেছিলেনঃ সম্যক্ দৃষ্টি, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ জীবন, সৎ চেষ্টা, সৎ সংকল্প, সৎ স্মৃতি এবং এই সকলের ফলস্বরূপ সম্যক্ সমাধি। বুদ্ধদেবের এ বাণী সরলতা-মাখা। এতে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। তাঁর ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল সকল জীবে দয়া ও অহিংসা। বুদ্ধদেব কিন্তু ভগবান সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি।

জীবিতকালের মধ্যে বুদ্ধদেব তাঁর বাণী লিপিবদ্ধ করেন নাই। তাঁর মহানির্বাণের পর তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ রাজগৃহের কাছে একটা পাহাড়ের গুহাতে এক **বৌদ্ধ সংগীতি** আহ্বান করেন। এই সংগীতিতে বৌদ্ধধর্মের বাণী ও বৌদ্ধভিক্ষুদের পালনীয় নিয়মাবলী তখনকার মগধে প্রচলিত পালি ভাষাতে লিপিবদ্ধ করা হয়। এর প্রায় ১০০ বছর পর বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতির অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আচরণ সম্বন্ধে অনেক তর্ক উত্থাপিত হয়েছিল। এর পর সম্রাট্ অশোক

পাটলিপুত্রে বৌদ্ধদের তৃতীয় সংগীতি আহ্বান করেন। এই সংগীতির পর বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ রচনা করা হয়েছিল। এই কার্যে বৌদ্ধভিক্ষু সারিপুত্ত ও মোগ্‌গল্লান প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁদের দেহভস্ম প্রায় ২৩০০ বৎসর পর কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি পেয়েছেন। সম্রাট্‌ অশোকের পর সম্রাট্‌ কণিষ্ক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পুরুষপুরে বা বর্তমান পেশোয়ার নগরে চতুর্থ ও শেষ বৌদ্ধ সংগীতি আহ্বান করেন। এই সংগীতিতে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের বিশদ নিবন্ধ বা ব্যাখ্যা প্রণীত হয়।

বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম **'ত্রিপিটক'**। ত্রিপিটকের প্রথম ভাগের নাম 'সুত্ত'; এতে বুদ্ধদেবের বাণী সন্নিবেশিত আছে। দ্বিতীয় ভাগের নাম 'বিনয়'; এতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় অনুশাসন আছে। আর তৃতীয় ভাগের নাম 'অভিধর্ম'; এতে বৌদ্ধধর্মের মূল দার্শনিক তথ্যসকল লেখা আছে।

বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঃ—বুদ্ধদেবের মহানির্বাণের বহুদিন পর পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ভারতের একটি সামান্য অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে মৌর্য সম্রাট্‌ অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাহিরেও দূর দূর দেশে বিস্তারলাভ করে। সম্রাট্‌ অশোকই বৌদ্ধধর্মকে পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান ধর্মে পরিণত করেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর গ্রীকগণ আবার যখন এদেশে রাজ্যস্থাপন করেছিল, তখন গ্রীক রাজাদের মধ্যে একজন, মিনাণ্ডার, বৌদ্ধধর্মে অনুরক্ত ছিলেন; 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' নামক গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সম্রাট্‌ কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল।

চীনদেশের বিখ্যাত পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যখন খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে এদেশে এসেছিলেন তার অনেক আগেই মধ্য-এশিয়া—খীভা, বোখারা, সমরখন্দ প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানসকল—বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম মহাচীনকেও জয় করেছিল। সম্ভবতঃ ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চীনসম্রাট্‌ সিং-টি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করেছিলেন। তারই রাজত্বকালে মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন নামে দুইজন ভারতীয় বৌদ্ধপ্রচারক চীনে গিয়েছিলেন এবং অনেক বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থের চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। চীন থেকে বৌদ্ধধর্ম ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া ও জাপানে বিস্তারলাভ করেছিল।

ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের রাজত্বকালে যখন চীনদেশ থেকে বিখ্যাত বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং এদেশে এসেছিলেন, তখন পাটলিপুত্রের নিকট অবস্থিত বৌদ্ধবিহার নালন্দা সমস্ত এশিয়ার শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। হর্ষবর্ধন স্বয়ং বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বঙ্গদেশে পালরাজগণও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং অনেক বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে স্রঙ্‌-সান্‌-গাম্পোর রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। বর্তমানে সমগ্র তিব্বতকে একটি বিরাট বৌদ্ধবিহার বললেই চলে। তিব্বতের ভাষাতে বঙ্গভাষার ছাপ আছে। তিব্বতের অক্ষর বা হরফ চৈনিক নহে। বাংলার পালরাজাদের সাথে তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিব্বতের অনেক ভিক্ষু ভারতের নালন্দা ও বিক্রমশীলাতে লেখাপড়া শিখতে আসতেন। অনেক ভারতীয় পরিব্রাজক

তিব্বত ও চীনে যেতেন। একাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত **শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর** বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। শত শত বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ তিব্বতী, চীনা ও জাপানী ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বর্তমান ইন্দোনেশিয়ায় শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য নামে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। শৈলেন্দ্ররাজগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতকে একজন শৈলেন্দ্ররাজ বঙ্গের পালরাজা দেবপালের অনুমতি নিয়ে নালন্দার নিকট অবস্থিত পাঁচখানি গ্রামের আয়ে একটি বৌদ্ধ সংঘারাম নির্মাণ করিয়েছিলেন। শৈলেন্দ্ররাজগণ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরাই যবদ্বীপে 'বরবুদুর' নামক স্থানে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। শৈলেন্দ্ররাজগণ নেই কিন্তু বরবুদুরের মন্দির এখনও পাহাড়ের উপর অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। ভাস্করগণ বরবুদুরে বুদ্ধদেবের যে পূজা নিবেদন করেছিল তা জগতে অতুলনীয়। বুদ্ধদেবের জন্মভূমি ভারতেও এপ্রকার মন্দির নেই।

ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত সামান্য একটি ক্ষত্রিয় প্রজাতন্ত্র পৃথিবীকে একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম উপহার দিয়েছে। বুদ্ধদেবকে তাই **'এশিয়ার আলোক'** বলে পূজা করা হয়।

হিন্দুধর্মের সহিত জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য ও সাদৃশ্য ঃ একদিক দিয়ে দেখতে গেলে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম বৈদিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফল। কিন্তু অপরদিক দিয়ে দেখলে এই দুই ধর্ম হিন্দুধর্মেরই শাখামাত্র। প্রথমতঃ, বৌদ্ধ ও জৈনগণ বেদকে অপৌরুষেয় শ্রুতি বলে মনে করেন না। দ্বিতীয়তঃ, বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের জটিলতা ও যাগযজ্ঞের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অহিংস নীতি। তৃতীয়তঃ, বৈদিক ধর্মে ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৌদ্ধ ও জৈনদের মনঃপূত ছিল না। তাই তাঁরা জাতিভেদ প্রথা মানেন নাই। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রবর্তক দু'জনই ছিলেন ক্ষত্রিয়। চতুর্থতঃ, হিন্দুধর্মে 'সংঘে'র কোন ব্যবস্থা নেই ; বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে সংঘারাম ছিল ধর্মের অঙ্গ।

আবার অপরদিক দিয়ে দেখলে বৌদ্ধ ও জৈন—দুই ধর্মেই বৈদিক হিন্দুধর্মের মূলমন্ত্র—কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ—স্বীকার করে। মানুষ জন্মজন্মান্তর কর্মফল ভোগ করে। সেই কর্মফল থেকে মুক্তি পেতে হলে 'নির্বাণ' বা 'কৈবল্য' লাভ করা আবশ্যক। তা হলে কামনা-বাসনা লীন হয়ে যাবে। জৈন ও বৌদ্ধ—দুটো ধর্মেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন মতপ্রকাশ নাই। কপিলমুনি-প্রণীত হিন্দু সাংখ্যদর্শনও এ বিষয়ে উদাসীন। দ্বিতীয়তঃ, 'নির্বাণ' বা 'কৈবল্য' লাভ করতে হলে চাই চিত্তশুদ্ধি। এর জন্য কৃচ্ছ্র সাধন প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে দুই ধর্মই হিন্দুধর্মের সঙ্গে একমত। তবে বৌদ্ধগণ কঠোর তপস্যার বিরুদ্ধে। তাঁরা 'মধ্যপন্থা'তে বিশ্বাস করেন। জৈনগণ আবার মধ্যপন্থাতে বিশ্বাস করেন না। অহিংসা ধর্ম সম্বন্ধে জৈনগণ বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও সচেতন। তাঁদের মতে শুধু মানুষ নহে, জগতের সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যেও প্রাণ আছে। আত্মা সম্বন্ধে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম দুইই নীরব বললেই চলে। তৃতীয়তঃ নির্বাণ লাভ করতে হলে, বৌদ্ধমতে 'পঞ্চশীল' অনুসারে কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ, জীবে দয়া দেখাতে হবে ; দ্বিতীয়তঃ চৌর্যপ্রবৃত্তি দমন করতে হবে ; তৃতীয়তঃ, ভোগবাসনা ত্যাগ করতে হবে ; চতুর্থতঃ, মিথ্যাচার বন্ধ

করতে হবে ; পঞ্চমতঃ, পরনিন্দা ত্যাগ করতে হবে। বৌদ্ধ ও জৈন—দুই ধর্মেরই মানুষের পুরুষকারের উপর প্রবল বিশ্বাস আছে। পঞ্চশীলের পর 'চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা' চাই। তার পর আসবে 'দিব্যজ্ঞান' বা 'প্রজ্ঞা'। প্রজ্ঞার পর আসবে 'সম্বোধি' বা 'সম্যক্ জ্ঞান'। সম্যক্ জ্ঞানই মানুষকে নির্বাণের পথে নিয়ে যাবে।

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ধর্মের ক্ষেত্রে ছিল এক বিপ্লব। বর্ণপ্রথার ভেদাভেদকে আক্রমণ করে এই ধর্ম নিম্নবর্ণের মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। বৌদ্ধ সংঘ মহিলাদের কাছেও উন্মুক্ত ছিল এবং তারা পুরুষদের সমান মর্যাদা পেতেন। সেই দিক থেকে বৌদ্ধধর্ম যেমন ছিল বাস্তববাদী তেমনি উদার ও গণতান্ত্রিক।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অবদান : বৈদিক যুগের বর্ণপ্রথার কঠোরতা ও জটিল প্রাণহীন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পরিবর্তে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ শূন্য, সহজ সরল জীবনাদর্শ প্রচার করে। অহিংসা, ক্ষমা, করুণা, সবল নৈতিক চরিত্রগঠন—উভয় ধর্মেই অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে এবং ভারতীয় জীবনের চিরন্তন আদর্শ হয়ে আছে।

ধর্মপ্রচারের জন্য জৈনরা ব্রাহ্মণদের ভাষা সংস্কৃত বর্জন করে প্রাকৃত ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন। প্রাকৃত ছিল সাধারণ মানুষের ভাষা। ফলে প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করে। প্রাকৃত থেকে বহু আঞ্চলিক ভাষা যেমন, সৌরসেনি ভাষার জন্ম হয়েছিল। এর থেকে আবার উদ্ভব হয়েছিল মারাঠী ভাষা। জৈনদের ধর্মসাহিত্য রচিত হয়েছিল মাগধীতে। অপভ্রংশের প্রাচীনতম কাজগুলিও জৈনদের রচিত। কানাড়ী ভাষার সমৃদ্ধি সাধনেও জৈনদের অবদান অসামান্য।

বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির কারণ : বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের পরবর্তী কয়েক শতাব্দী যাবৎ বৌদ্ধধর্ম একটি স্থানীয় ধর্ম হিসাবে প্রচলিত ছিল। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মের রূপ পায়। সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হয়। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ভারত থেকে লোপ পায়। এর পিছনে কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ বৌদ্ধধর্ম তার সংস্কারমুখী চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং ঐ ধর্মের সহজ, সরল আদর্শের পরিবর্তে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মতই নানা আচার অনুষ্ঠান ও রীতি নীতি এসে পড়ে। বৌদ্ধ ধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে এবং হিন্দুদের অনুসরণে বৌদ্ধরা বুদ্ধমূর্তি পূজা শুরু করে। ফলে হিন্দুধর্মের গণ্ডীর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের রীতিনীতি ফিরিয়ে আনা সহজ হয়। দ্বিতীয়তঃ, বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল প্রধানতঃ রাজশক্তির সমর্থনে। শক্তিশালী সম্রাটগণ বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পরবর্তীকালে রাজ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও জনসাধারণের মধ্যে হ্রাস পায়। তৃতীয়তঃ বৌদ্ধমঠগুলি পরে বিলাস ব্যসন ও দুর্নীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। মঠগুলির প্রভূত সম্পদ ও মঠগুলিতে মহিলাদের অবাধ প্রবেশ বৌদ্ধধর্মকে অবক্ষয়ের পথে ঠেলে দেয়। মঠগুলির সম্পদ আক্রমণকারীদেরও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। সবশেষে, হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনও বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শঙ্করাচার্য, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিত ও প্রচারকগণ হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যা করেন ও হিন্দুধর্মে নতুন প্রাণসঞ্চার করেন। ফলে দুর্বল বৌদ্ধধর্মের পক্ষে এই আঘাত সহ্য করা সম্ভব হয় নি। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যের অবসান ঘটে।

বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব ঃ—

বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এই ধর্ম ভারতের ইতিহাসে চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে সমর্থ হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে ঐ যুগে যে নতুন কৃষি-ব্যবস্থা, মুদ্রার ব্যবহার ও ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ঘটেছিল তা একশ্রেণীকে সম্পদশালী করে তুলে। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য তীব্র আকার ধারণ করে। বৌদ্ধধর্ম সহজ, সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আদর্শ প্রচার করে আদিম সাম্যবাদী সমাজে ফিরে যেতে চেয়েছিল। বিশেষ করে শ্রমণদের জন্য নির্দেশিত আচরণবিধি অর্থ, সম্পত্তি ও বিলাসবহুল জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বললে ভুল বলা হয় না। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তনগুলিকেও বৌদ্ধধর্ম আদর্শগত সমর্থন জানিয়েছিল। মহিলা ও শূদ্র—এদের সংঘে প্রবেশাধিকার দিয়ে বৌদ্ধধর্ম তাদের সামাজিক মর্যাদা দান করেছিল। অহিংসা ও জীবপ্রেমের আদর্শ প্রচার করে বৌদ্ধধর্ম দেশে পশু-সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ **সুত্তনিপাতে** গবাদিপশুকে খাদ্য এবং সৌন্দর্য ও সুখের উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীযুগে ব্রাহ্মণরা এই আদর্শ গ্রহণ করে পশুর, বিশেষ করে গবাদি পশুর পবিত্রতা ও অহিংসার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেন তার উপর সম্ভবতঃ বৌদ্ধ শিক্ষার একটা প্রভাব ছিল। চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ করে তা গ্রহণ করার উপদেশ ছিল এই ধর্মে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবে হলেও যুক্তিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল পালি ভাষার মাধ্যমে এবং বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল পালি ভাষায়। এর মধ্য দিয়ে পালি ভাষা সমৃদ্ধ হয়। পূর্ব ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত অপভ্রংশের রচয়িতা বৌদ্ধরাই। বৌদ্ধ মঠগুলি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। বিহারের নালন্দা ও বিক্রমশিলা, গুজরাটের বল্লভী প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল যেখানে ভারত তথা প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে শিক্ষার জন্য ছাত্ররা সমবেত হতেন। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার উপরেও বৌদ্ধধর্মের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিহারের গয়া ও মধ্য প্রদেশের সাঁচীতে উন্নত শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে পাথরের গায়ে বুদ্ধের জীবনের বহু কাহিনী অঙ্কিত আছে। পরে ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পরীতির মিশ্রণে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বিখ্যাত গান্ধার শিল্প গড়ে ওঠে। এসব অঞ্চলে বুদ্ধের যে সব মূর্তি তৈরী হয়েছিল তাতে ভারতীয় প্রভাবের সাথে বিদেশী প্রভাবও ফুটে উঠেছে। শ্রমণদের বসবাস করার জন্য পাহাড় কেটে ঘর তৈরী করা হত এবং এভাবেই গুহা-শিল্পের সূত্রপাত হয়। গয়ার পার্বত্য এলাকায় ও পশ্চিম ভারতে নাসিকে এই গুহাশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। রোমান বাণিজ্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বৌদ্ধ শিল্পকলা কৃষ্ণা ব-দ্বীপ অঞ্চলে বিকাশ লাভ করে এবং পশ্চিম এশিয়ার সংস্পর্শে এসে মথুরা ও গান্ধারে বৌদ্ধশিল্প বিকশিত হয়।

সাম্রাজ্যের যুগ এবং রাজনৈতিক ঐক্য ঃ The Age of Imperialism and Political Unification)

১। **ষোড়শ মহাজনপদ ঃ** ষষ্ঠ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিম বিহারে লোহার ব্যাপক ব্যবহার অনেক আঞ্চলিক রাজ্যের উত্থানের পথ সুগম করে তুলেছিল। বুদ্ধের যুগে আমরা ষোলটি বৃহৎ আঞ্চলিক রাজ্যের সন্ধান পাই-এদের বলা



হয় মহাজনপদ। এদের অধিকাংশ বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল ও বিহারে অবস্থিত ছিল। ষোলটি বৃহৎ রাজ্যগুলি হল—অঙ্গ, মগধ, কাশী. কোশল, ভজ্জি বা বৃজি, মল্ল বা মালব, চেদী, বৎস, কুরু, পাঞ্চাল. মৎস্য, শূরসেন, অশ্মক, অবন্তী, গান্ধার এবং কম্বোজ—এই ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে মগধ, কাশী, কোশল, বৎস ও অবন্তী বিশেষ শক্তিশালী ছিল। ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের পিতা অশ্বসেন কাশীর রাজা ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোশল শক্তিশালী রাজ্য হিসাবেআত্মপ্রকাশ করে এবং কাশী রাজ্য অধিকার করে। কোশলের রাজা মহাকোশল এবং তাঁর পুত্র প্রসেনজিৎ বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। কোশলের রাজধানী ছিল সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত অযোধ্যা

নগরে। নেপালের তরাই অঞ্চলে অবস্থিত শাক্যরাজ্য কোশলের অধিকারে ছিল। অল্পকাল পরে দক্ষিণ বিহারে অবস্থিত মগধ রাজ্য কোশলের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। কুরুরাজ্য বর্তমান দিল্লী ও মীরাট অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং রাজধানী ছিল হস্তিনাপুর। বর্তমান বেরিলি, বদাউন প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল পাঞ্চাল রাজ্য, রাজপুতানায় অবস্থিত ছিল মৎস্য রাজ্য এবং মথুরা অঞ্চলে শূরসেন রাজ্য। অশ্মক রাজ্য গোদাবরী তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং এর রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠানপুর। অবন্তী রাজ্য বর্তমান মালবে অবস্থিত ছিল এবং এর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। কাবুল উপত্যকায় গান্ধার ও কাশ্মীর উপত্যকার কম্বোজ রাজ্য অবস্থিত ছিল। বাকী রাজ্যগুলি অর্থাৎ অঙ্গ, মগধ, কাশী কোশল, বৃজি, মল্ল চেদী ও বৎস রাজ্য—এগুলি উত্তর ও দক্ষিণ বিহারে এবং বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর, বুন্দেলখণ্ড ও এলাহাবাদ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এই ষোলটি আঞ্চলিক রাজ্যের মধ্যে দক্ষিণ বিহারে অবস্থিত মগধ রাজ্য খুব শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং মগধকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে—রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

মগধের উত্থান : পূর্বেই বলা হয়েছে ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল মগধ। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে ও হর্যঙ্ক বংশের রাজা বিম্বিসারের সিংহাসনে আরোহণের সংগে সংগে মগধের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বিম্বিসার যুদ্ধ ও রাজ্য জয়ের নীতি গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি অঙ্গরাজ্য জয় করেন এবং অজাতশত্রুকে শাসনদায়িত্ব অর্পণ করেন। বিবাহের মধ্য দিয়ে তিনি রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনীকে বিবাহ করে তিনি কাশী রাজ্যের একাংশ যৌতুক হিসাবে লাভ করেন এবং কোশলরাজের মিত্রতা অর্জন করেন। এছাড়াও বিম্বিসার লিচ্ছবি রাজকন্যা চেল্লনা ও মদ্ররাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এই দুই বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তিনি রাজধানী রাজগৃহ (যার তৎকালীন নাম ছিল গিরিব্রজ) দুর্ভেদ্য করে গড়ে তোলেন।

বিম্বিসার প্রায় ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন।

বিম্বিসারকে হত্যা করে তাঁর পুত্র অজাতশত্রু সিংহাসনে আরোহণ করেন। মগধের শক্তি ও প্রাধান্য বিস্তারে তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁর রাজত্বকালে হর্যঙ্ক বংশ গৌরবের শিখরে আরোহণ করে। কাশী ও কোশলরাজ সম্মিলিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পরাজিত হন এবং অজাতশত্রুর সংগে কোশল রাজকন্যার বিবাহেব মধ্য দিয়ে শান্তি স্থাপিত হয়। এছাড়া কাশীর উপর সব অধিকার কোশলরাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি লিচ্ছবিরাজ্য আক্রমণ করেন ও বৈশালী জয় করেন। উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলি জয় করে তিনি মগধের রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। রাজধানী রাজগৃহকে তিনি আরও সুরক্ষিত করেন।

অজাতশত্রুর মৃত্যুর পর উদয়ন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৪৬০ খৃঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি তাঁর রাজত্বকালে গঙ্গা ও শোন নদীর সংগমস্থলে পাটলিপুত্রে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন।

উদয়নের পর অজাতশত্রুর মন্ত্রী শিশুনাগ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অবন্তী রাজ্য ধ্বংস করেন এবং ঐ রাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি সাময়িকভাবে বৈশালীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

শিশুনাগ বংশের পরবর্তী রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে মহাপদ্মনন্দ সিংহাসন অধিকার করে নন্দবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই নন্দবংশ অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। নন্দরা কলিঙ্গ জয় করেন। মহাপদ্মনন্দ নিজেকে 'একরাট' বলে দাবী করেন। নন্দবংশের রাজত্বকালে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, কিন্তু নন্দবংশের শক্তির কথা শুনে তিনি পূর্বদিকে আর অগ্রসর হননি। পরবর্তী নন্দরা ছিলেন দুর্বল। শেষ নন্দসম্রাট ধননন্দ ছিলেন অত্যাচারী। তিনি প্রজাদের অপ্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন। ধননন্দকে উচ্ছেদ করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মৌর্যবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

মৌর্য সাম্রাজ্য ঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঃ (৩২৪—৩০০ খৃঃ পূর্বাব্দ) খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ভারতের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। চাণক্য কৌটিল্য, বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত) নামে তক্ষশীলার এক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের সহায়তায় শেষ নন্দরাজ ধননন্দকে পরাজিত ও নিহত করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। মৌর্যদের আমলেই মগধ গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে।

চন্দ্রগুপ্তের বংশ পরিচয় সম্পর্কে পণ্ডিতরা একমত নহেন। গ্রীক ঐতিহাসিক জাস্টিন চন্দ্রগুপ্তকে নীচ বংশ সম্ভূত বলে বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা শূদ্রানী ও নন্দরাজের উপপত্নী ছিলেন। আবার কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দবংশীয় বলা হয়েছে। জৈন এবং বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে চন্দ্রগুপ্তকে পিপ্‌ফলিবনের ক্ষত্রিয় ময়ূর পোষক গোষ্ঠীর সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত বলেই মনে করেন।

চাণক্যের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী অধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করা ও অত্যাচারী নন্দবংশের ধ্বংস সাধন করা। নন্দরাজের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশও ছিল। চাণক্য বালক চন্দ্রগুপ্তকে রাজনৈতিক; সামরিক শিক্ষা দান করে ভবিষ্যৎ রাজশক্তি লাভের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে পাঞ্জাবে আলেকজাণ্ডারের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তাঁর নির্ভীকতা আলেকজাণ্ডারের কাছে ঔদ্ধত্য বলে মনে হলে তিনি চন্দ্রগুপ্তকে বন্দী করার আদেশ দেন। চন্দ্রগুপ্ত কৌশলে বন্দীদশা থেকে পলায়ন করেন। অতঃপর চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য সৈন্যবাহিনী গঠনে মনোযোগী হন এবং ক্ষুদ্রক, মালব, অশ্মক প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলি থেকে সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। তাঁর সেনাবাহিনীতে শক, যবন, কিরাত, কম্বোজ, বাহ্লীক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির সৈন্যরা স্থান পায়। চন্দ্রগুপ্তের সেনাবাহিনীর নিকট নন্দরাজের সেনাপতি ভদ্রসাল সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। নন্দবংশ ধ্বংস হয় এবং চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই বিষয়ে চাণক্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৩২৩ খৃঃ পূঃ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হলে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শাসকদের পরাজিত করে ভারতভূমিকে বিদেশী অধীনতা থেকে মুক্ত করেন। এই যুদ্ধ ৩১৭ খৃঃ পূঃ শেষ হয় যখন ইউডিমস নামক গ্রীক সেনাপতি ভারত ত্যাগ করেন।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি সেলুকাস ভারতে পুনরায় গ্রীক আধিপত্য স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হন। আনুমানিক ৩০৫ খৃঃ পূঃ সেলুকাস ব্যাবিলন ও ব্যাকট্রিয়া জয় করে সিন্ধু অঞ্চলে উপস্থিত হন। কিন্তু এইখানে তিনি মৌর্য সম্রাট

চন্দ্রগুপ্তের বাধার সম্মুখীন হন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে গ্রীক ঐতিহাসিক-গণ নীরব। তা থেকে অনুমান করা যায় সম্ভবতঃ সেলুকাস যুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের কাছে পরাজিত হন। গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে হিরাট, কাবুল, কান্দাহার ও মাকরান এই চারটি প্রদেশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে পাঁচ শত হস্তী দান করেন। উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধও স্থাপিত হয়। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে এক দূত প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' নামক গ্রন্থ থেকে তৎকালীন যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুটার্ক ও জাস্টিনের রচনায় চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র ভারত অধিকার করেছিলেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পারস্য থেকে সুদূর দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত সমগ্র ভূ-খণ্ড চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল—একথা অনুমান করলে ভুল হবে না।

মৌর্য যুগের শাসনব্যবস্থা ঃ মৌর্য শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব নেই। প্রথমতঃ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সেলুকাস কর্তৃক প্রেরিত গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' নামক গ্রন্থ থেকে শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা গ্রন্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি, তবে গ্রীক ঐতিহাসিক স্ট্র্যাবো, এ্যরিয়ান প্রভৃতির রচনায় ঐ গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃতি পাওয়া গিয়াছে। এইভাবে ইণ্ডিকার যেটুকু অংশ উদ্ধার করা গিয়েছে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকেও মৌর্য যুগের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ অশোকের শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি থেকেও মৌর্য শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন রাজা। তাঁর হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ প্রশাসক, প্রধান বিচারপতি, প্রধান সেনাপতি ও প্রধান আইন প্রণেতা। শাসন ব্যাপারে রাজা ব্যক্তিগতভাবে অংশ গ্রহণ করতেন। রাজ অনুশাসন প্রচার করে তিনি আইন প্রণয়ণের কাজ সম্পাদন করতেন। সামরিক বিভাগের প্রধান হিসাবে যুদ্ধ পরিকল্পনা রচনা করতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। শাসক হিসাবে তিনি হিসাব পরীক্ষক, মন্ত্রী, পুরোহিত, পরিদর্শক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিয়োগ করতেন।

রাজাকে রাজকার্যে সহায়তা করার জন্য ছিল মহামন্ত্রীগণ। তাঁদের অধীনে বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত বহুসংখ্যক রাজকর্মচারী ছিল। নগরগুলির দায়িত্বে ছিল নগরাধ্যক্ষগণ ও সৈন্যবাহিনীর দায়িত্বে থাকতো বলাধ্যক্ষগণ।

এছাড়াও ছিল মন্ত্রিপরিষদ। যদিও মন্ত্রিপরিষদের মতামত গ্রহণ করা রাজার পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিলনা তবুও জটিল ও জরুরী পরিস্থিতিতে রাজা মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন প্রদেশপাল। তাঁরা রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হতেন। প্রদেশসমূহ বিভক্ত ছিল বিভিন্ন জনপদে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীদের উপাধি ছিল সমাহর্ত্রি। এছাড়া স্থানিক, গোপ উপাধিধারী

রাজকর্মচারীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রামের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন গ্রামিক উপাধিকারী কর্মচারীবৃন্দ।

রাজধানী পাটলিপুত্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ত্রিশজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি নগর পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল। পাঁচজন করে সদস্য নিয়ে গঠিত ছয়টি সমিতি নগরীর বিভিন্ন কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করত। যেমন, শিল্প উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যাবলী, বিদেশীদের অভ্যর্থনা তত্ত্ববধান ইত্যাদি, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রক্ষা, ওজন মাপ তদারক, শিল্পসামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা এবং কর আদায়। অনুমান করা যায় যে উজ্জয়িনী, তক্ষশীলা, কৌশাম্বী প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরগুলিতেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

মৌর্য সম্রাটগণ বিশাল সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। সামরিক বিভাগ চারভাগে বিভক্ত ছিল—পদাতিক বাহিনী, হস্তীবাহিনী, অশ্বারোহীবাহিনী ও রথবাহিনী। এছাড়াও নৌবাহিনীর অস্তিত্ব ছিল। ত্রিশজন সভ্য নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ সামরিক বাহিনী পরিচালনা করত। পাঁচজন করে সদস্য নিয়ে গঠিত ছয়টি সমিতি যথাক্রমে পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তীবাহিনী, নৌবাহিনী, রথ-বাহিনী. খাদ্য ও পরিবহণ বিভাগের দায়িত্বে থাকতো।

মৌর্যযুগে বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন রাজা। এছাড়া প্রদেশ ও জনপদগুলিতেও বিচারালয় ছিল। দণ্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল। অঙ্গচ্ছেদ, প্রাণদণ্ড, জরিমানা প্রভৃতি শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

রাজস্ব প্রধানতঃ বলি ও ভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ফসলের ১/৬ ভাগ হিসাবে দিতে হত। বলি উৎপন্নদ্রব্যের ১/৪ থেকে ১/৮ অংশ পর্যন্ত আদায় করা হত। এছাড়াও বিক্রীত দ্রব্য মূল্যের ১/১০ অংশ কর, জন্ম-মৃত্যু কর, জরিমানা, বন, খনি ইত্যাদি সরকারের প্রধান আয়ের উৎস ছিল।

শাসনব্যবস্থায় গুপ্তচর বাহিনীর একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। গোপনে সেনাবাহিনী ও রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহ করা ও তা রাজার নিকট পৌছে দেওয়ার কাজ এদের করতে হত। মৌর্য যুগে অসংখ্য গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব :—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য ২৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর বিজয়বাহিনী সফলতা লাভ করেছিল। তিনি সামান্য অবস্থা থেকে উন্নীত হয়ে ভারতের বাইরে আফগানিস্তানের অন্তর্গত কাবুল, কান্দাহার, হিরাট, প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের মাকরান প্রদেশেও তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। অত্যাচারী নন্দবংশ ধ্বংস করে তিনি মগধ সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। গ্রীকদিগকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্বাধীনতা স্থাপন করলেন। সেলুকাসকে পরাজিত করায় চন্দ্রগুপ্তের মর্যাদা ভারতের বাইরেও বৃদ্ধি পেল। তাঁর পূর্বে ভারতের আর কোনও রাজা এত বড় সাম্রাজ্য অধিকার করেন নাই।

শাসনকার্যেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রজার মঙ্গল সাধনই ছিল তাঁর শাসনের মূল লক্ষ্য। শাসনকার্যের প্রত্যেক বিষয়ে তিনি দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর সময়ে বিরাট সেনাবাহিনী গঠন, বিভাগীয় শাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন, সুপরিচালিত গুপ্তচর প্রথার ও কঠোর দণ্ডবিধির প্রবর্তন প্রভৃতি থেকে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার

পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আধুনিক ধরণের অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থায় মৌর্য সাম্রাজ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য তখন সমগ্র পৃথিবীতে বিরল ছিল।

বিন্দুসার (৩০০—২৭৩ খৃঃ পূঃ) :—চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার অমিত্রঘাত-এর রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

অশোক (২৭৩—২৩২ খৃঃ পূঃ) :—বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক মৌর্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। অশোক ভারত তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট রূপে স্বীকৃত।

বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে অশোক তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতাদের হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সিংহাসনলাভ ও অভিষেক ক্রিয়ার (২৬৯ খৃঃ পূঃ) মধ্যে চারি বৎসরের ব্যবধান থেকে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

অশোকের রাজত্বকালের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান হল তাঁরই আদেশে খোদিত শিলা ও স্তম্ভলিপি সমূহ। সিংহাসনে আরোহণের নয় বৎসর পরে অশোক চন্দ্রগুপ্তের মতই রাজ্যজয়ে অগ্রসর হন। অশোকের ত্রয়োদশ লিপিতে (R. E XIII) কলিঙ্গ যুদ্ধের উল্লেখ আছে। চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে কলিঙ্গ স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং এর সৈন্যবাহিনীও ছিল শক্তিশালী। এই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও এর ফলাফলের সুস্পষ্ট বর্ণনা ত্রয়োদশ লিপিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধে কলিঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রায় দেড়লক্ষ লোক বন্দী হয় এবং এক লক্ষ সৈন্য প্রাণ হারায়। এই যুদ্ধের পর অশোক মৌর্য সম্রাটগণের অনুসৃত দিগ্বিজয় নীতি পরিত্যাগ করেন।



প্রিয়দর্শী অশোক

অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি :—অশোকের রাজত্বকালে কলিঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বৌদ্ধগ্রন্থ 'দিব্যবদান'-এ অশোক খশ দেশ জয় করেছিলেন—একথার উল্লেখ আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের সংগে নববিজিত অঞ্চলগুলি যুক্ত হবার ফলে অশোকের সাম্রাজ্য প্রায় সারা ভারতব্যাপী বিস্তৃত হয়। অশোকের শিলালিপি ও অন্যান্য দেশী ও বিদেশী লেখকদের রচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে পূর্বদিকে কামরূপ বা আসাম ও দক্ষিণে তামিল রাজ্যগুলি ছাড়া, সমগ্র ভারতই তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অশোকের ধর্মপ্রচার :—কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবননাশ অশোকের মনে দারুণ অনুশোচনার সৃষ্টি করে এবং তাঁর মধ্যে এক পরিবর্তন ঘটে। অশোক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দিগ্বিজয় নীতির পরিবর্তে তিনি ধর্মবিজয় জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করলেন। নিজের প্রজাবর্গ ছাড়াও সারা মানব জাতির কল্যাণের আদর্শে ব্রতী হয়ে তিনি ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে অশোক প্রথমেই পশুশিকার ও অন্যান্য হিংসাত্মক কার্যাবলী নিষিদ্ধ করেন। আমোদ প্রমোদের জন্য রাজপুরুষদের বিহার যাত্রার পরিবর্তে ধর্ম-যাত্রার প্রবর্তন করেন। ধর্ম প্রচার ও ধর্মীয় অনুশীলনে প্রবৃত্তি সৃষ্টি করার জন্য তিনি 'ধর্মমহামাত্র' নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন। ধর্মলিপি উৎকীর্ণ, ধর্মস্তম্ভ স্থাপন ও ধর্মশ্রবণের ব্যবস্থা করেন। রাজুক, যুত ও প্রাদেশিক উপাধিধারী কর্মচারীদের ধর্ম উপদেশ দান করার জন্যে দেশ পরিক্রমণের নির্দেশ দেন। বৌদ্ধসংঘগুলির রক্ষণা-বেক্ষণেও অশোক যত্নবান ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম মতাবলম্বীদের মধ্যে বিবাদ শুরু হলে অশোকের উদ্যোগে পাটলিপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহুত হয়। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচারক প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। কাশ্মীর, গান্ধার, নেপাল, মহারাষ্ট্র, মহীশূরে ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হয়।

মৌর্য সাম্রাজ্যে ও বিদেশে ধর্মপ্রচার :– কেবল মৌর্য সাম্রাজ্যের ভিতরে ধর্ম প্রচার করেই অশোক ক্ষান্ত হন নাই ; সাম্রাজ্যের বাইরেও যাতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় এজন্য তিনি দেশে দেশে ধর্ম-প্রচারক পাঠান। দক্ষিণ ভারতে তখন চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র ও কেরলপুত্র—এই চারটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই সকল রাজ্যেও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সঙ্ঘ স্থাপন করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোকের অনুরাগ এরূপ প্রবল হয়ে উঠল যে, তিনি ভারতের বাইরেও ধর্ম-বিজয়ের জন্য প্রচারক প্রেরণ করেন। সিরিয়া, মিশর, গ্রীস, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের অন্তর্গত গ্রীক্ রাজ্যগুলিতে ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। সিরিয়ার রাজা আন্টিয়োকস্ থিয়স্, মিশরের রাজা টলেমী ফিলাডেল্ফস্, ম্যাসিডনিয়ার রাজা আন্টিগোনাস্ গোনাটাস্, এপিরাস বা করিন্থের রাজা আলেকজাণ্ডার, উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত সাইরিনের রাজা মগস্—অশোকের সমসাময়িক ছিলেন। এই সব রাজার মধ্যে কয়েকজনের রাজ্যে তিনি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন এবং এও সত্য যে পশ্চিম এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল।

কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ধর্মপ্রচারে অশোক অধিকতর সাফল্যলাভ করেছিলেন। তিনি নিজ পুত্র (বা ভ্রাতা) মহেন্দ্রকে এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে ধর্মপ্রচারের জন্য সিংহলে পাঠিয়ে-ছিলেন। তাঁদের প্রভাবে সিংহল-রাজ তিস্য এবং তাঁর প্রজাগণ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। খুব সম্ভবতঃ সুবর্ণভূমিতেও (দক্ষিণ ব্রহ্ম, সুমাত্রা দ্বীপ এবং সম্ভবতঃ তৎসংলগ্ন স্থানে) ধর্মপ্রচারক পাঠান হয়েছিল।

অশোকের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র উত্তর ভারতে প্রচারিত হয়েছিল। অশোক এই সকল উপায় অবলম্বন করায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের সর্বত্র এবং এশিয়া ও ইওরোপের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাঁর চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মে পরিণত হয়।

ভারতের বাইরে ধর্মপ্রচারের ফলে ধর্মপ্রচারকগণের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে বিস্তারলাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের জনকল্যাণমূলক বাণী এবং সেবামূলক ব্যবস্থাও সকল দেশে আদরলাভ করেছিল।



অশোকের আদর্শ ছিল মানবতাবাদী। শুধু মানুষ নয়, জীবমাত্রেরই মঙ্গল সাধন তাঁর লক্ষ্য ছিল। রাজ্যের সর্বত্র শান্তিশৃঙ্খলা, সুবিচার যাতে সকলে পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য তিনি রাজকর্মচারীদের রাজ্য পরিক্রমার নির্দেশ দেন। আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার ও সম অপরাধের জন্য সম শাস্তি—অর্থাৎ দণ্ডসমতা ও ব্যবহার সমতা নীতি চালু করেন। মানুষ ও পশুর সুবিধার জন্য রাস্তার পাশে কূপ খনন, বৃক্ষরোপণ ও পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। রাজকর্মচারীরা যাতে তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে সে বিষয়ে তাদের সতর্ক করে দেন।

প্রজাদের পারলৌকিক উন্নতির জন্যে 'ধর্মমহামাত্র' গণকে নিযুক্ত করা হয় যারা

প্রজাদের ধর্মভাব বৃদ্ধির জন্য কাজ করতেন। স্ত্রীজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য 'স্ত্রী মহামাত্র'ও নিযুক্ত হয়। অশোক ব্রাহ্মণ, জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা করতেন।

বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ প্রচার করলেও অশোক উদার ও মানবধর্মী মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তাঁর ধর্মনীতি পরিবার ও পারিবারিক জীবনের উপর গুরুত্ব ছিল বেশী। পিতামাতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা, দাসদাসীদের প্রতি দয়া, আত্মীয় স্বজনদের প্রতি বিনয়, ব্রাহ্মণ, জৈন ও শ্রমণদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের উপদেশ তিনি দেন। এছাড়া সত্যকথন, পবিত্রতা, কৃতজ্ঞতা, সৎকাজে দান ইত্যাদির উপরেও তিনি গুরুত্ব দেন। আত্মপরীক্ষা মিতব্যয়িতা, অন্তদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার কথা অশোক প্রচার করেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে অশোকের ধর্ম আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্ম থেকে পৃথক ছিল। তাঁর ধর্মে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয় ঘটেছিল।

ইতিহাসে অশোকের স্থান:—প্রজাগণের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনই অশোকের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রজা বলতে তিনি কেবল নিজ রাজ্যের জনসাধারণকে বুঝতেন না, প্রজা বলতে তিনি সমগ্র মানবজাতিকেই বুঝতেন।

কলিঙ্গ যুদ্ধে বহুলোক নিহত, আহত ও বন্দী হল। শত সহস্র কলিঙ্গবাসীর রক্তস্রোতে যুদ্ধক্ষেত্র প্লাবিত হলে, অশোকের জীবনের গতি পরিবর্তিত হল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, জীবনে আর কখনও যুদ্ধ করবেন না। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পর অহিংসা, ধর্মবিজয় ও জীবকল্যাণ তাঁর জীবনের ব্রত হল। 'অহিংসা পরম ধর্ম'—বুদ্ধদেবের এই বাণী অশোকের নিকট পরম সত্য বলে মনে হল। মানবের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। যুদ্ধ করে নরহত্যা এবং ভোজনের জন্য প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ হল।

দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের আদর্শ গৃহীত হল। অশোকের ধারণা হল যে ধর্ম বিজয়ই প্রকৃত বিজয়। ভ্রাতৃভাবের দ্বারা মানব-হৃদয় জয় করাই হল প্রকৃত জয়লাভ। তিনি স্থির করলেন যে কোনও দেশ জয় করতে হলে অস্ত্র দিয়ে জয় করবেন না; ধর্মপ্রচার করেই সে দেশবাসীর মন জয় করবেন। এটাই অশোকের জীবনের মূল মন্ত্র হয়ে দাঁড়াল।

অশোক বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হলেও সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর ধর্মনীতি ছিল উদার। বিশ্বমৈত্রীই ছিল আশোকের সাধনা। শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, জৈন-নিগ্রর্ন্থ ও আজীবিক সম্প্রদায় তাঁর কাছে নানা প্রকারে সম্মানিত হতেন।

প্রজার নৈতিক চরিত্র উন্নত করবার জন্য অশোক ধর্মমহামাত্র এবং পার্থিব মঙ্গল সাধনের জন্য রাজুক নিযুক্ত করেছিলেন। সকল ধর্মের যা সার তাই তিনি সকলকে পালন করতে উপদেশ দিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গুরুজনে ভক্তি, জীবে দয়া, সত্যভাষণ প্রভৃতি শিক্ষা দান করতেন। সমগ্র মানবজাতির নৈতিক উন্নতির জন্য পৃথিবীতে আর কোনও সম্রাট এরূপ আন্তরিক চেষ্টা করেন নাই।

অশোকের রাজত্বকালে গরীবলোকেরা নিয়মিতভাবে ভিক্ষা পেত। পথিকদের সুবিধার জন্য রাজপথ তৈরী হয়েছিল। রাস্তার দু ধারেই গাছপালা রোয়া, পান্থশালা নির্মাণ, কূপ খনন, মানুষ ও পশুর চিকিৎসার জন্য আরোগ্যশালা তৈরী করে তিনি যশস্বী হয়েছেন। কেবল নিজ রাজ্যে মানুষ ও পশুর জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেই

তিনি ক্ষান্ত হন নি, বিশ্ববাসী মানব ও পশু মাত্রেরই উপকারের জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ধর্ম বলতে পাহাড়ের গায়ে লেখা বিধিগুলোও তাদের অনুশীলন বুঝায়।

অশোকের ধর্ম প্রচারের ফলে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। অশোকের পূর্বে যে কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁর সময়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মে পরিণত হল।

অশোকের চতুর্থ প্রস্তর লিপি এবং সপ্তম স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় যে, প্রজাগণকে বোঝাবার জন্য তিনি পাহাড়ের গায়ে ধর্মোপদেশ খোদাই করেন। শিলালিপিগুলি আট শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শিলালিপিগুলিতে নানাবিধ সৎ আচরণ শিক্ষা দেওয়া হত। এগুলি পাঠ করে জনসাধারণ উদার সার্বজনীন ধর্মনীতি মেনে চলতে আকৃষ্ট হত।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারই অশোকের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি নানাবিধ উপায় অবলম্বন করেন। আমোদ-প্রমোদের জন্য বিহার-যাত্রার পরিবর্তে তিনি ধর্মযাত্রার প্রবর্তন করেন। সর্ব ধর্মের সারাংশে জনসাধারণের মন আকৃষ্ট করবার ভার ধর্মমহামাত্রগণের উপর দেওয়া, ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি ধর্মশ্রবণের ব্যবস্থাও করেন।

যুদ্ধে হেরে যাবার পর অনেক সম্রাটকেই যুদ্ধ থেকে বিরত হতে দেখা যায়; কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করবার পর যুদ্ধ-বিরতি অশোক ছাড়া আর কেহ করেছেন বলে জানা যায় না। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, সকল দেশেই কোন কোন রাজা স্ব স্ব প্রজার মঙ্গল সাধনে সচেষ্ট হয়েছেন; কিন্তু মহামতি অশোকের ন্যায় পৃথিবীর সমগ্র মানব ও পশুর কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। সমগ্র মানবজাতিকে ধর্মপরায়ণ করে তোলাই ছিল তাঁর আকাঙ্খা। মহামতি অশোক অহিংসা ও মৈত্রীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্ব কল্যাণের যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা আর কোনও দেশের ইতিহাসে দেখা যায় না। এজন্য অশোককে প্রকৃতপক্ষে **রাজর্ষি** বলা হয়।

মৌর্য সম্রাটসুলভ সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি নিয়ে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু যুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও হত্যাকাণ্ড তাঁর জীবন ও নীতির পরিবর্তন ঘটায়। রাজপদকে ভোগবিলাস ও যুদ্ধজয়ের স্থল হিসাবে বিবেচনা না করে অশোক প্রকৃত প্রজাকল্যাণকামী সম্রাটে পরিণত হন। এমনকি "সকল মানুষই আমার সন্তান"—এই পিতৃত্বসুলভ মমত্ববোধের দ্বারা চালিত হয়ে তিনি সকল মানুষ ও জীবজগতের কল্যাণ সাধনের ব্রত গ্রহণ করেন। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অশোক এক মহত্তর মিলনের আদর্শ রূপায়িত করেন। সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার মূল আদর্শকেই তিনি তুলে ধরেন। সম্রাট অশোকের বাণীই ভারতের মর্মবাণী। এই সব দুর্লভ আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়ে অশোক পৃথিবীকে নতুন ভাবে চলার পথ দেখান। সেইজন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসাবে অশোকের স্থান সর্বোচ্চ। এই বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে দ্বিমত নেই। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক এইচ, জি. ওয়েলস্ যথার্থ ই বলেছেন--"ইতিহাস গগনে মহারাজ অশোক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দেদীপ্যমান"।

৪। **ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ ঃ** গ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল (উত্তরাপথ) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। এই অঞ্চল একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—গান্ধার, কম্বোজ ও মদ্র। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ও জেনোফোন এবং রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির রচনা থেকে জানা যায় যে পারস্য সম্রাট সাইরাস (৫৫৮-৫৩০ গ্রীঃ পূঃ) গান্ধার রাজ্য জয় করেন। আবার কোন কোন প্রাচীন রচনায় সাইরাসের গান্ধার আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছিল—এমনও উল্লেখ আছে। সাইরাসের পৌত্র দরায়ুস (৫২২-৪৮৬ গ্রীঃ পূঃ) গান্ধার রাজ্য দখল করেন এবং পারস্য সাম্রাজ্যের সীমা উত্তর পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ পারস্য সাম্রাজ্যের বিংশতিতম প্রদেশে পরিণত হয় এবং সাম্রাজ্যের রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ এখান থেকে সংগৃহীত হোত। পরবর্তী পারস্য সম্রাট জারেক্সিসের (৪৮৬-৪৬৫) গ্রীঃ পূঃ) আমলেও পারস্য সাম্রাজ্য ভারতের উত্তরপশ্চিমে অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল এবং এই অঞ্চল থেকে ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করা হত। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার পারস্য সম্রাট তৃতীয় দরায়ুসকে পরাজিত করে পারস্য সাম্রাজ্য অধিকার করলে ভারতে পারসিক আধিপত্যের অবসান হয়।

গ্রীক আক্রমণ ঃ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ

গ্রীসের ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপের পুত্র আলেকজাণ্ডার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন। পারস্য সাম্রাজ্য অধিকার করার পর আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। ঐ সময় উত্তর-পশ্চিম ভারত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে ঐ অঞ্চল বিভক্ত ছিল উপরন্তু তাদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকতো। গ্রীক লেখকদের বর্ণনায় অশ্বায়ন, নিকিয়া, গৌরীয়, অশ্বকায়ন, পুষ্করাবতী, তক্ষশীলা, উরশা, পুরুর রাজ্য, অভিসার প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। এছাড়া গান্ধার, সৌভূতি, ক্ষুদ্রক, মালব, শূদ্র প্রভৃতি আরও অনেক ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত ঐ ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারেনি। ৩২৭ গ্রীঃ পূঃ আলেকজাণ্ডার সৈন্যসহ ভারতে প্রবেশ করলে তক্ষশীলার রাজা অম্ভি, কোকিউস, সঞ্জয়, অশ্বজিৎ, এবং শশীগুপ্ত প্রভৃতি বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু পুষ্করাবতীর রাজা অষ্টক, অশ্বায়ন ও অশ্বকায়ন জাতি, মশকাবতী ও অন্তক নামক নগরীদ্বয় এবং ঝিলম ও চিনাব নদীর মধ্যবর্তী পুরুরাজ্য আলেকজাণ্ডারের প্রতিরোধে অগ্রসর হন। কিন্তু সকলেই তাঁর সুশিক্ষিত বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়।


আলেকজাণ্ডার

এর পর গ্রীক বাহিনী রাভী নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পার্শ্ববর্তী প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলি দখল করে। বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর গ্রীকবাহিনী আর পূর্বদিকে অগ্রসর হতে অস্বীকৃত হয়। সম্ভবতঃ দীর্ঘ যুদ্ধে ক্লান্ত গ্রীকবাহিনী নন্দরাজের সামরিক শক্তির কথা বিবেচনা করে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। বাধ্য হয়ে আলেকজাণ্ডার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। পথিমধ্যে মালব, ক্ষুদ্রক, অর্জুনায়ন মুষিক, পার্থ, শূদ্র প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীকে পরাজিত করেন। ৩২৫ খ্রীঃ পূঃ ব্যাবিলনের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফলাফল ঃ ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব লক্ষ্য করেন নি। প্রত্যক্ষ ফলাফলের দিক বিচার করলে এই অভিমত গ্রহণ করা যায়। আলেকজাণ্ডার বিজিত ভারতীয় অঞ্চলকে ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং গ্রীক শাসক নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু সংবাদ ভারতে পৌছিলে গ্রীক শাসনের অবসান হয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গ্রীক আধিপত্যের চিহ্ন লোপ করেন। ভারতীয় সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতির উপরেও এই অভিযানের কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। এমন কি সামরিক ক্ষেত্রেও উন্নত গ্রীক সামরিক কলাকৌশল কোন প্রভাব রাখতে সমর্থ হয় নি। আলেকজাণ্ডার ভারত অভিযানকালে কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশ (শহর) স্থাপন করেন—যথা, বুকেফেলা, নিকিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, সোগডিয়ানা ইত্যাদি। কিন্তু এগুলিও অল্পকাল পরেই ধ্বংস হয়ে যায়। এ অভিযানের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে স্থলপথ ও একটি জলপথ আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীকালে এই পথগুলি ব্যবসা বাণিজ্যের যোগাযোগের সূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশেষে প্রাচ্য সম্পর্কে ভৌগোলিক জ্ঞান পাশ্চাত্যে বিস্তৃত হয়।

কিন্তু এই অভিযানের পরোক্ষ ফল অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির অবসান ঘটে এবং পরবর্তীকালে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নেতৃত্বে রাজনৈতিক ঐক্যের পথ সুগম হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে উঠার ফলে পরবর্তীকালে গ্রীক ও রোমান শিল্পের প্রভাব ভারতীয় শিল্পে লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে বিখ্যাত গান্ধার শিল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। তৃতীয়তঃ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সংগে সংগে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিনিময় ঘটতে থাকে। ভারতীয় শিল্পকলা, বিজ্ঞান, মুদ্রানীতি গ্রীক প্রভাবে প্রভাবিত হয়। অপরদিকে ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি পাশ্চাত্যে প্রসারিত হয়।

(খ) মৌর্যোত্তর যুগে ব্যাকট্রিয় গ্রীক, শক এবং পহ্লবদের শাসন ঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল বারবার বিভিন্ন বৈদেশিক জাতি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ঐ অঞ্চলে তাদের আধিপত্য গড়ে উঠে। বাহ্লীক দেশ বা ব্যাকট্রিয়া (আফগানিস্তানের উত্তর অঞ্চল, অধিবাসী গ্রীক) এবং পার্থিয়া (কাস্পিয়ান তীরবর্তী খোরাসান অঞ্চল, অধিবাসী পহ্লবজাতি) সেলুকাসের বংশধরদের অধীন ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতকের মাঝামাঝি সময়ে এরা স্বাধীন হয়ে যায় এবং ভারতের

দিকে এগিয়ে আসে। আবার মধ্য এশিয়ার যাযাবর শক জাতি এবং চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের যাযাবর ইউচি জাতির অন্যতম শাখা কুষাণরা ভারতের দিকে এগিয়ে আসে। এইভাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ব্যাকট্রিয় গ্রীক, শক, পহ্লব ও কুষাণ জাতির আধিপত্য গড়ে উঠে।

ব্যাকট্রিয় গ্রীক অনুপ্রবেশ ঃ স্বাধীন ব্যাকট্রিয় গ্রীক রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ডায়াডোটাস। তাঁর বংশধর ডেমেট্রিয়াস পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ও আফগানিস্থানের একাংশে নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু তিনি গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে অগ্রসর হলে শুঙ্গরাজ বসুদেবের কাছে বাধা পান। ডেমেট্রিয়াসের পরবর্তী রাজা ইউক্রেটাইডিসও এই সমস্ত বিজিত অঞ্চলে আধিপত্য রক্ষা করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পহ্লবজাতি ব্যাকট্রিয়া অধিকার করে নেয়। ফলে ব্যাকট্রিয় গ্রীক রাজ্য ভারতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং তারা ক্রমশঃ ভারতীয় হয়ে যান। ভারতীয় গ্রীক রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিনাণ্ডার। সাকেত বা শিয়ালকোটে ছিল তাঁর রাজধানী। প্লুটার্কের রচনা থেকে জানা যায় যে তিনি ন্যায়পরায়ণ ও পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো' গ্রন্থের রাজা মিলিন্দ এবং মিনাণ্ডার অভিন্ন ব্যক্তি বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। এছাড়া এ্যাণ্টালসিডাস নামে আর একজন গ্রীক রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি হেলিওডোরাস নামে এক দূত বিদিশার রাজা ভাগভদ্রের রাজসভায় পাঠিয়েছিলেন এবং হেলিওডোরাস-এর গরুড় মূর্তি সম্বলিত একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়েছে। শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি জাতির আক্রমণে ব্যাকট্রিয় গ্রীক শাসনের অবসান হয়।

শক শাসন ঃ শক জাতি মধ্য এশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে ক্রমে সিন্ধু উপত্যকায় ও পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করে। শক রাজাদের মধ্যে প্রথমেই মোগ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি পশ্চিম ভারতের এক বিশাল অংশ অধিকার করেছিলেন এবং মহারাজ, রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। মোগ-এর পর রাজা হন অয়, অজিলিস এবং দ্বিতীয় অয়। দ্বিতীয় অয়-এর রাজত্বকালে ভারত সীমান্তবর্তী শক অধিকৃত স্থানগুলি পহ্লব অধিকারে চলে যায়।

শক জাতির ক্ষহরত শাখা পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে রাজ্যবিস্তার করে। এদের উপাধি ছিল ক্ষত্রপ, মহাক্ষত্রপ প্রভৃতি। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা নহপান মহারাষ্ট্র, কোঙ্কন, কাথিয়াবাড়, মালব, আজমীর তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সাতবাহন রাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী নহপানকে পরাজিত করে মহারাষ্ট্র ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল উদ্ধার করেন। শকজাতির কার্দমক শাখা উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করতো। এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা চষ্টন ও রুদ্রদামন। রুদ্রদামন মালব কাথিয়াবাড়, উত্তর-গুজরাট, কচ্ছ, কোঙ্কনের উপর তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করেন। তিনি সুশাসক ও সুপণ্ডিত ছিলেন।

গুপ্তবংশের রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতের শক শাসনের অবসান ঘটান ও শকারি উপাধি গ্রহণ করেন।

পহ্লব রাজগণ ঃ সেলুকাসের বংশধরদের আমলে অর্সসেস-এর নেতৃত্বে পহ্লবগণ

স্বাধীন হয়ে যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গান্ধারের একাংশে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, পহ্লব রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল গণ্ডোফার্নিস। তিনি সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি কাবুল উপত্যকায় গ্রীক শাসনের অবসান ঘটান এবং শকদেরও পরাজিত করেন। তাঁর রাজত্বকালে খৃষ্টান ধর্মযাজক সেন্ট টমাস ভারতে আসেন। শেষ পর্যন্ত আফগানিস্থান, সিন্ধু ও পাঞ্জাব অঞ্চলে কুষাণ জাতি পহ্লব আধিপত্য বিনষ্ট করে।

(গ) **সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা:** মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা, অন্যান্য গ্রীক লেখকদের রচনা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং অশোকের শিলালিপি থেকে এই যুগের সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যায়।

অর্থনীতি ছিল মূলতঃ কৃষিনির্ভর। সমাজে অধিকাংশ লোকই ছিল কৃষিজীবি। জমির উর্বরা শক্তির জন্য খাদ্যশস্যের ফলনও ছিল প্রচুর। নানা প্রকার, ফলও উৎপন্ন হত। কৃষি ছাড়া শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। খনিশিল্পের মধ্যে সোনা, রূপা, তামা, লোহা প্রভৃতি শিল্প উল্লেখযোগ্য। খনিশিল্প ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। এছাড়া যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ, অলঙ্কার নির্মাণ, বয়নশিল্প ও আরো নানারকম শিল্প গড়ে উঠেছিল। পশুপাখী শিকার ও পশুপালন করেও বহুলোক জীবিকা অর্জন করত। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যের উল্লেখ মেগাস্থিনিসের রচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু মেগাস্থিনিসের ভারত ত্যাগের অল্পকাল পরেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল তার প্রমাণও আছে। বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থনীতির একটি প্রধান অংগ এবং এই যুগে পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে রোম, পশ্চিম এশিয়া ও চীনের সংগে বাণিজ্যিক আদান প্রদান চলত।

সমাজ ছিল বর্ণবিভক্ত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উচ্চবর্ণের লোকদের চতুরাশ্রমের যাবতীয় কর্তব্য পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। মেগাস্থিনিস ভারতীয় সমাজকে সাতটি জাতিতে ভাগ করেছেন। এগুলি হল, দার্শনিক, কৃষক, শিকারী ও পশুপালক, কারুশিল্পী, যোদ্ধা, পরিদর্শক ও অমাত্য। কিন্তু এইগুলি বৃত্তিগত ও পেশাগত শ্রেণী। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে সমাজে দাসপ্রথা ছিল না। কিন্তু তাঁর এ ধারণাও ঠিক নয়। দাসপ্রথা ছিল তবে তারা যথেষ্ট উদার ব্যবহার পেত। মৌর্যযুগে সমাজে নারীজাতির স্থান ছিল উচ্চে। তাদের বিদ্যার্জন ও শাস্ত্র আলোচনার অধিকার ছিল। বৈদেশিক জাতিগুলির আক্রমণ শুরু হলে সমাজে রক্ষণশীলতা দেখা দেয় এবং স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও শিক্ষার অধিকার কমে যায়। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণ প্রথা সমাজে প্রচলিত হয়।

মৌর্যযুগে অসংখ্য নগর গড়ে উঠে। এগুলির মধ্যে তক্ষশীলা, পাটলিপুত্র উজ্জয়িনী, পুণ্ড্রনগর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নগরগুলি ছিল সুসজ্জিত এবং নাগরিকরা প্রাচুর্য ও বিলাসের জীবন কাটাতেন।

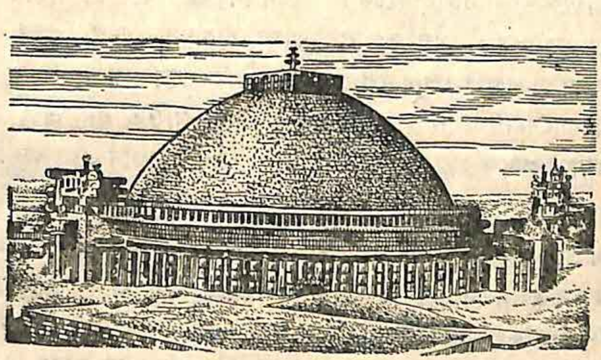
মৌর্যোত্তর যুগে ব্যাকট্রিয় গ্রীক, শক, পহ্লব প্রভৃতি জাতি ভারতে আসে। কালক্রমে এই সব বিদেশী জাতিগুলি ভারতে স্থায়িভাবে বসবাস করতে থাকে এবং ভারতীয় জনসমাজে মিশে যায়। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মিশ্রণের ফলে সামাজিক কাঠামোয় আসে

বৈচিত্র্য। প্রায়শ্চিত্ত যজ্ঞের মধ্য দিয়ে বিদেশী জাতিগুলিকে ভারতীয় বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। 'অগ্নিকুল' বলে যারা দাবী করেন, যেমন রাজপুত জাতি, তারা যে বিদেশী জাতি থেকেই এসেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ঃ মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে বিদেশের সংগে ভারতের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে ওঠে। মৌর্যযুগ থেকেই গান্ধার (আফগানিস্তান) অঞ্চলের সংগে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। পরে মধ্য এশিয়া, চীন, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতির সংগেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে মধ্য এশিয়া, চীন ও রোমের সংগে বাণিজ্য চলতে থাকে। বিদেশের সংগে যোগাযোগের ফলে ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন ঘটে ও এক উন্নততর ভারতীয় সভ্যতা গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়।

মৌর্য শিল্প ঃ মৌর্যযুগে শিল্পকলা, বিশেষ করে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। মেগাস্থিনিস ও অন্যান্য গ্রীক লেখকদের বিবরণ ও প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষগুলি থেকে মৌর্যযুগের উন্নত স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্রাট অশোক নির্মিত আজীবিক সম্প্রদায়ের গুহাগুলিও স্থাপত্য শিল্পের উন্নত নিদর্শন।

ভাস্কর্য শিল্পেও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। স্তম্ভগুলির অলংকরণ ও স্তম্ভশীর্ষের সিংহ, ষাঁড় প্রভৃতি পশু মূর্তিগুলির নিখুঁত গড়ন, মসৃণতা লক্ষ্য করার মত। সারনাথের অশোকস্তম্ভ এই যুগের ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শিল্পীদের অনুপাত জ্ঞান ও শিল্প কৌশলের অপূর্ব সমন্বয়ে এটি নির্মিত হয়েছিল। সম্রাট অশোক অসংখ্য স্তূপ নির্মাণ



সাঁচী স্তূপ

করেছিলেন। এগুলির মধ্যে সাঁচী স্তূপ আজও শিল্পরসিকদের বিস্ময় উদ্রেক করে। এযুগের বিভিন্ন পাথরের মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে। মৌর্যযুগের শিল্পে গ্রীক ও পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৫। কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহাস ঃ

যে সকল বিদেশী জাতি ভারতে রাজ্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কুষাণ জাতি। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কুষাণ বংশের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

চীনা ঐতিহাসিকগণের রচনা থেকে জানা যায় যে চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে বসবাসকারী ইউ-চি নামে এক যাযাবর জাতি হিউং নু নামে অপর এক তুর্কী যাযাবর জাতি দ্বারা বিতাড়িত হয়ে নতুন চারণভূমির সন্ধানে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। ইলি নদীর উপত্যকায় ইউ-চি জাতি উ-সুন জাতিকে পরাজিত করে আরও পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয় এবং ক্রমে সিরদরিয়া অঞ্চলে শক জাতিকে পরাজিত করে। পরাজিত শকরা ভারতে প্রবেশ করে। ইউচি জাতি সিরদরিয়া অঞ্চল ত্যাগ করে আমুদরিয়া অঞ্চলে আশ্রয় নেয় এবং এখানে বসবাস কালেই তারা যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিজীবি হয়ে ওঠে। ইউ-চি জাতি ক্রমে পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এদের মধ্যে কুষাণ শাখাই সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

প্রথম কদফিসিস ঃ চীনা ঐতিহাসিক ফান-ই-র বিবরণ থেকে জানা যায় যে কুজুল কদফিসিস বা প্রথম কদফিসিস অপর চারটি ইউচি শাখার দলপতিদের পরাজিত করে রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর রাজ্যসীমা পারস্য দেশের সীমা থেকে আরম্ভ করে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে মনে করা হয়। অবশ্য ঐতিহাসিকরা এই বিষয়ে একমত নন। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে কেহ কেহ মনে করেন।

দ্বিতীয় কদফিসিস ঃ প্রথম কদফিসিসের পুত্র বীম কদফিসিস বা দ্বিতীয় কদফিসিস ভারতের অভ্যন্তরে রাজ্যবিস্তার করেন। তিনি সিন্ধুনদ বিধৌত পাঞ্জাব অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য গড়ে তোলেন। সম্ভবতঃ তাঁর রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিন্ধু উপত্যকার পহ্লব রাজ্যগুলি সম্পূর্ণরূপে জয় করে তিনি পহ্লব শাসনের অবসান ঘটান। অবশ্য তিনি চীনা সেনাপতি প্যান চাও-এর হাতে পরাজিত হন এবং চীন সম্রাটকে বাৎসরিক করদানে স্বীকৃত হন। তিনি রোমান সম্রাট ট্রাজান-এর সভায় দূত প্রেরণ করেন।

কণিষ্ক ঃ দ্বিতীয় কদফিসিস-এর মৃত্যুর পর কণিষ্ক কুষাণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। দ্বিতীয় কদফিসিস-এর সংগে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল জানা যায় নি। কণিষ্কের সিংহাসনে আরোহণ কাল সম্পর্কেও ঐতিহাসিকরা একমত নন। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে কণিষ্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজে একটি অব্দের প্রচলন করেছিলেন এবং ৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে শকাব্দ নামে একটি অব্দের গণনা করা হয়। এই তথ্যগুলি একত্রে বিচার করলে কণিষ্ক শকাব্দের প্রবর্তক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

কোন কোন ঐতিহাসিক কণিষ্ককে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথমভাগে (১১০ খ্রীঃ) স্থাপন করেছেন। যাই হোক এই বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হয় নি।

রাজ্যবিজেতা হিসাবে কণিষ্ক কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কল্হনের রাজতরঙ্গিণী ও বৌদ্ধ কাহিনী থেকে জানা যায় যে তিনি কাশ্মীর জয় করেন। চীনা ঐতিহাসিক গ্রন্থে তিনি সাকেত (অযোধ্যা) এবং পাটলিপুত্র (মগধ) পর্যন্ত জয় করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। তবে তার সামরিক সাফল্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কাশগড়, খোটান ও ইয়ারকন্দ অধিকার। এই অঞ্চলগুলি চীন সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। এই অঞ্চলগুলি জয় করে কণিষ্ক দ্বিতীয় কদফিসিস-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং জনৈক চীনা রাজকুমারকে প্রতিভূস্বরূপ নিজের রাজসভায় নিয়ে আসেন। হিউয়েনসাঙ্-এর রচনায় এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়।



কণিষ্কের ভগ্নমূর্তি

বিভিন্ন উপাদান থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে কণিষ্ক এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্য মধ্যদেশ, উত্তরাপথ ও অপরান্ত (উত্তর কোঙ্কন) নিয়ে গঠিত ছিল। পশ্চিমে খোরাসান থেকে পূর্বে বিহার পর্যন্ত এবং উত্তরে খোটান থেকে দক্ষিণে কোঙ্কন পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বর্তমান উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, ভাওয়ালপুর তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। রাজপুতানা, মালব, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি স্থানও তাঁর আনুগত্য স্বীকার করত বলে অনুমান করা হয়। কাবুল ও গান্ধার তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশওয়ার।

কণিষ্ক ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম ঃ সম্রাট অশোকের পর কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মকে রাজপোষকতায় সম্মানিত করেন। তার পূর্বে গণ্ডোফার্নিস, মিনাণ্ডার, কদফিসেস্ প্রমুখ বিদেশী বংশজাত রাজারা বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব, এমন কি খ্রীষ্টধর্মের প্রতি যে উদারতা দেখিয়েছিলেন তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অশোকের সময় থেকেই ভারতে গান্ধার অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসার হতে থাকে। গ্রীকদের হাতে তাঁর রূপান্তর ঘটতে থাকে ধীরে ধীরে। বিশুদ্ধ নির্বাণ তত্ত্বের উচ্চমার্গ থেকে নেমে ক্রমে ইহলোকের মানুষের কল্পনার সীমায় মূর্তিধারণ করে। ভাবরাজ্যের ও ধ্যানরাজ্যের বুদ্ধ ক্রমে শিল্পীর কল্পনায় পাথরে ও ধাতুতে নব-নব মূর্তিতে রূপায়িত হতে থাকেন। এর মধ্যেই খ্রীষ্টধর্মের বিকাশ হয়। পশ্চিম এশিয়া ও মিশরে খ্রীষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকেরা মিলিত হন। যীশুর মতই বুদ্ধকে ঈশ্বর কল্পনা করার চেতনা এইভাবেই জাগে। তার উপর ভারতে

পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন হচ্ছিল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য বহু দেবতাও এই পৌরাণিক ধর্মে স্থান করে নিয়েছিল। এইভাবেই মৌর্যযুগের পর গ্রীক-পারসিক, ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম কালোপযোগী নবরূপ ধারণ করেছিল। এইভাবেই মহাযান' (Great Vehicle) বৌদ্ধধর্ম মতের জন্ম। এই মহাযান উপাসনা পদ্ধতি অনুযায়ী বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করে বুদ্ধকে ঈশ্বরের স্তরে উন্নীত করা হয়েছিল। বুদ্ধের নিরাকার উপাসনা পদ্ধতিকে 'হীনযান (Lesser Vehicle) বলা হত। যাই হোক, মহাযান মতে বৌদ্ধধর্মের নবরূপায়ণে সাহায্য করে কণিষ্ক এক বিরাট ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অশোক বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ও সমৃদ্ধির জন্য যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, কণিষ্ক তা আরও সুসংবদ্ধভাবে সম্পাদন করবার চেষ্টা করেন।

বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশ তাঁর তিরোধানের পর কণিষ্কের আগে তিনবার সংকলিত হয়েছিল তিনটি মহাসংগীতিতে। কণিষ্ক কাশ্মীরে (মতান্তরে জলন্ধরে) যে বৌদ্ধ সংগীতি ডেকেছিলেন তা হল চতুর্থ। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে মতভেদ তখন তীব্র ও জটিল আকার ধারণ করেছে। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে যাবতীয় পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে সেগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা ও টীকা প্রস্তুত করা যায় এবং ঐক্য মতে পৌছুবার জন্য এই মহাসংগীতির আহ্বান করা হয়েছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত বসুমিত্র ছিলেন এই মহাসংগীতির সভাপতি এবং অশ্বঘোষ ছিলেন এর সহ সভাপতি। বৌদ্ধ শাস্ত্র ও বাণীর যে টিকা ও ব্যাখ্যা হ'ল তা তাম্রপটে খোদাই করে একটি কাস্কেটের মধ্যে ভরে স্তূপের ভিতরে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কণিষ্ক মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও সকল ধর্মের প্রতি তাঁর সমান শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর প্রবর্তিত মুদ্রা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীক, ইরানী বা পারসী, হিন্দু প্রভৃতি কোন ধর্মের দেবদেবীকে তিনি অশ্রদ্ধা করেননি। এছাড়া তিনি বুদ্ধের বহু প্রস্তর-মূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এইসব দেখে বোঝা যায় কেন তিনি মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মকে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

কণিষ্কের রাজত্বকাল ভারত ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি ছিলেন একাধারে বিজয়ীবীর, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির উৎসাহদাতা। কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে তো বটেই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে কণিষ্ক স্বীকৃত হন।

কুষাণ যুগে বিদেশের সংগে যোগাযোগ ঃ এইযুগে ভারতের সংগে বহির্জগতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। চীনদেশের সংগে যোগাযোগ আগে থেকেই ছিল। ৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কুষাণ রাজসভা থেকে রোম সম্রাট ট্রাজনের দরবারে দূত প্রেরিত হয়। রোম ও ভারতের মধ্যে জল ও স্থলপথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদান শুরু হয়। ভারত থেকে রেশম, মশলা, মণিমুক্তা প্রভৃতি সামগ্রী রোমে রপ্তানী করা হোত এবং রোম থেকে প্রচুর সোনা ভারতে আসত। দ্বিতীয় কদফিসিস রোমান সম্রাটদের অনুকরণে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন। এছাড়া মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সংগেও ব্যাপক বাণিজ্যিক আদান প্রদান শুরু হয়। বহির্জগতের সংগে যোগাযোগের প্রভাব লক্ষ্য করা

স্থায় কুষাণ যুগের শাসন ব্যবস্থায় ও শিল্পে। এর মধ্যে গ্রীক প্রভাবই সবচেয়ে বেশী ছিল।

ভারত ইতিহাসে কুষাণ যুগের গুরুত্ব ঃ কুষাণযুগ ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে এক অন্ধকারময় যুগের সূচনা হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে কুষাণ বংশ উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানে আধিপত্য বিস্তার করে এবং রাজনৈতিক ঐক্য কিছু পরিমাণে উদ্ধার করে। এমনকি মধ্যএশিয়া কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই যুগে বিভিন্ন জাতির সংগে সংস্পর্শের ফলে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

সাহিত্য ঃ সাহিত্যক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিলেন নাগার্জুন অশ্বঘোষ, বসুমিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ। কণিষ্ক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজশেখরের কাব্য মীমাংসা গ্রন্থে কুষাণরাজ বাসুদেবকে কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অশ্বঘোষ রচিত 'বুদ্ধচরিত' ও 'সূত্রালংকার', বসুমিত্র রচিত 'মহাবিভাষা' এই যুগের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কীর্তি। আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞ চরক এই যুগে আবির্ভূত হন।

বিদ্যাচর্চা ঃ ধর্মোৎসাহের সঙ্গে কণিষ্ক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেন। প্রাচীন তক্ষশিলায় 'উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রটি কণিষ্কের আমলে খ্যাতির উচ্চশিখরে উঠে। এখানে তাঁর সময়ে বেদ-বেদান্ত, ব্যাকরণ, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল।

কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ হয়। **অশ্বঘোষের** মত কবি, বৌদ্ধ দার্শনিক, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ, নৈয়ায়িক কণিষ্কের রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। অনেকে তাঁকে একাধারে মিল্টন, গোথে, কাণ্ট ও ভল্তেয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

কণিষ্কের সভায় আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম হল **নাগার্জুন**। তাঁকে মার্টিন লুথারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। হিউয়েন সাঙ্ তাঁকে পৃথিবীর চারটি আলোকবর্তিকার একজন বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। তিনি ছিলেন মহাযান ধর্মপদ্ধতির ব্যাখ্যাকার। মহাযান বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে 'প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র'। প্রজ্ঞা হচ্ছে মৈত্রী, করুণা ইত্যাদির মত এক পারমিতা। এই সূত্র অবলম্বন করে তিনি কণিষ্কের সময় তাঁর "মাধ্যমিক সূত্র" রচনা করেন।

বসুমিত্র ছিলেন কণিষ্কের সময়ের একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ ও দার্শনিক। তিনি চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। বৌদ্ধ-ত্রিপিটকের ব্যাখ্যা ও টীকা সহ আলোচনা 'মহাবিভাষা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন বসুমিত্র। এই গ্রন্থকে বৌদ্ধশাস্ত্রের মহা-অভিধান বলা হয়।

কণিষ্কের আমলেই আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিশারদ চরক তাঁর চিকিৎসক ছিলেন। **চরক** ছিলেন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের আদি পণ্ডিত। প্রাচীন শল্য বিদ্যার জনক **সুশ্রুত** কণিষ্কের আমলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বহু মণীষীর আবির্ভাবে কুষাণ যুগ ভারত ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে আছে।

শিল্পসৃষ্টি ঃ মৌর্য যুগ থেকেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গান্ধার অঞ্চলে গ্রীক ও পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের ফলে গ্রীক-রোমান-বৌদ্ধ শিল্পরীতির এক সুন্দর মিলন ঘটেছিল। এই গান্ধার শিল্পরীতিকে (art style) গ্রীক-বৌদ্ধ (Graeco Buddhist) এবং গ্রীক-রোমান (Graeco-Roman) রীতি বলে অভিহিত করা হয়। গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর মত বুদ্ধের মূর্তি, জীউসের মতে যক্ষ কুবেরের মূর্তি শিল্পীরা গড়তেন। মূর্তির গায়ে পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রীক ভঙ্গীতে দেওয়া হয়। কণিষ্কের আমলে চীনা-তুর্কীস্থানের ভিতর দিয়ে বৌদ্ধধর্ম সুদূর প্রাচ্যে চীন ও জাপানে বিস্তৃত হয়। তাই চীনা ও জাপানী বৌদ্ধ মূর্তির মধ্যে গান্ধার শিল্পরীতির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ছিল। যাই হোক গান্ধার শিল্পের উৎকর্ষ কণিষ্কের আমলকে গৌরবদীপ্ত করেছিল এসম্পর্কে সন্দেহ নেই।



গান্ধার শিল্পের নিদর্শন

কিন্তু মনে রাখতে হবে, গ্রীক-রোমক শিল্পের প্রভাব যথেষ্ট হলেও গান্ধার শিল্পের………গান্ধার শিল্পের বিষয়বস্তু, ঘটনা ও রীতি ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। এমনকি শিল্পের মূলনীতি ছিল ভারতীয়। দক্ষিণ ভারতে অমরাবতী ও কৃষ্ণা প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় আবিষ্কৃত সমসাময়িক ভাস্কর্য শিল্প ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। অমরাবতীতে পাওয়া পাথরে খোদাই করা বিরাট পদক বা মথুরা অঞ্চলে কণিষ্কের একটি মস্তকহীন পাথরের প্রতিকৃতি তখনকার ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পের সাক্ষ্যই বহন করছে।

স্তূপ, চৈত্য ও নগর নির্মাণে কণিষ্ক যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসাবে মথুরা নগরী ও পুরুষপুরে নির্মিত বিশাল চৈত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৬। **সাতবাহন সাম্রাজ্য (ক) উদ্ভব ও বিস্তৃতি**—দাক্ষিণাত্য ও মধ্য ভারতে মৌর্যদের ভারতীয় উত্তর সূরীদের মধ্যে সাতবাহনেরা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সংযোগস্থলে বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের গোড়ার দিকে মহারাষ্ট্রে এই সাতবাহন বংশের আমলে এক রাষ্ট্রশক্তির উত্থান ঘটে। এই রাষ্ট্রশক্তির সংগঠকগণ সাতবাহন নামে নিজেদের পরিচয় দেন। একেবারে গোড়ার দিকে তাঁরা ছিলেন দক্ষিণ ভারতের একটি উপজাতিগোষ্ঠী। পুরাণসমূহে এদের অন্ধ্র বা অন্ধ্রভৃত্য বলা হয়েছে। সাতবাহনগণ জাতিতে ছিল ব্রাহ্মণ। এদের রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠান (বর্তমান পৈথান)।

পুরাণসমূহে বলা হয়েছে যে অন্ধ্রজাতীয় সিমুক মগধের শেষ কাণ্ব বংশীয় রাজা সুশর্মাকে হত্যা করে রাজা হন। তিনি মগধ অধিকৃত দক্ষিণাপথের কিছু অঞ্চল, বিদিশা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করেন। সিমুক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্য মধ্যভারতের দক্ষিণাংশ এবং দাক্ষিণাত্যের উত্তর অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। সিমুকের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর ভ্রাতা কৃষ্ণ বা কন্‌হ। তিনি আঠারো বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র

সাতকর্ণীর আমলে দক্ষিণাপথের উত্তরাঞ্চল, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ সাতবাহন শাসনে আসে। এছাড়া উত্তর কোঙ্কন ও সৌরাষ্ট্রেও তাঁর প্রভাব ছিল। সাতকর্ণীর মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ প্রতিদ্বন্দ্বী শকদের হাতে সাতবাহনের পরাজয় ঘটে।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী (১০৬-১৩০ খ্রীঃ) খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী সাতবাহন শক্তি পুনর্জীবিত করেন। তিনি নিজেকে শক-যবন-পহ্লব-নিসূদন এবং সাতবাহন কূল-যশঃ-প্রতিষ্ঠা-পণ-করেন বলে দাবী করেছেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনি শক-যবন-পহ্লবদের পরাজিত করেছিলেন। ১২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তিনি ক্ষহরত (শক জাতির এক শাখার নাম) শক ক্ষত্রপ নহপানকে পরাজিত ও নিহত করেন। নাসিক প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে অপরান্ত (উত্তর কোঙ্কন), অনূপ (নর্মদা অঞ্চল), সুরাষ্ট্র (সৌরাষ্ট্র), আকর (পূর্ব মালব) এবং অবন্তী (পশ্চিম মালব) গৌতমীপুত্রের অধিকারভুক্ত ছিল। এছাড়াও ঋষিক (উত্তর কৃষ্ণা অঞ্চল), অশ্মক (হায়দ্রাবাদ রাজ্যের বোধন অঞ্চল) মূলক (গোদাবরী অঞ্চল) এবং বিদর্ভে (বেরার) তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। গৌতমীপুত্রের রাজত্বকালের শেষ দিকে কার্দমক শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামন তাঁকে পরাজিত করে এবং শকদের কাছ থেকে তিনি যে বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করেছিলেন তা পুনরুদ্ধার করেন। কানহেরী লিপি থেকে অনুমান করা হয় যে গৌতমীপুত্র কার্দমক শকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁর অধিকৃত কিছু কিছু এলাকা রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। গৌতমীপুত্রের রাজত্বকাল ১০৬ থেকে ১৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ছিলেন জনকল্যাণকামী শাসক। পার্শ্ববর্তী রাজগণ সকলেই তাঁকে মান্য করতেন। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ও জাতিগত বৈষম্য বজায় রাখেন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর পর পর বশিষ্ঠ পুত্র পুলুমায়ী সাতবাহন বংশের রাজা হন। তাঁর আমলে অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ এবং করমণ্ডল উপকূল সাতবাহন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামনের হাতে তিনি পরপর দু'বার পরাজিত হন। ফলে উত্তর কোঙ্কন অঞ্চল তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায়।

সাতবাহন বংশের সর্বশেষে শক্তিশালী রাজা যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী (১৭৪-২০৩ খ্রীঃ)। তিনি মহারাষ্ট্রের একাংশ ও উত্তর কোঙ্কন শকদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেন।

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর পর থেকে এই বংশের পতন শুরু হয়। তাঁদের উত্তরসূরী ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশ। শেষ পর্যন্ত আভির জাতি, এবং পল্লব আক্রমণে সাতবাহন রাজত্বের অবসান হয়।

সাতবাহন শাসনের গুরুত্বঃ সাতবাহন যুগে দাক্ষিণাত্যে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তাতে স্থানীয় ও উত্তর ভারতীয় উপাদানের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তবে কুষাণদের মত সাতবাহনেরা স্বর্ণ মুদ্রা-নির্মাণের কাজে ব্যবহার করতেন না। তাঁরা প্রধানতঃ সীসার মুদ্রা চালু করেছিলেন। তাছাড়া তামার বা ব্রোঞ্জের মুদ্রাও ছিল। দাক্ষিণাত্যের ধানের সঙ্গে তুলোর চাষ হত। বিদেশীদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে তুলোর চাষের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশের নাম উল্লেখযোগ্য। অতএব দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উন্নত গ্রামীণ

অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। প্লিনির মতে অন্ধ্রপ্রদেশের সৈন্যবাহিনীতে ১,০০,০০০ পদাতিক সেনা, ২০০০ অশ্বারোহী সেনা এবং ১০০০ হাতি ছিল। এই বিশাল সামরিক বাহিনীর ব্যয়ভার বহন করার মত ক্ষমতার কারণ ছিল স্পষ্টতই উন্নত অর্থনীতি। প্লিনির বিবরণ থেকে জানা যায় পূর্ব দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র রাজ্যে ৩০টি দেওয়াল ঘেরা নগর গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া অসংখ্য রোমান ও সাতবাহন মুদ্রা থেকে এযুগের ব্যাপক-বাণিজ্যের কথা জানা গিয়েছে।

কারিগরি ও বাণিজ্যের প্রসার হওয়ায় এ যুগে কারিগর ও বণিক সম্প্রদায় সমাজের পুরোভাগে স্থান পেয়েছিলেন। কারিগর ও বণিক সম্প্রদায়, উভয়েই বৌদ্ধদের দান ধ্যান করতেন। কারিগরদের মধ্যে দাতা হিসাবে গান্ধিকদের নাম বারবার উল্লেখ হয়েছে। পরবর্তীকালে 'গান্ধিক' বলতে বোঝাত সব রকমের দোকানদার।

তবে সাতবাহন যুগে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল পরিবারের কাঠামো। সাতবাহন যুগে পরিবারগুলি ছিল সম্ভবতঃ মাতৃতান্ত্রিক। সাতবাহন রাজারা মায়ের নামে নিজেদের নাম রাখতেন। গৌতমীপুত্র, বশিষ্ঠি প্রভৃতি নাম থেকে আমরা বুঝতে পারি এ যুগের সমাজে মায়ের বিশেষ মর্যাদা ছিল। রাণীরাও এ যুগে দান ধ্যান করতে পারতেন। তবে এতৎসত্ত্বেও সাতবাহন শাসক-বংশ ছিল পিতৃতান্ত্রিক। কারণ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতে পারতেন একমাত্র পুরুষ।

ধর্মশাস্ত্রগুলিতে রাজার কর্তব্য বলতে যা যা বোঝানো হয়েছে, সেগুলি পালন করতে সাতবাহনেরা ছিলেন সদা তৎপর। রাজা ছিলেন ধর্মের রক্ষক। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করা হত। তার নিচে ছিলেন মহাভোজ, তৃতীয় স্তরে ছিলেন সেনাপতি। সাতবাহন রাজারা অশোকের শাসন ব্যবস্থার কয়েকটি বিষয় গ্রহণ করেছিলেন। অশোকের আমলের মত সাতবাহন যুগেও জেলাকে বলা হত 'আহর' (ahara) এবং রাজকর্মচারীদের নাম ছিল অমাত্য বা মহামাত্র। সেনাপতিরা ছিলেন একধারে প্রদেশের শাসক। গ্রামাঞ্চলে শাসনব্যবস্থায় দায়িত্ব ছিল গৌলমিকের (goulmika) হাতে। সাতবাহন শিলালিপিতে 'কাতক' (kataka) বা স্কন্ধাবার শব্দের উল্লেখ আছে। এই শব্দের অর্থ ছিল সামরিক ঘাঁটি। এই ঘাঁটিগুলি ছিল শাসনকার্য চালনার কার্যালয়। সাতবাহন রাজারা বৌদ্ধ শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের করমুক্ত গ্রাম দান করতেন।

সাতবাহন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিস্তারলাভ করেছিল। প্রথম থেকে সাতবাহন বংশের রাজা ও রানীরা অশ্বমেধ প্রভৃতি বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন করেছিলেন। একই সঙ্গে সাতবাহন রাজারা আবার বৌদ্ধধর্মেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৭। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাসঃ কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজনৈতিক ঐক্য নষ্ট হয়ে যায় এবং ভারত আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। এগুলির মধ্যে বিন্ধ্যপর্বত অঞ্চলে বাকাটক রাজ্য, লিচ্ছবি রাজ্য, বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে নাগরাজ্য ও

মগধ উল্লেখযোগ্য। মগধকে কেন্দ্র করে গুপ্তবংশের নেতৃত্বে আবার রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়—গড়ে উঠে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য।

গুপ্ত বংশের প্রথম তিনজন রাজা যথাক্রমে মহারাজ **শ্রীগুপ্ত,** মহারাজ **ঘটোৎকচ গুপ্ত** ও মহারাজাধিরাজ **চন্দ্রগুপ্ত** নামে উল্লিখিত হয়েছেন। তবে **তৃতীয় রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের** আমল থেকেই গুপ্ত রাজ্য বিস্তৃত হতে থাকে। তাঁর মহারাজাধিরাজ উপাধি এবং তাঁর প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রাগুলি থেকে একথা সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়। বৈশালীর লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করে চন্দ্রগুপ্ত তাঁর রাজ্যের এলাকা ও শক্তি বাড়াতে পেরেছিলেন। অনুমান করা হয় যে তাঁর রাজ্য বিহার, বঙ্গদেশের পশ্চিম অংশ ও উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত ছিল। তিনি ৩২০ থেকে ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ রাজত্ব করেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণকাল থেকে অর্থাৎ ৩২০ খ্রীঃ থেকে গুপ্তাব্দের সূচনা একথা মনে করার সংগত যুক্তি আছে।

সমুদ্রগুপ্ত (৩৩৫-৩৮০ খ্রীঃ) সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালের একটি নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান হল তাঁর সভাকবি হরিষেণ রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি'। ঐ স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় যে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের জীবিতকালেই তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত হন।

রাজ্যজয় ঃ সমুদ্রগুপ্ত সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। সিংহাসন লাভের পর তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি উত্তর ভারতের নয়জন রাজাকে পরাজিত করে তাদের রাজ্য নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এঁরা হলেন নাগসেন, গণপতি নাগ, অচ্যুত, চন্দ্রবর্মা, রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত; নন্দী ও বলবর্মা। নাগবংশীয় নাগসেন গণপতি নাগ, বিদিশা, কান্তিপুর ও পদ্মাবতীতে রাজত্ব করতেন। অচ্যুত ও চন্দ্রবর্মা যথাক্রমে অহিচ্ছত্র ও পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। বাকী পাঁচজন কোন অঞ্চলে রাজত্ব করতেন সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

এলাহাবাদ প্রশস্তিতে পাঁচটি প্রত্যন্ত করদ রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় যারা সমুদ্র গুপ্তের আনুষ্ঠানিক অধীনতা স্বীকার করে চলতেন। এগুলি হল—সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গদেশ), কামরূপ (উত্তর আসাম), নেপাল, দাবক (আসামের নওগাঁ অঞ্চলে) ও কর্তৃপুর (বর্তমান পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলার কর্তারপুর)।

এছাড়া কয়েকটি জাতি, যথা, মালব, অর্জুনায়ন, যৌধেয়, মদ্রক, সনকানিক, আভীর, প্রার্জুন প্রভৃতি জাতিসমূহ সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করত। এইভাবে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে তার আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতেও অভিযান করেন এবং বরোদার রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন বলে এলাহাবাদ প্রশস্তিতে বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য দক্ষিণ ভারতের বিজিত অংশ তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে না এনে কেবলমাত্র রাজাদের বশ্যতা আদায় করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের যে সমস্ত রাজা তাঁর হাতে পরাজিত হন তাঁরা হলেন —কোশলের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ, পিষ্টপুরের মহেন্দ্রগিরি, বেঙ্গির হস্তীবর্মা, পালক্কের উগ্রসেন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, এরণ্ডপল্লের দমন, দেবরাষ্ট্রের কুবের, কোরালের মন্তরাজ, কোট্টরের স্বামীদত্ত, অবমুক্তের নীলরাজ এবং কুস্থলপুরের ধনঞ্জয়।

পশ্চিম ভারতের বিশেষ করে মালব ও সৌরাষ্ট্রের শক ক্ষত্রপরা তাঁর প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পশ্চিম পাঞ্জাব ও আফ্‌গানিস্থানে কুষাণ রাজা তাঁর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ তাঁর অনুমতি নিয়ে বুদ্ধগয়ায় ভিক্ষুদের জন্য সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন।

সমুদ্রগুপ্তের নিজ অধিকৃত রাজ্যের সীমা উত্তরে হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং সেই উপলক্ষ্যে অশ্বমেধ পরিক্রমা নামে এক বিশেষ মুদ্রা প্রচলন করেন।

অসাধারণ বিজয়ী বীররূপে সমুদ্রগুপ্তকে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তিনি 'ভারতের নেপোলিয়ন' নামে বিখ্যাত।

সমুদ্রগুপ্ত রাজ্যজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতে পুনরায় রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন। সম্রাট অশোকের পর তিনিই একমাত্র সম্রাট যিনি প্রায় সমগ্র ভারতের আনুগত্য অর্জন করেছিলেন। শুধুমাত্র দিগ্বিজয়ী বীর হিসাবেই নন সুদক্ষ রাষ্ট্রশাসক, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি হিসাবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি 'কবিরাজ' উপাধি লাভ করেন এবং তাঁর মুদ্রায় বীণাবাদনরত মূর্তি দেখে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাঁর প্রশস্তিকারের দাবী মেনে নেওয়া অসঙ্গত নয়। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুরাগী ছিলেন কিন্তু পরধর্মসহিষ্ণুতা তাঁর উল্লেখযোগ্য নীতি ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থকার বসুবন্ধু তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। সুতরাং কেবলমাত্র বিজয়ী বীর ও সুশাসক রূপে নয়, বিদ্যোৎসাহী ও মানবহিতৈষী হিসাবেও সমুদ্রগুপ্ত ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয়। সমুদ্রগুপ্ত দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (আঃ ৩৮০-৪১৫ খ্রীঃ)ঃ গুপ্তযুগের পরবর্তী-কালে রচিত কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগুপ্ত পিতার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তকেই পুত্রদের মধ্যে যোগ্যতম বিবেচনা করে আপন উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী এবং বহুগুণসম্পন্ন রাজা ছিলেন। তিনি কুবেরনাগা নাম্নী এক নাগবংশীয়া রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের পরাক্রান্ত বাকাটক বংশীয় নরপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে নিজের মেয়ে প্রভাবতীর বিবাহ দেন। এইভাবে তিনি আপন প্রভাব বৃদ্ধি ও রাজ্যসীমা সুরক্ষিত করেন। এই দুইটি বৈবাহিক সম্বন্ধই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপগণকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে মালব ও সুরাষ্ট্র অধিকার করেন এবং **শকারি** নামে পরিচিত হন। শক-বিজয় দ্বারা ভারতে বৈদেশিক প্রভুত্ব বিলোপসাধনাই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই বিজয়ের ফলে পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ বন্দরগুলোর মাধ্যমে পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে জলপথে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করে গুপ্তসাম্রাজ্যের

আর্থিক সমৃদ্ধি অনেক বেড়ে যায়। তিনি উজ্জয়িনীতে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। দিল্লীর নিকটবর্তী মেহেরৌলী লৌহস্তম্ভ গাত্রে জনৈক চন্দ্ররাজের বিজয়-কাহিনী খোদাই করা আছে। অনেকের মতে এই চন্দ্ররাজ এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অভিন্ন



ব্যক্তি। এই লিপিপাঠে জানা যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিন্ধুনদ অতিক্রম করে বাহ্লীক দেশ পর্যন্ত জয় করেন এবং বঙ্গের রাজন্যবর্গকে পরাভূত করেন। তিনি **বিক্রমাদিত্য** উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

পিতা সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও বিদ্যোৎসাহী, শিল্পানুরাগী রাজা ছিলেন। কোন কোন মুদ্রায় দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটের প্রাচীন লিপিতে তাঁকে 'সূর্যের মত বিক্রমশালী' এবং 'পাটলীপুত্র ও উজ্জয়িনীর অধীশ্বর' বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই কিংবদন্তীর প্রসিদ্ধ **নবরত্ন** সভার পৃষ্ঠপোষক 'শকারি

বিক্রমাদিত্য'। বীরসেন নামক বিখ্যাত কবি তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে একই সময় কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, ধন্বন্তরি, অমরসিংহ, ক্ষপর্ণক এবং শঙ্ক নামক তৎকালীন ভারতের নয়জন মনীষী তাঁর সভা অলংকৃত করে ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত পিতার ন্যায় একাধারে রণনিপুণ সেনানায়ক ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বাকাটক রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। এই মৈত্রী দ্বারা তিনি শক শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তিসাম্য স্থাপন করেন।



দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল **পরম ভাগবত**। তিনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন; কিন্তু অন্য ধর্মের এবং সম্প্রদায়ের প্রতিও শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁর একজন সেনাপতি ছিলেন বৌদ্ধ এবং তাঁর মন্ত্রীবর্গের মধ্যে অন্তত একজন ছিলেন শৈব।

ফা-হিয়েনের বিবরণ ঃ চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করার পর থেকে বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদি সংগ্রহের জন্য পর পর একাধিক চৈনিক পরিব্রাজক এসেছিলেন। এদের মধ্যে ফা-হিয়েন ছিলেন অন্যতম। তিনি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে এসেছিলেন। তিনি প্রায় এগার বৎসর এদেশে বাস করেন। তার মধ্যে ছ' বছর তিনি কাটান বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে। আর বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দরে তিনি ছিলেন প্রায় তিন বছর। তাঁর বিবরণী থেকে গুপ্তযুগের সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। মধ্যদেশ অর্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ফা-হিয়েন বলেছেন যে, তখন লোকসংখ্যা অধিক হলেও জনসাধারণ সুখেই জীবনযাপন করত।

স্বাধীন জীবনযাত্রা ঃ ফা-হিয়েনের বিবরণে শহর ও নগরের বর্ণনা পাওয়া যায়। পাটলিপুত্র সে সময়ে সমৃদ্ধ নগর ছিল। সম্রাট অশোক নির্মিত মৌর্য প্রাসাদের গঠন ও শিল্পকলা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তখনকার দিনে সরকারী হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সাধারণ লোকেরা মোটামুটি স্বাধীনভাবে দিন কাটাত। যারা রাজার জমি চাষ করত, তারা সরকারকে সেই ফসলের একাংশ কর হিসেবে দিত। দণ্ডাজ্ঞা তেমন কঠোর ছিল না। সাধারণ অপরাধের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরিমানা করা হত। তবে বিদ্রোহীদের হাত পা কেটে দেওয়া হত।

নিরামিষ ভোজন ঃ তখনকার সমাজের অধিকাংশ লোকই ছিল নিরামিষাশী অহিংসপন্থী। পেঁয়াজ, রসুন, ও মাংস ভক্ষণ বা মদ্যপান ছিল প্রায় নিষিদ্ধ। তবে চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ছিল মাংসভোজী। নীচজাতীয় লোকেরা লোকালয়ের বাহিরে বাস করত।

স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তা ঃ অধিকাংশ সাধারণ লোকের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল। ধনী লোকেরা জনসাধারণের মঙ্গলার্থে দাতব্য চিকিৎসালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করত। রাজপথের দু'দিকেই ছিল ধর্মশালা ও বিশ্রামাগার। পথে দস্যু-তস্করের ভয় ছিল না।

ধর্মমত ঃ পাটলিপুত্র নগরে মহাযান ও হীনযানপন্থীদের জন্য আলাদা আলাদা বিহার ছিল। প্রত্যেক মঠে প্রায় পাঁচ-সাত হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করত। শহরের লোকেরা বেশ আরামে দিন কাটাত। বাংলা, পাঞ্জাব ও মথুরা অঞ্চলেও বৌদ্ধধর্মের সমাদর ছিল। তবে মধ্যদেশে বৌদ্ধ ধর্ম তেমন উন্নত ছিল না।

জাতিভেদ প্রথা ঃ গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে, জাতিভেদপ্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। তখন সমাজে অবশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা জমিদার, বৈশ্য বা বণিক শ্রেষ্ঠী ও কৃষিজীবী এবং শূদ্র বা চণ্ডাল এবং অন্যান্য জাতিরও অস্তিত্ব ছিল। তবে জীবিকার জন্য যে কোন শ্রেণীগত পেশা গ্রহণ করা চলত। অসবর্ণ-বিবাহও ঘটত। তখন শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিগুলি ক্ষত্রিয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নারীজাতির অবস্থা ঃ গুপ্তযুগে নারীজাতির মর্যাদা হ্রাস পায়। পুরুষেরা বহু বিবাহ করত। রাজকার্যে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীদের তেমন ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ভক্তিবাদের প্রকাশ ঃ এই সময় বৈদিক যাগযজ্ঞের জনপ্রিয়তা কমে যায়। পরিবর্তে ভক্তিবাদ অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা ভগবানের করুণা লাভের মতবাদ প্রাধান্য পায়। এছাড়া দুর্গা, শিব, লক্ষ্মী, কার্তিক ও বিষ্ণু প্রভৃতি লৌকিক দেবতাগণ ইন্দ্র ও বরুণের স্থান অধিকার করেন। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম এ যুগে বিশেষ প্রসার লাভ করে।

অর্থ নৈতিক অবস্থা ঃ গুপ্তযুগেই ভারতের যথেষ্ট অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। তখন কৃষিই ছিল সাধারণ লোকের জীবিকা। এছাড়া চামড়া, লোহা প্রভৃতি শিল্পও ছিল জীবিকা সংস্থানের উপায়। তখন স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্য চলত। সমাজে বণিক ও শ্রেষ্ঠীদের সমাদর ছিল। মসলিন, মুক্তা, রেশম, মশলা ইওরোপে চালান যেত। তমলুক বা তাম্রলিপ্ত বন্দরের মাধ্যমে যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দক্ষিণ এশিয়ার দেশের সঙ্গে তখন বাণিজ্য চলত।

প্রথম কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য (আঃ ৪১৫—৪৫৫ খ্রীঃ) ঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনিও পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষ ভাগে দাক্ষিণাত্যের নর্মদা তীরবর্তী অঞ্চলের পুষ্যমিত্র নামক এক দুর্ধর্ষ জাতির আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত হয়। পুষ্যমিত্রগণ সম্ভবতঃ নর্মদা তীরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত বীরবিক্রমে পুষ্যমিত্রদের যুদ্ধে পরাস্ত করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আসন্ন পতন কিছুদিনের জন্য রোধ করেছিলেন। তার পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হূণ আক্রমণকারীদিগকে প্রতিরোধ করে যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত পিতৃরাজ্য রক্ষা করেছিলেন।

স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (৪৫৫—৪৬৭ খ্রীঃ)ঃ কুমারগুপ্তের পর পুষ্যমিত্র ও হূণবিজয়ী স্কন্দগুপ্ত পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় তিনিও বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত। তাঁর পিতার রাজত্বকালেই সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে হূণ আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় হূণ আক্রমণ আরম্ভ হয়। মহারাজ স্কন্দগুপ্ত বুদ্ধি ও বাহুবলে হূণ আক্রমণ ব্যর্থ করেন। তাঁর সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য পূর্বে বঙ্গদেশ থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্কন্দগুপ্তের জীবদ্দশায় হূণগণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমানা পার হতে পারে নাই। হূণ আক্রমণের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমান্তে কয়েকজন গোপ্তৃ বা শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন।

বৈদেশিক আক্রমণ থেকে স্বদেশ রক্ষার ইতিহাসে পুরু, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, পুষ্যমিত্র শুঙ্গ প্রভৃতির মত স্কন্দগুপ্তের নামও ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়কালেই মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ হূণগণ ইওরোপে হত্যা ও ধ্বংসের মহাতাণ্ডব আরম্ভ করেছিল। এমন কি বিপুল শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্যও এই ধ্বংসলালার হাত থেকে রক্ষা পায় নাই। ঐ সময়েই শ্বেতহূণ নামে হূণজাতির একটি শাখা হিন্দুকুশ অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। স্কন্দগুপ্ত হূণদের প্রতিহত করতে না পারলে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সুসমৃদ্ধ সভ্যতা এবং সংস্কৃতিও রোমান সাম্রাজ্যের সংস্কৃতির ন্যায় বিনষ্ট হয়ে যেত। পরবর্তীকালে হূণগণ খণ্ড খণ্ড ভাবে ভারত সীমান্ত আক্রমণ করেছে। কিন্তু প্রথম আক্রমণের প্রচণ্ডতাকে স্কন্দগুপ্তই প্রতিহত করেছিলেন এবং প্রারম্ভেই আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে না পারলে সমগ্র ভারতবর্ষকে হূণদের ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা করা কঠিন হত।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণঃ সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের চেষ্টায় যে বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য গড়ে উঠে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষ দিকে তা'তে দ্রুত ভাঙ্গনের লক্ষণ দেখা যায় এবং ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পায়।

ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় যে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব একান্তই ব্যক্তিনির্ভর। শক্তিশালী রাজার অভাব ঘটলেই সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। স্কন্দগুপ্তের পর সিংহাসন নিয়ে গৃহবিবাদ শুরু হয়। ফলে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে, প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীন হতে শুরু করে আর সামন্তরাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকে।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই দুর্বলতার ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়ে। এই সময়ে শুরু হয় বৈদেশিক হূণজাতির আক্রমণ। স্কন্দগুপ্তের সময় থেকে বার বার হূণ আক্রমণ ঘটতে থাকে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই হূণ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হলেও সাম্রাজ্যের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায়।

ক্রমাগত হূণ আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে সাম্রাজ্যের আর্থিক শক্তি ভেঙ্গে পড়ে। সাম্রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস ছিল দুটি—(১) সামন্তরাজা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিকট প্রাপ্ত কর ও (২) বৈদেশিক বাণিজ্যসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ।

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে প্রথম সূত্র থেকে আয় একেবারে কমে যায়। আর ৪৭৬ খ্রীঃ রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ যে অর্থ নৈতিক দূরবস্থা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গুপ্ত সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রাচীন ভারতে দীর্ঘস্থায়ী সার্বভৌম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করার গৌরবের অধিকারী হলেন গুপ্ত রাজগণ। ৩২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দেড়শত বছর কাল ধরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরিধি ও প্রভাব যেমন বিস্তৃত হয়েছে তেমনি সর্বদিকে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ও উন্নতি এই যুগকে এক বিশেষ গৌরবময় অধ্যায়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এইজন্য গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বা মধ্যাহ্নকাল বলা হয়। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংহতি, বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, অর্থ নৈতিক প্রাচুর্য, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানে অভাবনীয় উন্নতি এবং হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্যই এই যুগকে **স্বর্ণযুগ** বলে অভিহিত করা হয়েছে। মৌর্যযুগের পর ভারতে কোন সার্বভৌম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। শুঙ্গ, কাণ্ব, সাতবাহন প্রভৃতি রাজবংশের রাষ্ট্রমঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান এবং গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির আগমন ও রাজদণ্ড ধারণ একটি নাটকীয় অঙ্কের মধ্যবর্তী দৃশ্যের মত। প্রকৃত পক্ষে সুদীর্ঘ এই ৫০০ বছরের ইতিহাসকে রাজনৈতিক দিক থেকে অন্ধকারময় যুগ বলা যায়। শুঙ্গ ও কুষাণ যুগে আংশিকভাবে রাজনৈতিক ঐক্য গঠিত হলেও ভারত সংস্কৃতিতে তাঁদের আত্মীকরণই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্তরাজগণই প্রায় বিলুপ্ত হিন্দুসাম্রাজ্য ও সংস্কৃতিকে তমসাচ্ছন্ন যুগ থেকে আলোকোজ্জ্বল পথে নিয়ে এসেছিলেন এবং দেড়শত বছর ধরে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্যকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে ও সুদূর দক্ষিণ ভারতে তাঁদের রাজ্যবিস্তৃত না হলেও ভারতবর্ষের একটি বিরাট অঞ্চলকে তাঁরা সুশাসনে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। তাছাড়া ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে তাঁদের প্রভাব প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহুদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

গুপ্ত শাসন ব্যবস্থা ঃ গুপ্তসাম্রাজ্য ছিল রাজতন্ত্রভিত্তিক এবং রাজা যে ঐশ্বরিক শক্তির মানবিক বিকাশ—এই ধারণার উপরেই গুপ্তশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য দেশকে কতকগুলি ভুক্তি বা প্রদেশে, প্রদেশগুলিকে কয়েকটি বিষয় বা জেলায়, বিষয়গুলিকে কয়েকটি বীথী বা মহকুমায় এবং বীথীগুলিকে কয়েকটি চতুরক বা চৌকিতে ভাগ করা হয়। ভুক্তিপতি (উপরিক), বিষয়পতি (নিযুক্তক বা আযুক্তক) এবং বীথিপতিরা জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর সাহায্যে ভিতরের শাসন কার্য চালাতেন। গুপ্তযুগের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন মূলক না হলেও এতে গণতান্ত্রিক আদর্শ অনেকটা মেনে চলা হত। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্রী ছিল। তা সত্ত্বেও রাজাকে মন্ত্রণা দেবার জন্য ছিলেন মন্ত্রীরা। সন্ধিবিগ্রহিক, অক্ষপটলাধিকৃত, মহাদণ্ডনায়ক, মহাবলাধিকৃত, মহাপ্রতীহার প্রভৃতি ছিলেন সামরিক ও বেসামরিক দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত বড় বড় মন্ত্রী বা রাজকর্মচারী। কুমারামাত্য নামে একশ্রেণীর

অমাত্যও ছিলেন। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক শাসন এক আমলা-অমাত্য গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত হত। রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভাগ (উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ)। খেয়া শুল্ক, নিরাপত্তা কর ও বলি প্রভৃতি বিভিন্ন করও ছিল। মৌর্যযুগের শাসন ব্যবস্থার কাঠামোটি গ্রহণ করে গুপ্তযুগে তার আরও শ্রীবৃদ্ধি করা হয়।

সমাজ, অর্থনীতি ও বাণিজ্যের উন্নতি ঃ প্রাচীন ভারতে শক্তিশালী রাজশক্তির সময়েই যে দেশের ও জনসাধারণের বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে, গুপ্তযুগ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জনসমাজে শৃঙ্খলা, জাতিবর্ণগত সংহতি, আচার নিষ্ঠা, আদর্শানুরাগ প্রভৃতি গুণগুলির এই যুগেই বিকাশ হয়। সমাজে স্থৈর্য ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। অবশ্য অর্থ ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত ছিল। পাটলিপুত্র ও অন্যান্য নগরের জনকল্যাণমূলক শাসনব্যবস্থার মধ্যে সেই যুগের বৈষয়িক সমৃদ্ধির ও জনগণের সমাজ-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে দেশের শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গুপ্তসম্রাটরা সমুদ্রপথে পশ্চিমের সঙ্গে বিশেষ করে রোমান-সাম্রাজ্যাধীন মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন করে পৃথিবীর প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও রোমান সাম্রাজ্যের সম্পদকে ভারতের অর্থকারা উন্নতিতে প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গুপ্তরাজাদের মুদ্রাসংস্কার, বিনিময়োপযোগী সোনা ও রূপার মুদ্রার প্রচলন বাণিজ্যের লেনদেনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

সাহিত্য চর্চা ঃ এই রাজনৈতিক উৎকর্ষ ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি এই যুগের সাহিত্য-চর্চার সুযোগ বৃদ্ধি করেছিল। গুপ্তযুগকে সংস্কৃত-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। পাণিনির পরে সুদীর্ঘ প্রায় পাঁচশ বছর ধরে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার যে বিকাশ ঘটে গুপ্তযুগে তার পরিপূর্ণতা ঘটেছিল। বহুসংখ্যক প্রতিভাধরের অমর সাহিত্য কীর্তি গুপ্তযুগকে গৌরবের শীর্ষে স্থাপন করেছিল। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ ইত্যাদির সংস্কার সাধন ও নূতন করে সম্পাদন করা। যুগ যুগ ধরে শত শত কাহিনী, উপাখ্যান, বিশ্বাস, রূপকথা, নীতিকথা, কিংবদন্তী প্রভৃতি মিলে মিশে রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে সংকলিত হয়েছিল। এ যেন এক মহারণ্যের মতো। গুপ্তযুগের পণ্ডিতগণ এই বিরাট উপাদান সমৃদ্ধ সূত্রগুলিকে একটি ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে তার নবরূপ দান করেছিলেন। আজকের রামায়ণ, মহাভারত ও অধিকাংশ পুরাণের যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি, প্রায় দেড়হাজার বছর আগে গুপ্তযুগে এই বিরাট কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল। গুপ্তযুগে বৌদ্ধসাহিত্যেরও যে সমৃদ্ধি হয়েছিল তা অতুলনীয়। 'বুদ্ধচরিত' প্রভৃতি কাব্য, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র এবং সংস্কৃতে রচিত বৌদ্ধ সাহিত্য সবই গুপ্তযুগের অবদান। তাই গুপ্তযুগে হিন্দুসাহিত্য ও শাস্ত্রের যে সংস্কার হয়েছিল তা বৌদ্ধদের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার জন্য নয়। এই সাহিত্য সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ, এগুলিকে যুগপোযোগী ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা। দ্বিতীয়তঃ, গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির আক্রমণ ও

প্রভুত্বের ফলে ভারতীয় আদর্শের মধ্যে যে সব বিকৃতি, বিসদৃশতা, অসংগতি এবং নিন্দনীয় উপসর্গের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সেগুলিকে উৎখাত করা।

কালিদাস, বিশাখদত্ত, শূদ্রক, ভারবি, ভবভূতি ছিলেন এই যুগের সব বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার। শকুন্তলা, রঘুবংশম, মেঘদূত, ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব, মালবিকাগ্নিমিত্রম প্রভৃতি অমর গ্রন্থের রচয়িতা কালিদাস ছিলেন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। এছাড়া 'মুদ্রারাক্ষস' প্রণেতা **বিশাখদত্ত,** 'মৃচ্ছকটিকম্' গ্রন্থ প্রণেতা **শূদ্রক,** এলাহাবাদ প্রশস্তি রচয়িতা **হরিষেণ,** বৌদ্ধ দার্শনিক ও গ্রন্থকার **বসুবন্ধু,** কবি **বীরসেন** গুপ্তযুগের সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। দেবীচন্দ্রগুপ্তম নাটকটিও বিশাখদত্ত লিখেছিলেন। ভারবি 'কীরাতার্জুনীয়ম' লিখেছিলেন। ভট্টি রচিত ভট্টিকাব্য এই যুগেই রচিত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। **সৌমিল্ল এবং কুলপুত্র** এ যুগেরই নাট্যকার বলে পরিচিত। 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থের রচয়িতা **বিষ্ণুশর্মা** এই যুগেরই লোক। এ ছাড়া নৈষধবধকাব্য, উত্তর রামচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ এই যুগেই রচিত হয়েছিল। বিখ্যাত নাট্যকার **ভাসকে** অনেকে এই যুগের লোক বলে মনে করেন। এটা বোধহয় সত্য নয়, তিনি বোধহয় প্রাক্-গুপ্ত যুগের কবি। সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যের এই গৌরবময় বিকাশের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের বিকাশও ঘটেছিল। শৈব বা পাশুপত এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের এই সময় সংগঠিত রূপ দেখা যায়। শিল্পশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও সংহতি দেখা যায়। 'ভারতনাট্যশাস্ত্র' এই সময় সংকলিত হয় এবং চৌষট্টি কলার বিকাশও এই সময়ে হয়।

বিজ্ঞান চর্চা : বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গুপ্তযুগের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতের ইতিহাসে এই বিজ্ঞানচর্চার প্রাথমিক সূচনা ঘটেছিল। **আর্যভট্ট, বরাহমিহির** এবং **ব্রহ্মগুপ্তকে** পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতশাস্ত্রবিদদের মধ্যে পুরোধা বলে গণ্য করা হয়। **আর্যভট্টই** আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী তার নিজের কক্ষরেখার (axis) চারিদিকে ঘুরছে। গণিতের উপর ভিত্তি করে তিনি সূর্য চন্দ্রগ্রহণাদি, গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান এবং দিনের সময় গণনার নিয়মও আবিষ্কার করেছিলেন। সর্বক্ষেত্রেই তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল না হলেও ভুল খুবই কম ছিল। তিনিই প্রথম গণিতশাস্ত্রবিদ্ যিনি দশমিক প্রথার প্রয়োগের ব্যাপারে অগ্রণী হন, যদিও এই প্রথা তাঁর আগেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। **বরাহমিহির,** ছিলেন একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি ছিলেন 'সূর্যসিদ্ধান্ত' গ্রন্থের প্রণেতা (মতান্তরে আর্যভট্ট ছিলেন এই গ্রন্থের প্রণেতা)। তাঁর প্রণীত 'বৃহৎ সংহিতা' গ্রন্থে জ্যোতির্বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল সম্পর্কে আলোচনা আছে। তিনি পাঁচটি প্রাচীন সিদ্ধান্তও সংকলিত করেছিলেন তাঁর 'পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা', গ্রন্থে। 'বৃহজ্জাতক' 'লঘুজাতক' প্রভৃতি গ্রন্থও বরাহমিহিরের রচিত। **ব্রহ্মগুপ্ত** একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ও চিন্তার বিশেষ কোন ভুল ছিল না। এই যুগেই **পালকাপ্য** পশুচিকিৎসা সম্পর্কে 'হস্তায়ুর্বেদ' গ্রন্থটি লিখেছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে নবরত্নের **ধন্বন্তরীর** নাম কিংবদন্তী পর্যায়ে বলা যায়। তখন শল্য চিকিৎসাও উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

রসায়নশাস্ত্রবিদ্ **নাগার্জুন** এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। গণিতশাস্ত্রে শূণ্যতত্ত্ব (theory of zero) এই যুগেরই বিরাট আবিষ্কার। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই যুগে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়। ধাতুশিল্পে বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। দিল্লীতে চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ এ বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে।

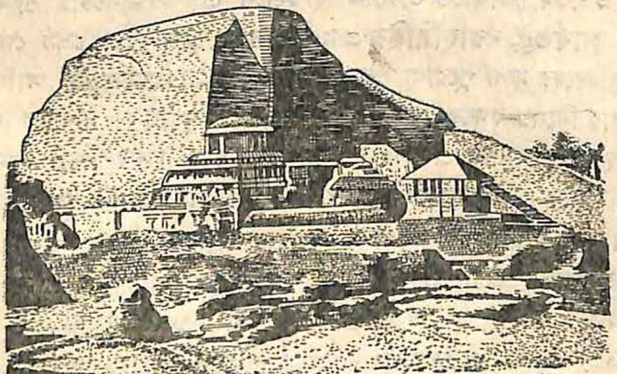
শিল্পসৃষ্টি ঃ সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞানের মতই গুপ্তযুগের সমৃদ্ধি শিল্পকলাতে





চৈত্যগৃহ (অজন্তা দেয়ালচিত্র)

প্রতিফলিত হয়েছিল। স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিল্পীরা



নালন্দা

অসাধারণ কুশলতা ও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই শিল্পসৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলনা। হিন্দুশিল্পের মতই বৌদ্ধ শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে শিল্পীরা সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। সারনাথ, বুদ্ধগয়া, অজন্তা ও ইলোরার চিত্রকলা ও ভাস্কর্য বিস্ময়কর

ভাবে সুন্দর। ভূমরার শিব মন্দির, ঝাঁসীর অন্তর্গত দেওগড়ের দশাবতার মন্দির, এই যুগের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের নিদর্শন। দেবমন্দির, স্তূপ ও চৈত্য নির্মাণে স্থাপত্য শিল্পের, বুদ্ধ ও হিন্দু-দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে ভাস্কর্য শিল্পের এবং গুহামধ্যে অঙ্কিত চিত্রগুলিতে চিত্রকলার যে বিকাশ হয়েছিল তা শুধু গুপ্তযুগের সাবলীল শিল্পসুষমার সাক্ষ্যই বহন করছে না, গুপ্তযুগের নবজাগরণের সুস্পষ্ট চিত্রও বহন করছে। **অজন্তার** গুহা মন্দিরগুলি হল গুপ্তযুগের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। গুহাগাত্রে চিত্রগুলির মধ্যে, মাতা ও পুত্র (যশোধরা ও রাহুল), রাজকুমারার মৃত্যু প্রভৃতিতে চিত্রশিল্পীর অপূর্ব দক্ষতার নিদর্শন রয়েছে। এই যুগে ভারতের নিজস্ব আদর্শ ও ঐতিহ্য পুনরায় আবিষ্কার করে শিল্পীরা তাঁদের শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন। গুপ্ত যুগে শিল্পকলার এক নূতন চেতনা ও জাগরণের উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। দেশের পুরানো ঐতিহ্য থেকে যা ভাল তা গ্রহণ ও আত্মস্থ করে এবং বিদেশজাত বা যা দেশের ঐতিহ্য বিরোধী তাকে বর্জন করে এক নূতন ও একান্ত ভারতীয় শিল্পকলা সৃষ্টিতে ভারতীয় শিল্পীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।


অজন্তার গুহাচিত্র (মাতাপুত্র)

আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে গুপ্তযুগে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি চরম উৎকর্ষ লাভ করলেও গুপ্তরাজগণ অন্য ধর্ম সম্পর্কে তাদের পূর্ববর্তী সম্রাটদের মত সহনশীল ও উদার ছিলেন। শুধু তাই নয় বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয়ের পরিবেশও তখন গড়ে উঠেছিল।

উপসংহার ঃ সবদিক বিচার করে গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারতের 'স্বর্ণযুগ' (golden age) বললেও অত্যুক্তি হবেনা। কারণ গুপ্তযুগ শুধু হিন্দুদের নবজাগরণের যুগ নয়। এই যুগ ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের এক সার্থক পরিণতিতে সমুজ্জ্বল। গুপ্তযুগকে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুত্থানের যুগ না বলে ভারতের নবজাগরণের যুগ বললে সত্যের অপলাপ করা হয় না। আবার একে যথার্থ 'স্বর্ণযুগে'র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত যুগ বলেও চিহ্নিত করা চলে। কারণ গুপ্তযুগে ভারতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে সাথে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশিল্পের বিকাশ হয় এবং চীন ও মধ্য এশিয়ায় এই ধর্মের বিস্তার ঘটে।

গুপ্তযুগকে সাধারণতঃ গ্রীক ইতিহাসের পেরিক্লিসের যুগের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। পেরিক্লিসের যুগে এথেন্স সাম্রাজ্য বিস্তৃতি, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে এক চরম উন্নতি লাভ করেছিল। গুপ্তরাজত্বকালেও গুপ্তসাম্রাজ্য শক্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, শিল্পে অপরূপা, বাণিজ্যে সমৃদ্ধ, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় অগ্রণী হয়ে পেরিক্লিসের যুগের ন্যায়ই ভারতের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাধান্যের জন্য সংগ্রাম (Struggle for Domination)

১। উত্তর ভারতের কথা। (ক) হূণ আক্রমণ ও যশোধর্মন ঃ

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে দুর্ধর্ষ হূণ জাতির একটি শাখা অক্ষু উপত্যকায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এরা শ্বেত হূণ নামে পরিচিত ছিল। হূণরা হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে গান্ধার জয় করে এবং ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ৪৬০ খ্রীঃ নাগাদ গুপ্ত সম্রাট **স্কন্ধগুপ্ত** এদের প্রতিহত করেন।

ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে **তোরমান** নামে এক হূণ নেতা পাঞ্জাব, পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ এবং মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ অধিকার করেন। তোরমান সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু তাঁর মুদ্রা থেকে ঐ সমস্ত অঞ্চলে তাঁর অধিপত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে তোরমানের উত্তরাধিকারী হন তাঁর পুত্র **মিহিরকুল**। তাঁর সাম্রাজ্য গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মিহিরকুল কাশ্মীর অঞ্চলে মালবরাজ যশোধর্মনের কাছে পরাজিত হন। যশোধর্মনের মৃত্যুর পর মিহিরকুল পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠেন, কিন্তু গুপ্তরাজ নরসিংহ গুপ্তের কাছে তিনি পরাজিত হন।

ভারতের হূণরা স্থায়িভাবে রাজ্য গড়ে তুলতে পারেনি। কাশ্মীর অঞ্চলে হূণদের কিছু প্রভাব থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত হূণদের ভারতে কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। তারা ভারতের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যায়।

(ক) যশোধর্মন ঃ বারবার হূণ আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষদিকে বাকাটক রাজ হরিষেণ মালব ও গুজরাট জয় করেন। হূণরাও মালবে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিল। এই রকম রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যশোধর্মন নামে স্থানীয় এক নেতা মালবে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হূণদের পরাস্ত করেন।

মান্দাশোর লিপি থেকে জানা যায় যে যশোধর্মনের রাজ্য উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্বত, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে মহাসমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কিন্তু তিনি গুপ্তদের ধ্বংস করতে পারেননি এবং হূণশক্তিকেও নির্মূল করতে পারেন নি। সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে বলা যায়,যে যশোধর্মন ভারতের ইতিহাসে কোন গভীর প্রভাব রেখে যেতে পারেন নি।

(খ) শশাঙ্ক ঃ "বাঙ্গালী রাজগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি।" তাঁর বাল্যজীবন বা বংশ পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা চলে না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে শশাঙ্ক গুপ্ত-রাজপরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর আর এক নাম ছিল নরেন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ শশাঙ্ক মগধ ও গৌড়ের অধিপতি গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের অধীনে প্রথমে একজন মহাসামন্ত ছিলেন। প্রাচীন রোহিতাশ্বর বা

রোটাসগড় গিরিগাত্রে "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক" এই নামটি উৎকীর্ণ আছে। খুব সম্ভবতঃ ইহা গৌড়রাজ শশাঙ্কেরই পূর্ব নাম।

৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাংলাদেশের পরবর্তী গুপ্তরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে শশাঙ্ক একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং কর্ণসুবর্ণতে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' নাম নিয়ে উত্তর ভারতের জটিল রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। শশাঙ্ক দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও বর্তমান গঞ্জাম জিলায় অবস্থিত প্রাচীন কোঙ্গোদ রাজ্য জয় করে গৌড় রাজ্যের বিস্তারসাধন করেন। কোঙ্গোদ রাজ্যের শৈলোদ্ভব রাজগণ তাঁর অধীনে সামন্তরাজা ছিলেন। পশ্চিমে মগধ রাজ্যও শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত হয়। খুব সম্ভবতঃ দক্ষিণ বঙ্গের স্বাধীন বঙ্গরাজ্যেও তাঁর আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। শশাঙ্কই সর্বপ্রথম বাঙ্গালী রাজা যিনি এইরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

গৌড়রাজ্যের সঙ্গে কনৌজের মৌখরীরাজ্যের সম্পর্কের তিক্ততা আগে থেকেই ছিল। থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজনান্দনী রাজ্যশ্রী ছিলেন মৌখরী রাজ-মহিষী। উত্তর ভারতে এই সময় তাই মৌখরী-পুষ্যভূতি রাজনৈতিক শক্তিজোটের সৃষ্টি হয়। আবার মালবের গুপ্তবংশীয় নরপতি দেবগুপ্ত ছিলেন কনৌজের মৌখরীরাজ গ্রহবর্মনের বংশানুক্রমিক শত্রু। গৌড়রাজ শশাঙ্ক তাই মৌখরী-পুষ্যভূতি মৈত্রীর বিরুদ্ধে দেবগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। এই দুই দলের যুদ্ধে গ্রহবর্মন নিহত হন ও রাজ্যশ্রী বন্দিনী হন। রাজ্যশ্রীর ভ্রাতা থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাজিত করে কনৌজ উদ্ধারের চেষ্টা করলে শশাঙ্কের হাতে নিহত হন। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট ও চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের মতে শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন। তবে তাঁদের এই মত খুব সম্ভবতঃ পক্ষপাতদুষ্ট। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর কনৌজ কিছুকাল শশাঙ্কের অধীনে ছিল। কিন্তু পুষ্যভূতি সম্রাট হর্ষবর্ধন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। শশাঙ্কের সঙ্গে এদের যুদ্ধের বিবরণ ও ফলাফল বিস্তৃতভাবে কিছুই জানা যায় না। তবে শশাঙ্ক যে জীবিতকাল পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে গেছেন তার প্রমাণ আছে। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য কিছুকালের জন্য বাংলার রাজনীতিতে বিপর্যয় ঘটে।

কৃতিত্ব ঃ "শশাঙ্ক বাংলার শৌর্য ও স্বাধীনতার প্রথম মূর্তবিগ্রহ"। যদিও হর্ষবর্ধনের সভাকবি বানভট্ট পুষ্যভূতি রাজ্যের এই পরাক্রমশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে গৌড়াধম, গৌড়ভুজঙ্গ, রূপে বর্ণনা করেছেন ও বৌদ্ধপরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌ও তার অপযশ প্রচারে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, তবু মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক ছিলেন অপরাজেয় বীর, বাংলার স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সংহতির প্রথম ঐতিহাসিক স্রষ্টা ও বাংলার সেই দারুন দুদিনে সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষার একমাত্র ভরসাস্থল। শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। বৌদ্ধ-সাহিত্যে তাঁকে পরম পাপিষ্ঠ, বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষী রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এটা প্রমাণ করা খুবই কঠিন। **ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, "বাণভট্টের মত চরিত-লেখক অথবা হিউয়েন সাঙের মত সুহৃদ থাকলে হয়ত হর্ষবর্ধনের**

মতই তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হত। কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ বিড়ম্বনায় তিনি স্বদেশে অখ্যাত ও অজ্ঞাত, এবং শত্রুর কলঙ্ক-কালিমাই তাঁকে জগতে পরিচিত করেছে।”

(গ) হর্ষবর্ধন : গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে উত্তর ভারত বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এসব রাজ্যের রাজাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে থানেশ্বরে (বর্তমান হরিয়ানায়) পুষ্যভূতি নামে একটি রাজবংশ শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলে। এই রাজ্যের রাজা প্রভাকরবর্ধনের রাজত্বকাল ৫৮০ খ্রীঃ নাগাদ শুরু হয়েছিল। হূণ, সিন্ধু, গুর্জর, মালব প্রভৃতি রাজ্যের উপর তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ এবং কনৌজের মৌখরী রাজবংশ মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ ছিল। প্রভাকর বর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে কনৌজরাজ গ্রহবর্মণ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এই একই সময়ে গৌড়ে শশাঙ্ক শক্তিশালী হয়ে উঠেন এবং মালবরাজ দেবগুপ্ত ও শশাঙ্ক মিলিতভাবে কনৌজরাজগ্রহবর্মনকে পরাজিত ও নিহত করেন। দেবগুপ্ত থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হলে প্রভাকরবর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধন তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। কিন্তু রাজ্যবর্ধন নিজে শশাঙ্কের চক্রান্তে নিহত হন। ফলে একই সঙ্গে থানেশ্বর ও কনৌজের সিংহাসন শূন্য হয়। এই অবস্থায় রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্ধন উভয় রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি থানেশ্বর থেকে কনৌজে রাজধানী সরিয়ে আনেন। ৬০৬ খ্রীঃ হর্ষবর্ধনের রাজত্ব শুরু হয়।



হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের নির্ভরযোগ্য উপাদান হল বানভট্টের রচিত হর্ষচরিত, চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণ এবং ঐ যুগের বহু শিলালিপি অনুশাসন ও মুদ্রা।

রাজ্যজয় : সিংহাসনে আরোহণ করে হর্ষবর্ধন দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমেই ভ্রাতৃহন্তা গৌড়রাজ শশাঙ্ককে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি অগ্রসর হন। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন শশাঙ্কের শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত ছিলেন এবং তিনি হর্ষের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষের অভিযান সফল হয়েছিল এমন প্রমাণ নেই। বরং ৬১৯খ্রীঃ পর্যন্ত শশাঙ্ক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন তা প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষ মগধ জয় করেন এবং কঙ্গোদ পর্যন্ত সকল স্থান নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযানের পর হর্ষ সুরাষ্ট্রের বলভী রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি সফল হতে পারেন নি। হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে হর্ষের আমলে বলভীর মৈত্রকগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। বলভীর রাজা ধ্রুবসেনের সঙ্গে হর্ষের কন্যার বিবাহ হয়।

তাঁর দ্বিতীয় অভিযান ছিল চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর বিরুদ্ধে। কিন্তু নর্মদার তীরে এই যুদ্ধে হর্ষ পরাজিত হন এবং দক্ষিণ ভারত জয়ের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে হর্ষ সাফল্যলাভ করেছিলেন কিনা এ সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। হিউয়েন সাঙ্-এর সিন্ধুদেশ পর্যটনের সময় ঐ দেশ স্বাধীন ছিল---তা তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়।

সমসাময়িক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে তিনি তুষারশৈল দেশের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন, সেখান থেকে কর আদায় করেন। এছাড়া কাশ্মীর রাজ্যও তিনি আক্রমণ করেন।

হর্ষের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঃ হর্ষের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে থানেশ্বর, কনৌজ, অহিচ্ছত্র, শ্রাবস্তী, প্রয়াগ প্রভৃতি অঞ্চল, মগধ, উড়িষ্যা তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। জলন্ধরের রাজা উদিত ও পূর্ব মালবের রাজা মাধবগুপ্ত তাঁর অধীনতা মেনে চলতেন। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনও তাঁর অনুগত ছিল। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল লিপিতে হর্ষকে 'সকল উত্তরপথনাথ' বা সমগ্র উত্তর ভারতের সম্রাটরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে মনে হয় যে বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে সমগ্র ভূভাগ তাঁর অধীনে ছিল। এমন কি কাশ্মীর ও নেপাল তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল—এমনও কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে, হর্ষের সাম্রাজ্য পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মগধ, উড়িষ্যা ও কঙ্গোদ নিয়ে গঠিত ছিল। বাংলাদেশে হর্ষের আধিপত্য সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন।*

তবে সমর নায়ক হিসাবে অপরাজেয় না হলেও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও কনৌজকে কেন্দ্র করে হর্ষবর্ধন যে এক প্রকার রাষ্ট্রীয় সংহতি স্থাপনে সাফল্যলাভ করেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। প্রায় চল্লিশ বৎসর তিনি ছিলেন উত্তর ভারতের সম্রাট। শ্রীহর্ষের দানশীলতা, বিদ্যানুশীলন ও বিদ্যোৎসাহিতা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর রাজত্বকালে আগত চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ তাঁর ভারত বিবরণীতে মহারাজ শ্রীহর্ষের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণ ঃ হর্ষের রাজত্বকালে ৬৩০ খ্রীঃ চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ভারত পর্যটনে আসেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর তিনি ভারতে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিভিন্ন রাজ্যে ভ্রমণ করেন। তাঁর বিবরণ থেকে তৎকালীন ভারত সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

হিউয়েন সাঙ্ সেই সময়কার ভারতে ১৩৮টি ভারতীয় রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধন ও দক্ষিণ ভারতে দ্বিতীয় পুলকেশীকে তিনি সবচেয়ে শক্তিশালী বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যে যান এবং পুলকেশীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

---

* "The Emperor's army had overrun almost the whole of Northern India from the snowy mountain of the north to the Nerbuda in the south, and from Ganjam in the east to Valabhi in the west"—An Advance History of India. —P. 158.

হিউয়েন সাঙ্ হর্ষের শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। দণ্ডবিধি কঠোর ছিল, উৎপন্ন শস্যের ১/৬ অংশ রাজস্ব হিসাবে গৃহীত হত, রাজকর্মচারীগণ বেতনের বদলে জমি ভোগ করতেন. কৃষকদের বীজ ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র দিয়ে সাহায্য করা হত—এসব তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন। জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্যিক আদান প্রদানের কথাও জানা যায়। তাম্রলিপ্ত ছিল বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর।


হিউয়েন সাঙ

হিউয়েন সাঙ্ ভারতের জনসাধারণের সাধু ও সরল ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন। সাধারণের জীবনযাত্রা ছিল সরল ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। রাস্তাঘাট অবশ্য নিরাপদ ছিল না এবং হিউয়েন সাঙ্ একাধিকবার দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন।

সে যুগেও কৃষিকার্য ছিল বেশ উন্নত। ধান, গম এবং নানারকমের ফল হত প্রচুর। মালব গুজরাট ইত্যাদি জায়গা থেকে সমুদ্রপথে বাণিজ্য হত।

বাঙ্গলাদেশের তাম্রলিপ্ত থেকে বাণিজ্য হত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এমন কী চীনের সাথেও।

ধর্মের ক্ষেত্রে তখন আবার এসেছিল হিন্দুধর্মের প্রাধান্য। বিদেশীর চোখে তখন ভারত ছিল ব্রাহ্মণের দেশ। শিক্ষিত লোকেরা সংস্কৃত ব্যবহার করতেন। বৌদ্ধ পণ্ডিতরাও ছিলেন সংস্কৃতে বিদ্বান। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিদ্বেষ ছিল না। কাশীতে হিন্দু মন্দির ছিল অসংখ্য। কিন্তু বৌদ্ধমঠ এবং ভিক্ষুও ছিলেন অনেক।

পরধর্মসহিষ্ণুতার উদাহরণ ছিলেন সম্রাট হর্ষ নিজেই। অশোকের মতই তিনি অনেক মঠ আর চিকিৎসাগার গড়েছিলেন। ধর্মসভা ডেকে পণ্ডিতদের ধর্মালোচনা তিনি শুনতেন। এসব সভায় বৌদ্ধপণ্ডিত যেমন আসতেন. হিন্দুপণ্ডিতও আসতেন তেমনি। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের ধর্মসভাতে হিউএন সাঙ্ নিজেই হাজির ছিলেন। চার হাজার বৌদ্ধ সাধু আর তিন হাজার ব্রাহ্মণ ও জৈন সাধু সেখানে এসেছিলেন। তা ছাড়া প্রয়াগ তীর্থে প্রতি পাঁচ বছরে হত ধর্মমেলা। মেলার সাথে হত বুদ্ধ, শিব আর সূর্যের পূজা। প্রত্যেক দিনই বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী এবং দীনদরিদ্রকে অকাতরে দান করা হত। অনুষ্ঠানের শেষ দিন রাজার ব্যক্তিগত সবকিছু সঞ্চিত সম্পদই তিনি বিলিয়ে দিতেন। হর্ষবর্ধন সব ধর্মের পণ্ডিতদেরই শ্রদ্ধা জানাতেন, কারণ তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। নিজেও ছিলেন বিদ্বান এবং কবি। 'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ', 'প্রিয়দর্শিকা' নাটক তিনি নিজেই লেখেন। তাঁর রাজসভাতে ছিলেন বাণভট্ট। তিনি লিখেছিলেন 'কাদম্বরী' আর 'হর্ষচরিত'। কবি ময়ূরভট্টও পেয়েছিলেন কনৌজ সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কনৌজ যুগের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। একটি ছোট শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে অনেক আগেই

নালন্দা সৃষ্টি হয়েছিল। ফা-হিয়েনের সময় পর্যন্ত নালন্দা তেমন কিছু বড় ছিল না। কিন্তু হূণ আক্রমণে তক্ষশীলা ধ্বংস হওয়ার পর থেকেই বড় হতে লাগল নালন্দা। গুপ্তসম্রাটরা প্রায় সকলেই নালন্দার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজা, শ্রেষ্ঠী আর জনসাধারণের দানে অবৈতনিক এবং আবাসিক উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে নালন্দা হয়েছিল বিশ্ববিখ্যাত। সবচেয়ে বেশী খ্যাতি ছিল কনৌজ যুগে।

নালন্দার স্নাতকরা সব জায়গায় সম্মান পেতেন। তাই এখানে ঢুকবার জন্য লেগে থাকত শিক্ষার্থীর ভীড় কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতেন শতকরা মাত্র ২০ জন। তবুও নালন্দার আকর্ষণে চীন, কোরিয়া, তিব্বত, মধ্য এশিয়ার নানা দেশ থেকে স্রোতের মত আসতেন ছাত্রের দল। ৮৫০০ ছাত্রের জন্য এখানে ছিলেন ১৫০০ অধ্যাপক। 'রত্নসাগর', 'রত্নদধি', 'রত্নরঞ্জক' নামে ছিল তিনটি বড় গ্রন্থাগার। মানমন্দিরও ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীতে ছিল ৮টি হলঘর এবং ৩০০টি ছোট ঘর। একশ' ঘরে একশ' বিষয়ে সারাদিন পড়াশুনো হ'ত। ছাত্রদের জন্য ছিল ছাত্রাবাস।

নালন্দাতে মহাজন বৌদ্ধ মতেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সব ধর্মশাস্ত্রই এখানে পড়ানো হত। জৈন শাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ ছাড়াও সাংখ্য, ন্যায়, ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, ভাস্কর্য-স্থাপত্যও ছিল জনপ্রিয় পাঠ্য। এখানকার ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ছিলেন দিঙনাগ, ধর্মপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রজ্ঞামিত্র এবং শীলভদ্র। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে বৌদ্ধ পণ্ডিতরা যেতেন চীন, যবদ্বীপ, সিংহল কিম্বা মধ্য এশিয়ায়। নালন্দায় আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ মনে করিয়ে দেয় কনৌজ যুগের সাংস্কৃতিক গৌরব।

প্রতিহার ও পাল সাম্রাজ্যের উত্থান : ত্রিকোণ দ্বন্দ্ব

(ঘ) **প্রতিহার বংশ :** খ্রীষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতকে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের রাজনৈতিক সংযোগের স্থল হিসাবে দক্ষিণ রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। হর্ষবর্ধনের পর উত্তর ও পূর্ব ভারতে রাজ্য ভাঙ্গা-গড়ার যুগে শুরু হয় আরব অভিযান যা সিন্ধু অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং সৌরাষ্ট্র, গুর্জরদেশ, রাজস্থান ও মালব অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এই আরব আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতেই গুর্জর-প্রতিহার শক্তি গড়ে উঠে। বিভিন্ন প্রতিহার গোষ্ঠীকে এবং চাহমান, গুহিলপুত্র, চালুক্য ও পারমারদের একত্রিত করে প্রথম নাগভট্ট আরব আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং শক্তিশালী গুর্জর-প্রতিহার রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। চালুক্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর ভিত্তি করে দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট রাজ্য গড়ে উঠে। ৭৫৩ থেকে ৭৬৮ খ্রীঃ মধ্যে রাষ্ট্রকূটরা সমগ্র মহারাষ্ট্র ও মহীশূর দখল করে শক্তিশালী হয়ে উঠে। আবার পূর্বভারতে হর্ষের মৃত্যুর পর যে মাৎস্যন্যায় সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসান ঘটিয়ে গোপাল পাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন (৭৫০ খ্রীঃ)। উত্তর ও দক্ষিণের এই তিনটি শক্তিশালী রাজ্যের সাম্রাজ্য বিস্তারের যে দ্বন্দ্ব কনৌজের আধিপত্যকে কেন্দ্র করে শুরু হয় তা' ত্রিকোণ দ্বন্দ্ব (Tripartite Struggle) নামে পরিচিত।

হর্ষবর্ধনের সময় থেকেই কনৌজের রাজনৈতিক গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। কনৌজ উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যের প্রতীক হয়ে উঠে। ফলে কনৌজ অধিকার করার

জন্য এবং তা দখলে রাখার জন্য রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার ও পালদের মধ্যে তীব্র-সংগ্রাম শুরু হয়।

কনৌজের উপর কর্তৃত্ব ছিল গুর্জর-প্রতিহার রাজ্যের এবং কনৌজের শাসক ইন্দ্রায়ুধ প্রতিহার রাজবংশের মনোনীত ছিলেন। পালরাজা ধর্মপাল উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন এবং কনৌজ আক্রমণ করে, ইন্দ্রায়ুধকে উচ্ছেদ করে তারই আত্মীয় চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে বৎসরাজ ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং ধর্মপাল ঐ যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। ৭৮৮ খ্রীঃ বৎসরাজ কনৌজ অধিকার করে বঙ্গদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু ইতিমধ্যে দক্ষিণের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব বৎসরাজকে আক্রমণ করেন। বৎসরাজ পরাজিত হয়ে মরু অঞ্চলে সরে যান। ধর্মপালও ধ্রুবের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। কিছুকাল প্রতিহারদের শক্তিক্ষয়ের সুযোগ নিয়ে কনৌজে এবং সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। কনৌজের শাসক হিসাবে চক্রায়ুধকে আবার প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্রতিহাররাজ বৎসরাজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট পুনরায় কনৌজ আক্রমণ করেন এবং চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করে পুনরায় ইন্দ্রায়ুধকে কনৌজের রাজা করেন। ধর্মপাল দ্বিতীয় নাগভট্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন, কিন্তু এবারেও তাঁর পরাজয় ঘটে। অপরদিকে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে পরাস্ত করেন। ধর্মপাল আনুষ্ঠানিকভাবে তৃতীয় গোবিন্দের বশ্যতা মেনে নেন। তৃতীয় গোবিন্দ স্বদেশে ফিরে গেলে আগের মতই ধর্মপাল হলেন লাভবান। একথা মনে করা অসংগত নয় যে রাষ্ট্রকূট ও পালরাজাদের মধ্যে কূটনৈতিক বোঝাপড়া ছিল।

ত্রিকোণ দ্বন্দ্বের শেষ পর্যায়ে প্রতিহাররাজ মিহিরভোজ কনৌজে আধিপত্য গড়ে তোলেন। তিনি একদিকে পালবংশের রাজা দেবপাল ও অপরদিকে রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্মকে প্রতিহত করেন। এই সময় মগধ ও দক্ষিণ বিহার পালদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এমনকি পালদের পিতৃভূমি উত্তরবঙ্গও প্রতিহারদের অধীনে চলে আসে। ৯০৮ খ্রীঃ নাগাদ প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে পালবংশের নারায়ণ পাল উত্তরবঙ্গ ও মগধ প্রতিহারদের হাত থেকে উদ্ধার করেন। মহেন্দ্রপালের পর থেকেই কনৌজকে কেন্দ্র করে গড়া প্রতিহার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে।

(ঙ) **পালবংশ** : খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পালবংশের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর পার্শ্ববর্তী রাজারা বারবার বাংলা আক্রমণ করতে থাকেন। ফলে বাংলাদেশে চরম অরাজকতা দেখা দেয়। স্থানীয় শাসকগণ পরস্পর বিবাদে ব্যস্ত ছিলেন। এই অরাজকতা ও আত্মকলহ মাৎস্যন্যায় সৃষ্টি করে। এই রকম সংকটময় অবস্থায় ৭৫০ খ্রীঃ বাংলাদেশের জনসাধারণ গোপাল নামে এক স্থানীয় নেতাকে বাংলার সিংহাসনে নির্বাচিত করেন। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল বাংলাকে কেন্দ্র করে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা করেন।

গোপাল : (৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ) গোপালের আদি দেশ ছিল বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত মানসে' একথা বলা হয়েছে। তাঁর পিতার নাম ব্যপট ও

পিতামহ দ্বৈতবিষ্ণু। তিনি শান্তিশৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। আনুমানিক ৭৭০ খ্রীঃ তার মৃত্যু হয়।

ধর্মপাল : (৭৭০-৮১০খ্রীঃ) গোপালের পুত্র ধর্মপালের সময়েই পালবংশের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি গড়ে উঠে। তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলাদেশ উত্তর ভারতের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়।

ধর্মপাল উত্তর ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনে অগ্রসর হন। কনৌজের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট শক্তির সংগে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ধর্মপাল প্রথমে কনৌজ অধিকার করে নিজ মনোনীত চক্রায়ুধকে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু প্রতিহাররাজ বৎসরাজের কাছে পরাজিত হন। বৎসরাজও রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের কাছে পরাজিত হয়ে সরে যেতে বাধ্য হন। এই সুযোগে ধর্মপাল ধ্রুবের বশ্যতা মেনে নিয়ে এবং ধ্রুব স্বদেশে ফিরে গেলে সেই সুযোগে কনৌজসহ সমগ্র উত্তর ভারতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। বৎসরাজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট পুনরায় ধর্মপালকে পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করেন ; কিন্তু তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে পরাস্ত করলে ধর্মপালই লাভবান হন। এইভাবে ত্রিকোণ দ্বন্দ্বের সুযোগে ধর্মপাল সমগ্র উত্তর ভারতে অধিকার গড়ে তোলেন। উত্তরে তাঁর রাজ্যসীমা বঙ্গোপসাগর থেকে দিল্লী ও জলন্ধর পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ধর্মপাল 'পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন যা তার সার্বভৌমত্বের পরিচায়ক। তিনি পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করেন। ধর্মপাল বৌদ্ধ-ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বিহারের বিখ্যাত বিক্রমশীল মহাবিহার নির্মাণ করেন।

দেবপাল (আনুমানিক ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ) পালবংশের তৃতীয় রাজা দেবপাল আসাম ও কলিঙ্গ জয় করেন। গুর্জর প্রতিহার রাজ প্রথম ভোজ দেবপালের কাছে পরাস্ত হন। দ্রাবিড়দের সংগেও তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষকে পরাস্ত করেন। হূণদের বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ করেন। তাঁর রাজ্য উত্তরে কম্বোজ থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেবপালের খ্যাতি ভারতের বাইরে সুবর্ণভূমি অর্থাৎ সুমাত্রা, জাভা, মালয় উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। সুবর্ণভূমির রাজা বালপুত্রদেব তাঁর কাছে পাঁচখানি গ্রাম চেয়ে পাঠান নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণের জন্য। দেবপাল এই অনুরোধ রেখেছিলেন। তাঁর সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম উত্তর ভারতে নবজীবন লাভ করে।

দেবপাল শিল্পকলা ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁর রাজসভায় স্থান পেয়েছিলেন। দেবপাল মুঙ্গেরে তাঁর নূতন রাজধানী গড়ে তোলেন।

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের গৌরব ও শক্তি কমে যায়। পরের দিকের পালরাজারা ছিলেন অকর্মণ্য। ফলে পাল সাম্রাজ্য পতনের দিকে এগোতে থাকে।

প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮ খ্রীঃ)ঃ পালবংশের নবম রাজা প্রথম মহীপালের সময়ে পাল সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবিত হয়। এই সময়ে পালসাম্রাজ্য শুধুমাত্র দক্ষিণ বিহারের মগধ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। প্রথম মহীপাল উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের কিছু অংশ পুনরায় দখল করেন। উত্তর বিহার এবং পশ্চিমে বারাণসী এলাকা পর্যন্ত তিনি জয় করে তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন। মহীপালের আমলে বাংলাদেশে তামিল রাজা রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণ ঘটে। রাজেন্দ্র চোল উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন ও প্রথম মহীপালকে পরাজিত করেন। ১০২৬ থেকে ১০৩৪—এর মধ্যে চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেব মহীপালকে পরাস্ত করে তীরভুক্তি বা বারাণসী অঞ্চল অধিকার করেন।

প্রথম মহীপালও অন্যান্য পালরাজাদের মত বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নালন্দায় একটি বিশাল বৌদ্ধমন্দির তার সময়ে নতুন করে নির্মিত হয়।

পরবর্তী রাজা বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় **মহীপালের** আমলে পালশক্তি আবার বিপন্ন হয়ে পড়ে। গয়া-মণ্ডলের সামন্ত বিশ্বাদিত্য, ঢেক্কারির সামন্ত বিশ্বযোগ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। এদিকে দ্বিতীয় মহীপালের সঙ্গে তাঁর দুই ভাই দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপালের বিরোধ উপস্থিত হয়। এই অবস্থার সুযোগে দিব্য নামক জনৈক কৈবর্ত নেতা দ্বিতীয় মহীপালকে নিহত করে বরেন্দ্রী বা উত্তরবঙ্গ দখল করে নেন। পালেরা সমগ্র বাংলাদেশ থেকে উৎখাত হয়ে তাঁদের বিহারের অংশটুকুর মধ্যেই টিকে থাকেন। এখানে প্রথমে শূরপাল রাজত্ব করেন এবং পরে তাঁর ভাই রামপাল ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রাজত্ব করেন।

রামপাল (১০৭৭-১১২০)ঃ এদিকে ১০৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কৈবর্ত নেতা দিব্য বরেন্দ্রীতে রাজত্ব শুরু করেছিলেন। তিনি বিহারে রামপালের এলাকার উপর অভিযান চালিয়েছিলেন বলে প্রকাশ। পূর্ববঙ্গের যাদব বংশের জাতবর্মা দিব্যকে পরাজিত করেছিলেন বলে দাবি করেছেন। সে যাই হোক, দিব্য শক্তিমান রাজা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রুদোক এবং তারপর রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজা হন। ভীমও বিশেষ শক্তিমান ছিলেন যেকথা সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর রামচরিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভীমকে শীঘ্রই বিভিন্ন আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর আমলে পরমার লক্ষ্মণদেব বরেন্দ্রী আক্রমণ করেন। ওদিকে বিহারে পালবংশীয় রামপাল নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। চৌদ্দজন সামন্ত ও বন্ধুরাজার সহায়তায় তিনি একটি বাহিনী গঠন করেন। তাঁকে একাজে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন তাঁর মামা অঙ্গের শাসক মথনদেব। এই বাহিনী গঙ্গা অতিক্রম করে ভীমকে পরাস্ত করে এবং বরেন্দ্রী আবার পালদের অধিকারে আসে।

অতঃপর রামপাল পূর্ববঙ্গের যাদবরাজ হরিবর্মার আনুগত্য আদায় করেন। রামপালের সেনাপতি তিঙ্গ্যদেব কামরূপ দখল করেন। কিন্তু পশ্চিমে রাজ্য-বিস্তার করতে গিয়ে রামপাল কনৌজের গাহড়বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের নিকট পরাজিত হন। এটা ঘটেছিল

১১০০ থেকে ১১০৯ সালের ভিতরে। উড়িষ্যার রাজনীতিতে রামপাল মাথা গলান এবং অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গকে পরাজিত করে তাঁর নিজের লোক দণ্ডভূক্তির জয়সিংহকে উৎকলের শাসক করে দেন। ১১১২ সালের কিছু আগে অনন্তবর্মা ওই জয়সিংহকে হটিয়ে তাঁর নিজের লোক কর্ণকেশরী বা তাঁর পুত্রকে উৎকলের শাসক করে দেন।

১১২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও মাতুল মথনদেব মারা গেলে শোকগ্রস্ত রামপাল মুঙ্গেরে গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জন দেন। তাঁর পুত্র **রাজ্যপালের** হাতে রামপাল তাঁর শেষজীবনে ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু রাজ্যপালের অকাল মৃত্যু হওয়ায় রামপালের দ্বিতীয় **পুত্র কুমারপাল রাজা** হন যাঁর সময় বিদ্রোহ করে তাঁদের বহু সামন্ত স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলেন, এবং ক্রমাগত একের পর এক বাইরের আক্রমণ চলেছিল। বিদ্রোহীদের মধ্যে ছিলেন গয়ামণ্ডলের সামন্ত-শাসক বিশ্বদিত্যের পুত্র যক্ষপাল, মগধের শাসক বর্ণমান ও তাঁর পুত্র রুদ্রমান, মিথিলার নান্যদেব যিনি খোদ কুমারপালকেই যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। এদিকে গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্র ১১২৪ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে পালদের হাত থেকে দিনাপুর পর্যন্ত বিহারী অঞ্চল দখল করে নেন। বল্লভরাম নামক কলচুরিদের এক সামন্তও পালরাজ্যে হানা দিয়েছিলেন। কামরূপে তিঙ্গ্যদেব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্য কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব তিঙ্গ্যদেবকে উৎখাত করেছিলেন, কিন্তু মনিবের হাতে কামরূপ অর্পণ না করে তিনি নিজেই সেখানকার রাজা হয়ে বসেন। এদিকে পালদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ গঙ্গাতীরবর্তী হুগলী জেলা পর্যন্ত জয় করেন, এবং তাঁর মিত্র সেনবংশীয় বিজয়সেন রাঢ়ে রীতিমত ক্ষমতা সঞ্চয় করেন। ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দে কুমারপালের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র তৃতীয় গোপাল ১৪ বছর রাজত্ব করেন। ১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে তাঁর কাকা, রামপালের কনিষ্ঠপুত্র, মদনপাল রাজা হন। ইনিই পালবংশের শেষ রাজা। ১১৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে, রাজত্বের সূচনাতেই, মদনপাল গাহড়বাল গোবিন্দচন্দ্রের নিকট পরাজিত হয়ে মুঙ্গেরের অধিকার হারিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি গোবর্ধন নামক এক বিদ্রোহী সামন্তকে দমন করেন। কিন্তু কলিঙ্গরাজ অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ ও সেনবংশীয় বিজয়সেনের সঙ্গে তিনি পেরে ওঠেননি। কালিন্দী নদীর তীরে তিনি বিজয়সেনের আক্রমণ প্রথম দিকে প্রতিহত করতে পারলেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। পরাজিত হয়ে তিনি বরেন্দ্রীর অধিকার বিজয়সেনকে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অতঃপর মদনপাল অঙ্গদেশে চলে আসেন এবং সেখানে ১১৬১ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পালবংশের ইতিহাস এখানেই সমাপ্ত। গোবিন্দপাল নামক জনৈক 'গৌড়রাজ' (যিনি মদনপালের কেউ হলেও হতে পারেন) গয়া অঞ্চলে কিছুকাল রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দে বল্লালসেন কর্তৃক পরাজিত হন।

সেনবংশ ঃ একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সামন্তসেন ও তাঁর পুত্র হেমন্তসেন কাসিপুরী নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এরা সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। প্রথম দিকে সেনরা পালরাজাদের অধীনে সামন্তরাজা

ছিলেন। রামপালের মৃত্যুর পর পালবংশ দুর্বল হয়ে পড়লে সামন্তসেনের পৌত্র বিজয় সেন পাল বংশের উচ্ছেদ করেন এবং স্বাধীন রাজার মর্যাদা অর্জন করেন।

বিজয়সেন (আনুমানিক ১০৯৫-১১৫৮)ঃ বিজয়সেন ছিলেন সেনবংশের প্রথম স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজা। তিনি বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান জয় করেন এবং উত্তর বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের যাদববংশকে পরাস্ত করে বিক্রমপুর দখল করেন এবং বিজয়পুর নামে একটি রাজধানী স্থাপন করেন। কলিঙ্গরাজ চোড়গঙ্গের সঙ্গে তাঁর মিত্রতার সম্পর্ক ছিল। দক্ষিণ রাঢ়ের শূরবংশীয় রাজকন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। এর ফলে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়।

বিজয় সেনের দীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলাদেশে শান্তি শৃংখলা ও সমৃদ্ধি ফিরে আসে। উমাপতিধরের প্রশস্তি থেকে তাঁর কৃতিত্বের কথা জানা যায়। তিনি পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি সম্রাট সুলভ উপাধি গ্রহণ করেন।

বল্লালসেন (আনুমানিক ১১৫৮–১১৭৯ খ্রীঃ)ঃ বিজয়সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বল্লালসেন বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনে বেশী মনোযোগী ছিলেন। বল্লালসেন কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক হিসাবে বিখ্যাত হয়ে আছেন। হিন্দুসমাজকে নতুনভাবে গঠন করার জন্য ও জাগতিক পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য—এই তিনশ্রেণীর সামাজিক আচার ব্যবহার, বিবাহ বিষয়ে কয়েকটি রীতিনীতির প্রবর্তন করেন।

বল্লালসেন তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিদ্যানুরাগী হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে দুটি মূল্যবান গ্রন্থ তাঁরই রচনা।

লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫ খ্রীঃ)ঃ বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন .১৭৯ খ্রীঃ ৬০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাম্রশাসন এবং মীন্‌হাজউদ্দীন রচিত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' নামক গ্রন্থ থেকে তাঁর সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি। বাল্যকাল থেকেই তাঁর রণকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। গৌড়, কলিঙ্গ; কাশী ও কামরূপের রাজগণ তাঁর কাছে হেরে যান। তিনি পুরী, কাশী ও প্রয়াগে বৃহৎ জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। মগধে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। নদীয়া নগরী তাঁর রাজধানী ছিল। তাঁর রাজত্বের শেষভাগে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে সেনগণ দুর্বল হয়ে পড়েন। তখন দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। লক্ষ্মণ সেন বিদ্যোৎসাহী ও সুকবি ছিলেন। গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, গোবর্দ্ধন, হলায়ুধ প্রভৃতি কবি ও পণ্ডিতগণ তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেন বল্লাল সেনের 'অদ্ভুত সাগর' নামক গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তিনি 'পরম বৈষ্ণব' উপাধি ধারণ করেন।

প্রায় কুড়ি বৎসর রাজত্ব করবার পর বৃদ্ধ বয়সে তিনি নবদ্বীপে বসবাস করেন। আনুমানিক ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবুদ্দিন আইবকের সেনাপতি বখতিয়ার খিলজি অতর্কিতে নদীয়া আক্রমণ করলে লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। নদীয়া মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে কিছুকাল রাজত্ব করবার পর তিনি পরলোকগমন করেন।

লক্ষ্মণ সেনের পরে তাঁর পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন রাজত্ব করেন। এরা উভয়েই সূর্যের উপাসক ছিলেন। মীনহাজউদ্দিন লিখেছেন যে সেন রাজারা পূর্ববঙ্গে ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। সেন রাজত্বকালে বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। তাঁদের সময়ে সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধর্ম শক্তিশালী হয়ে উঠে।

২। দাক্ষিণাত্য :

(ক) **বাদামী বা বাতাপীর চালুক্য বংশ :** খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে চালুক্য বংশের উত্থানের সময় থেকেই দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাস শুরু হয়। চালুক্যগণ উত্তর ভারতের রাজপুতদের শাখা হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিত। ডঃ স্মিথ মনে করেন যে তারা ছিল গুর্জর জাতির এক শাখা। কেউ কেউ তাদের কানাড়ী জাতির লোক বলেও মনে করেন।

বাদামীর চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **প্রথম পুলকেশী**। এঁরা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। প্রথম পুলকেশী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

প্রথম পুলকেশীর পর তাঁর পুত্র **কীর্ত্তিবর্মণ** ভারতের পূর্ব উপকূলের সব জায়গা দখল করেন। উত্তরদিকে তিনি বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হন। দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি তামিল রাজ্যগুলি তিনি জয় করেন। মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গঙ্গা, দ্রাবিড়, অঞ্চলও তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। পশ্চিম উপকূলে মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের কিছু অংশ তাঁর অধিকারে আসে। তিনিই ছিলেন চালুক্য প্রাধান্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

(খ) **দ্বিতীয় পুলকেশীর কৃতিত্ব :** কীর্তিবর্মণের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০৯-৬৪২ খ্রীঃ) চালুক্যবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। তাঁর বিজয়বাহিনী উত্তরে গুজরাট ও মালব অর্থাৎ নর্মদা থেকে দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। কাঞ্চীর পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণও তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। সুদূর দক্ষিণের চের, চোল এবং পাণ্ড্যরাজ্যেও তাঁর আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। তিনি নর্মদা তীরে উত্তরাপথের অধীশ্বর হর্ষবর্ধনকে প্রতিহত করে চালুক্য সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। তিনি গোদাবরী তীরস্থ পিষ্ঠপুরম অধিকার করেছিলেন এবং ভ্রাতা কুব্জ বিষ্ণুবর্মনকে ঐ অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। এই কুব্জ বিষ্ণুবর্ধনই কৃষ্ণা-গোদাবরীর মোহনা অঞ্চলে বেঙ্গীতে পূর্বদেশীয় চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে দ্বিতীয় পুলকেশী সাতবাহন নরপতি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর মত প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। কথিত আছে যে পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর সহিত গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর পত্র ও উপহার বিনিময় হয়েছিল। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাঙ্ তাঁর রাজসভা পরিদর্শন করেন। তিনি চালুক্য নরপতির প্রচণ্ড সামরিক শক্তি, বিপুল ঐশ্বর্য এবং প্রজাপুঞ্জের শৌর্যবীর্য দর্শনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীর বিজয়গৌরব দীর্ঘদিন স্থায়ী হল না। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র নরসিংহবর্মণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন। রাজধানী বাদামীও বিধ্বস্ত হল। এই পরাজয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যে চালুক্যশক্তি খর্ব হয়ে গেল।

কিন্তু দ্বিতীয় পুলকেশীর এই পরাজয়েও চালুক্য-পল্লব প্রতিযোগিতার অবসান হল না। দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পিতার পরাজয় ও মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে পল্লব রাজধানী কাঞ্চী অবরোধ করলেন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের পৌত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী অধিকার করলেন। পল্লব বংশের শক্তি ও গৌরব বিলুপ্ত হল। তাঁর অধীনস্থ একজন মহাসামন্ত সিন্ধুর আরবদিগকে প্রতিহত করেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চালুক্য ও পল্লববংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উভয়েই হীনবল হয়ে পড়ে। ৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূট দন্তিদুর্গ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পুত্র ও উত্তরাধিকারীকে পরাজিত করে চালুক্যবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন এবং একটি নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই নূতন রাজবংশই মহারাষ্ট্র অঞ্চলের রাষ্ট্রকূটবংশ।

চালুক্য রাজগণের পরাক্রমেই আরব আক্রমণকারিগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করতে পারে নাই। চালুক্য নরপতিগণও দেশের শিল্পস্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁদের আমলে বিশ্বের বিস্ময় অজন্তা ও এলিফ্যান্টার গুহাচিত্রগুলো চিত্রিত হয়েছিল। অজন্তার দেওয়াল চিত্রগুলো এই সময়েই অঙ্কিত হয়েছিল।

(গ) **রাষ্ট্রকূট বংশ (৭৫৩-৯৭২ খ্রীঃ)**: হর্ষোত্তর যুগে তিনটি পরাক্রমশালী রাজ-বংশের অভ্যুদয় হয়—(১) মহারাষ্ট্রের নাসিক অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট বংশ (২) কল্যাণে পরবর্তী চালুক্য বংশ এবং (৩) তাঞ্জোরে চোলবংশ। দাক্ষিণাত্যের আধিপত্যকে কেন্দ্র করে চোল ও চালুক্যগণের মধ্যে সুদীর্ঘ সংগ্রাম চলেছিল। রাষ্ট্রকূট নরপতিগণ কনৌজের মহোদয়শ্রী লাভের জন্য বাংলার পাল ও গুর্জর প্রতিহার শক্তির সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। চোলগণও উত্তর ভারতের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন এবং দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বহির্ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে (৭৫৩ খ্রীঃ) বাতাপীর চালুক্য শক্তিকে ধ্বংস করে **দন্তিদুর্গ** নাসিক অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট শক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রকূটগণ শ্রীকৃষ্ণের অনুচর যাদববংশীয় সাত্যকির বংশধর বলে গর্ব করে। কেহ বলেন, রাষ্ট্রকূটগণ তেলেগু রেড্ডীগণের বংশধর। কেহ বা বলেন, রাষ্ট্রকূটগণ ক্ষত্রিয় বংশসম্ভূত এবং রাষ্ট্রকূটদের নামানুসারেই দেশটির নামকরণ হয়েছে মহারাষ্ট্র। কাহারও মতে প্রথমে রাষ্ট্রকূটগণ চালুক্য রাজগণের অধীনে সামন্ত ছিলেন। সম্ভবত রাষ্ট্রকূটগণ দ্রাবিড় জাতীয় এবং কৃষিজীবি ছিলেন। পরে তারা চালুক্যরাজগণের অধীনে বংশানুক্রমিক প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ লাভ করেন এবং পরবর্তীকালের মারাঠা দেশমুখগণের মত শক্তিশালী হয়ে একটি সুবিশাল রাষ্ট্র গঠন করেন।

রাষ্ট্রকূটবংশের দ্বিতীয় নরপতি ছিলেন দন্তিদুর্গের পিতৃব্য **প্রথম কৃষ্ণ**। তার রাজত্বকালেই ইলোরার বিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির নির্মিত হয়েছিল (৭৫৮-৭৩ খ্রীঃ)। এই মন্দিরটি একটি বিরাট পর্বত ক্ষোদাই করে তৈরী হয়েছে। এইরূপ স্থাপত্যরীতি পৃথিবীর অন্যত্র দৃষ্ট হয় না এবং এই ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি ভারতীয় শিল্পের নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

পল্লব-চালুক্য সংঘর্ষের মত প্রথম কৃষ্ণের পরবর্তী রাষ্ট্রকূট রাজগণের ইতিহাস কনৌজের প্রতিহারগণের সহিত সংঘর্ষেরই কাহিনী। কৃষ্ণের পুত্র ধ্রুব প্রতিহারবংশীয় নরপতি **বৎসরাজকে** পরাভূত করেছিলেন এবং রাষ্ট্রকূটবংশীয় ধ্রুবই সম্ভবত গৌড়াধিপতি ধর্মপালকেও দোয়াব অঞ্চল হতে বিতাড়িত ও অধিকারচ্যুত করেছিলেন।

(ঘ) তৃতীয় গোবিন্দের কৃতিত্ব: মহারাজ ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৩-৮১৮ খ্রীঃ) রাষ্ট্রকূটবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি পল্লবরাজ দন্তিবর্মণকে পরাজিত করে কর প্রদানে বাধ্য করেন। উত্তর ভারতে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তিনি কনৌজের প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করলেন। এমন কি বাংলার দিগ্বিজয়ী সম্রাট ধর্মপাল এবং তাঁর সামন্ত চক্রায়ুধও তৃতীয় গোবিন্দের প্রবল প্রতাপ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং কিছুকাল তাঁর বশংবদ ছিলেন।

তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম **অমোঘবর্ষ** (৮১৫—৮৭৭ খ্রীঃ) মান্যখেট বা মালখেড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বেঙ্গীর চালুক্যগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলে তিনি পিতার উত্তরাপথ বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নাই কিংবা উত্তরাপথের ইতিহাসে কনৌজের মহোদয়শ্রী লাভের জন্য পাল-প্রতিহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তিনি প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজের দাক্ষিণাত্য অভিযান প্রতিহত করেছিলেন। অবশ্য তিনি রাষ্ট্র ও যুদ্ধনীতি অপেক্ষা ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতিই অধিক অনুরাগী ছিলেন। সমসাময়িক একজন আরব লেখক বলেছেন, মান্যখেটের রাষ্ট্রকূটরাজ ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন এবং তিনি চীনসম্রাট, বাগদাদের খলিফা এবং রোমের কনস্টান্টিনোপলের সুলতানের সমকক্ষ ছিলেন। অমোঘবর্ষ দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আমলে ভৃগু কচ্ছ বা ভারুচ একটি শ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত হয়।

অমোঘবর্ষের পুত্র **তৃতীয় ইন্দ্র** রাষ্ট্রকূটবংশের শেষ পরাক্রান্ত নরপতি। তিনি প্রতিহাররাজ প্রথম মহীপালকে (৯৮৮ খ্রীঃ) আক্রমণ করে তাঁর রাজধানী কনৌজ সাময়িকভাবে অধিকার করেন।

তৃতীয় কৃষ্ণ ও তার কৃতিত্ব: তৃতীয় ইন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় কৃষ্ণ চোলগণকে পরাজিত করে কাঞ্চী ও তাঞ্জোর অধিকার করেছিলেন। সাময়িক কালের জন্য তিনি চোল আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি ছিলেন এই বংশের শেষ কাঞ্চী রাজা।

রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে রাজধানী মান্যখেট পরমাররাজ কর্তৃক বিজিত ও লুণ্ঠিত হয় (৯৭২ খ্রীঃ)। উহার পরেই তৃতীয় কৃষ্ণের সামন্ত চালুক্য বংশীয় **দ্বিতীয় তৈল** শেষ রাষ্ট্রকূট নরপতিকে পরাজিত করে কল্যাণ নগরে চালুক্য বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন (৯৭৩ খ্রীঃ)।

পরবর্তী চালুক্য বংশ (কল্যাণের চালুক্য বংশ): কল্যাণের চালুক্য বংশ বাতাপীর চালুক্য বংশেরই একটি শাখা। দশম শতাব্দীর শেষভাগে (৯৭৩ খ্রীঃ) রাষ্ট্রকূটগণকে পরাভূত করে চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় তৈল এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মালবের পরমাররাজ মুঞ্জকে পরাজিত ও নিহত করেন। দাক্ষিণাত্যের প্রভুত্বকে

কেন্দ্র করে চালুক্য ও চোলগণের মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী সংগ্রাম চলেছিল। চালুক্য নরপতি সোমেশ্বর আহবমল্ল (১০৪১-১০৬৮ খ্রীঃ) চোলরাজ রাজাধিরাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে চোল রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন এবং কল্যাণ নগরে রাজধানী স্থাপন করেন।

১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সোমেশ্বরের পুত্র **ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য** ত্রিভুবনমল্ল উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন, যাঁর কীর্তিকলাপ অবলম্বনে বিল্‌হন বিক্রমাংকদেবচরিত রচনা করেছিলেন। ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য নিজের নামে একটি অব্দেরও প্রচলন করেছিলেন। তাঁর ছোট ভাই জয়সিংহ, যিনি সান্তলিজে এবং কদুরের শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বের গোড়াতেই, অর্থাৎ ১০৮২-র কিছু পরে, বিদ্রোহ করেন। বিক্রমাদিত্য তাঁকে কৃষ্ণা নদীর তীরে পরাজিত করে বন্দী করেন, কিন্তু পরে তাঁকে মুক্ত করে দেন।'

১০৮৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বিক্রমাদিত্য চোলদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে কাঞ্চী দখল করেন। ১০৯১ থেকে ১০৯৩-র মধ্যে কোন সময়ে তিনি তাঁর সেনাপতি গোবিন্দরসের সহায়তায় বেঙ্গি ধ্বংস করেন, বেলনাণ্টি প্রথম গোঙ্ককে পরাজিত করেন এবং বীর চোড়ের নিকট থেকে অন্ধ্র অঞ্চল কেড়ে নেন। ১০৯৯ সাল নাগাদ **কুলোত্তুঙ্গ** চোল চালুক্যদের কাছ থেকে বেঙ্গি দখল করেন এবং ১১১৭ পর্যন্ত তা নিজ কর্তৃত্বে রাখেন। ১১১৮ থেকে অন্ধ্র আবার বিক্রমাদিত্যের হাতে চলে যায় এবং ১১২৪ পর্যন্ত তা বজায় থাকে।

গঙ্গবাড়ির হোয়সলদের, (যাদের রাজ্য বর্তমান হাসান, তুমকুর এবং মহীশূরের কয়েকটি জেলা নিয়ে ছিল এবং রাজধানী ছিল দোরসমুদ্র), সঙ্গে বিক্রমাদিত্য অতঃপর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তিনি তাঁর বন্ধু পরমার জগদ্দেবকে হোয়সলদের বিরুদ্ধে পাঠান এবং ক্রমাগত যুদ্ধের পর হোয়সলরা বিক্রমাদিত্যের বশ্যতা স্বীকার করেন। এই যুদ্ধ ঘটেছিল দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে। গোয়ার কদম্বরাজ বিজয়াদিত্য এই সময়ই বিক্রমাদিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন কিন্তু বিক্রমাদিত্যের সামন্ত দ্বিতীয় আচ সেই বিদ্রোহ দমন করেন। দ্বিতীয় আচ পাণ্ড্যরাজ উচ্চঙ্গির বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। করহাটকের (বর্তমান সাতারা জেলার করাদ) শিলাহাররাজ ভোজের একটি বিদ্রোহ বিক্রমাদিত্য দমন করেন। উত্তরেও বিক্রমাদিত্য অভিযান করেছিলেন এবং সম্ভবত চৌলুক্য কর্ণকে পরাজিত করেছিলেন। এটা ঘটেছিল তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে।

বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করেছিলেন ১০৭৬ থেকে ১১২৮ পর্যন্ত। তাঁর রাজত্ব ছিল মোটামুটি দক্ষিণে হাসান, তুমকুর এবং কুড্‌ডাপা জেলাত্রয়, পূর্বে ও দক্ষিণ খম্মমেট ও গোদাবরী জেলা ও উত্তরে নর্মদা। কিন্তু তাঁর প্রভাবাধীন এলাকা ছিল বহু বিস্তৃত। বিক্রমাদিত্যের উত্তরাধিকারী, তাঁর পুত্র তৃতীয় সোমেশ্বর (১১২৮-১১৩৮) হোয়সল বিষ্ণুবর্ধনের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি হোয়সলদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। তাঁর সময় দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গ চোল ১১৩৪-এর কিছু পূর্বে চালুক্যদের কাছ থেকে অন্ধ্র অঞ্চলটি কেড়ে নেন।

তৃতীয় সোমেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জগদেকমল্ল (১১৩৮-১১৫১) রাজা হয়েই গঙ্গবাড়ির হোয়সলদের এবং গোয়ার কদম্বদের বিদ্রোহের সম্মুখীন হন কিন্তু অনুগত

সামন্ত সিন্দ পের্মাডিদেবের সহায়তায় তা দমন করতে সক্ষম হন। ১১৩৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তিনি হোয়সল নরসিংহের সহায়তায় পরমার জয়সিংহকে পরাজিত করে মালবের সিংহাসন জনৈক বল্লালের হস্তে অর্পণ করেন। সেই সময়েই তিনি অভিযান করে গুর্জর রাজা কুমারপালকে পরাস্ত করেন। দক্ষিণে দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গ চোল এবং কলিঙ্গের অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, এবং নোঢ়ম্ব পল্লবদের একটি বিদ্রোহ দমন করেছিলেন।

জগদেবমল্লের উত্তরাধিকারী তৃতীয় তৈল (১১৫১-১১৫৬) চৌলুক্য কুমার পাল ও চোল দ্বিতীয় কুলোতুঙ্গের আক্রমণ প্রতিহত করলেও কাকতীয় প্রোলের বিদ্রোহ দমন কালে বন্দী হন। অবশ্য কাকতীয়রা পরে তাঁকে ছেড়ে দিলেও অভ্যন্তরীণ আরও বহু বিদ্রোহে চালুক্যরা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে চালুক্যদেরই সামন্ত কলচুরি বিজ্জল ক্ষমতা দখল করেন ১১৫৬ খ্রীষ্টাব্দে।

৩। **দক্ষিণ ভারতের কথা** ঃ এ পর্যন্ত একের পর এক যে কয়টি সাম্রাজ্যের কথা আলোচনা হল, সেগুলো প্রধানতঃ ছিল উত্তর ভারতের সাম্রাজ্য। সেগুলো উত্তর ভারতের রাজনৈতিক একতা এনেছিল। কেবল মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতেও বিস্তৃত ছিল। কিন্তু মৌর্যরাও সমস্ত দক্ষিণ ভারতকে সাম্রাজ্যের মধ্যে আনেননি। গুপ্তদের আমলে দক্ষিণ ভারতের যে সব জায়গা সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল সেখানেও স্থানীয়-ভাবে অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত শাসন রেখে করদ রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু উত্তর ভারতে যেমন ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য নানা রাজনৈতিক ওঠানামা হয়েছে, তেমনি দক্ষিণ ভারতেও একচ্ছত্র সাম্রাজ্য গড়ে রাজনৈতিক ঐক্য আনবার জন্য নানারূপ ভাঙ্গাগড়া হয়েছে। এমনকি কোন কোন শক্তিশালী রাজা দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতেও এসেছিলেন। এই ভাঙ্গাগড়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ না দিলে প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা সম্বন্ধে বলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

(ক) **কাঞ্চীর পল্লববংশ** ঃ সাতবাহন শক্তির পতনের যুগে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে পল্লবগণ কাঞ্চীকে কেন্দ্র করে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরাক্রান্ত গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার দাক্ষিণাত্য অভিযান কালে পল্লব নরপতি বিষ্ণুগোপকে পরাজিত করেন। বিষ্ণুগোপ নামটি পল্লব বংশের অনেক নরপতিই গ্রহণ করেছিলেন—সুতরাং সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক এই বিষ্ণুগোপের সহিত প্রাকৃত লিপির উল্লিখিত 'ধর্মপরায়ণ, শক্তিশালী এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা' পল্লবরাজ শিবস্কন্দবর্মণের কি সম্বন্ধ ছিল তা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। ইহা নিঃসন্দেহ যে পরবর্তী পল্লবরাজগণ তেলেগু এবং কানাড়ীয় দেশের বহুলাংশ জয় করেছিলেন। এমন কি মহীশূরের গঙ্গ এবং বৈজয়ন্তীপুরের কদম্বগণ চুটু সাতকর্ণিদের পরে তারা এই রাজ্য অধিকার করেছিলেন এবং পল্লবরাজগণের আধিপত্য স্বীকার করেছিলেন। "লোকভাগ" থেকে জানা যায় যে ৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহবর্মণ নামক একজন পল্লব নরপতি কাঞ্চীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে **সিংহবিষ্ণুর** সিংহাসনারোহণের সঙ্গে পল্লববংশের ধারাবাহিক

ইতিহাস সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সিংহবিষ্ণু বাহুবলে চের, চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য জয় করে তামিলগণের এক রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপন করেন। তিনি সিংহলরাজকে পরাজিত করেছিলেন। সিংহবিষ্ণু বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মামল্লপুরমের বরাহগুহায় সিংহবিষ্ণু এবং তাঁর দুই মহিষীর প্রতিকৃতি আবিস্কৃত হয়েছে।

সিংহবিষ্ণুর পর তাঁর পুত্র **প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ** কাঞ্চীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকালেই পল্লব ও চালুক্য বংশের বংশানুক্রমিক সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। চালুক্য নরপতি দ্বিতীয় পুলকেশীর বিজয়-বাহিনী পল্লব রাজধানী কাঞ্চী পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল এবং পুলকেশী মহেন্দ্রবর্মণকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রবর্মণের পরাজয়ের পরেও চোল-চালুক্য সংঘর্ষের অবসান হয় নাই।

মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র **নরসিংহবর্মণ** পল্লব বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করে চালুক্য রাজধানী বাতাপী অবরোধ করেন। দ্বিতীয় পুলকেশী নরসিংহবর্মণের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলেন। নরসিংহবর্মণ এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। নরসিংহ বর্মণ মমল্লপুরমে (মহাবলীপুরমে) একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। মহাবলীপুরমের রথমন্দিরগুলি তাঁর শিল্পানুরাগের পরিচয় প্রদান করে। এক একটি বিশাল প্রস্তর খণ্ড খোদিত করে এই মন্দিরগুলি ('সপ্তরথ') নির্মিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র **প্রথম বিক্রমাদিত্য** পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণকে পরাজিত করেন এবং পল্লবরাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন। অবশ্য পল্লবগণ কাঞ্চী পুনরুদ্ধার করেছিলেন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের পৌত্র দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে চালুক্যগণ পুনরায় পল্লবরাজ্য আক্রমণ করেন। পল্লবরাজ নন্দবর্মণ চালুক্যদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলেন। রাজধানী কাঞ্চী চালুক্যদের হস্তগত হল। পল্লবগণ এই সময়ে দক্ষিণের পাণ্ড্যগণ কর্তৃকও আক্রান্ত হয়েছিলেন—পাণ্ড্যগণ কাবেরী নদী পর্যন্ত ভূখণ্ড অধিকার করেছিলেন। অবশেষে চোল নরপতি আদিত্য চোল নবম শতাব্দীর শেষভাগে শেষ পল্লবরাজ অপরাজিতবর্মণকে পরাজিত করে তাঁর রাজ্য অধিকার করেন।

পল্লববংশের কৃতিত্ব ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে পল্লবগণের রাজত্বকাল স্মরণীয় যুগ। পল্লবগণই প্রথম দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের সাম্রাজ্য সীমা উত্তরে তুঙ্গভদ্রা ও পেন্নার হতে দক্ষিণে প্রায় সিংহল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহু বৈষ্ণব, আলভার এবং শৈব নায়নার পল্লব রাজত্বকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পল্লবদের অধীনে কাঞ্চী ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। পল্লবগণ শিল্পের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কাঞ্চীর অসংখ্য মন্দির তাঁদের স্থাপত্যও ভাস্কর্যপ্রীতির নিদর্শন। কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দির দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মণের অক্ষয় কীর্তি।

(খ) **চোল সাম্রাজ্য ঃ** মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে সুদূর দাক্ষিণাত্যের চোল রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। চোল রাজ্যের নৌবাণিজ্যের উল্লেখ কোন কোন গ্রীক রোমক রচনায় পাওয়া গেলেও চোলদের প্রাচীন রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে চোলরাজ্য পল্লবদের অধীনে চলে যায়। তাঞ্জোরের চোলবংশের প্রতিষ্ঠাতা **বিজয়ালয়** প্রথমে পল্লবদের সামন্ত ছিলেন। তাঁর পুত্র **প্রথম আদিত্য** (৮৭১-৯০৭ খ্রীঃ) পল্লবদের দুর্বলতার সুযোগে পল্লব এলাকা সমূহ দখল করেন। তিনি পাণ্ড্যদের কাছ থেকে কঙ্গুদেশ জয় করেন। প্রথম আদিত্যের আমলেই চোল রাজ্য স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

তাঁর পুত্র **প্রথম পরন্তক** (৯০৭-৯৫৩ খ্রীঃ) পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ করেন ও ঐ রাজ্যের রাজধানী মাদুরা লুণ্ঠন করেন। ৯১৫ খ্রীঃ তিনি পাণ্ড্য ও সিংহলের যুগ্মবাহিনীকে পরাস্ত করেন। পরন্তকের সময়ে চোল রাজ্যের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তির যুগের সূত্রপাত হয়।

রাজরাজ (৯৮৫-১০১২): দ্বিতীয় পরন্তকের দ্বিতীয় পুত্র প্রথম রাজরাজ ৯৮৫ সনে পুনরায় চোলশক্তিকে গড়ে তোলেন। তিনি চের ও পাণ্ড্য রাজাদের পরাজিত করেন। ভেঙ্গীর পূর্ব চালুক্য রাজ্য তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেছিল। এক নৌবহর গঠন করে তিনি সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা করে সিংহলের কিছু অংশ এবং 'সাগরের দ্বীপগুলি' জয় করেছিলেন। এইভাবে রাজরাজ চোলশক্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর রাজত্বকালে চোলরাজ্যের মধ্যে বর্তমানের মাদ্রাজ বিভাগ, মহীশূরের কিছু অংশ, কুর্গ, সিংহলের উত্তরাংশ এবং 'সাগরের দ্বীপগুলি' (সম্ভবতঃ লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ) অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাজেন্দ্র চোলদেব (১০১২-১০৪৪ খ্রীঃ): রাজরাজের মৃত্যুর পর রাজেন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন চোলবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। সিংহাসনে বসেই তিনি পিতার ন্যায় রাজ্যবিস্তার নীতি গ্রহণ করেন। তাঁর আমলের তাম্রলিপি ও তরুমালাই পর্বতলিপি থেকে তাঁর রাজত্বের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি চালুক্যরাজ সোমেশ্বরকে পরাজিত করেন। রায়চুর, দোয়াব, কুলপক, মালখেদ, সিংহল, আরবসাগরের দ্বীপ শান্দিমঞ্জি, পশ্চিম চালুক্যরাজ্য, পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

পিতার মত তিনিও শক্তিশালী নৌবহরের সাহায্যে সাগর পথে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল সিংহল দখল করেন। ১০২৫ খ্রীঃ নাগাদ তিনি বর্তমান ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াতে অভিযান চালান। এই অভিযানের ফলে শ্রীবিজয় (সুমিত্রা), অধিকার করেন। এছাড়া মালয় উপদ্বীপ, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, পেনাং-এর নিকটবর্তী কেদাহ্ তার অধিকারে আসে। কার্যতঃ সমগ্র বঙ্গোপসাগর একটি চোল হ্রদে পরিণত হয়। এছাড়া পিতা কর্তৃক বিজিত দ্বীপসমূহের উপরও রাজেন্দ্রের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। নিঃসন্দেহে বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই বহির্ভারতে চোলগণ যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। চোলগণ যে দুর্দ্ধর্ষ নৌশক্তি গড়ে তুলেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চীনের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন। তখন একাদশ শতক হতে চীনের সাথে নিয়মিত বাণিজ্য শুরু হয়। দক্ষিণ ভারত থেকে চীনে রপ্তানী হত তুলাজাত বস্ত্র, মশলা, সুগন্ধি ইত্যাদি।

রাজেন্দ্র চোল পালরাজ প্রথম মহীপালকে পরাজিত করে গঙ্গইকোণ্ড বা গঙ্গাবিজয়ী উপাধি গ্রহণ করেন এবং গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরম নামে একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন।

রাজেন্দ্র চোলদেবের মৃত্যুর পর রাজাধিরাজ রাজত্ব করেন। তিনি সিংহলের বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করেন। রাজাধিরাজের মৃত্যুর পর অধিরাজেন্দ্র চোল সিংহাসনে আরোহণ করেন। অধিরাজেন্দ্রের শাসন জনপ্রিয় ছিল না। তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। তার পরবর্তী চোলরাজগণের দুর্বল শাসনকালে পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যরাজ কুমার কুলোতুঙ্গ সিংহাসনে বসেন।

চোলদের পতন ঃ কুলোত্তুঙ্গের পরে তাঁর অযোগ্য বংশধরদের শাসনকালে চোলরাজ্য ক্রমশঃ পতনের পথে অগ্রসর হতে থাকে। চোলরাজ্যের দক্ষিণ অংশ পাণ্ড্যগণ অধিকার করেন। অন্যান্য অংশগুলির অধিকারের প্রশ্নে কাকতীয় এবং হোয়সলদের মধ্যে বিবাদ বাধে। চোলদের আমলে দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে পড়ে, কয়েকটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে, দক্ষিণ ভারত বিভক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ১২৫০ খ্রীঃ নাগাদ কাকতীয় রাজা গণপতি চোলদের দুর্বলতার সুযোগে কাঞ্চী দখল করে নেয়।

চোলদের শাসনব্যবস্থা ঃ চোলগণ এক সুশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন। চোল রাজাদের লিপিগুলি থেকে (Inscriptions) এই শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। চোলরাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। চোল বংশের রাজকুমার কোন কোন প্রদেশে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। কোন কোন অঞ্চলে সামন্তগণ রাজার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে এবং কর ও সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে শাসনভার পেতেন। 'মণ্ডলম' বা প্রদেশগুলি 'কোট্টমে' এবং 'কোট্টম'গুলি 'নাড়ু'তে বিভক্ত ছিল। কয়েকটি গ্রাম বা 'কুড়ম' নিয়ে জেলা গঠিত হত। শাসন-ব্যবস্থার সর্বনিম্নে ছিল গ্রাম। জমির এক ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হত। তখনকার স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল 'কাসু' ভূমি রাজস্বই ছিল প্রধান আয়।

গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন ঃ চোলদের রাজত্বে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের এক সুন্দর পদ্ধতি চালু ছিল। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী মহাশয় চোল-লিপিগুলির ভিত্তিতে ইহার প্রামাণ্য বিবরণ দিয়েছেন। গ্রামের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ছিল গ্রামসজ্ঞ (Village Assemblies)। গ্রামের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের নিয়ে গ্রামসজ্ঞ গঠিত হত। গ্রামসজ্ঞগুলি দুই রকমের ছিল—'উর' এবং 'সভা'। 'উরে' স্থানীয় অধিবাসীরা মিলিত হয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করত। প্রতি 'উরে' একটি কার্যনির্বাহক সমিতি ছিল। ব্রাহ্মণদের গ্রামগুলিতে ছিল 'সভা' বা 'মহাসভা'। এই 'সভা'গুলির হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিল। এরাই ছিল গ্রামের জমিজমার মালিক। এরাই ট্যাক্স বা কর আদায় করত। গ্রামের ছোটখাট মামলা-মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি এরাই করত। প্রাথমিক শিক্ষার ভার ছিল এদের উপর। দেবমন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও দীঘি বা পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা এরাই করত। নাটকের অনুষ্ঠানের জন্য এরা 'নাটকশালা' নির্মাণ করত। 'সভার' সভ্যগণ নির্বাচিত হতেন। সাধারণতঃ দেবমন্দিরে 'সভার' বৈঠক বসত। ঢোল দিয়ে 'সভার' বৈঠক ডাকা হত।এই 'সভা'গুলি অবশ্য রাজ-কর্মচারীদের সাধারণ পরিচালনায় কাজ করত। বিচার রাজস্ব, ঋণ, পথ ও পুকুর ধর্মস্থান রক্ষণাবেক্ষণ আইন শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের প্রচুর ক্ষমতা ছিল।

সপ্তম অধ্যায়

(ক) সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি

(৭ম থেকে ১২শ শতাব্দী)

রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনায় সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের গতি অনেক ধীর। ফলে আগের যুগের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পরের যুগেও থেকে যায়। আবার নতুন যুগের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিও সহজেই চিনে নেওয়া যায়। এইভাবেই প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগে নতুন ও পুরাতন ভাবধারার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রত্যেক যুগের পরিবর্তনের ধারা ভিন্ন রকমের হয়। আলোচ্য যুগের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

এই যুগের সামাজিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে সমাজের প্রধান স্থানে রইলেন তাঁরা, যাঁরা ভূমিতে কোন কায়িক শ্রম না দিয়েই ভূমি থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন। রাজা বা শাসকই ছিলেন আইনত সমস্ত ভূমির মালিক। কিন্তু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, রাজারা ও তাদের অনুচরবর্গ বংশপরম্পরায় স্থানীয় প্রধানগণ সমরকুশলী বীরগণ এবং উপজাতির ও গোষ্ঠী দলপতিগণ সীমিত অঞ্চলের রাজস্ব, ভোগ করতেন। এদের কারও এলাকা ছিল বড় আবার কারও বা শুধুমাত্র একটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এলাকা ছিল। এই ভূখণ্ডগুলি 'রাজস্ব দেয়া ভূখণ্ড' (ইংরাজীতে fief) নামে পরিচিত ছিল। শাসক বা রাজা এগুলি ভূস্বামীদের ব্যবহারের জন্য দান করতেন এবং পরিবর্তে ভূস্বামীগণ কর, খাজনা, শ্রম এবং সর্বোপরি আনুগত্য প্রদান করতো। শাসকরা ইচ্ছা করলে এইভাবে দেয় ভূখণ্ড কেড়ে নিতে পারতেন। কিন্তু কার্যতঃ বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণিত না হলে তা করা হত না। এই সব ভূস্বামীরা আবার তাদের অনুগতদের মধ্যে ভূমির অংশ ভাগ করে ইজারা দিতেন। এইভাবে নানা স্তরে বিভক্ত ভূস্বামী শ্রেণী গড়ে ওঠে। এরা ভূমির উপর বংশগত অধিকার দাবী করতেন। ক্রমে সরকারী পদও বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। এই ভূস্বামী শ্রেণী নিজ নিজ এলাকায় রাজস্ব সংগ্রহ করতেন, অপরাধীর বিচার করতেন, জরিমানা আদায় করতেন, জমির উপর অধিকার খাটাতেন। এই ভাবে কায়িক শ্রম না দিয়ে তারা ভূমি থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সামন্ত প্রথার বিকাশের ফল হল সুদূরপ্রসারী। এর ফলে রাজা বা শাসকের ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাস পেল। তাঁরা সামন্তশ্রেণীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। সামন্ত প্রধানদের আধিপত্যের ফলে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। অবশ্য বিশৃঙ্খল ও অরাজক যুগে সামন্ত প্রধানরা কৃষক ও দুর্বল শ্রেণীর জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা গ্রহণ করেছিল। নয়ত সাধারণ জীবনযাত্রা হয়তো স্তব্ধ হয়ে যেতো।

বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত বর্ণবিভাগ প্রথা এ যুগের ও সমাজের ভিত্তি ছিল। নিম্নবর্ণের পক্ষে প্রযোজ্য নানা বিধিনিষেধ এই যুগে আরো কঠোর হয়। স্মৃতিশাস্ত্রকার পরাশর—শূদ্রদের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ, শূদ্রদের সঙ্গে মেসামেশা, শূদ্রদের কাছে থেকে পাঠ গ্রহণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ এ যুগে নিন্দনীয় ছিল। বিভিন্ন কর্মীসংঘ, যেমন, তাঁতী, জেলে, কামার, কুমোর, মুচী, স্বর্ণকার, শিকারী, নাপিত প্রভৃতি এই যুগে জাতি শ্রেণীভুক্ত হয়। এই যুগের স্মৃতিশাস্ত্রকাররা হস্তশিল্পকে নিম্ন পেশা বলে গণ্য করতেন। এই যুগে রাজকীয় সংস্থায় কর্মরত ব্রাহ্মণ, শূদ্রসহ বিভিন্ন বর্ণের লোক নিয়ে গঠিত হয় কায়স্থ জাতি। আবার বিভিন্ন বিদেশী জাতিগুলিও হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হয় এবং বিভিন্ন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত রাজপরিবার রাজপুত্র বা রাজপুত নামে অভিহিত হয়ে ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা লাভ করে। তবে যতটা মনে করা হয় ততটা জাতিভেদের কঠোরতা ছিল না। ব্যক্তি বা দল উচ্চবর্ণে উন্নীত হতে পারতো। বহু স্থানীয় উপজাতি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারা বিবাহ ও নানা উৎসব অনুষ্ঠানে নিজেদের আচারবিধি মেনে চলতো। এইভাবে সমাজ ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে উঠে।

পূর্বযুগের মত এই যুগেও সমাজে নারীজাতির বিশেষ কোন মর্যাদা ছিল না। অন্ধভাবে স্বামীসেবা ও স্বামীর আদেশ পালনই নারীর ধর্ম বলে বিবেচিত হত। নারীর বিবাহের বয়স হ্রাস করা হয়। ফলে উচ্চশিক্ষার পথও রুদ্ধ হয়। এই যুগের বিভিন্ন নাটকে অবশ্য রাজপরিবারের নারীদের চিত্রাঙ্কনে; সঙ্গীতে ও কবিতা রচনায় দক্ষতার উল্লেখ পাওয়া যায়। গৃহে নারীর সম্মান ছিল। পরিত্যক্তা স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীকে গ্রহণ করতে হতো। বহুবিবাহ, সতীদাহ ইত্যাদি নানা কুপ্রথা এই যুগে প্রসারলাভ করে।

এই যুগে ভারতের স্ত্রী-পুরুষের পোষাক পরিচ্ছদের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। পুরুষরা ধুতি ও স্ত্রীলোকেরা শাড়ি পরতো। সাধারণ লোক সূতী-বস্ত্র ব্যবহার করতো; কিন্তু ধনীরা রেশমী ও সূক্ষ্ম মসলিন ব্যবহার করতো। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অলঙ্কার পরতো। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা থেকে ভারতীয় রাজাদের অলঙ্কারপ্রিয়তার কথা জানা যায়। এই যুগে বহু অঞ্চলে ও উচ্চবর্ণের মধ্যে নিরামিষ খাদ্যের প্রচলন ছিল। তবে ময়ূর, ঘোড়া, বনমোরগ ইত্যাদির মাংস খাওয়া যে নিষিদ্ধ ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণ খাদ্য হিসাবে গমের প্রচলন এ যুগে হয়নি। কোন কোন স্মৃতি লেখক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও এই যুগের সাহিত্যে মদ্যপানের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ করে উৎসব অনুষ্ঠানে, শিকারে ও বিবাহভোজে মদ্যপানের প্রচলন ছিল। রাজপরিবারের স্ত্রীলোকেরাও মদ্যপান করতো। প্রমোদ ভ্রমণ, সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ, বিভিন্ন পশুপাখীর লড়াই, পাশা খেলা, শিকার প্রভৃতি রাজা ও 'জনসাধারণের অবসর বিনোদনের মাধ্যম ছিল।

জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে এই যুগে বিশেষ কোনও অবনতি ঘটেনি। ভারতীয় কৃষি আগের মতই উন্নত ছিল। জমির উর্বরতা ও কৃষকদের দক্ষতার সপ্রশংস উল্লেখ বিভিন্ন পর্যটকদের রচনায় পাওয়া যায়। তেমনি হস্তশিল্প, ধাতুবিদ্যা ইত্যাদির

ক্ষেত্রেও উচ্চমান বজায় ছিল। এই যুগের মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও সমস্ত প্রধানরা রাজাদের মতই জাঁকজমক ও সমারোহে বাস করতেন। তারা সুসজ্জিত প্রাসাদ, বিদেশী পোষাক, প্রসাধন দ্রব্য, মূল্যবান রত্ন ও সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করতেন। তাদের গৃহে প্রচুর স্ত্রীলোক ও গৃহভৃত্য থাকতো। বড় বড় ব্যবসায়ীরাও রাজকীয় জীবন যাপন করতো। তবে দেশের সর্বত্র সুখ সমৃদ্ধি বিরাজ করতো—এ ধারণা ঠিক নয়। খাদ্যদ্রব্য সস্তা ছিল বটে তবে বহু লোক পেট ভরে খেতে পেতো না। দারিদ্র্যের জ্বালায় অনেকে দস্যু ও লুণ্ঠনবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হত। দুর্ভিক্ষ প্রায়ই লেগে থাকতো। গ্রামের কৃষকদের জীবন ছিল দুর্বিষহ। তাদের সামন্ত প্রধানদের গৃহে বেগার খাটতে হতো। সামন্ত প্রধানদের উৎপীড়ন, খুশীমত অর্থ আদায় ইত্যাদি জীবনযাত্রার অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই যুগ উত্তর ভারতের ক্ষেত্রে ছিল জড়ত্ব ও অবক্ষয়ের যুগ। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে ইউরোপে অন্ধকারময় যুগের শুরু হয়। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভীষণ অবনতি ঘটে। এর ফলে উত্তর ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বেশ উন্নত ও লাভজনক অর্থাৎ অনুকূল বহির্বাণিজ্য চলতো। এই ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়। নগরগুলি ও নাগরিক জীবন জৌলুষহীন হয়ে পড়ে। আবার ইসলামের অভ্যুত্থানের ফলে স্থলপথে বৈদেশিক বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উত্তর ভারতে স্বর্ণমুদ্রার ঘাটতি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় শক্তিশালী আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য ক্রমে ক্রমে পুনরুজ্জীবিত হয়। ভারতীয় বস্ত্র, গন্ধ দ্রব্য ও মশলার ব্যাপক চাহিদা থাকায় আরব বণিকরা ভারতের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে তোলে। এই সময়ে উত্তর ভারতে মালব প্রভৃতি জায়গায় নূতন নূতন শহর গড়ে ওঠে। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ছয় শতক থেকে শুরু করে পূর্বভারত বিশেষ করে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে দ্রুত বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। ভারতীয় রাজারা বিশেষ করে পাল ও সেন রাজারা এবং দক্ষিণ ভারতের পল্লব ও চোল রাজারা বৈদেশিক প্রসারের জন্য চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময় করেছিলেন। স্থলপথে বাণিজ্য এ সময়ে নিরাপদ ছিলনা। তাই ভারত ও চীনের মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলি চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যাত্রা বিরতিস্থল হিসাবে কাজ করত। জাভা, সুমাত্রা, সুবর্ণদ্বীপ (আধুনিক ইন্দোনেশিয়া) প্রভৃতি স্থানে সমুদ্রপথে বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করতো। চীনের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান সমুদ্র বন্দর ছিল ক্যাণ্টন। চোল রাজারা বিশাল নৌশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গোপসাগর কার্যত চোল হ্রদে পরিণত হয়। এই লাভজনক সামুদ্রিক বাণিজ্য বাংলাদেশ ও দক্ষিণ ভারতকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গে

ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে খ্রীষ্টীয় বারো শতক পর্যন্ত। এর পর চীনা ও আরবদের সঙ্গে ভারতীয় জাহাজগুলি প্রতিযোগিতায় হটে যেতে থাকে। ফলে খ্রীষ্টীয় তেরো শতক থেকে ভারতীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যে আবার মন্দা শুরু হল। ব্যবসায়িক যোগাযোগের সূত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বহু ভারতীয় বসতি স্থাপন করে। বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম ঐ অঞ্চলে বিস্তৃত হয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসারিত হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকে একদিকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যায় অপর দিকে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও প্রসার লক্ষ্য করা যায়। খ্রীষ্টীয় আট ও নয় শতকে বৌদ্ধধর্ম শুধুমাত্র পূর্বভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলা দেশের পালরাজারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পালরাজাদের পতনের পর ঐ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম অবলুপ্ত হয়। এছাড়া সহজ, সরল বৌদ্ধধর্মের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। বুদ্ধকে দেবতাজ্ঞানে পূজা শুরু হয় অনেক আগেই। এখন সেই পূজা ক্রমশ জটিল হতে লাগলো। বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করলো—কঠোর আত্মসংযম, জপতপ, যোগাভ্যাস গোপন আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা অতিপ্রাকৃত শক্তি অর্জনের চেষ্টা চলল। বহু হিন্দু যোগীসম্প্রদায়ের উদ্ভব হল যাদের মধ্যে গোরখনাথ প্রবর্তিত নাথ সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। এই যোগীরা অনেকেই নিম্নবর্ণের ছিলেন। তাঁরা বর্ণবিভাগ মানতেন না। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যই এই পথ খোলা ছিল। এইভাবে বৌদ্ধধর্মের একেবারে বিলুপ্তি ঘটল না। তবে তা ভিন্নরূপে প্রকাশ পেল এবং হিন্দুধর্মের কাছাকাছি চলে এল।

জৈনধর্ম পশ্চিম ভারতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। চালুক্য রাজারা জৈনধর্মের অনুরাগী ছিলেন। মালবের পারমার রাজারা জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতকে জৈনধর্মের কঠোরতা ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে জৈনধর্মের অবনতি ঘটে। হিন্দুধর্মের এই যুগে উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটে। শিব ও বিষ্ণুর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং এদের পূজাকে কেন্দ্র করে শৈব ও বৈষ্ণব আন্দোলন গড়ে ওঠে। পূর্ব ভারতে সৃষ্টির কারণ হিসাবে নারীশক্তির পূজা শুরু হয়। হিন্দুরা দুর্গা, সরস্বতী, কালী প্রভৃতি দেবীর এবং বৌদ্ধরা তারাদেবীর পূজা শুরু করলো। এই যুগে বহু উপজাতি হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে। তাদের দেবী ক্রমে শিব ও বিষ্ণুর সঙ্গিনীরূপে পূজিত হতে থাকলো। এই সাংস্কৃতিক আত্তীকরণে লোককাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের ভক্তিবাদ নামে ধর্মীয় আন্দোলন খুবই উল্লেখযোগ্য। আচারসর্বস্ব, প্রাণহীন অনুষ্ঠান ও কঠোর আত্মসংযমের পরিবর্তে ঈশ্বর ও পূজকের প্রেমের প্রাণময় বন্ধন—ভক্তিবাদের মূলকথা। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন নয়নার ও আলওয়ার নামে পরিচিত জনপ্রিয় সাধকরা। এঁরা জাতিভেদ মানতেন না। তাই এঁদের প্রদর্শিত ভক্তিপথ সকলকে আকর্ষণ করেছিল। খ্রীষ্টীয় বারো শতকে

লিঙ্গায়েত আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাসব ও তাঁর ভাগিনেয় চরবাসব। এঁরা ছিলেন শৈব। এঁরাও জাতিভেদ মানতেন না। তাছাড়া উপবাস, ভোজ, তীর্থযাত্রা ও পশুবলি তাঁরা বর্জন করতেন। সামাজিক ব্যাপারে তাঁরা বাল্য-বিবাহের বিরোধিতা করেন ও বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন। এইভাবে গণমুখী শক্তিশালী ধর্মীয় আন্দোলন ভক্তিবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।

পাশাপাশি গড়ে ওঠে একটি শক্তিশালী পুঁথিগত ও বুদ্ধিবাদী আন্দোলন। এঁর নেতা ছিলেন শঙ্করাচার্য। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় নবম শতকে তিনি কেরলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দর্শন 'অদ্বৈতবাদ' যা 'দ্বিতীয় রহিত মতবাদ' নামে বিখ্যাত। তাঁর মতে মুক্তির প্রধান উপায় হল, জ্ঞান এবং বেদই সত্য জ্ঞানের চরম উৎস। শঙ্করাচার্যের হিন্দুদর্শনের নূতন ব্যাখ্যা হিন্দুধর্মে শক্তি সঞ্চার করে এবং দক্ষিণ ভারত থেকে জৈনধর্ম নির্বাসিত হয়। কিন্তু বেদান্ত দর্শনের আবেদন কেবলমাত্র পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জনমানসে এর প্রভাব পড়েনি। এগারো শতকে বিখ্যাত পণ্ডিত রামানুজ বেদের ঐতিহ্যের সঙ্গে ভক্তিবাদের মিলন ঘটিয়ে ভক্তিবাদকে প্রবল আন্দোলনে পরিণত করেন। রামানুজের পর মাধবাচার্য, রামানন্দ, বল্লভাচার্য প্রমুখ দার্শনিকগণ তাঁর মতবাদ অনুসরণ করেন। এইভাবে এই যুগের শেষে ভক্তিবাদ হিন্দুসমাজে সকলের নিকট গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্বযুগের শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ কোনও পরিবর্তন এই যুগে হয়নি। ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ জনশিক্ষার প্রচলন হয় নি। গ্রামে গ্রাম্য পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ লেখাপড়া শেখাতেন। কোনো কোনো মন্দিরে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পাঠ্যবিষয় ছিল বেদ, বেদান্ত ও ব্যাকরণ। শিশুদের বর্ণমালার সঙ্গে কিছু কিছু গণিত শিক্ষা ও দেওয়া হত। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহ ছিল না। বৌদ্ধবিহার ও মঠগুলি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এই বিষয়ে নালন্দা, বিক্রমশীলা ওদন্তপুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীরও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই যুগের পণ্ডিতরা নূতন ধ্যানধারণা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা থেকে নিজেদের সযত্নে সরিয়ে রাখতেন। পুরাতন বিদ্যার পুনরাবৃত্তিতেই তারা ব্যস্ত ছিলেন। এই বিজ্ঞান-বিমুখতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ভারতের অনগ্রসরতার একটি মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এর জন্যে ভারতকে মূল্যও দিতে হয় প্রচুর।

শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে এই যুগ গৌরবময়। দাক্ষিণাত্যে পল্লব, চালুক্য ও চোল রাজত্বকালে ভারতীয় শিল্পের অভাবনীয় বিকাশ ঘটে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে।

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এই সাধারণ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রেখে এখন আমরা পাল-সেন, চালুক্য, পল্লব, রাষ্ট্রকূট চোল প্রভৃতি আমলে এই বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করতে পারি।

পাল-সেনযুগ : পাল ও সেন যুগের সাহিত্য গ্রন্থসমূহ বিশেষ করে সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' থেকে এই যুগের সামাজিক, অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া

যায়। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগে স্থলেমান নামে জনৈক আরব বণিক ভারতে আসেন। তার রচনা থেকেও পাল রাজত্বকাল সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তিব্বতী বিবরণ থেকেও পালরাজাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। এই সমস্ত বিবরণী থেকে জানা যায় যে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, পাল শাসনে বাংলাদেশে সমাজ, সাহিত্য সংস্কৃতি ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি হয়েছিল ঃ সেন রাজত্বকালে রাজনৈতিক প্রাধান্য কিছুটা হ্রাস পেলেও অন্যান্য উৎকর্ষ অব্যাহত ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' থেকে বাঙ্গালী জাতির সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার কথা জানা যায়। পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে অলংকার ব্যবহারের রীতি ছিল। বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা কপালে সিঁদুরের টিপ পরতেন। নারীজাতির স্থান ছিল উচ্চে। নারী জাতিকে সম্মান দেখানো বাঙ্গালী কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ছিল। বাঙ্গালীর খাদ্য এখনকার মতই ছিল। ভাত, ডাল, মাছ, মাংস- শাক-সজী, দুধ ও দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন বাঙ্গলার প্রধান খাদ্য ছিল। বাঙ্গালী সমাজ-জীবনে পূজাপার্বণ ও নানা অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য ছিল। এই সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত, বাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও পাশা, দাবা প্রভৃতি খেলার প্রচলন ছিল। পরিবহণের জন্য গরুর গাড়ি, ঘোড়া, হাতী, নৌকা প্রভৃতি ব্যবহৃত হত। সমাজে জাতিভেদ প্রচলিত ছিল। সেন যুগে বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। হিন্দুসমাজকে নূতনভাবে গঠন করার জন্য ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ—এই তিন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহার, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। জাতিগত পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। যাই হোক হিন্দুসমাজ এর ফলে আরো রক্ষণশীল হয়ে পড়ে।

গ্রাম ও নদীমাতৃক বাংলাদেশে কৃষিই ছিল অর্থ নৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি। জমির উর্বরতাহেতু বাংলাদেশ শস্যসম্পদে পূর্ণ ছিল। কৃষি ছাড়া শিল্প ও বাণিজ্যে সে যুগে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। সূক্ষ্ম কার্পাস ও সূতী বস্ত্র, গণ্ডারের শিং, টিন প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হত। তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম ছিল গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। এই বন্দরগুলি থেকে সমুদ্রপথে বণিকগণ সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, মালয়, সুমাত্রা ও চীনদেশে বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করতো। অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করলেও সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিরা শহরে বাস করতো। সম্পদশালী ও মনোরম শহরের অভাব ছিল না। 'রামচরিত' গ্রন্থে রাজধানী রামাবতীর বর্ণনা পাওয়া যায়। সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যে এই নগরী পূর্ণ ছিল।

পাল ও সেন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এই যুগে বাঙ্গালী মনীষার এক অপূর্ব বিকাশ ঘটে। পাল যুগে চর্যাপদ নামে বহু বৌদ্ধগান ও দোঁহা রচিত হয়। এই চর্যাপদগুলিই বাংলা ভাষার আদিরূপ। লুইপাদ, কাহ্নপাদ, চর্যাপদ রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'; গৌড় অভিনন্দের কাদম্বরী ও হলায়ুধের 'অভিধান রত্নমালা' এই যুগে রচিত হয়। চক্রপাণি দত্ত ছিলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদ

শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁর রচিত 'চিকিৎসা সংগ্রহ' উল্লেখযোগ্য। স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীকর, জীমূত বাহন, শ্রীধর ভট্ট এই যুগে জন্ম নেন। সেনরাজ বল্লাল সেন 'দান সাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব, পবনদূত রচয়িতা ধোয়ী, কবি উমাপতি ধর সেন রাজত্বকালে আবির্ভূত হন।

বৌদ্ধধর্ম পাল যুগের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ফলে ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে অবলুপ্ত হলেও পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্ম সগৌরবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে নানা পরিবর্তন আসে। এর মধ্যে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে। বুদ্ধ, ক্রমে হিন্দুদেবতা বিষ্ণুর অবতার রূপে স্বীকৃত হন। ব্রত, নিয়ম, জপ, মন্ত্র, হোম ইত্যাদি বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করে। অবশ্য সেন বংশের আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য বাংলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

পালরাজারা বৌদ্ধ শিক্ষা ও ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথম পালরাজা গোপাল ওদন্তপুরী বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। বিখ্যাত নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মপালের সময়ে পুনরুজ্জীবিত হয়। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার গ্রহণের জন্য দুইশত গ্রাম পৃথক রাখার ব্যবস্থা করেন। ধর্মপাল বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপন করেন এবং খ্যাতির দিক থেকে নালান্দার পরেই এর স্থান ছিল। মগধে গঙ্গাতীরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এই বিহার অবস্থিত ছিল। দেবপালের আমলে সোমপুরী বিহার নির্মিত হয়। এই বৌদ্ধবিহারগুলিতে বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হত। এইগুলি ক্রমে বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। সেই যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ এই শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিতে অধ্যাপনা করতেন। ভারত ও ভারতের বাইরে তিব্বত প্রভৃতি দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে সমবেত হতেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশীলা মহাবিহারে অধ্যাপনা করতেন।

পালযুগে তিব্বতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্ত রক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁরা এক নূতন ধরণের বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গেও পালরাজাদের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শক্তিশালী শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং বহুবার তাঁরা পাল রাজসভায় দূত পাঠান। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব দেবপালের নিকট নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের অনুমতি চান এবং ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করার অনুরোধ জানান। দেবপাল এই অনুরোধ রক্ষা করেন।

চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে পাল ও সেনযুগে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এই যুগের শিল্প নিদর্শনগুলি অধিকাংশ মুসলমান আক্রমণের সময়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তবুও যে সামান্য নিদর্শনগুলি থেকে গিয়েছে তার থেকে ঐ যুগের উন্নত শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। গোপাল নির্মিত ওদন্তপুরী বিহার স্থাপত্য শিল্পের এক সুন্দর নিদর্শন। পাল-যুগের বিখ্যাত শিল্পীদ্বয় ধীমান ও বীতপাল ও সেনযুগের শিল্পী শুলপাণির নাম উল্লেখযোগ্য। ধাতুমূর্তি নির্মাণেও এই যুগের শিল্পীরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

পালযুগের স্থাপত্য ও শিল্পরীতির অনুকরণে তিব্বতে ও সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধবিহার নির্মিত হয়েছিল। মৃৎশিল্প, পোড়ামাটির কাজ (টেরা কোটা) প্রভৃতি পাল যুগের অভিনব অবদান।







পোড়ামাটির নিদর্শন

দারুশিল্পের নিদর্শন

পাহাড়পুর প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির কাজে এবং অসংখ্য তৈজসপত্রে তার অপূর্ব নিদর্শন দেখা যায়।

চালুক্য যুগ ঃ এই যুগের সামাজিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তবে বাদামীর চালুক্যরাজারা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তাই মনে হয় সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল এবং সমাজ বর্ণবিভক্ত ছিল। চালুক্য রাজাদের সময়ে নানা বৈদিক ধর্মের অনুষ্ঠান ও যাগ-যজ্ঞাদির কথা জানা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই

সময়ে প্রচুর উন্নতি ঘটে। তার ফলে আর্থিক সমৃদ্ধি আসে। প্রায় দুই শতাব্দী কাল ধরে আরব সাগরের তীরবর্তী বন্দর সমূহে তাঁদের একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্-সাঙ্ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে এই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। তাঁর বিবরণী থেকে চালুক্য রাজ্যের শক্তি ও সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। কল্যাণের



ধ্যানমগ্ন শিবের ত্রিমূর্তি, এলিফ্যাণ্টা

চালুক্যরাজ জয়সিংহের রাজত্বকালে বসব নামে একজন ধর্ম প্রচারক 'লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়' নামে এক শৈব সম্প্রদায় গঠন করেন। এই সম্প্রদায় জাতিভেদ মানতেন না। তীর্থযাত্রা, পশুবলি, ভোজ, উপবাস তাঁরা বর্জন করতেন। সামাজিক ব্যাপারে তাঁরা বাল্যবিবাহের প্রসারে বিরোধিতা করেন এবং বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন।

চালুক্য আমলে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। হাতী গুহা ও অজন্তা গুহায় চালুক্য যুগের শিল্পোৎকর্ষের চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায়। চালুক্যরাজ মঙ্গলেশের সময়ে বাতাপী বা বাদামীর নিকট পাহাড় কেটে একটি বিরাট মণ্ডপযুক্ত মন্দির নির্মিত হয়।

চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে শিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নতি লক্ষ্যনীয়। রাষ্ট্র বিজ্ঞান, বিচার ব্যবস্থা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা, প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি পুস্তক রচনা করেন। চালুক্য রাজারা কানাড়ী ও তেলেগু— এই দুই আঞ্চলিক ভাষার উন্নতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এই সময়ে মহাভারতের তেলেগু সংস্করণের কাজ শুরু হয় এবং তা শেষ হয় খ্রীষ্টীয় তেরো শতকে।

রাষ্ট্রকূট যুগ ঃ রাষ্ট্রকূট আমলে সমাজে জৈনধর্মের প্রাধান্য থাকলেও শৈব ও বৈষ্ণবধর্মও শক্তিশালী ছিল। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে ইসলাম ধর্মও প্রচারিত হয়। মুসলমানরা এই রাজ্যে বসবাস করার এমনকি বন্দর সমূহে মসজিদ নির্মাণ করার অনুমতি পায়। এর থেকেই বোঝা যায় যে রাষ্ট্রকূট আমলে যথেষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করা হতো। রাষ্ট্রকূট রাজাদের উদার নীতির ফলে দেশের বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটে ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়। সমসাময়িক পর্যটক আল্ মাসুদি ও আরব বণিক সুলেমানের বিবরণী থেকে রাষ্ট্রকূট রাজাদের প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। ভৃগুকচ্ছ ছিল শ্রেষ্ঠ বন্দর। এই বংশের রাজারা শিল্প ও সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের রাজসভায় একদিন রাজশেখরের ন্যায় বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত আবার অপরদিকে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার পণ্ডিত ও কবিদের সমাবেশ হয়েছিল। রাষ্ট্রকূট রাজ অমোঘবর্ষ জীনসেন নামে জনৈক ভিক্ষুর নিকট জৈনধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় জীর্ণসেন 'পার্শ্ব-অভ্যুদয়' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। 'জয় ধাবল', 'রত্নমালিকা' প্রভৃতি দার্শনিক ও সাহিত্য গ্রন্থাদি এবং 'সার সংগ্রহ' নামে গণিতশাস্ত্রের একটি মূল্যবান গ্রন্থ এই যুগে রচিত হয়।

অমোঘবর্ষ নিজ রাজ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন এবং মালক্ষেত্র বা মালখেদ এ নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ পরমকৃষ্ণের নির্মিত ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির এই যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন।

চন্দেল্ল যুগ ঃ প্রতিহার শক্তির দুর্বলতার ফলে মধ্যভারতে যে কয়টি রাজশক্তির অভ্যুত্থান ঘটেছিল বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লগণ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। চন্দেল্লবংশের পূর্বতন নৃপতিগণ প্রতিহার রাজশক্তির অধীনে 'খর্জর বাহক' বা বর্তমান খজুরাহোতে রাজত্ব করতেন। তাঁদের রাজ্যের প্রাচীন নাম ছিল জেজাকভুক্তি। খজুরাহো, মহোবা এবং কালিঞ্জর ছিল এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান। কালিঞ্জরের সুরক্ষিত দুর্গই ছিল চন্দেল্লদের সামরিক শক্তির কেন্দ্রস্থল।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পর তিনজন শক্তিশালী রাজার সমরনীতির ফলে চন্দেল্লশক্তির চরম বিকাশ ঘটে। তাঁরা হলেন হর্ষদেব (৯০০-৯২৫ খ্রীঃ), যশোবর্মা এবং ধঙ্গ (আনুমানিক ৯৫৫-১০০০ খ্রীঃ)। শেষোক্ত রাজার রাজত্বকালে চন্দেল্ল রাজ্য উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ধঙ্গের রাজত্বের প্রথমাংশে গোয়ালিয়র, যমুনা নদী, কালিঞ্জর, জব্বলপুর জেলার উত্তরসীমা এবং ভিলসা ছিল চন্দেল্ল রাজ্যের প্রত্যন্তে অবস্থিত। কিন্তু ধঙ্গ শেষ পর্যন্ত গোয়ালিয়র রক্ষা করতে পারেননি। ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের আগেই কচ্ছপঘাত বংশীয় বজ্রদামন উহা অধিকার করে নেন। গজনীর সবুক্তগীন পরিচালিত মুসলিম অভিযানের বিরুদ্ধেও সম্মিলিত হিন্দু শক্তির অন্যতম ছিলেন ধঙ্গ।

ধঙ্গের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র গণ্ড (১০০৮-১৭ খ্রীঃ) পৈতৃক সাম্রাজ্যের উপর তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় ছিল। গণ্ডের পর বিদ্যাধর (১০১৭-২৯ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। জনৈক মুসলিম ঐতিহাসিক লিখেছেন যে বিদ্যাধরই ছিলেন সে

সময়ে ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সম্রাট। বিদ্যাধর কেবলমাত্র প্রতিবেশী পরমার এবং কলচুরি শক্তিকেই দমন করেননি গজনীর সুলতান মামুদেয় বিরুদ্ধেও তিনি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। বিদ্যাধরের মৃত্যুর পর কলচুরি এবং মুসলিম অভিযানের ফলে চন্দেল্ল শক্তির পতন শুরু হয়। খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কীর্তিবর্মা চেদীরাজ কর্ণদেবকে পরাজিত করে চন্দেল্লবংশের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপেও কীতিবর্মা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পরমর্দ্দি বা পরমাল চন্দেল্ল বংশের শেষ শক্তিশালী নরপতি। ১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজ চৌহান এবং ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবুদ্দিন আইবকের নিকট তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ফলে চন্দেল্ল শক্তির গৌরবও অস্তমিত হয়। স্থানীয় রাজশক্তিরূপে অবশ্য তাঁরা দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছিলেন।

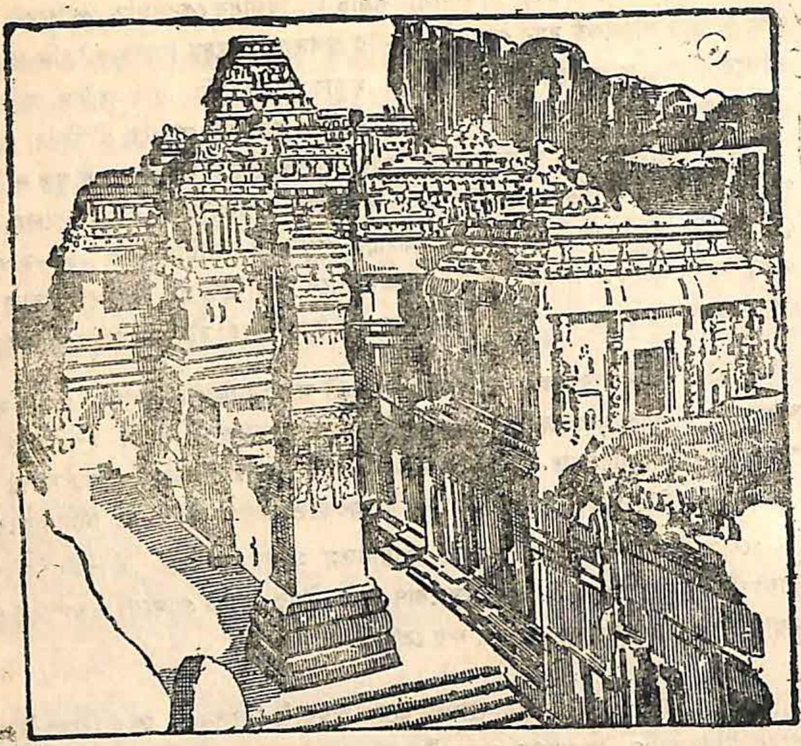
সংস্কৃতি, শিল্পকলার ক্ষেত্রে চন্দেল্লগণের যথেষ্ট অবদান ছিল। অনুপম ভাস্কর্য সমন্বিত খজুরাহের মন্দিরগুলি তাদের রাজত্বকালেই নির্মিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় দশম হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত খজুরাহোতে বহু মন্দির নির্মিত হয়। স্থানীয় বিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন একটি শিলালিপিতে উক্ত হয়েছে চন্দেল্লরাজ ধঙ্গ শিব মরকতেশ্বরের একটি মন্দির নির্মাণ করেন।

চন্দেল্লযুগের এই মন্দির নগরীর প্রাচীনতম মন্দির চতুঃষষ্টি যোগিনী নির্মিত হয় আনুমানিক নবম শতকে। উচ্চ চতুঃষ্কোণ মঞ্চের উপর একটি প্রাঙ্গণের চতুস্পার্শে রচিত হয়েছিল পরস্পর সংলগ্ন ক্ষুদ্রাকার মন্দির শ্রেণী।

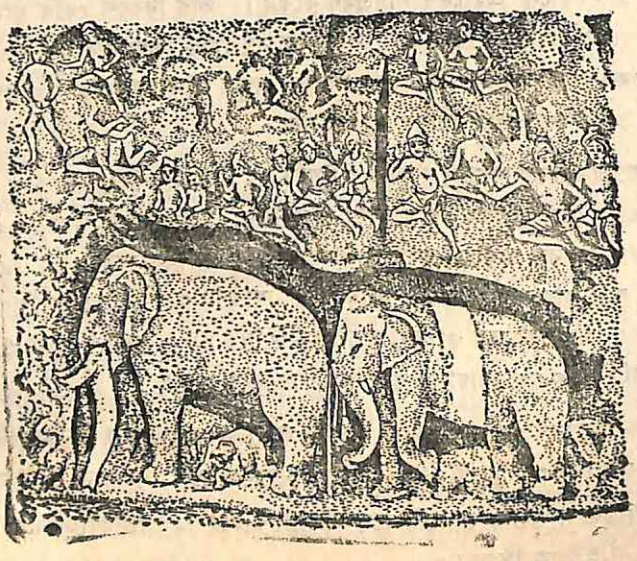
পল্লব যুগ ঃ পল্লব রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তবে বিষ্ণুর উপাসক, শিবের উপাসক ও জৈনধর্মের অনুরাগী রাজাও এই বংশে ছিলেন। পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতি পল্লব যুগে অনুসৃত হয়েছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ পল্লবরাজ নরসিংহ-বর্মনের রাজত্বকালে এই দেশ পরিভ্রমণ করেন। তাঁর বিবরণী থেকে জানা যায় যে পল্লব রাজ্যে অনেক বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং সেগুলিতে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন। তাঁর বিবরণী থেকে পল্লব রাজ্যের ভূমির উর্বরতা, শস্যের প্রাচুর্য ইত্যাদির কথা জানা যায়। কাঞ্চি নগরীর সুন্দর বর্ণনা তাঁর রচনায় পাওয়া যায়।

শিল্পক্ষেত্রে পল্লব আমলে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। কাঞ্চির ত্রিপুরান্তকেশ্বর ও ঐরাবতেশ্বর মন্দির এবং মহাবলীপুরম-এর মুক্তেশ্বর ও কাঞ্চির কৈলাসনাথের মন্দির পল্লব শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বড় বড় পাহাড় কেটে এই মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। এইগুলির নির্মাণ কৌশল, সূক্ষ্ম কারুকার্য আজও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহাবলীপুরম-এর 'সপ্তরথ' মন্দিরগুলি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত হয়। পল্লব স্থাপত্য ও শিল্প ভারতের শিল্পের ইতিহাসে এক মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

পল্লবরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ঘটে। কাঞ্চি ঐ সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিরাতার্জুনীয়ম প্রণেতা কবি ভারবি, সংস্কৃত পণ্ডিত দণ্ডিন এই যুগে জন্মগ্রহণ করেন। পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মা নিজেও একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন।



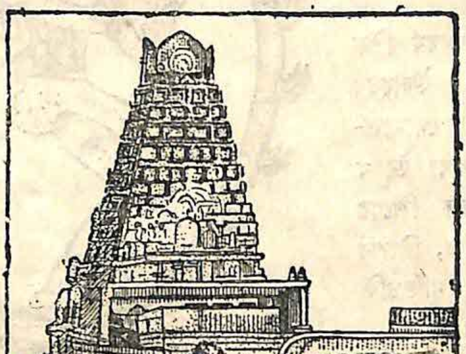
ইলোরার কৈলাস মন্দির



মহাবলীপুরমে পর্বতগাত্রে খোদিত ভাস্কর্য

চোলযুগ ঃ চোলযুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের অসাধারণ উন্নতি ঘটে। চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সংগে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠায় চোল সাম্রাজ্য ধনসম্পদে ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। চোলরাজারা তাঞ্জোর, গঙ্গইকোণ্ড, চোলপুরম, কাঞ্চী প্রভৃতি বড় বড় রাজধানী নির্মাণ করেন। ঐ সব নগরের ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য ও নগরবাসীদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার কথা জানা যায়। কয়েকটি বৃহৎ ব্যবসায়ীসংঘের কথা জানা যায় যারা জাভা বা যবদ্বীপ ও সুমাত্রার সংগে ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো। চোলযুগের শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। উর বা গ্রামীণ সাধারণ পরিষদ এবং মহাসভা বা ব্রাহ্মণ বয়স্ক পরিষদ গ্রামের শাসনকার্য পরিচালনা করতো। রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, চাষের জমিতে জল বিতরণ করা প্রভৃতি যাবতীয় দায়িত্ব তারা পালন করতো। এই যুগের সাহিত্যে চোলরাজা, তাঁদের মন্ত্রী ও ধনী ব্যবসায়ীদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের বিবরণ পাওয়া যায়।

চোল যুগে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্পের, বিশেষতঃ মন্দির শিল্পের চরম উন্নতি ঘটে। চোল শিল্পের বৈশিষ্ট্য-ই হল উহার বিশালতা। বড় বড় পাহাড় কেটে তা থেকে মন্দির



তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির

নির্মাণ ও নানাবিধ সূক্ষ্মকারুকার্য করা চোল শিল্পীদের শিল্পকৌশলের উৎকর্ষের চরম নিদর্শন। এই নূতন মন্দির-স্থাপত্য দ্রাবিড় শিল্পরীতি নামে পরিচিত। মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যের হল গোপুরম্। দেবমূর্তি যেখানে স্থাপিত হ'ত, তার উপরে থাকত একটি চূড়া কিন্তু প্রধান দেবগৃহ বা গর্ভগৃহটি হত সিংহদ্বার থেকে অনেক দূরে। গর্ভগৃহের সম্মুখে মণ্ডপ বা প্রশস্ত হলঘর এবং দেওয়াল ঘেরা আকাশ ছোঁয়া কারুকার্যময় তোরণদ্বার বা গোপুরম্—এই হল দ্রাবিড় মন্দির-শিল্প। মন্দিরগুলি ক্রমে ছোটখাট

নগরে পরিণত হয়। এখানে পুরোহিতদের বাসগৃহ, অতিথিশালা, যাত্রীনিবাস থাকতো। কোনো কোনো মন্দির অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। এমনকি মন্দিরগুলো থেকে টাকা ঋণ দিত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্যোগ নিত। সাধারণ লোকের কাছে মন্দির শুধুমাত্র পূজার্চনার স্থান ছিল না, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্র ছিল। এই রীতির সর্বোৎকৃষ্ট ও সুপরিকল্পিত মন্দির হল প্রথম রাজরাজ নির্মিত তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির। গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরমের মন্দিরও চোলযুগের মন্দির স্থাপত্যের আর একটি সুন্দর নিদর্শন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে আরও বহু মন্দির নির্মিত হয়।

চোলযুগের জলসেচ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। কাবেরী ও অন্য নদীগুলি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। সেচের জন্য বহু পুষ্করিণী খনন করা হয়। চোলনগরী গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরমে ছিল বহু পুষ্করিণী।

চোল আমলে ভাস্কর্য শিল্প ছিল উন্নতমানের। উদাহরণ স্বরূপ, শ্রবণবেলগোলায় গোমতেশ্বরের বিরাট মূর্তির কথা উল্লেখ করা যায়। নৃত্যরত শিবের বা নটরাজের মূর্তিগুলি, বিশেষ করে ব্রোঞ্জ-নির্মিত মূর্তিগুলি অতুলনীয় শিল্প সৃষ্টি।


নটরাজ মূর্তি

চোলযুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষাতেও সাহিত্যের উন্নতি ঘটে। তিরুমূরহি নামক গ্রন্থে শৈব ও বৈষ্ণব সাধুদের সব লেখা সংগৃহীত হয়। তামিল ধ্রুপদী সাহিত্যের অন্তর্গত কম্বনের রামায়ণ এই যুগে রচিত হয়। পুগালেণ্ডির 'নলবেম্ব' নল-দময়ন্তীর প্রেমকাহিনীর তামিল সংস্করণ। অন্যান্য বহু কবি রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে বহু কাব্য রচনা করেন ও এই দুই মহাকাব্যকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। এইভাবে চোলযুগে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক উপাদানেরও অসামান্য উন্নতি ঘটে।

উড়িষ্যা গঙ্গযুগ :

প্রাচীন যুগের ইতিহাসে উড়িষ্যাকে সাধারণতঃ কলিঙ্গ বলা হত। গুপ্তযুগের শেষভাগে কলিঙ্গদেশে গঙ্গ বংশীয় রাজাগণ রাজত্ব করতেন। মহানদী হতে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। কলিঙ্গ নামে একটি নগরও ছিল। গঙ্গ

বংশের একটি শাখা মহীশূর অঞ্চলে এবং অন্য একটি শাখা কলিঙ্গে রাজত্ব করত। মহীশূরের গঙ্গবংশকে কলিঙ্গের গঙ্গবংশীয়দের থেকে আলাদা দেখাবার জন্য এই বংশকে পশ্চিম গঙ্গ এবং কলিঙ্গের রাজাদের প্রাচ্য গঙ্গ নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইন্দ্রবর্মন ছিলেন প্রাচ্যগঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশ প্রায় চারশ' বছর রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চালুক্য ও চোল রাজ্য কর্তৃক কলিঙ্গ রাজ্য বারবার আক্রান্ত হয়েছিল। ১০৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বজ্রহস্ত অনন্ত বর্মন নামে এক শক্তিশালী রাজা চোড়গঙ্গ (১০৭৮-১১৪৭খ্রীঃ) ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি চোলরাজা এবং পাল রাজাকে পরাজিত করে গোদাবরী থেকে গঙ্গার তীর পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। তাঁর সময়েই পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন ধর্ম, শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। অনন্ত বর্মনের পরেই বাংলায় সেন রাজগণের সামরিক দক্ষতায় দক্ষিণ পশ্চিমগঙ্গ চোড় গঙ্গরাজগণের হস্তচ্যুত হয়। সেন বংশের রাজত্বে মুসলিম অভিযানে বিধ্বস্ত হলেও গঙ্গবংশ পূর্ব-দক্ষিণে মুসলমানদিগের অগ্রগতি অনেকদিন পর্যন্ত প্রতিরোধ করেছিলেন। চোড়গঙ্গের বংশধরগণের মধ্যে প্রথম নরসিংহ (১২৩৮-৬৪) ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। তাঁর সময়েই কোণারকের সূর্য মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল।

উড়িষ্যার স্বাধীন গঙ্গরাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী হয় পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির। মন্দিরই হল উড়িষ্যার বৈশিষ্ট্য। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হ'তে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মন্দির নির্মাণ উড়িষ্যাবাসীদের নেশায় পরিণত হয়েছিল। মন্দিরগুলো প্রধানতঃ ভুবনেশ্বর, পুরী, এবং কোণারককে কেন্দ্র ক'রে নির্মিত হয়েছিল এবং অধিকাংশ মন্দিরের গঠনশৈলী ছিল ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের অনুকরণে। একমাত্র ভুবনেশ্বরেই ছোট বড় পাঁচ শতাধিক মন্দির রয়েছে। মন্দিরগুলির অপূর্ব স্থাপত্য রীতি, অলঙ্করণ ও বাস্তব জীবনের চিত্র রূপায়ন দর্শকদের বিস্মিত করে। উড়িষ্যার মন্দিরশিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মারক কোণারক সূর্য মন্দির। সমগ্র মন্দিরটি যেন সূর্যরথের পরিকল্পনা।

এছাড়া রাজস্থানের রণকপুর ও আবু পাহাড়ের দীলওয়ারা মন্দিরের সূক্ষ্ম কারুকার্য শিল্প প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের বহু জৈন মন্দির ও স্তম্ভ তৈরী হয়েছিল। কর্ণাটকের গঙ্গরাজারা জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বহির্বিশ্বের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঃ

সুপ্রাচীন কাল হতেই ভারতবর্ষ বহির্জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাকৃতিক সীমারেখার মধ্যে কুপমণ্ডুকের জীবন যাপন করে নাই। হরপ্পা সভ্যতার আমল থেকেই ভারতের সাথে সম্পর্ক ছিল সুমের, ব্যাবিলন, মেসোপটেমিয়ার (টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী ভূভাগ)। পারসিকদের সাথেও যোগাযোগ হয়েছিল ভারতের। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে গ্রীকদের সাথেও ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সম্রাট অশোক ধর্ম প্রচারক পাঠিয়েছিলেন সিংহলে, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। মৌর্যযুগের পরে

মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিলেন বাহ্লীক, গ্রীক, শক, পহ্লব ও কুষাণরা। তাঁরাই ভারতের সামনে মধ্য এশিয়ার সিংহদরজা খুলে দিয়েছিলেন।

সুদূর অতীতকালেই ভারতের সঙ্গে মধ্য এশিয়া, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সূত্র ছিল ধর্ম, সংস্কৃতি ও বাণিজ্য। ভারতের বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও তিব্বত গ্রহণ করেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধর্মও প্রচারিত হয়েছিল। ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে ছিল বলেই বামন পুরাণে রয়েছে 'দ্বীপময় ভারত' কথাটি। ভারতীয় বণিকগণ এইসব দেশে বাণিজ্য উপলক্ষে যাতায়াত করত। ভারতীয় ধর্মপ্রচারক এবং ভারতীয় বণিকদের প্রভাবে মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে গড়ে উঠেছিল বৃহত্তর ভারত। বৃহত্তর ভারতে বিভিন্ন দেশে ভারতীয় ভাষা, লিপি, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছিল ভারতীয়দের বাজার ও বাসস্থান। আজও এইসব দেশে ভারতীয় শিল্পকলা, স্থাপত্য ভাস্কর্য ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্য এশিয়ার তাকলামাকান মরুভূমি খনন করে বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার, বৌদ্ধ, হিন্দুর দেবদেবী মূর্তি, ভারতীয় ভাষা ও লিপিতে লিখিত পুঁথি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অঞ্চল সম্পর্কে **প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্যার অরেলস্টেইন বলেন অঞ্চলটি দেখার সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি প্রাচীন ভারতেরই একটি নগরে ঘুরে বেড়া'চ্ছন।**

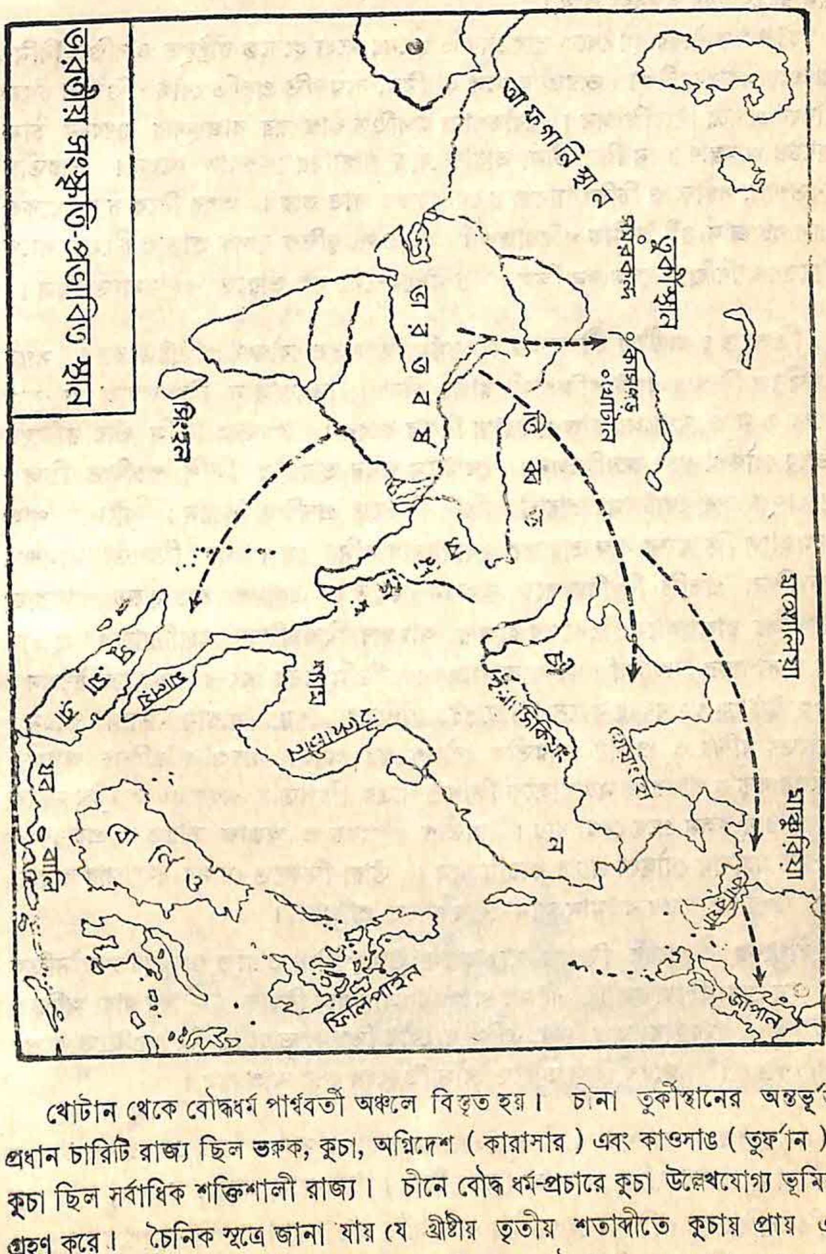
বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি স্থলপথ ও জলপথ এই দু' পথেই প্রসার লাভ করে। এই সূত্রে ভারতীয়রা দেশান্তরে গিয়ে বসবাস করেছেন। গড়ে উঠেছে ভারতীয় উপনিবেশ। সেখানে প্রসারিত হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতি।

স্থলপথ ঃ স্থলপথে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রধানতঃ মহাযান বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করে মধ্য এশিয়ায় প্রবেশ করে। মধ্য এশিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনে এবং চীন থেকে কোরিয়া হয়ে জাপানে প্রবেশ করে। মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিবরণ ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাঙ্ নামক চীনা ভ্রমণকারীগণ উল্লেখ করেছেন।

কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক ও ভারতীয় ধর্মপ্রচারকদের প্রভাবে মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতিগুলি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন। মধ্য এশিয়ার গান্ধার বিশেষ করে আফগানিস্তান, বমিয়ান, খোটান, কাশগড়, প্রভৃতি স্থান ছিল কণিষ্কের সাম্রাজ্যভূক্ত। বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল খোটান। পূর্ব তুর্কিস্তানের কুয়েনলুন পর্বতের উত্তরে এবং তাকলামাকান মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্তে ইহার অবস্থান। ভারতের বৌদ্ধ পণ্ডিত আর্য বিরোচন খোটানের রাজার শিক্ষাগুরু ছিলেন। খোটানীদের বিশ্বাস অনুসারে সম্রাট অশোকের পুত্র খোটানে এসেছিলেন এবং ভারতীয় রাজবংশ দীর্ঘকাল খোটানে রাজত্ব করেছিল। ২১১ খৃঃ পূর্বাব্দে সর্বপ্রথম খোটানে একটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়।

খোটান ঃ সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ ভারত থেকে পামির পর্বতমালা অতিক্রম করে কাশগড়, ইয়ারখন্দ ও খোটান হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে-ছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে তখন থেকে খোটানের সমৃদ্ধি বজায় ছিল

এবং সেখানে বহু বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিল। অনেক চীনাবৌদ্ধ শিক্ষালাভের জন্য খোটানে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তিনি খোটানের রাজা বিজিত সিংহের নাম উল্লেখ করেছেন।



খোটান থেকে বৌদ্ধধর্ম পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। চীনা তুর্কীস্থানের অন্তর্ভুক্ত প্রধান চারিটি রাজ্য ছিল ভরুক, কুচা, অগ্নিদেশ (কারাসার) এবং কাওসাঙ (তুর্ফান)। কুচা ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী রাজ্য। চীনে বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচারে কুচা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। চৈনিক সূত্রে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কুচায় প্রায় এক হাজার বৌদ্ধস্তূপ ও মন্দির ছিল। কুচার পণ্ডিতগণ বৌদ্ধশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ চীনভাষায়

অনুবাদ করেন। তুর্ফান রাজ্যের উইগুর তুর্কগণ একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত মোঙ্গল নায়ক চেংগিজ খানও বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন। আজও মধ্য এশিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান ও মঙ্গোলিয়ায় অগণিত নরনারী বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করে।

চীন ঃ কণিষ্কের যুগ থেকে ভারতবর্ষ ও চীনের মধ্যে হয়েছে রাষ্ট্রদূত ও পণ্ডিত বিনিময় এবং অবাধ বাণিজ্য। ভারতবর্ষ হতে ধর্মমিত্র, সংঘভূতি প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে গিয়েছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্মন চীন সম্রাটের আমন্ত্রণে চীনে গিয়ে চীনা ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্রাদির অনুবাদ করেন। ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, সঙ্গীত ও চিকিৎসাবিদ্যা চীনে সমাদর লাভ করে। অপর দিকে চীন থেকেও আসে বহু জ্ঞানীগুণী চৈনিক পরিব্রাজক। ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছাড়াও চীনের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। চীনা রেশমের বস্ত্র ভারতে খুবই সমাদৃত ছিল।

তিব্বত ঃ অতীশ দীপংকর ঃ দুর্গম তিব্বতেও বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বত একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। তৎকালীন তিব্বতরাজ স্রং-সাঙ গাম্পো চীন ও নেপালের রাজ-পরিবারে বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর রাণীদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। খোটানে তখন ভারতীয় লিপি প্রচলিত ছিল। স্রঙ-সাং গাম্পো খোটানের ভারতীয় লিপি তিব্বতে প্রচলিত করেন। বাংলায় পাল শাসনকালে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। বহু তিব্বতী নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। একাদশ শতাব্দীতে পালরাজ নয়াপালের রাজত্বকালে তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে বিক্রমশিলা মহাবিহারের মহাচার্য অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান তিব্বত যাত্রা করেন। তিনি তের বৎসর তিব্বতে ছিলেন। ১০৫৩ খ্রীস্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তিব্বতেই দীপংকর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিব্বতের মন্দির ও গুম্ফায় ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রের অমূল্য গ্রন্থগুলি রক্ষিত আছে। দীপংকর কর্তৃক পালরাজ নয়াপালকে লিখিত পত্রের তিব্বতীয় অনুবাদও তান্‌জুর নামক তিব্বতীয় সংকলন গ্রন্থে দেখা যায়। অতীশ দীপংকর ও অন্যান্য ভারতীয় প্রচারকগণ তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁরা তিব্বতে যে সব ধর্মসংস্কার করেন, তারই উপর তিব্বতের বর্তমান লামা-বৌদ্ধ ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত।

দীপংকর শ্রীজ্ঞানের তিব্বত যাত্রাকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এই সব অঞ্চল ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তুর্কীদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। ধর্মরক্ষার জন্য মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ভারতের বিহারগুলিতে আশ্রয় সন্ধান করেন। বঙ্গদেশ ছিল ভারতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শেষ আশ্রয়স্থল।

সমুদ্রপথ ঃ স্থলপথ ব্যতীত জলপথেও ভারতের সঙ্গে বাইরের দেশের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ইন্দোনেশিয়া, কম্বোজ (কম্বোডিয়া) ভিয়েৎনাম, মালয়, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমুদ্রপথে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। বৈদেশিক সূত্র, যেমন অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক কর্তৃক

লিখিত "পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান্ সী" গ্রন্থে অথবা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, জাতক কাহিনী, কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে "স্বর্ণভূমির"র উল্লেখ রয়েছে।

স্বর্ণভূমি ঃ অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় বণিকগণ স্বর্ণভূমি বা স্বর্ণদ্বীপের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। স্বর্ণভূমি যে বিশেষ কোন দেশ তা নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব অঞ্চলই প্রাচীন যুগে স্বর্ণভূমি বা স্বর্ণদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। ভারতীয় বণিকগণ এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে মশলা ও অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্য করত। বাণিজ্য থেকে প্রচুর লাভ হত বণিকদের। তাই তারা এই অঞ্চলের মাটিকে বলত সোনার মাটি বা স্বর্ণভূমি।

বসতিস্থাপন ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টোলেমি কর্তৃক রচিত ভূগোল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু বন্দরের নাম জানা যায়। নামগুলি ভারতীয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরগুলির ভারতীয় নাম প্রমাণ করে যে এই সময়ে বহু ভারতীয় বণিক স্বর্ণভূমি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। শুধু বণিকগণই নয়, প্রাচীন এবং মধ্যযুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় রাজবংশ রাজত্ব করত। এই অঞ্চলের উপর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব ছিল অপরিসীম। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশে সংস্কৃত পুঁথি ও অনুশাসন, বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ, বুদ্ধ এবং হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন ইত্যাদি পাওয়া গেছে। ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণের কাহিনী আজও অত্যন্ত জনপ্রিয়। সুকর্ণ, রত্না নামের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ইন্দোনেশিয়ার বিমান ভারতের পক্ষী দেবতা গরুড়ের নামাঙ্কিত।

যশোধরপুর বা অঙ্কোরঠোম ঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে কম্বোজে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কম্বোজ রাজ্যের প্রাধান্যের দিনে সমগ্র কম্বোডিয়া,



অঙ্কোরভাটের মন্দির

লাওস, কোচিন, চীন, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপের কিয়দংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কম্বোজরাজ সপ্তম জয়বর্মন আঙ্কোরঠোম (নগরথাম ?) নগর পুনঃ নির্মাণ করেন। অঙ্কোরঠোমের প্রাচীন নাম ছিল যশোধরপুর। নবম শতকে

যশোধরপুর প্রথম নির্মিত হয়। অঙ্কোরভাটের বিষ্ণুমন্দির কম্বোজ রাজবংশের একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। অঙ্কোরভাট মন্দির পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্পরূপে পরিগণিত হয়। কম্বোজরাজ জয়বর্মন দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিলেন। জয়বর্মন কর্তৃক নির্মিত অঙ্কোরঠোম নগর ছিল প্রাচীর-বেষ্টিত। প্রত্যেক দিকে নগরের প্রাচীর ছু'মাইল বিস্তৃত ছিল। নগরের কেন্দ্রে ছিল বেয়ন মন্দির। অঙ্কোরভাট মন্দির অঙ্কোরঠোম নগরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

কম্বোজ : কম্বোজ (বর্তমানের কাম্পুচিয়া) ছিল সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান। এখানকার শক্তিশালী রাজারা যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় জয়বর্মন, যশোবর্মন এবং দ্বিতীয় সূর্যবর্মন প্রভৃতি ছিলেন শক্তিশালী। তাঁরা ছিলেন শিবের পূজারী। সংস্কৃতে লেখা সে সময়ের (খ্রীষ্ট শতাব্দী থেকে) বহু শিলা ও ধাতুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।

চম্পা : কম্বোজের কাছেই অবস্থিত ছিল প্রাচীন হিন্দুরাজ্য চম্পা (বর্তমান দক্ষিণ ও উত্তর ভিয়েতনামের কিছু অংশ নিয়ে)। চম্পার রাজারাও ছিলেন শৈব এবং রাজভাষা রূপে সংস্কৃত স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এখানে ছিল বহু বৌদ্ধবিহার ও হিন্দুমন্দির। ভারতীয় বেদ এবং ধর্মশাস্ত্র চর্চার এক পীঠস্থানে রূপান্তরিত হয়েছিল চম্পা।

মালয় : গুপ্তযুগের শেষ দিকে মালয়ে ভারতীয়দের বসতি স্থাপনের কথা জানা যায়। পঞ্চম শতাব্দীর কয়েকটি অনুশাসন থেকে জানা যায় যে, ভারতীয়গণ মালয়ে রাজ্য স্থাপন করেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

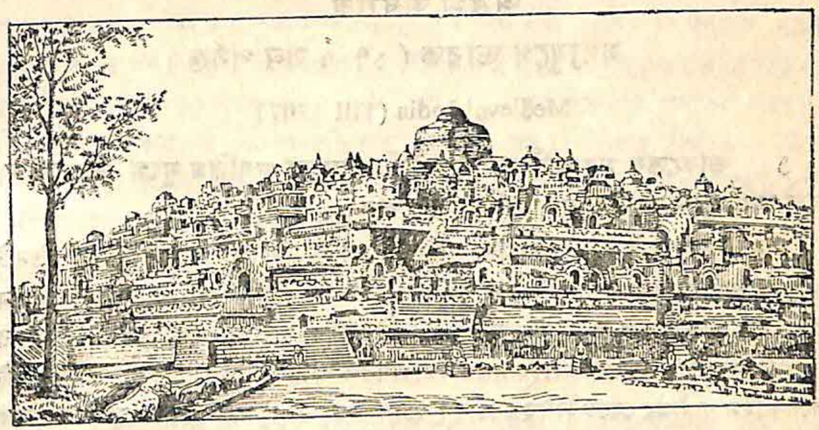
জাভা : খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জাভা, বালী, সুমাত্রা, বোর্ণিও, প্রভৃতি দ্বীপ এবং মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ বা জাভায় শৈলেন্দ্র বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। শৈলেন্দ্র বংশের শাসকগণ মহাযানী বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন। বাঙালী বৌদ্ধ কুমার ঘোষ জনৈক শৈলেন্দ্র বংশীয় মহারাজের গুরুর পদ অলংকৃত করেন। সে সময়ে বঙ্গদেশ ছিল মহাযান বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব নালন্দায় বিহার নির্মাণ করেন। তিনি বিহার পরিচালনার জন্য পালরাজা দেবপালের নিকট পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করেন। দেবপাল এই প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন।

শৈলেন্দ্ররাজগণ ভারত এবং চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। আরব বণিকদের বিবরণ থেকে শৈলেন্দ্র বংশের ঐশ্বর্যের কথা জানা যায়।

বরবুদুর : জাভার শৈলেন্দ্র বংশের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বরবুদুর স্তূপ নির্মাণ। ভারতের বাইরে কোথাও এত বড় স্তূপ দেখা যায় নি। বিশাল স্তূপটিতে বুদ্ধ ও বুদ্ধের জীবনের কাহিনী অবলম্বনে বহু মূর্তি খোদিত আছে। **বরবুদুরকে 'পৃথিবীর 'অষ্টম আশ্চর্য'** বলা হয়। বরবুদুর পাহাড়ের উপর নির্মিত। নীচ থেকে উপর পর্যন্ত নয়টি স্তর। সবার উপরে ঘণ্টাকৃতি স্তূপ।

একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত শৈলেন্দ্র বংশ সগৌরবে রাজত্ব করে। অতঃপর দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্র চোলের (১০১২-১০৪৪ খ্রীঃ) আক্রমণে শৈলেন্দ্র বংশের পতন আরম্ভ হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র রাজশক্তির অবসান হয়।

শৈলেন্দ্র বংশের পতনের পর বিজয় নামে রাজা পূর্ব যবদ্বীপে একটি হিন্দু রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজধানী ছিল তিক্তবিল্ব। তিক্তবিল্বের যবদ্বীপীয় নাম মজপহিত।



বরবুদুর স্তূপ

চতুর্দশ শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপ এবং ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপ মজপহিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে গিয়েছে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় শিল্পরীতি। সিংহলের স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পে আছে সুস্পষ্ট ভারতীয় ছাপ। অনুরাধাপুরের শিল্প কেন্দ্র যেন ভারতীয় শিল্পকেন্দ্রেরই একটি সংস্করণ। ব্রহ্ম, শ্যাম ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের মঠ মন্দিরই কেবল নয়, নদ-নদী ও মানুষের নামেও রয়েছে ভারতীয় প্রভাব।

প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করেছে। মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে শেষ দিকে ইসলামধর্মের জোয়ার আসার আগে পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মই ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হিন্দুশক্তিগুলি ইসলামের নিকট বিজিত হওয়ার পরও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। এইসব অঞ্চলের অধিবাসীরা উন্নততর সমন্বয়ধর্মী ভারতীয় সংস্কৃতির স্পর্শলাভ ক'রে তাদের জীবনধারা গড়ে তুলেছিলেন। তা বলে বৃহত্তর ভারতের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ কিন্তু তথাকথিত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভারত শোষণের পরিবর্তে সভ্যতার আলোকবর্তিকা নিয়ে সে সব অনগ্রসর দেশে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। ভারতের সঙ্গে এই সংযোগ ছিল মৈত্রী বা সৌহার্দের—শোষক ও শোষিত বা শাসক ও শাসিতের সংযোগ নয়। এই সৃষ্টিশীলতার অভিনব সুখ-স্মৃতিই আধুনিক ভারতকে করেছে ওদের বন্ধু। বর্তমান ভারতের সাংস্কৃতিক বন্ধুত্বের হাত মেলে দিয়ে কবিগুরু বলেছেন—

"এনেছি শুধু বীণা—
দেখতো চেয়ে আমারে তুমি
চিনিতে পার কিনা"

অষ্টম অধ্যায়

মধ্যযুগে ভারত (১৭০৭ সন পর্যন্ত)

Medieval India (Till 1707)

১। ভারতের মধ্যবর্তীকালের ইতিহাসকে মুসলিম যুগে ভারত না বলে 'মধ্যযুগে ভারত' বলা যুক্তিযুক্ত কেন ?

মানব সভ্যতার কাল বা সময়টিকে পণ্ডিতগণ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি পর্যায় বা স্তরে ভাগ করেছেন নিছক সুবিধার জন্য। প্রাচীন যুগ আমাদের বর্তমান কাল থেকে অনেক দূরে ও অনেক আগে। সেই সুদূর অতীত এবং বর্তমান কালের মধ্যবর্তী সময়টিকে আমরা মধ্যযুগ নামে আখ্যায়িত করে থাকি। কিন্তু কোন একটি বিশেষ দিন বা বছর থেকে ইতিহাসের যুগ সূচনা হয় না। কেবলমাত্র সুবিধার জন্যই বিশেষ ঘটনা কিম্বা বছরকে কোন যুগের সূচনা বলে অভিহিত করা হয় মাত্র।

আমাদের দেশে যুগ বিভাজনের কয়েকটি বিশেষ সমস্যা রয়েছে। প্রায়ই দেখা যায় ইতিহাসকে 'হিন্দু যুগ' 'মুসলিম যুগ', ইত্যাদি ভাগে ভাগ করতে। কিন্তু প্রশ্ন হল, যদি শাসকবর্গের ধর্ম দিয়েই যুগ নির্দেশ করা হয় তবে ইংরেজ শাসনের যুগকে 'খ্রীষ্টান যুগ' বলা হয় না কেন ? এই যুগটিকে তো বৃটিশ যুগই বলা হয়ে থাকে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে 'হিন্দু ইতিহাস' বলা যায় কি ? যে বিচিত্র ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রাচীন ভারতের জীবন গড়ে উঠেছিল তার যথার্থ স্বীকৃতির বদলে শুধু 'হিন্দু যুগ' কথাটি ব্যবহারের মধ্যে সংকীর্ণতা অনুপ্রবেশ করে। তেমনি ইসলামের ভারত প্রবেশের পর থেকে ভারতের সব কিছু পরিচয় কি মুসলিম কথাটির মধ্যে প্রকাশ পায় ? তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসকে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান্, ইংরেজ প্রভৃতি অধ্যায়ে ভাগ করার মধ্যে গলদ থেকে যায়। যেমন বলা যায় যে কোন কালেই ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করে নি। মুসলিম যুগে মধ্যভারত ও রাজস্থানের বহু অঞ্চল হিন্দু শাসনে ছিল। বস্তুতঃ হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এই ধরনের আখ্যায় যুগের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হয় না। যেমন প্রায়ই দেখা যায় মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী জয় থেকেই মধ্যযুগ হিসেব করা হয়। এক্ষেত্রেও কিন্তু লক্ষ্য রাখা হয় না যে, যেসব নিদর্শন দিয়ে মধ্যযুগকে চিনতে পারা যায় সেসব নিদর্শনের সূচনা হয়েছিল অনেক আগে থেকেই, যেমন সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব। তাই যুগ নিদর্শনের বিশ্লেষণ দিয়েই যুগের হিসেব করা কাম্য। কারণ যুগ-বৈশিষ্ট্য 'হিন্দু রাজার পক্ষে যেমন সত্য, মুসলমান রাজার পক্ষেও তেমনি সত্য। তাই রাজা হিন্দু ছিলেন কিম্বা মুসলমান ছিলেন সে বিচার চলে না। জায়গীর প্রথা যেমন সুলতানী শাসনকে ব্যতিব্যস্ত করেছে, হিন্দু রাজাদেরকেও তেমন করেছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে যুগ-বৈশিষ্ট্য দিয়েই যুগকে চিহ্নিত করা বাঞ্ছনীয়, ধর্ম বা সম্প্রদায় দিয়ে নয়।

২। সুলতানী যুগের ইতিহাস রচনার নানাবিধ উপাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—

ত্রয়োদশ শতকের একেবারে গোড়া হতে অর্থাৎ কুতুবউদ্দিনের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে (১২০৬ সন) ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পানিপথের যুদ্ধের (১৫২৬ সন) পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ইব্রাহিম লোদীর শাসন পর্যন্ত মধ্যযুগীয় ভারত ইতিহাসের কালকে সুলতানী যুগ বলা হয়। সুলতানী যুগের তুর্ক-আফগান শাসকেরা সরকারী দলিল পত্র রক্ষা করতেন এবং সভাপণ্ডিতদের ইতিহাস রচনায় উৎসাহ দিতেন। ফলে সুলতানী যুগের ঐতিহাসিক উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই উপাদানগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়। যথা—

(ক) **সরকারী দলিল পত্র ঃ** সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ফুতুহা-ই-ফিরোজ শাহী নামে এক আত্মচরিত রচনা করেন। এছাড়া তিনি কয়েকটি সংস্কৃত পুঁথি ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়ে দলাইল-ই-ফিরোজশাহী নামে প্রকাশ করেন।

(খ) **সমকালীন ঐতিহাসিকগণের রচনাসমূহ ঃ** মীন্হাজউদ্দিন সিরাজের তবকৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে মহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযান থেকে ১২৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত সুলতানী সাম্রাজ্যের এক ধারাবাহিক ইতিহাস সন্নিবিষ্ট আছে। হাসান নিজামী রচিত তাজ-উল্-মাসির-এ কুতুবউদ্দিন ও ইল্‌তুত্‌মিসের রাজত্বকালের প্রথম দিকের এক প্রামাণিক গ্রন্থরূপে গণ্য করা হয়। জিয়াউদ্দিন বরণীর তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী গ্রন্থে খলজী ও তুঘলক বংশের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়। এছাড়া রয়েছে শামস-ই-সিরাজ আফিফের তুঘলঘ বংশের উপরে লেখা তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থ। অপর এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক হলেন আমীর খসরু। তাঁর খাজাইন-উল্-ফুতুহ গ্রন্থটি খলজী ও তুঘলক রাজত্বের ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। সুলতানী যুগের অপর এক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ছিলেন ঈশামী, তাঁর রচিত 'ফুতুহ'-উস্-'সালাতিন' (রাজাদের বিজয়)। খলজী ও তুঘলক রাজত্বের অনেক মূল্যবান তথ্য এতে সন্নিবিষ্ট আছে।

(গ) **বিদেশী পর্যটকগণের বিবরণী ঃ** মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে মরক্কোর অধিবাসী ইবন বতুতা ভারতে আসেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী 'রাহেলা' হ'তে তুঘলক যুগের ইতিহাসের বহু তথ্যাদি পাওয়া যায়। এ-ছাড়া ইটালীর ভেনিসের অধিবাসী মার্কোপোলোর ভ্রমণ কাহিনী থেকে দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়।

(ঘ) **মুদ্রা ও স্থাপত্য নিদর্শন ঃ** সুলতানী যুগে মুদ্রা থেকে শাসকদের রাজত্বকাল, রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ধাতুশিল্পের উন্নতি সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়া মসজিদ, প্রাসাদ, ও ভাস্কর্যশৈলীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ রয়েছে কুতুবমিনার, আলাই দরওয়াজা প্রভৃতি এই যুগের শিল্পকলা ও সভ্যতার পরিচয় বহন করে।

(ঙ) আমীর খসরু রচিত 'খাজাইন-উল-ফুতুহ এবং মহম্মদ জায়সী রচিত পদ্মাবত্ নামক গ্রন্থ দুটিতে মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

৩। ইসলামের ভারত আগমন :

হজরত মহম্মদের দেওয়া নূতন আদর্শ নিয়ে আরবের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক নবীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেন এবং আরব জাতিকে নূতনভাবে উদ্দীপ্ত করেন। ধর্মীয় ঐক্য রাজনৈতিক শক্তিকে সুদৃঢ় করে ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হজরতের পরলোক গমনের পরে একশ বছরের মধ্যে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে স্পেনে ইসলাম ধর্ম ও আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেন মুসলমানগণের ধর্মগুরু ('খলিফা') অর্থাৎ হজরতের উত্তরাধিকারী। তিনি রাষ্ট্রেরও প্রধান আবার ধর্মেরও প্রধান। এমন জায়গায় আরব সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল যেখান থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যোগাযোগ হয়েছে সহজেই। উভয় সংস্কৃতি থেকে রস নিয়ে আরব সংস্কৃতি তখন জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, গণিতে, চিকিৎসায় এবং শিল্প স্থাপনে হয়ে উঠল পরিপুষ্ট।

সিন্ধুতে আরব অভিযান : আরব নৌশক্তি তখন খুবই প্রবল। মহম্মদের জন্মের আগে থেকেই আরবদের জাহাজ আসত ভারতে বাণিজ্য করতে। পরে বহু মুসলমান বণিক ভারতের পশ্চিম-উপকূলে ঘর বাঁধেন। তাঁরা অনেকেই ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করেন এবং ভারতীয়দের মধ্যে মহম্মদের ধর্মপ্রচারের চেষ্টাও করেন। ফলে অনেক ভারতীয় মুসলমান হন। মুসলমানগণ শান্তিপ্রিয় বণিকের মতই প্রথমে দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন, তখন কোন যুদ্ধ বা রক্তপাত কিছুই হয় নি। কিন্তু উত্তর ভারতে তাঁরা শান্তশিষ্টের মত আসেন নি। নৌশক্তির জোরেই ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে আরবেরা ভারতের সিন্ধু অঞ্চলে অভিযান করেন। তখনকার রাজা দাহির তাঁদের অভিযান প্রতিহত করতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। ভারতের মধ্যে আরও ঢুকবার জন্য আরবদের চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়। রাজস্থান অঞ্চলে প্রতিহার রাজারা তাদের প্রতিহত করতে ও রুখতে পেরেছিলেন। অবশ্য সিন্ধু অঞ্চলে আরব অধিকার আরও কিছুকাল টিকে ছিল।

রাজনৈতিক জয় পরাজয় বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয় নি। তবে আরবদের আগমনের ফলে ভারতের পশ্চিম সমুদ্রতীরে বড় বড় নৌবন্দর এবং ব্যবসায়ের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। আর আরব সংস্কৃতি এবং ইসলাম ধর্মের সাথে ভারতের পরিচয় হয়েছিল। আবার ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র হতে আরবগণ বিশেষ উপকৃত হয়েছিল।

৪। ভারতে মুসলমান শাসনের সূচনা :

মহম্মদ-বিন-কাশেমের পরবর্তী শাসকগণের মধ্যে জুনেইদ ভারতে আরব অধিকার বিস্তার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আরবদের মধ্যে শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের পরস্পর বিদ্বেষ, আরব শাসকবর্গের অসহিষ্ণু আচরণ এবং গুর্জর-প্রতিহার ও চালুক্যগণ কর্তৃক আরবদের বাধা দানের ফলে ভারতে আরব অধিকার ও শাসনের ভিত মজবুত হতে পারে নি। তাই ৩০০ বছর ধরে আরবদের সিন্ধু শাসনে ভারতের ভিতরে আর অগ্রসর হতে পারে নি। ক্রমে আরব অধিকার ক্ষীয়মান হয়ে ঘুর বংশীয় নেতা মহম্মদ

ঘোরীর আক্রমণে আরব শাসনের শেষ চিহ্নটুকুর অবসান ঘটে। ভারতে স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্যের সূচনা গজনীর সুলতানগণের ভারত অভিযানের সময় হতেই ধরা যেতে পারে।

চালুক্য ও গুর্জর প্রতিহারগণের প্রতিরোধে আরবগণ প্রতিহত হবার পর হতে গজনী রাজ্য কর্তৃক ভারত আক্রমণের অন্তর্বর্তীকালে ভারতবর্ষ কোন শক্তিশালী একচ্ছত্র সম্রাটের অধীন ছিল না। দশম শতাব্দীর শেষ দিকে আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনী হতে তুর্কী জাতীয় মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে থাকে। তাদের বারংবার আক্রমণের ফলে উত্তর পশ্চিম ভারতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন শাহীবংশের রাজগণের অধীন ছিল। আর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে গুর্জর, প্রতিহার, চালুক্য ও রাষ্ট্রকূটগণ রাজত্ব করতেন। আজমীর ও দিল্লী তখন ছিল চৌহান বংশের অধীন। মালবের পরমারগণ, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্লগণ, কনৌজের গাহড়বালগণ নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। এই রাজনৈতিক অনৈক্য উত্তর ভারতীয় রাজগণের দুর্বলতা ও পরে পরাজিত হবার অন্যতম কারণ হয়েছিল। সম্মিলিতভাবে বৈদেশিক আক্রমণ-কারীদের বাধাদানের প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করেন নি। ক্রমে ক্রমে বৈদেশিক আক্রমণকারীগণ রাজনৈতিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হবার সুযোগ লাভ করে। আবার উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দু রাজগণের যখন পতন হতে থাকে তখনও দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজগণ স্থানীয় স্বার্থ ও যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। ফলে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠার পর এক শতাব্দীর মধ্যেই দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজ্যগুলি মুসলমানদের অধীন হয়ে পড়ে। এবার আর আরব নয়, তুর্কি-আফগান অভিযান।

(সুলতান মামুদ ৯৯৮-১০৩০ খ্রীঃ)

৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে গজনীতে একটি শক্তিশালী রাজবংশ স্থাপন করেন আলপ্তগীন। ৯৭৭-৭৮ সনে পাঞ্জাব অঞ্চলের শাহী বংশের রাজা জয়পালের সাথে চলে ওখানকার সুলতান সবুক্তগীনের কয়েকবার সংঘর্ষ! কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় বিপদ এল একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এ সময় গজনীর সুলতান মামুদ ১৭ বার উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হানা দেন। শাহী রাজ্য ছাড়া সৌরাষ্ট্র, থানেশ্বর, কনৌজ, মথুরা পর্যন্তও তার অভিযানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য অভিযান ছিল গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন। কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও ধনরত্ন নিয়ে যান গজনীতে। এখানে স্থায়িভাবে রাজ্য না গড়ে ভারতের সম্পদ নিয়ে মামুদ সাজিয়ে তোলেন নিজের গজনীকে। তাঁর সভাতেই ছিলেন কবি ফিরদৌসী, ভ্রমণকারী অল্‌বিরুণী, ঐতিহাসিক উৎবী, দার্শনিক ফরাবী।

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের ফলাফল :—সুলতান মামুদের ভারত অভিযানগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন এবং তা' করতে গিয়ে তিনি

নির্বিচারে হত্যা করেছেন ভারতীয়দের এবং দেবমন্দিরও ধ্বংস করেছেন। ভারতে গজনীর সাম্রাজ্যবিস্তার তাঁর অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল না। যদিও পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে অভিযানের ফলে সেখানকার অধিকাংশ স্থানে তুর্কি আধিপত্য বিস্তারলাভ করে। এদিক থেকে তিনি ভারত আক্রমণের যে দরজা খুলে দিয়ে গেলেন সেই পথেই হয়েছিল পরবর্তী সময়ে মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ। এছাড়া মামুদের পুনঃ পুনঃ অভিযান এবং প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন লুণ্ঠন উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করে দেয় এবং বারবার আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে উত্তর ভারতে সামরিক শক্তিও হ্রাস পায়। পরবর্তীকালে মুসলমান অভিযানের সাফল্যের পথে ইহা সহায়ক হয়। সর্বশেষে মামুদের হিন্দুধর্ম বিরোধী আচরণের ফলে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রচারে ও প্রসারে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতা সম্পর্কে অল্ বিরুণীর অভিমত : অল্ বিরুণী ছিলেন সুলতান মামুদের সভায় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী খ্যাতিমান পণ্ডিত। অল্ বিরুণী (৯৭০-১০৪৮ খ্রীঃ) সুলতান মামুদের সহিত ভারতে এসেছিলেন। তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ভারতে কিছুদিন অবস্থান করে তিনি হিন্দু দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় এবং কয়েকটি আরবী গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁর পুস্তক 'তহকিক্-ই-হিন্দ' হতে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক বহু তথ্য জানা যায়। সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থার এক মনোজ্ঞ বিবরণ এর থেকে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন হিন্দুদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দুগণ নানাবিধ মূর্তির উপাসনা করতেন। দেবমন্দিরগুলিতে প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চিত থাকত। জাতিভেদ প্রথা কঠোরভাবে প্রচলিত থাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ছিল না। সে সময়কার বিচার-ব্যবস্থা ছিল উদার। গুরুতর অপরাধ করলেও ব্রাহ্মণদের প্রাণদণ্ড হত না। অপহৃত সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তিভোগ করতে হত। কোন কোন অপরাধে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সকলকে উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজকর হিসেবে দিতে হত।

তিনি ভারত বিষয়ক বর্ণনায় ভারতীয় পণ্ডিতদের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের বিদ্যার একমুখীনতা ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলেছেন। তিনি নিজে অবশ্য ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতীয় পণ্ডিতরা ছিলেন উদ্ধত, দাম্ভিক, নির্বোধ, আত্মাভিমানী ও অবিচলিত। তাঁদের স্বভাব হলো যে তাঁদের অর্জিত জ্ঞান সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইতেন না। বিদেশীদের তো দূরের কথা নিজের দেশের ভিন্ন জাতির লোকেরা যাতে তাঁদের জ্ঞানের বিন্দুমাত্র অবগত হতে না

পারে সে বিষয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা খুব সতর্ক ছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে তাঁরা ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্ট জীবের বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ছিল না।"

জ্ঞানকে সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা এবং নানা ধ্যান-ধারণাকে একেবারে আমল না দেওয়া—ভারতীয়দের এই যে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, তা আমাদের অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ, একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

৫। অভিযান থেকে সাম্রাজ্য গঠন :

গজনীর সুলতান মামুদের উপর্যুপরি ভারত আক্রমণের ঘটনা থেকে ভারতীয় রাজা মহারাজাদের যে শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। তারা আগের মতই আবার পরস্পর ঝগড়া বিবাদে মত্ত হলেন। দেশ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। এই সময় অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে গজনীর এক নতুন ঘোর বংশীয় সুলতান মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন।

ঘোর বংশ : মহম্মদ ঘোরী (১১৭৫-১২০৬ খ্রীঃ) : আফগানিস্থানের হিরাট ও গজনীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঘোর নামে একটি রাজ্য ছিল। গজনীর সুলতান মামুদ এই রাজ্য জয় করেন। কিন্তু মামুদের মৃত্যুর পর ঘোর বংশীয় গিয়াসুদ্দিন ও তার ভাই মুইজুদ্দিন মোহম্মদ ঘোরী গজনী পুনরাধিকার করেন। মোহম্মদ ঘোরীর নাম হল **মুইজুদ্দিন মহম্মদ-বিন-সাম**। প্রথম দিকে মুইজুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি। তিনি সুলতান মামুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারত-বিজয়ের জন্য উদ্যোগী হন। ভারত-বিজয়ই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা।

তখন আফগানিস্থান থেকে ভারতে আসার দুটো পথ ছিল। এক মুলতানের পথে, দ্বিতীয় পঞ্জাব হয়ে। মহম্মদ ঘোরী প্রথম ভারত অভিযানে আসেন মুলতানের পথে।

১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুলতান আক্রমণ করে সেখানকার আরব শাসনের অবসান ঘটান। এই অভিযানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পর বৎসর তিনি উচ্ দুর্গটি অধিকার করেন। কিন্তু গুজরাট আক্রমণের সময় তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় ভীমের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এই পরাজয়েও মহম্মদ ঘোরী একটুও দমলেন না। পর বৎসর তিনি পেশোয়ার জয় করেন এবং সুলতান মামুদের বংশধরের কাছ থেকে লাহোর অধিকার করেন। অতঃপর উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দিল্লী ও আজমীরের চৌহান বংশীয় নৃপতি পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধে। কনৌজরাজ জয়চন্দ্রের সঙ্গে পৃথ্বীরাজের পূর্ব বিরোধ থাকায় প্রথম তরাইনের যুদ্ধের সময় জয়চন্দ্র নিরপেক্ষ ছিলেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী পরাজিত ও আহত হন এবং পৃথ্বীরাজ জয়লাভ করেন। কিন্তু পর বৎসর তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর কাছে পরাজিত ও নিহত হন (১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে)। অতঃপর ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে কনৌজ অধিকার করেন।

মহম্মদ ঘোরীর কৃতিত্ব : ভারতে মুসলমান প্রভুত্ব স্থায়িভাবে স্থাপনের ব্যাপারে মহম্মদ ঘোরীর কৃতিত্ব ও অবদান বড় কম নয়। তিনি অসামান্য সাহস ও বাহুবলে ক্ষুদ্র ঘোর রাজ্যকে আফগানিস্তান থেকে সুদূর বাংলাদেশ পর্যন্ত এক সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তিনি সুলতান মামুদের মত ধনরত্ন লুণ্ঠনের আশায় ভারত আক্রমণ করেননি স্থায়ী রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। জাতিভেদ আর আত্মকলহে ভারতীয় হিন্দুরাজারা অনৈক্যের দুর্বলতায় যে কত হীনবল, মহম্মদ ঘোরী তা টের পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যের ক্ষিপ্রতা ও অসিচালনার সামনে হিন্দু পদাতিক সেনাদের সাবেকী কায়দায় যুদ্ধ প্রণালী অচল। এই সব দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি সহজেই ভারতের মাটিতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন যেমন একজন দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক সেনাপতি, তেমনি দূরদর্শী শাসক ও সংগঠক। যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকলেও, তিনি কবি ফকরুদ্দিন ও নিজামি উরজির সমাদর করতেন। তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ভারতের ইতিহাসে তাঁর নাম স্মরণীয়।

কুতুবউদ্দীন আইবক (১২০৬-১০ খ্রীঃ) **:** মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁর ক্রীতদাস ও পরে সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবক দিল্লীতে তুর্কী শাসনের পত্তন করেন। তাঁর স্থাপিত রাজবংশ **দাসবংশ** নামে অভিহিত। এই বংশের তিনজন প্রধান সুলতান—যথাক্রমে কুতুবউদ্দিন, ইলতুৎমিস ও গিয়াসুদ্দিন—প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। এই কারণে দিল্লীর তুর্কী রাজবংশ ইতিহাসে দাসবংশ নামে খ্যাত।

কুতবউদ্দিন কর্তৃক দিল্লীতে সুলতানী প্রতিষ্ঠা : কুতুবউদ্দিন প্রথম কয়েক বছর মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধিরূপেই রাজ্য শাসন করেন। তারপর (১২০৬ খ্রীঃ) তিনি দিল্লীতে সুলতান হন। তিনি এবং তার পরবর্তী কয়েকজন সুলতান প্রথম জীবনে ছিলেন ক্রীতদাস। সেইজন্য এই রাজবংশকে দাসবংশ বলা হয়। অতীত জীবনে যাই থাকুক না কেন, এঁরা কিন্তু নিজেদের দক্ষতার গুণেই হয়েছিলেন সুলতান।

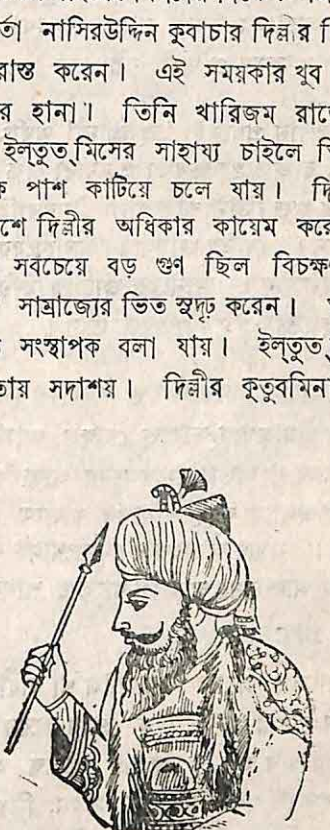
কুতুবউদ্দিন মাত্র চার বছর (১২০৬-১২১০ খ্রীঃ) রাজত্ব করেছিলেন। ভারতে তুর্কী সুলতানী রাজ্য বিস্তারে কুতুবউদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর ও গুজরাট জয় করেন। বক্তিয়ার খলজী নামে তাঁর এক অনুচর ১২০৫ খ্রীঃ লক্ষ্মণসেনকে পরাস্ত করে বাংলা জয় করেন। বাংলার রাজধানী নদীয়ার রাজা তখন লক্ষ্মণসেন। তিনি পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান। কুতুবুদ্দিনের চরিত্রে দয়া ও নিষ্ঠুরতার বিচিত্র সমাবেশ ছিল। দিল্লীর কুতুবমিনারের কাজ তিনি আরম্ভ করেন। কুতুবউদ্দিনের

মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে দলাদলিতে এক পক্ষের সাহায্য নিয়ে কুতুবউদ্দিনের জামাতা ইল্‌তুত্‌মিস সুলতান হলেন ১২১১ খ্রীঃ।

ইলতুত্‌মিস (১২১১-৩৬খ্রীঃ অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বিপদ ঃ ইল্‌তুত্‌মিস প্রথমেই অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করলেন। দিল্লী, বদাউনী, অযোধ্যা, বারাণসীতে তাঁর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। তারপর তিনি মন দিলেন বাইরের বিপদের দিকে। গজনীর সুলতান তাজউদ্দিন ইলতুজ ও পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচার দিল্লীর দিকে লোভাতুর দৃষ্টির প্রতিকারে উভয়কেই তিনি পরাস্ত করেন। এই সময়কার খুব বড় ঘটনা হ'ল ভারতে মঙ্গল বিজেতা চেঙ্গিস খানের হানা। তিনি খারিজম রাজ্যের শাহ্‌-এর পিছু নিয়ে পাঞ্জাবে ঢুকে পড়েন। শাহ্‌ ইল্‌তুত্‌মিসের সাহায্য চাইলে তিনি তা দেননি। ফলে চেঙ্গিসের অভিযান ভারতকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। দিল্লীর সুলতানী বিপদমুক্ত হয়। এরপর তিনি বাংলাদেশে দিল্লীর অধিকার কায়েম করেন। রাজপুতানায়ও তাঁর প্রভাব প্রসারিত হয়। তাঁর সবচেয়ে বড় গুন ছিল বিচক্ষণতা এবং দূরদৃষ্টি। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে সুলতানী সাম্রাজ্যের ভিত সুদৃঢ় করেন। তাই ইলতুত্‌মিসকে উত্তর ভারতে তুর্কীবিজয়ের প্রকৃত সংস্থাপক বলা যায়। ইল্‌তুত্‌মিস ছিলেন জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষক এবং দানশীলতায় সদাশয়। দিল্লীর কুতুবমিনারের নির্মাণকার্য তাঁর সময়েই শেষ হয়।

শেষ বয়সে ছেলেদের অযোগ্যতায় চিন্তিত হয়ে তিনি কন্যা রাজিয়াকে সিংহাসনের জন্য মনোনীত করে যান। কিন্তু সমাজে তখন মেয়েদের কর্তৃত্ব মানতে অনেকে রাজী ছিলেন না।

রাজিয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও রক্ষণশীল আমীর এবং মোল্লাদের ষড়যন্ত্রে তাঁকে সিংহাসন ও প্রাণ—দুইই দিতে হয় (১২৪০ খ্রীঃ)।


গিয়াসুদ্দিন বলবন

গিয়াসুদ্দিন বলবন ঃ (১২৩৭-৮৭খ্রীঃ) রাজতন্ত্রের সঙ্গে তুর্কী প্রধানদের বিরোধের মধ্যে উলুগ খাঁ নামে এক তুর্কীপ্রধান রাজ্যের সকল ক্ষমতা ধীরে ধীরে করায়ত্ত করে শেষ পর্যন্ত ১২৬৫ খ্রীঃ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসে তিনি গিয়াসুদ্দিন বলবন নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের পর দিল্লীর সুলতানীতে এক সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় শাসনের যুগ শুরু হয়।

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও সামরিক সংস্কার ঃ সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে ভাল মানুষ ইলতুতমিসের এক ছেলে নাসিরউদ্দিন মামুদের সুলতানী চালাবার

সময় আমীর হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা রাজতন্ত্রের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে। ইলতুতমিসের আমল থেকে ৪০ জন আমীরের একটা চক্র রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করেছিল। তারাই ষড়যন্ত্র করে সুলতান অদল-বদল করতেন। এই তুর্কী অভিজাতদের কখনও কখনও বলা হত "চল্লিশ চক্র" বা 'চহলগানী'। বলবন যখন উলুগ খাঁ ছিলেন তখন তিনিও ছিলেন এই চল্লিশ দাস চক্রের একজন। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে তাই তিনি তিনটি নীতি গ্রহণ করলেন—(ক) রাজ্যের সঠিক কর্তৃত্ব এবং সুলতানের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা; (খ) শাসনব্যবস্থা নূতন করে সাজানো এবং (গ) মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করা।

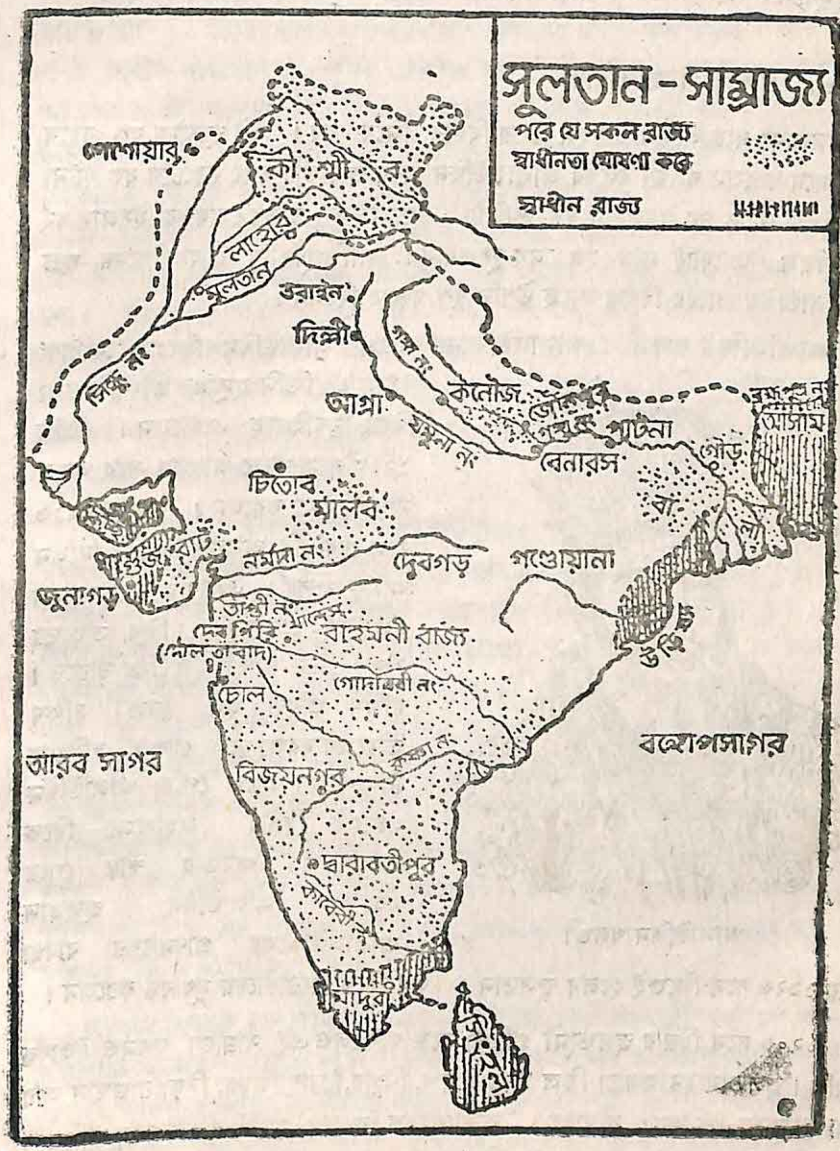
বলবান প্রথমেই 'চহলগানী' অর্থাৎ তুর্কী অভিজাতদের ক্ষমতা চূর্ণ, অভ্যন্তরীণ বিপদ, রাজতন্ত্রের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে এবং মোঙ্গলদের বাধা দিতে সফলকাম হওয়ার জন্য তিনি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী (পদাতিক এবং অশ্বারোহী) নূতন করে গড়লেন। বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহীদের তিনি দমন করলেন। আমীরদের ক্ষমতা কেড়ে নিলেন। অনেকের জায়গীর ফিরিয়ে নিলেন। বুঝিয়ে দিলেন রাষ্ট্র সবার উপরে এবং সুলতান-ই সব ক্ষমতার উৎস।

মোঙ্গল আক্রমণ ও বাংলায় বিদ্রোহ দমন: বলবনের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথে ভারতে মোঙ্গল আক্রমণ আরম্ভ হয়। বলবান তাঁর সেনাপতি ও দুই পুত্রের সহায়তায় মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তিনি অভ্যন্তরীণ বিপদ বা বিশৃঙ্খলাকে কড়া শাসনের মাধ্যমে প্রতিকার করে সীমান্তে বিপদের মোকাবিলা করেন। কারণ অভ্যন্তরীণ গোলযোগই বাইরের শত্রুকে হাতছানি দেয়। এই সময়েই মোঙ্গল আক্রমণের সুযোগে বাংলার শাসনকর্তা তুঘরিল খাঁ বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

বাংলার শাসনকর্তা তুঘরিল খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তাঁকে দমন করবার জন্য বলবন দু'বার সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু দু'বারই সুলতানী সেনাদল পরাজিত হলে, বলবন স্বয়ং তুঘরিলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। সে যুদ্ধে পরাজিত তুঘরিল খাঁ প্রাণ রক্ষার্থে পলায়নের চেষ্টা করেন, কিন্তু সুলতানের সেনাবাহিনীর হস্তে নিহত হন। অতঃপর বলবন নিষ্ঠুরভাবে তুঘরিল খাঁর অনুগতদের হত্যা করেন। এইরূপে বাংলার বিদ্রোহ দমন করে বলবন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁকে বাংলার শাসক নিযুক্ত করেন।

সুলতানী সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়করণ: তুর্কী সুলতানগণের মধ্যে কৃতিত্বের দিক থেকে বলবানকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। দিল্লীর সুলতানীর ভিতরে ও বাইরে সেই বিপদাবস্থায় বলবনের মত দৃঢ়চেতা সুলতান না হলে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং মোঙ্গল আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। তিনি স্বেচ্ছাচারী আমীর-গণকে দমন করে সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দৃঢ় করেন। ডাঃ আর. পি. ত্রিপাঠীর মতে,

তিনি রাজকীয় ক্ষমতার সাথে রাজকীয় দায়িত্ববোধের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। মৌলিক কোন শাসন সংস্কার তিনি করতে পারেন নি সত্য, প্রজাহিতকর কাজও তেমন করতে



পারেন নি। কিন্তু রাজ্যের স্থায়িত্ব এনে এবং সুলতানের মর্যাদা বাড়িয়ে পরবর্তীকালে আলাউদ্দিন খিলজীর পথপ্রদর্শকরূপে পূর্বসূরীর ভূমিকা পালন করেন। তিনি

বিদ্বান ও জ্ঞানীগুণীর সমাদর করতেন। মিন হাজউদ্দিনের মত ঐতিহাসিক, আমীর খসরুর মত কবি এবং নিজামীর মত সুলেখকের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময়ে দিল্লী মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়।

৬। খলজী সাম্রাজ্যবাদ

বলবনের পরে আবার শুরু হল উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব। এই সুযোগে বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে বসলেন খলজী বংশের জালালউদ্দিন ফিরোজ। তাঁর সময় সবচেয়ে বড় ঘটনা হল দিল্লীর কাছে নব মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা। পরাজিত যে সব মোঙ্গলরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল, তাদেরই নাম হল নব-মুসলমান। শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপনের জন্য জালালাউদ্দিন তাদের দিল্লীর কাছে উপনিবেশ গড়তে দিলেন।

আলাউদ্দিন খলজী : জালালউদ্দিনের ভাইপো আলাউদ্দিন ছিলেন 'কোরার' শাসক। তিনি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহে এগোলেন। তিনি ১২৯৩ সনে মালব আক্রমণ করে অজস্র সম্পদ সংগ্রহ করলেন। তারপর ১২৯৬ সনে দেবগিরি আক্রমণ করে আনলেন অনেক সম্পদ। এইসব অভিযানের ফল হল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ ভারতের সম্পদ টেনে দেওয়া হল উত্তর ভারতে। দক্ষিণ ভারত হল দুর্বল। দক্ষিণ ভারতের দরজা খুলে গেল। দক্ষিণের টাকা-পয়সা হাতে পেয়ে আলাউদ্দিন সহজেই দিল্লীর সিংহাসনের দিকে তাকালেন। ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে যুবরাজ আলাউদ্দিন সুলতান জালালউদ্দিনের প্রাণনাশের ব্যবস্থা করে ১২৯৬ সনে নিজেই হলেন সুলতান। অর্থ দিয়ে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করলেন।



আলাউদ্দিন খলজী

১২০৬ সনে দিল্লীর সুলতানী প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকলেও এই সাম্রাজ্য তখনও ঐক্যবদ্ধ হয়নি। সুলতানদের ক্ষমতা ছিল উত্তর প্রদেশ, বিহার, গোয়ালিয়র, সিন্ধু, রাজস্থান আর মধ্য ভারতের এক অংশে সীমাবদ্ধ। বাঙ্গালাদেশ সুযোগ পেলেই স্বাধীন হয়ে যাচ্ছিল। প্রাদেশিক শাসকরা ছিলেন প্রায় স্বাধীন। অনেক স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। মোঙ্গলরাও অনবরত হানা দিচ্ছিল।

তাঁর সিংহাসন দখলের পদ্ধতি যতই মন্দ হোক, আলাউদ্দিন খলজী এইসব বিষয়েই

দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন। তিনি উত্তর ভারতে সুলতানীকে নিষ্কণ্টক করেছিলেন, মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। দক্ষিণ ভারতে অভিযান করে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়েছিলেন। শাসন সংস্কারও করেছিলেন।

আলাউদ্দিনের অধীনে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা : আলাউদ্দিন খলজী ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। তিনি আলেকজাণ্ডারের ন্যায় দিগ্বিজয় নীতি গ্রহণ করেন। তাই তিনি সমগ্র ভারতে সার্বভৌম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধাভিযান শুরু করেন। সিংহাসনে আরোহণ করেই আলাউদ্দিন যে সব সামরিক অভিযান চালনা করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ১২৯৭ সালে গুজরাটের বিরুদ্ধে, তারপর রণথম্বরের বিরুদ্ধে (১৩০১ খ্রীঃ), চিতোরের বিরুদ্ধে (১৩০৩ খ্রীঃ) এবং মালবের বিরুদ্ধে (১৩০৫ সনে)। এরপর তিনি মাণ্ডু, ধার ও চাকন্দরী প্রভৃতি রাজ্যও অধিকার করেন। সবচেয়ে বড় অভিযান ছিল চিতোরের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধের সাথেই রাণী পদ্মিনীর গল্পটি যুক্ত। যদিও ঐতিহাসিক জি. এইচ. ওঝা ও কে. এস্. লাল. এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বস্তুত কাশ্মীর ও বঙ্গদেশ ছাড়া সারা উত্তর ভারতে তিনি সুলতানী সাম্রাজ্য প্রসারিত করেন। এ ছাড়া তিনি মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে সফল হন। উত্তর ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করেই এবার তিনি তাকালেন দক্ষিণ ভারতের দিকে।

দক্ষিণ ভারত অভিযান : আলাউদ্দিনের শাসনকালেই দক্ষিণ ভারত সর্বপ্রথম মুসলমান অধিকারভুক্ত হয়। দাক্ষিণাত্যে তখন প্রধান রাজ্য ছিল চারটি—দেবগিরি, তেলেঙ্গানা, দ্বোর সমুদ্র এবং পাণ্ড্য। এছাড়াও ছিল কেরল, ম্যাঙ্গালোর প্রভৃতি জায়গায় কয়েকটি ছোট রাজ্য। এইসব রাজ্যে পারস্পরিক অনৈক্য ও অভ্যন্তরীণ গেলেযোগ আলাউদ্দিনের জয়লাভের পক্ষে সহায়ক হয়। তিনি ১৩০৮—১৩১৩ খ্রীঃ এর মধ্যে একে একে সবক'টি রাজ্যকে পরাজিত করে তার অনুগত রাজ্যে পরিণত করেন। দক্ষিণ ভারতের ধনদৌলত; শক্তিশালী সেনাবাহিনী পোষণ করতে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করার কাজে সহায়ক হয়। দাক্ষিণাত্য অভিযানে সম্রাটের প্রিয় সেনাপতি মালিক কাফুর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এইভাবে খলজী-রাজ্য এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। মৌর্য ও গুপ্ত যুগের পর ভারতে ইতিপূর্বে আর কখনো এরূপ রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয় নি। এক কথায় খলজী জঙ্গীবাদের ফলে আলাউদ্দিনের আমলেই সুলতানী সাম্রাজ্য বিশাল আকার ধারণ করে।

শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয়করণ : আলাউদ্দিন এক শক্তিশালী কেন্দ্রীভূত শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যথার্থই বুঝেছিলেন যে, আমীর ও ওমরাহদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার অন্যতম কারণ। তাই তিনি তাদের, এমনকি মৌলভীদেরও গ্রাহ্য করেন নি। নানাবিধ উপায়ে তিনি তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব খর্ব করতে সচেষ্ট হন। তিনি এক বিশাল সামরিক

বাহিনীর সাহায্যে অভ্যন্তরীণ অরাজকাতা দমন করতে ও কেন্দ্রীয় শাসন শক্তিশালী করতে সচেষ্ট হন। তাই সুলতানের ক্ষমতা যাদের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ শক্তিশালী সামরিক বাহিনী, তার সংস্কারের প্রতি তিনি মনোনিবেশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি এক অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন যার পরিকল্পনার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য, যদিও ফলাফলের জন্য নয়। তা হচ্ছে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বা রেশনিং ব্যবস্থা। তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সুলতানের অবশ্য কর্তব্য ছিল। কারণ তাদের অস্তিত্বের সঙ্গে সুলতানের অস্তিত্ব ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে। ফলে তাদের আহার ও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যাতে কম দামে সংগ্রহ করতে পারে সেইজন্য তিনি জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দেন। 'শাহান-ই-মণ্ডী' ও 'দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ' উপাধিধারী দুজন কর্মচারীর উপরে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করবার দায়িত্ব ছিল। কৃষক ও বণিকদের তিনি বাধ্য করলেন নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে। ফলে ব্যবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছিল যে তাদের বাইরে থেকে বেশী দামে মাল কিনে দিল্লীতে সস্তায় বিক্রি করতে হ'ত। এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কেবলমাত্র দিল্লী ও তার আশেপাশে চালু ছিল বলে কেবলমাত্র ঐ স্থানের অধিবাসীরাই সুবিধা ভোগ করতো, কিন্তু দেশের সর্বত্র ইহা প্রচলিত না থাকায় সারা দেশের মানুষের কাছে কোনরূপ সুবিধাজনক হতে পারে নি। কে. এস. লাল-এর মতে এই ব্যবস্থার ফলে বণিকগণ ক্ষতিগ্রস্থ হন এবং এই কারণে ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছিল। এই ব্যবস্থায় চাষীরাও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে স্বাভাবিক কারণেই আলাউদ্দিনের প্রবর্তিত মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যবস্থা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙ্গে পড়ে।

ইতিহাসে সুলতান আলাউদ্দিন প্রায় সারা ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি নিঃসন্দেহে একজন সাহসী এবং সুদক্ষ সেনানায়ক ছিলেন। তাঁর পূর্বগামী বলবনের পথ অনুসরণ করে সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করেছিলেন। প্রধানত সামরিক প্রয়োজনের তাগিদেই তিনি পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছিলেন। খলিফার বন্ধনরজ্জু এবং ধর্মীয় অনুশাসন থেকে রাষ্ট্রকে মুক্ত করে তিনি রাজক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সামরিক রাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল বালির বাঁধের উপর। তাঁর সর্বপ্রধান ব্যর্থতা ছিল এই যে, তিনি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। তাঁর শেষ জীবনেই এই ব্যবস্থায় ভাঙনের লক্ষণ দেখা দিল এবং তাঁর মৃত্যুর কিছু পরেই এটা ধ্বসে পড়ল। আলাউদ্দিন ছিলেন স্বৈরতন্ত্রী শাসক। ঐতিহাসিকগণ শাসকরূপে আলাউদ্দিনের মূল্যায়নে পরস্পর বিপরীত মন্তব্য করেছেন। মরক্কোর পর্যটক ইবন বতুতা তাঁকে যেমন বলেছেন একজন শ্রেষ্ঠ সুলতান, সেখানে জিয়াউদ্দিন বরণী তাকে ফ্যারাওদের চাইতেও বেশী রক্তপিপাসু বলে অভিহিত করেছেন। কেহ কেহ বলেন বরণীর এরূপ মন্তব্যের পেছনে কারণ ছিল যে মোল্লাতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন বরণী আর আলাউদ্দিন ছিলেন সেই মোল্লাতন্ত্রের বিরোধী। তিনি যে শুধু

বীর যোদ্ধা ছিলেন তাই নয়, তাঁর শাসনসংস্কারের মধ্যেও ছিল নানা উদ্ভাবনী প্রতিভা। তিনি ছিলেন গুণীজনের পৃষ্ঠপোষক। আমীর খসরু, সুফী সন্ত নিজামুদ্দিন আউলিয়া পর্যন্ত আলাউদ্দিনের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। দিল্লীর এক বিখ্যাত মসজিদের তোরণরূপে নির্মাণ (আলাইদরওয়াজা) তার সাংস্কৃতিক বোধের পরিচায়ক। কিন্তু সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসন প্রজাদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে স্থায়ী হতে পারে নাই।

শাসন বিভাগে তাঁর সাহা যার্থে মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সকল শক্তির আধার। বস্তুত মন্ত্রীরা ছিলেন তাঁর আদেশ পালন করার মর্যাদাপূর্ণ কেরাণী। তিনি প্রাদেশিক শাসকগণের ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রীয় শাসন শক্তিশালী করেন। সুলতানের গুপ্তচরগণ রাজকর্মচারী ও অভিজাতদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় শাসনকে শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করেছিল কিন্তু স্বৈরাচারী একক অধিনায়ক রাজকর্মচারী বা প্রজার স্বাভাবিক আনুগত্যের উপর নির্ভর করে না। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ীও হতে পারে না। জঙ্গীশাহীতে সামরিক নেতারাই ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। সামরিক সেনাপতি মালিক কাফুর তাই করেছিলেন। ফলে আবার দেখা দেয় রাষ্ট্রনৈতিক অস্থিরতা। ক্ষমতালোলুপ অন্যতম শক্তিশালী আমীর গাজীমালিক গিয়াসুদ্দিন তুঘলক নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন।

৭। **মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন**—গিয়াসুদ্দিন তুঘলক তাঁর মাত্র পাঁচ বছর রাজত্বকালে সাম্রাজের গৌরব ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই রাজবংশ ১৪১২ খ্রীঃ পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে। তারপর সুলতান হলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অথচ অব্যবস্থিত চিত্ত, আবেগপ্রবণ ও মিশ্র চারিত্রিক উপাদানে গঠিত এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব মহম্মদ-বিন-তুঘলক। নানা গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রাজত্বকাল ছিল ব্যর্থতা ও অভিশাপে পূর্ণ। মহম্মদ-বিন-তুঘলক শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কয়েকটি দুঃসাহসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং কৃষিকার্যে অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করেন।

সিংহাসনে আরোহণের অল্পকাল পরেই মহম্মদ-বিন-তুঘলক দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সুলতানের এই সিদ্ধান্তটি তাঁর সবচেয়ে বিতর্কমূলক পদক্ষেপ। দক্ষিণ ভারতে মুসলিম রাজ্য বিস্তারের কেন্দ্র ছিল এই দেবগিরি। দক্ষিণ ভারতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বাসনায় সুলতান দেবগিরিকে দ্বিতীয় রাজধানী করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দেবগিরির নূতন নাম হল দৌলতাবাদ। এ-ছাড়া মোঙ্গল বিপদ থেকে দূরে থাকাবার ইচ্ছায় তিনি নূতন রাজধানী গড়ে তোলেন দেবগিরিতে। দিল্লী থেকে দৌলতাবাদের দূরত্ব ১৫০০ কিলোমিটার, তার উপরে সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল। দীর্ঘ পদযাত্রার পরিশ্রম ও প্রচণ্ড উত্তাপে বহুলোকের প্রাণহানি হয়। তিনি শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে দিল্লী থেকে দক্ষিণ ভারত শাসন করা যেমন অসম্ভব

দৌলতাবাদ থেকে উত্তর ভারত শাসন কারও সহজসাধ্য নয়। কয়েক বছর পর তিনি ফিরে গেলেন দিল্লীতে ব্যর্থতার স্মৃতি বহন করে।

মুদ্রা-ব্যবস্থার সংস্কার :—মুদ্রা-ব্যবস্থার সংস্কার তাঁর রাজত্বের এক প্রসিদ্ধ ঘটনা। তখন দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। তিনি তার বদলে তামার নোট প্রবর্তনের আদেশ দিলেন। অর্থ-নৈতিক তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে তাঁর এই সংস্কার আদৌ ভুল ছিল না। ত্রয়োদশ শতকে চীনে কাগজের নোট প্রবর্তিত হয়েছিল। সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল অল্প মূল্যে বেশী নোট প্রবর্তনের মাধ্যমে কোষাগারকে সমৃদ্ধ করা ; জনসাধারণকে ঠকাবার মতলব তাঁর ছিল না। কিন্তু সেই যুগের চেতনার তুলনায় এই সংস্কার অনেক বেশী অগ্রসর ছিল। সুলতান খেয়াল করেন নাই যে তামার নোট লোকে সহজেই জাল করতে পারে। নোট জাল করবার বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয় নাই। এই সংস্কার প্রবর্তনের পরে দেখা গেল যে দেশে জাল নোটের ছড়াছড়ি। বরণী লিখেছেন : "প্রতি হিন্দুর ঘর একটি টাকশালে পরিণত হল।...প্রতিটি কামার কামারশালে তামার নোট তৈয়ার করত।" বাজারে এত বেশী পরিমাণ তামার নোট আসার ফলে পুরানো মুদ্রার দর বেড়ে গেল এবং নূতন তামার নোটের দর খুবই কমে গেল। ফলে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হবার উপক্রম হল। চার বৎসর পরে সুলতান এই সংস্কার বাতিল করলেন এবং জাল টাকার দাম রাজকোষ থেকে স্বর্ণ বা সোনা বা রূপার টাকায় ফেরত দিলেন। স্বভাবতঃই এতে রাজকোষের অবস্থা খুবই সঙ্গিন হয়ে উঠল। মুদ্রা-ব্যবস্থার এই সংস্কারের মধ্যে সুলতানের সাহসিকতা এবং কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগে তামার নোট প্রচলনের প্রচেষ্টা বাস্তবিক অভিনব। কিন্তু এই সংস্কারকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন তৈরি করতে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন।



মহম্মদ-বিন-তুঘলক

জনসাধারণের বিক্ষোভ :—মহম্মদ বিন-তুঘলকের কার্যকলাপের ফলে লোকের মধ্যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। চারদিকে বিদ্রোহ শুরু হল। চরম নিষ্ঠুরতার সহিত তিনি বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ শান্ত হলনা। সুদূর দক্ষিণে 'মাবার' (মাদুরা) স্বাধীনতা ঘোষণা করল। বাংলার শাসনকর্তাও দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করলেন। দক্ষিণাপথে বাহমনী রাজ্য এবং হরিহর ও বুক্কা নামে

ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হল। দিল্লীর সুলতানী শাসনের পতন শুরু হল, যদিও ইহা আরও প্রায় চার দশক টিকেছিল।

মহম্মদ-বিন-তুঘলকের আর একটি পরিকল্পনা হ'ল দোয়াব অঞ্চলের (গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী স্থান) ভূমি-রাজস্ব বিপুলভাবে বাড়িয়ে দেওয়া। তিনি ঠিক ঠিক মত ধার্য রাজস্ব আদায়ের আদেশ দেন কিন্তু সেখানে হ'ল দুর্ভিক্ষ। কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ দেখা দেয়। সুলতান যদিও সাহায্য ও খয়রাতি নিয়ে এগিয়ে গেলেন তাতে কিন্তু ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণকে লাঘব করতে পারে নি।

মহম্মদ-বিন-তুঘলকের আরও একটি পরিকল্পনা ছিল। ইহা ছিল তাঁর দিগ্বিজয়ের বাসনা। এই উদ্দেশ্যে তিনি একবার মধ্য এশিয়ায় রাজ্যজয়ের জন্য সেনাবাহিনী গড়েছিলেন। সেই অভিযান হ'ল না কিন্তু অর্থের অপব্যয় হয়ে গেল প্রচুর। হিমালয়ের দুর্গম কারাজল অঞ্চলে তিনি এক অভিযান পাঠালে তার অধিকাংশ সৈন্য পথকষ্টে মারা যায়। মহম্মদের এই সামরিক ব্যর্থতার ফলে দাক্ষিণাত্য, বাংলা ও সিন্ধুতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইতিমধ্যে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের মৃত্যু হয়।

সমসাময়িক লেখক বরণী ও ইবন্ বতুতা মহম্মদ-বিন-তুঘলকের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদ ও গার্ডনার ব্রাউন এ-মতের বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে মহম্মদ-বিন-তুঘলক-কে এল. ফিন্-ষ্টোনের কথা অনুযায়ী "বিকৃত মস্তিষ্ক" বা পাগল বলা যায় না। বরং তাঁর সংস্কারগুলি ছিল, যেমন একদিকে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক, অপর দিকে অবশ্য বাস্তববুদ্ধির অভাবজনিত ত্রুটি। যুগের বিচারে তাঁর চিন্তা ছিল অগ্রগামী। ডঃ ত্রিপাঠির মতে, তিনি মোল্লাদের উপদেশকে আমল না দিয়ে আপন বিবেকের অনুশাসনের দ্বারাই বেশী পরিচালিত হতেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন বলে মোল্লা শ্রেণী তাঁর বিরোধীতা করতেন। তবে, তাঁর চরিত্রে পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ দেখা গেলেও ডঃ ঈশ্বরী প্রসাদের মতে, মধ্যযুগের সম্রাটদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা যোগ্য লোক। তিনি অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন না এবং তার প্রতিটি কাজকর্মের পিছনেই একটা যুক্তির ভিত্তি ছিল। তিনি বিচার ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ এবং দুর্নীতিমুক্ত করতেও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কতগুলি প্রধান নীতিতে তাঁর ব্যর্থতার জন্য দাক্ষিণাত্য, বাংলাদেশ, অযোধ্যা, কারা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। কোন কোন বিদ্রোহ তিনি দমন করলেও বিদ্রোহ পরিস্থিতির মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। বস্তুতঃ মহম্মদ-বিন-তুঘলকের নানাবিধ গুন থাকা সত্ত্বেও তাঁর পরিকল্পনাকে কাজে লাগাবার জন্য যে ধৈর্য ও নিষ্ঠা থাকা দরকার সেখানেই ছিল তাঁর অভাব। কেহ কেহ তাঁকে পাগল রাজা বললেও আসলে তিনি ছিলেন হতভাগ্য রাজা।

ফিরোজশাহের শাসনে প্রকৃতিগত পরিবর্তন : মহম্মদের মৃত্যুর পর আমীর ওমরাহগণের অনুরোধে তাঁর পিতৃব্য ফিরোজশাহ ১৩৫১ খ্রীঃ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মহম্মদ-বিন-তুঘলকের নীতি অনুসরণ না করে উল্টো নীতি গ্রহণ

করলেন। তিনি মহম্মদের অনুসৃত ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির বদলে উলেমাগণের অধীন হয়ে পড়েন। মোল্লা ও আমীররা মহম্মদের সময় ছিলেন বিক্ষুব্ধ। ফিরোজ তুঘলক প্রথমেই তাঁদের দিকে আবার বন্ধুত্বের হাত বাড়ালেন। আবার তাঁদেরকে জায়গীর দিলেন। সুযোগ সুবিধা দিলেন আরও নানা ধরনের। মোল্লা মৌলভীরা আবার রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করবার সুযোগ পেলেন। তাছাড়া ধর্মের ব্যাপারেও ফিরোজ ছিলেন নিজে গোঁড়া এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি অনুদার। তাই জনসাধারণের মধ্যে নানা ধরনের বিক্ষোভ জমে রইল। মোল্লা মৌলভীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের ফলে ফিরোজ তুঘলকের সিংহাসন হারাবার ভয় ছিল না। কিন্তু রাজার উপর অন্যান্যদের প্রভাব বাড়ায় সুলতানী শাসনই গেল দুর্বল হয়ে। বিহার ও বাংলাদেশের শাসকরা এই সুযোগে করলেন বিদ্রোহ। তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেও ফিরোজ কোন স্থায়ী ফল পেলেন না। বরং বাংলাদেশে সৃষ্টি হল একটি স্বাধীন সুলতানী শাসন ব্যবস্থা।

অন্যান্য ব্যবস্থা :—প্রজাদের উপকারের জন্য তিনি আরও কিছু ব্যবস্থা করেছিলেন। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি একটা কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। দরিদ্র, বিধবা ও অনাথ মুসলমানদের কন্যাদের সাহায্য করবার জন্য 'দিওয়ান-ই-খয়রাত' নামে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল।

জায়গীর প্রথার পুনঃ-প্রবর্তন :—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং কর্মচারীদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি জায়গীর প্রথার পুনঃ-প্রবর্তন করেছিলেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এইসব লোকদের জায়গীর হিসাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমর্থন সুলতানের পক্ষে আশু সুবিধাজনক হলেও, শেষ পর্যন্ত এর ফল শুভ হয় নাই। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষমতাবৃদ্ধি অনিবার্যভাবে কেন্দ্রীয় শাসনকে দুর্বল করল এবং সুলতান জায়গীরদারদের সমর্থন ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে আলাউদ্দিন রাজক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জায়গীর প্রথা বাতিল করেছিলেন। পরিবর্তিত অবস্থায় ফিরোজের পক্ষে সম্ভবতঃ আলাউদ্দিনের পথ অনুসরণ করা সম্ভবপর ছিল না। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে জায়গীরপ্রথা অনিবার্যভাবে শক্তি সঞ্চয় করে।

ধর্মীয় মতামত :—রাজপুত রমণীর পুত্র হলেও ফিরোজ ছিলেন একজন গোঁড়া মুসলমান এবং কোরাণের বিধান মত তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। তিনি মিশরের খলিফার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করলেন। নিজেকে তিনি খলিফার প্রতিনিধি বলে মনে। আলাউদ্দিনের মত তিনি আদৌ ধর্মীয় অনুশাসনকে রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে আলাদা করে দেখেন নাই। তাঁর নির্দেশে অমুসলমানদের উপর 'জিজিয়া' কর প্রবর্তিত হল। অমুসলমানদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হল।

মঙ্গলকামী ব্যবস্থা :—ফিরোজ তুঘলক অবশ্য প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কতকগুলি কাজ করেছিলেন। জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে তিনি কৃষিকার্যে সহায়তা করেছেন। যমুনা নদী থেকে যে খাল তিনি কেটেছিলেন সেটিই ছিল তাঁর সময়কার অন্যতম উল্লেখ-

যোগ্য প্রজা-হিতকর কাজ। ফিরোজপুর, ফিরোজাবাদ, জৌনপুর প্রভৃতি কয়েকটি শহর তিনি গড়ে তুলেছিলেন। অনেক শিক্ষালয় এবং চিকিৎসালয় তৈরী করিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাই তিনি ধর্ম ও দর্শন তত্ত্ব সম্পর্কে কয়েকখানি সংস্কৃত বই আরবী এবং ফার্সীতে অনুবাদ করিয়েছিলেন। বহুদূর থেকে তিনি দু'খানি অশোক স্তম্ভ দিল্লীতে আনিয়েছিলেন। তার মধ্যে একখানি তিনি নিজের প্রাসাদের ছাদে নতুন করে বসিয়েছিলেন। আজও দিল্লীর ফিরোজ শাহ কোটলায় গেলে সেই সুন্দর অশোক স্তম্ভটি চোখে পড়ে।

শাসকরূপে ফিরোজশাহ তুঘলকের জনগণের মঙ্গলবোধক কর্মসূচী তার কৃতিত্বের মতই সাক্ষ্য রূপে থাকুক না কেন, তার হিন্দু নির্যাতনের নীতি, জায়গীর ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন, মধ্যযুগীয় দুষ্টক্ষতের ন্যায় দাস প্রথার সমর্থন প্রভৃতি তার দূরদৃষ্টির অভিভাবকরূপে চিহ্নিত হয়। তার শাসনকালের আগে থেকেই দিল্লীর সুলতানীর গৌরব ম্লান হতে থাকে একথা সত্যি। কিন্তু ফিরোজশাহ সুলতানী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনরোধ করার মত বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন না। দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমনের কোন চেষ্টাই তিনি করেন নি। আবার বাংলার দুটি অভিযানই তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাবে কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি আমীর ওমরাহদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তিনি উলেমাদের ধর্মীয় অনুজ্ঞা পালন করে রাজকীয় সত্তার বিসর্জন দেন এবং জায়গীর প্রথার পুনঃ প্রবর্তন করে কেন্দ্রীয় শাসনকে দুর্বল ও পঙ্গু করে তোলেন। তার মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই দিল্লীর পতনোন্মুখ সুলতানী ধ্বসে পড়ে। এই বংশের শেষ সুলতান মাহমুদশাহের আমলে সমরখন্দের অধিপতি তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন।

ফিরোজ তুঘলকের পরবর্তী তুঘলক বংশীয় সুলতানরা ছিলেন অকর্মণ্য। তাঁদের অপদার্থতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসকরা বিদ্রোহের সৃষ্টি করল। অনেক নূতন নূতন রাজ্য সৃষ্টি হল। সুলতানী শাসন সীমাবদ্ধ হয়ে রইল দিল্লীর আশে পাশে সামান্য জায়গায়।

তুঘলক বংশের শেষ সম্রাট সুলতান মহম্মদ শাহ ১৪১২ খ্রীঃ মারা যান। পর বছর দৌলতখাঁ লোদী দিল্লীর সুলতান রূপে ঘোষিত হন।

৮। **তৈমুর লঙ্গের ভারত আক্রমণ**– ফলাফল—সুলতানী সাম্রাজ্যের পতন : সৈয়দ ও লোদী বংশ।

তুঘলক বংশের পতনোন্মুখ অবস্থার মধ্য এশিয়ার সমরখন্দের দুর্দ্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা তৈমুর লঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন (১৩৯৮ খ্রীঃ)। তিনি খোঁড়া ছিলেন বলে লোকে তাঁকে 'লঙ্গ' বলত। তাঁর ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন। তাঁর দিল্লী অভিযানে তাঁকে বাধা দেবার কেহ ছিল না। নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন চালিয়ে শেষে দিল্লীকে শ্মশানে পরিণত করে অভাবনীয় ধনরত্ন নিয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

ভারতবাসীর দিক থেকে বিচার করলে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ ছিল ভগবানের অভিসম্পাত স্বরূপ। তাঁর আক্রমণ পতনশীল দিল্লীর সুলতানীর উপর চরম আঘাত হেনে

ছিল। এই আঘাতের স্বল্পকাল পরেই দিল্লীর সুলতানীর অবসান ঘটে। তৈমুরের আক্রমণের পর যে ব্যাপক অভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তৈমুরের আক্রমণের ফলে পাঞ্জাব ও দিল্লীতে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। ভারতে তার অভিযানের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ফল ছিল খুব সামান্য।

সৈয়দ বংশ ঃ তৈমুরের অবর্তমানে লাহোর ও মুলতানে তাঁর প্রতিনিধি খিজির খান আমীরদের পারস্পরিক কোন্দল এবং সুলতানের চরম অযোগ্যতার সুযোগে দিল্লীর সিংহাসন হস্তগত করেন। খিজির খান যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করলেন তার নাম সৈয়দ বংশ। ১৪১৪ থেকে ১৪৫১ সন পর্যন্ত এই বংশের চারজন সুলতান রাজত্ব করেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই করতে পারেন নি। কারণ, তাঁরা ছিলেন অকর্মণ্য। বাহলুল লোদী নামক জনৈক উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মচারী সিংহাসন দখল করে সৈয়দ বংশের পতন ঘটান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬ খ্রীঃ) নামে পরিচিত। এই লোদী বংশই হল ভারতের সুলতানীর শেষ আলোকবর্তিকা।

লোদী বংশ (১৪৫১—১৫২৬ খ্রীঃ)

বহলুল লোদী (১৪৫১—১৪৮৯ খ্রীঃ) ঃ সৈয়দ বংশের শেষ অকর্মণ্য সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহকে বিতাড়িত করে বহলুল লোদী ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। লোদীরা জাতিতে আফগান। বহলুল লোদী জৌনপুর অধিকার করেন।

সিকন্দর লোদী (১৪৮৯—১৫১৭ খ্রীঃ) ঃ বহলুল লোদীর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সিকন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ত্রিহুত এবং বিহারে অন্যান্য অঞ্চল জয় করে বাংলার সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। তিনি ন্যায় বিচারক ও দক্ষ সুলতান ছিলেন। তাঁর কঠোর শাসনাধীনে রাজ্যের সর্বত্র শৃঙ্খলা, শান্তি ও ন্যায় বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭—১৫২৬) ঃ সিকন্দরের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর দুর্ব্যবহারে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী অসন্তুষ্ট হন। তিনি সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য সুলতানের এক প্রতিদ্বন্দ্বী কাবুলের অধিপতি বাবরকে দিল্লী আক্রমণের জন্য আহ্বান জানান। এই বাবর ছিলেন যথাক্রমে তৈমুর ও চেঙ্গীজ খাঁর বংশধর। বাবর এই সুযোগকে কাজে লাগান। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত ও নিহত করে বাবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এভাবে দিল্লীতে মুঘল অধিকারের সূত্রপাত ঘটে।

তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ঃ—একাধিক কারণে দিল্লীর সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে।

প্রথমত, তুর্ক-আফগান রাজশক্তি সামরিক শৌর্য ও একনায়কতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাসক ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন না হলে শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ত। ফিরুজ তুঘলকের পরবর্তী শাসকগণ ছিলেন দুর্বল ও রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাঁদের অক্ষমতার জন্য রাজশক্তির ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, সে যুগে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত আইন বলবৎ না থাকায় সিংহাসন নিয়ে সহজেই যুদ্ধবিগ্রহের সূত্রপাত হত।

তৃতীয়ত, মহম্মদ-বিন-তুঘলকের অপরিণামদর্শী কার্যকলাপের ফলে রাজ্যমধ্যে গভীর অসন্তোষ ও নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তারা দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। ফিরুজ তুঘলকের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার অভাব সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে আরও শিথিল করে দেয়।

চতুর্থত, তুর্ক-আফগান সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন দিল্লীর মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়। প্রথমদিকে তাঁরা সাহসী, পরিশ্রমী ও কর্মদক্ষ ছিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের নৈতিক অবনতি ও বিলাসপ্রীতির ফলে তুর্কী শাসনব্যবস্থাও দুর্নীতিগ্রস্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

পঞ্চমত, তুর্কী সম্রাটদের অনুদার ধর্মনীতির ফলে তাঁরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লাভ করতে পারেন নি।

তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তিমদশায় তৈমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ (১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে) এই অন্তসারশূন্যতা আরও প্রকট করে তুলেছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা ঘোষণায় যে সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়েছিল তারই সমাধি রচনা করেন মোগলবীর বাবর পানিপথের সমরাঙ্গণে (১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য লোদী সুলতানরা জিনিসের দামকে লোকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনবার জন্য জিনিসের দাম বেঁধে দেন। কিন্তু আমীর ওমরাহরা শক্তিশালী ও দক্ষ কোন সুলতাদের অস্তিত্ব সহ্য করতে পারলেন না। তাই আমীররা আবার বিদ্রোহ করলেন। অনেক বিদ্রোহকে সুলতানরা দমনও করলেন। আমীররা তখন ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন বাইরের শক্তির সাথে। বিহারের দরিয়া খান লোহানী, লাহোরের দৌলত খান লোদী, এবং ইব্রাহিম লোদীরই কাকা আলমখান পর্যন্ত সুলতাদের বিরুদ্ধে ছল করে ইব্রাহিম লোদীকে সাজা দেওয়ার জন্য কাবুলের আমীর জহিরউদ্দিন বাবরকে ডেকে নিয়ে এলেন।

৯। স্বাধীনসত্ত্বা নিয়ে কতিপয় রাজ্যের উত্থান:

ইলিয়াস শাহের অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে বাংলার অবস্থা:—সমগ্র সুলতানি আমলে বাংলা দিল্লীর অধীন হলেও প্রকৃতপক্ষে সচেতন স্বতন্ত্র সত্ত্বা নিয়ে দিল্লী সাম্রাজ্যের একটি অনিশ্চিত অংশ রূপেই ছিল বাংলার রাজনৈতিক পরিচয়। বাংলার স্বাধীনতাপ্রিয়তাই ছিল দিল্লীর রজনৈতিক বিবাদের অন্যতম প্রধান কারণ।

বাংলার মুসলমান শাসকগণ বহুবার দিল্লীতে প্রভাব ও শাসন হতে মুক্ত হবার প্রয়াসে এক এক সময় সাফল্য অর্জন করেন। তাই বাংলাদেশকে দুর্বল করে রাখবার উদ্দেশ্যে বলবনের সময় থেকেই নানাপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর বাংলাকে পরাধীন রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত গিয়াসুদ্দিন তুঘলক নিজের প্রাধান্য স্থাপন করে বাংলাকে তিনভাগে ভাগ করে দেন—পশ্চিম বাংলায় লক্ষ্মণাবতী, পূর্ব বাংলায় সোনার গাঁ, আর দক্ষিণ বাংলায় সাত গাঁ। কিন্তু রাজনৈতিক বিবাদের তা'তে কোন সুমীমাংসা হয়নি।

বাংলাদেশে তুর্ক আফগান শাসনকালে (প্রায় ৩৫০ বছর) প্রধান দুটি বংশ ছিল ইলিয়াস শাহী বংশ এবং হুসেন শাহী বংশ। মহম্মদ তুঘলক যখন দিল্লীর সুলতান তখন ইলিয়াস শাহ ছিলেন দিল্লীর আমীর। তিনি বাংলাদেশে এসে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নাম ধারণ করে লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৩৪২-৫৭)*। সেই সময় থেকেই বাংলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। পাণ্ডুয়াতে ছিল তাঁর রাজধানী। বাংলা ও বিহারের বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নেপাল ও উড়িষ্যা আক্রমণ করে প্রচুর সম্পদ নিয়ে বাংলায় ফিরে আসেন। ১৩৫৩ খ্রীঃ তিনি সোনার গাঁ দখল করে বাংলায় রাষ্ট্রীয় ঐক্য পুনস্থাপন করেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী কাশী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। পূর্বভারতে ইলিয়াস শাহের রাজ্য-বিস্তৃতি সুলতান ফিরোজ তুঘলকের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বিরাট এক সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁকে দমন করতে এসেও একডালা দূর্গ দখল করতে না পেরে দিল্লী ফিরে যান। উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয় এবং বাংলার স্বাধীনতা বাজায় থাকে।

সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-৮৯)

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার ন্যায় তিনিও ছিলেন বিচক্ষণ, বীর, যোদ্ধা ও সুদক্ষ শাসক। তাঁর শাসনকালে তিনি দিল্লীর বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীনতা বজায় রাখতে অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন। তাঁর সময়েও ফিরোজ তুঘলক বাংলাকে দমন করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। সুনিপুণ শাসক বলে সিকান্দারের খ্যাতি আছে। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্যও কম ছিল না। তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন বিদ্রোহী হয়ে সোনার গাঁয়ে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করেন এবং শেষ পর্যন্ত পিতাকে হত্যা করে সমগ্র রাজ্যের অধিকারী হন (১৩৯৩-১৪১০ খ্রীঃ) কিন্তু পিতৃহন্তা শক্তিশালী শাসক হিসাবে গিয়াসউদ্দিনের খ্যাতি আছে। তিনি

*"A new chapter was opened in the history of Bengal with the accession of Ilyas Shah to the throne of Lakhnawati..."History of Bengal. Vol-II p. 103)

চীন সাম্রাজ্যে দূত প্রেরণ করেন এবং মিং সম্রাট ও বাংলা দেশের মধ্যে এই সম্পর্ক বহুদিন ধরে চলছিল।

কংসনারায়ণ ও যত্ন ঃ—ইলিয়াস শাহী বংশের কয়েকজন সুলতানের পর ১৪১৫ সনে ভাতুড়িয়ার ব্রাহ্মণ জমিদার কংসনারায়ণ বা গণেশ বাংলার সিংহাসন দখল করেন। রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে জালালউদ্দিন রাজত্ব করেন। (ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে যত্ন হয়েছিলেন জালালউদ্দিন)।

ইলিয়াস শাহী বংশ আবার ১৪৪২ সনে ক্ষমতা উদ্ধার করে এবং ১৪৮৬ সন পর্যন্ত রাজত্ব চালায়। কিন্তু এই সময়ে শাসনের অধোগতি ঘটে। আবিসিনীয় হাবসী ক্রীতদাসরা রাজসভায় প্রবল হয়ে ওঠে এবং তাদের দৌরাত্ম্যে প্রজাসাধারণের দুর্নীতির সীমা থাকে না। প্রজা বিদ্রোহের ফলে হাবসী শাসন শেষ হয়। বাংলার অভিজাত বর্গ আলাউদ্দিন হুসেনকে সুলতান পদে নিযুক্ত করেন। হুসেনশাহ উপাধি নিয়ে তিনি বাংলার ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন (১৪৮৩-১৫১৮ খ্রীঃ)

হুসেন শাহ ঃ হুসেন শাহ যদিও ইলিয়াস শাহী বংশোদ্ভূত নন, তবুও যুগের চরিত্র বিচারে ইলিয়াস শাহী বংশের সঙ্গেই তার নাম উল্লেখ করা সমীচীন। তিনি হাবসীদের দমন করেন এবং প্রাসাদরক্ষী বাহিনীকেও হীনবল করেন। জৌনপুরের সুলতানদের কাছ থেকে বিহারের অনেকটা অংশ অধিকার করেন। উড়িষ্যার সীমা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন এবং ত্রিপুরা এবং আসামও কিছুকাল অধিকারে রাখেন। কূটনীতি সম্বন্ধে তাঁর অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

হুসেন শাহের পুত্র ছিলেন নসরৎশাহ। সুদক্ষ নরপতি হিসাবে তাঁরও সুনাম আছে। কিন্তু তাঁর সময়েই বাংলাদেশে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের উপদ্রব আরম্ভ হয়। প্রাসাদ রক্ষীদের মতে এই সুলতানের মৃত্যুর পরেই বাংলার দুর্দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে। ১৬৩২ সনে তিনি এক গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হলে তাঁর পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ সিংহাসনে বসেন। রাজনীতিতে তিনি তাঁর পিতার ন্যায় বিচক্ষণ ছিলেন। এছাড়া তিনি ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন, আলাউদ্দিন ফিরোজশাহের সরকার ও সৈন্যবাহিনীর সংগঠনে তাঁর উদার নীতির নিদর্শনের ছাপ আছে।

সাংস্কৃতিক সাফল্য ঃ ইলিয়াস শাহী যুগে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি। একত্র মিলে তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন। সংস্কৃতি, বিশেষতঃ স্থাপত্যের বিকাশেও ইলিয়াস শাহের অবদান ছিল। সিকান্দার শাহও ছিলেন স্থাপত্য শিল্পের সহায়ক। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ তিনিই তৈরী করেন। ইলিয়াস শাহী যুগে মালদহ জেলায় বিখ্যাত নোটন মসজিদ নির্মিত হয়। হুসেন শাহ এবং তাঁর পুত্র

নসরৎ শাহ মালদহের বড় সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন। গিয়াসউদ্দিন ছিলেন সুফরি ও ন্যায়-পরায়ণ। পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের সাথে তাঁর পত্র বিনিময় হ'ত। চৈনিক পর্যটক মা-ওয়ান এই সময় বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন! বাঙালীর পোষাক, মেয়েদের বেশভূষা, বাংলার বিখ্যাত মসলীন প্রভৃতির উল্লেখ মা-ওয়ানের বিবরণে আছে। এই রচনা থেকে তখনকার বাংলার আতিথেয়তা এবং সমৃদ্ধির কথাও জানা যায়।

উদার, ন্যায়-পরায়ণ, প্রজাহিতৈষী, স্থাপত্য শিল্প অনুরাগী এবং বিদ্যোৎসাহী হিসাবে হুসেন শাহ ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁর সময় বহু মসজিদ ও চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। দানধ্যানে তিনি ছিলেন অকাতর।

এই যুগ বাঙালীর সাংস্কৃতিক বিকাশের যুগ ; বঙ্গদেশের স্বাধীন সুলতানগণ সরকারী ভাবে বঙ্গভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁরা দিল্লীর সুলতানের মত ফার্সী অথবা উর্দু ভাষা বঙ্গদেশে প্রচলন করেন নি। ফলে বাংলা ভাষা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের ভাষারূপে বিকাশ লাভ করেছে। তাঁর রাজত্বকালেই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। হুসেনের সময় বহু হিন্দু উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইলিয়াসশাহী এবং হুসেনসাহী যুগে কতিপয় কবি ও সাহিত্যিক চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে কাব্য রচনায় যশস্বী হয়েছেন যেমন চণ্ডীদাস, মালাধর বসু, কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, রঘুনাথ পণ্ডিত, কৃষ্ণকমল গোস্বামী, জ্ঞানদাস, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ রূপ ও সনাতন গোস্বামী এবং গোপীনাথ বসু এবং মুসলমান কবিদের মধ্যে পুরন্দর খান, উদ্ধরণ সেখ, আবদুল গফুর আরীফ প্রমুখ সাহিত্যিকদের আবির্ভাব হয়। চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বন করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করেন। বিখ্যাত মনসামঙ্গল কাব্যও এই যুগে রচিত হয়। এককথায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে হুসেন শাহের দান অবিস্মরণীয়। তাঁর আগ্রহ ও আনুকূল্যে রূপ গোস্বামী রচনা করে 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব'। ভাগবতের অনুবাদ করে মালাধর বসু, গুণরাজ-খাঁ' উপাধি লাভ করেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর এর পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ রচনা করেন।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে রচিত বাংলা পুস্তকের বেশীর ভাগই লোপ পেয়েছে। কিন্তু, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস, এবং যশোরাজ খাঁ সকলেই তাঁর নামের সকৃতজ্ঞ উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃত ভাষার চর্চার ক্ষেত্রেও আসে এক নব জীবনের আলোড়ন'। চৈতন্যদেবের ভক্তি-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রঘুনন্দনের মত খ্যাতনামা স্মৃতিকার, রঘুনাথ শিরোমণির মত নৈয়ায়িক, এবং চতুর্ভুজ মিশ্রের মত কবি বাংলার সংস্কৃত চর্চার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। মিথিলা, উড়িষ্যা, গয়া, বারাণসী এবং বৃন্দাবন প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গে বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির সুযোগ স্থাপিত হয়। এই যুগে নবদ্বীপের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্তি লাভ করে।

(খ) বাহমনি রাজ্য (১৩৪৭-১৬৬৮ খ্রীঃ): মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষ ভাগে প্রথম ইসমাইল মুখ নামক একজন মুসলমান নেতার অধীনে দৌলতাবাদে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় (১৩৪৭ খ্রীঃ)। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই হাসান খান বা জাফর খান নামে একজন মুসলমান আমীরের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করেন। এই হাসান খানই ইতিহাসে হাসান আলাউদ্দিন বাহমন শাহ এবং হাসান গঙ্গু বাহমনি নামে পরিচিত। ডঃ স্মিথ বলেন, হাসান পারস্য দেশীয় বীর বাহমনের বংশধর; সুতরাং তাঁর নাম হল হাসান বাহমন শাহ। বংশের নাম হল বাহমনি বংশ। তাঁর রাজ্য হল বাহমনি রাজ্য। ফেরিস্তা বলেন হাসান প্রথমে গঙ্গু নামক এক ব্রাহ্মণের দাস ছিলেন। পরবর্তীকালে রাজপদ লাভ করে প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তিনি হাসান গঙ্গু বাহমন উপাধি গ্রহণ করেন এবং রাজ্যের নামকরণ করেন বাহমনি রাজ্য।

বাহমনি বংশের আঠার জন সুলতান ১৩৪৭ খ্রীঃ হতে ১৫১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত একশত একাত্তর বছর রাজত্ব করেন। তাঁদের প্রথমে রাজধানী ছিল বর্তমান হায়দরাবাদের অন্তর্গত গুলবর্গা, পরে বিদর। গোয়া ও দাইবুল বন্দর এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাহমনি রাজ্যের ইতিহাস অন্তর্দ্বন্দ্ব, ষড়যন্ত্র, নৃসংশতা, নরহত্যা ও পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের সাথে ক্রমাগত সংঘর্ষের কাহিনী। বাহমনি বংশের আঠার জন সুলতানের মধ্যে পাঁচজন নিহত, দুজনের নেশাগ্রস্ততা হেতু অকালমৃত্যু ও তিনজন সিংহাসনচ্যুত হন। অন্যদিকে বাহমনি সুলতানগণ দুর্গ, মসজিদ, সমাধি নির্মাণ, শিক্ষা বিস্তার ও জলসেচের ব্যবস্থা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন।

হাসান গঙ্গুর রাজত্ব (১৩৪৭-১৩৫৭ খ্রীঃ): রাজ্যলাভের পর হাসান পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি আত্মসাৎ করে নিজ রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন—পশ্চিমে আরব সাগর থেকে পূর্বে ওড়িশা পর্যন্ত ও উত্তরে তাপ্তী নদী বরাবর এবং দক্ষিণ সীমানা কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী বরাবর। এ রাজ্যের দক্ষিণেই ছিল বিখ্যাত বিজয়নগর রাজ্য। তিনি গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর রাজ্য চারিটি তরফ বা বিভাগে বিভক্ত ছিল—গুলবর্গা, দৌলতাবাদ, বেরার ও বিদর। প্রত্যেক তরফের একজন শাসনকর্তা ছিলেন। হাসান ন্যায়পরায়ণ, প্রজাহিতৈষী ও ইসলাম ধর্ম প্রচারে খুব উৎসাহী ছিলেন।

হাসানের অষ্টম বংশধর ফিরুজ শাহ বাহমন (১৩৯৭-১৪২২ খ্রীঃ): এই বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। যুদ্ধ ও রাজ্যশাসনে তাঁর সমান যোগ্যতা ছিল। তিনি দু'বার বিজয়নগর-এর রাজাকে পরাজিত করেন এবং বিজয়নগরের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি তৃতীয় বারের যুদ্ধে বিজয়নগরের রাজার নিকট পরাজিত হন (১৪২০ খ্রীঃ)। এরপর তিনি ভ্রাতা আহম্মদের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করতে বাধ্য হন। ইসলাম ধর্মে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। গুলবর্গার সুরম্য হর্ম্যশ্রেণী ও ভীমা নদীর তীরবর্তী বিশাল রাজপ্রাসাদ ফিরুজ শাহ বাহমনের শিল্পানুরাগের পরিচয় বহন করে। পরবর্তী সুলতান আহম্মদ শাহও ছিলেন যুদ্ধবিজয়ী। তিনি বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায়কে যুদ্ধে হারিয়ে বার্ষিক কর দিতে বাধ্য করেন। গুজরাট, মালব এবং ওয়রঙ্গলের

বিরুদ্ধেও তিনি জয়ী হন। বাহমনি রাজ্যের উচ্চাশাও পূর্ণ হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে অভ্যন্তরীণ কলহের ফলে বাহমনি রাজ্যের অবনতি আরম্ভ হয়। এই সময় আমীরগণ দুইটি বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে যান। প্রথম দলে ছিলেন হাবস ও ভারতীয় সুন্নী মুসলমানগণ এবং দ্বিতীয় দলে ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত—দক্ষিণী তুর্কী, ইরাণী, মুঘল ও কতিপয় আরব।

দ্বিতীয় দলের নায়ক ছিলেন ইরাণী খাজা মামুদ গাওয়ান খাজা জাহান। তিনি প্রায় পঁচিশ বৎসরকালব্যাপী পর পর তিনজন সুলতানের মন্ত্রিত্ব করেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় বিচার বিভাগের সংস্কার হয়। তিনি স্বয়ং অনাড়ম্বর এবং সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিদরের বৃহৎ মাদ্রাসা তিনি নির্মাণ করান। নিপুণতা এবং দক্ষতার সাথে তিনি রাজ্যটির হাল ধরেছিলেন। কিন্তু আমীর চক্রের ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়। তারপর অতি দ্রুত বাহমনি রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পায়।

মামুদ গাওয়ানের শাসনকালেই রুশদেশীয় বণিক অকানাসি নিকিতিন বিদর সফর করেন। তিনি বাহমনি রাজ্যের প্রকাণ্ড সেনাবাহিনী, অভিজাত আমীর ওমরাহদের বিলাসবহুল জীবন এবং জনসাধারণের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন "দেশে জনসংখ্যা প্রচুর, গ্রামের লোক স্বল্প ও জীর্ণপোষাক পরে থাকে অথচ আমীর ওমরাহরা যেমন প্রতাপশালী তেমনি ধনী।"

মামুদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর বাহমনি রাজ্যের ইতিহাস হল, বেরার, বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদর—এই পাঁচটি স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের কাহিনি। বেরারে প্রতিষ্ঠিত হয় ইমাদশাহী বংশ, বিজাপুরে আদিলশাহী বংশ, আহম্মদনগরে নিজামশাহী বংশ, গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহী বংশ এবং বিদরে বারিদশাহী বংশ। এইসব রাজ্য সর্বদা পরস্পরের মধ্যে কলহে অথবা পার্শ্ববর্তী ভিন্ন রাজ্য মালব, গুজরাট, বিজয়নগর প্রভৃতি অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রায়ই ব্যাপৃত থাকত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আহম্মদ নগর বেরার রাজ্য অধিকার করে। বিজাপুর স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রায় ২০০ বছরের বেশী সময় অস্তিত্ব নিয়ে টিকে ছিল। ১৬১৮ সনে বিদর রাজ্য বিজাপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৬৮৬ সনে সম্রাট আওরঙ্গজের বিজাপুর রাজ্য মুঘল অধিকারভুক্ত করেন। তার পরের বছর গোলকুণ্ডাও মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

বিজয়নগর—(১৩৩৬-১৫৬৫ সন): দাক্ষিণাত্যে বাহমনি রাজ্যের পাশাপাশি দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্যটি পত্তন করেন সঙ্গম রাজবংশের দু'ভাই হরিহর ও বুক্ক (১৩৩৬ সন)। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে তাঁরা শক্তিশালী বিজয়নগর দুর্গটি নির্মাণ করেন এবং রাজ্যবিস্তারে মন দেন। ১৩৪৬ সনে হোয়সল রাজ্য তাঁদের হস্তগত হয়। দশবছর পর কদম্ববংশ শাসিত পার্শ্ববর্তী রাজ্যটিও তাঁরা অধিকার করেন। এরপর ১৩৬০ সনে বর্তমান উত্তর তামিলনাড়ুর রাজ্যটি বিজয়নগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। এইভাবে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত নিয়ে বিজয়নগর সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

বিজয়নগর ও বাহমনি রাজ্যের মধ্যবর্তী শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ উর্বর রাইচুর উপত্যকার দখল নিয়ে বাহমনি রাজ্যের সেনাবাহিনী বিজয়নগরের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালায়। জয় পরাজয় ঘটেছে উভয় রাজ্যেরই। সঙ্গমবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় দেবরায় (১৪২২-৪৬ সন)। তিনি রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধির জন্য শাসন, বাণিজ্য, নৌশক্তি ইত্যাদির উন্নতির বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হন। ইতালীর পর্যটক নিকোলকন্টি এবং পারসিক পর্যটক আব্দুর রজ্জাক তাঁকে দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ রাজা বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী রাজাদের সময় রাজ্যে খুবই ক্ষতি হয়। গৃহবিবাদ ও অরাজকতাপূর্ণ অবস্থায় সঙ্গম বংশের পতন হয়।

নরসিংহ শালুভ বিজয়নগরে শালুভ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১৪৮৬ খৃঃ)। এই সময় বাহমনি রাজ্য ৫টি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। শালুভ বংশের রাজা নরসিংহ অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি রাজ্যের সীমা প্রসারিত করেন। কিন্তু তারপর এই বংশের তেমন জৌলুস থাকেনি। এরপর ১৫০৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় আর একটি রাজবংশ—তুলুভ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাঁর পুত্র কৃষ্ণদের রায় তুলুভ বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। কৃষ্ণদেব রায়ের (১৫০৯-১৫২৯ সন) সময় বিজয়নগরের শক্তি ও সমৃদ্ধি হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি বিজাপুরের সুলতানকে পরাজিত করে সমৃদ্ধশালী রাইচুর দোয়াব আবার দখল করেন। দক্ষিণ দিকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত তার দখলে আসে। তিনি ওড়িষ্যা আক্রমণ করে ভিজাগাপত্তনম জেলার সিংহাচলম পর্যন্ত বিজয়নগরের রাজ্যসীমা প্রসারিত করেন। কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে পর্তুগীজদের সদ্ভাব ছিল; তিনি তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভাটকুলে একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দেন।

(গ) **বিজয়নগর-বাহমনি সংঘর্ষের প্রকৃতি ঃ** •বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্থান হতে পতন পর্যন্ত দীর্ঘ ইতিহাস প্রধানতঃ যুদ্ধবিগ্রহেরই ইতিহাস। এই যুদ্ধ দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন রাজ্যের সাথে সংঘটিত হলেও প্রধানতঃ হয়েছে বিজয়নগরের পাশাপাশি উত্তরে বাহমনি রাজ্যের সুলতানদের সাথে। উভয় রাজ্যের মধ্যবর্তী সমৃদ্ধশালী রায়চুর দোয়াবের উর্বর শস্যশ্যামলা অঞ্চল ও দুর্গের অধিকার উভয়কে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নামিয়েছে। এছাড়া বিজয়নগরের কয়েকজন নৃপতি পোর্তুগীজ বণিকদের সহায়তায় ঘোড়া আমদানির বাণিজ্যে বাহমনিকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। তাই বাহমনির পাঁচটি রাজ্যের প্রতিশোধ স্পৃহা আগুনে ইন্ধন দেয়। কৃষ্ণদেব রায়ের আমল থেকেই পোর্তুগীজদের সাথে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তিনি পোর্তুগীজ আলবুকার্ককে ভাতকূলের দূর্গ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন। পোর্তুগীজ পর্যটক পায়েস কৃষ্ণদেব রায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সেই সময়ে ভারতের সাথে সমুদ্রপথে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারে পোর্তুগীজরা ছিল অগ্রগণ্য। কৃষ্ণদেব রায় তাঁদের সাহায্যে পারস্য ও আরব থেকে ঘোড়া আমদানি করতে শুরু করেন। অপরদিকে পোর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ দাক্ষিণাত্যের সুলতানশাহীগুলিতে এই ঘোড়া আমদানির ব্যাপারে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেন। এর ফলে বিজয়নগর একটার পর একটা যুদ্ধে জয়লাভ করতে থাকে, এটা বিশেষ করে ঘটে ওই সময়ে অশ্বারোহী বাহিনীগুলি ভারতীয় সেনাবাহিনীগুলির মেরুদণ্ডস্বরূপ হয়ে

ওঠে। ইতিপূর্বে ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির পক্ষে ইসলাম ধর্মাবলম্বী অন্যান্য বন্ধুদেশ —যেমন আরব ও পারস্য থেকে ঘোড়া আমদানীর পথে কোনই অসুবিধা ছিল না। কিন্তু তখন ভারত মহাসাগর ও পারস্য উপসাগরে পোর্তুগীজ নৌ-শক্তির আবির্ভাবের ফলে বদলে গিয়েছিল সবকিছু। অতঃপর পোর্তুগীজদের সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করছিল ভারতের কোন রাজ্যকে সমুদ্রপার থেকে ঘোড়া আমদানি করতে দেওয়া হবে।

কৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব রায় সিংহাসনে বসেন (১৪৪৩-৬৭) কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ছিল ত্রাী শাসকগোষ্ঠীর নেতা মন্ত্র রামরাজার হাতে। রামরাজা দাক্ষিণাত্যের মুসলিম শক্তিগুলির পরস্পর পরস্পরের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিতে সমর্থ হন। তিনি পর্তুগীজদের সঙ্গে এক বাণিজ্য চুক্তি করেন। ফলে বিজাপুর সুলতানকে ঘোড়া সরবরাহ করা বন্ধ হয়ে যায়। প্রধানতঃ—অশ্বারোহী সৈন্যদের সাহায্যে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে তিনি বিজাপুর সুলতানকে পরাস্ত করেন। তারপর গোলকুণ্ডা ও আহম্মদনগরের সুলতানদেয় পরাস্ত করবার জন্য বিজাপুরের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। এ থেকে মনে হয় যে এই তিন শক্তির মধ্যে বিজয়নগরের অনুকূলে শক্তিসাম্য বজায় রাখা ছাড়া রামরাজার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। অবশেষে এই তিন শক্তি একত্রে মিলে ১৫৬৫ সনে তালিকোটার নিকটি বাণীহাটিতে বিজয়নগরকে মারাত্মকভাকে পরাস্ত করে। রামরাজা বন্দ হয়ে নিহত হন। বাণীহাটির যুদ্ধে বিজয়নগরের গৌরবময় যুগের অবসান ঘটে।

আরবীডু বংশ ঃ তালিকোটার বিপর্যয়ের পর বিজয়নগরের রাজবংশ পেনুগোণ্ডায় পালিয়ে যান। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে রামরায়ের ভ্রাতা তিরুমল সেখানে আরবীডু-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বছর পর রাজধানী চন্দ্রগিরিতে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু এই নতুন বংশের শক্তি বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। কালক্রমে রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিজয়নগরের শাসন-ব্যবস্থা, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ

বিজয়নগরের সম্রাটগণ এক কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শাসন-ব্যবস্থা প্রধানত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, দুইভাগে বিভক্ত ছিল। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তা ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্রাট স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। প্রজার মঙ্গল ও জনমতের প্রতি বিজয়নগরের সম্রাটগণ কখনও উদাসীন ছিলেন না। কৃষ্ণদেব রায় রচিত 'আমুক্ত মাল্যদা' নামক গ্রন্থে রাজকর্তব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, শাসনকার্যে সম্রাট ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হবেন। প্রজাবর্গের উপর পরিমিত করভার স্থাপন করা, প্রজাবর্গের প্রতি উদারতা প্রদর্শন এবং তাদের নিরাপত্তা বিধান করা হবে সম্রাটের প্রধান কর্তব্য। সুতরাং একথা মনে করা যেতে পারে যে বিজয়নগরের সম্রাটগণ এই সকল আদর্শ সম্মুখে রেখে রাজ্যশাসন করতেন।

বেশ কয়েকটি সামন্ত রাজ্যের অস্তিত্ব স্বত্বেও বিজয়নগর সাম্রাজ্য দক্ষিণ-ভারতের পূর্ববর্তী রাজ্যগুলির চেয়ে ছিল অধিক পরিমাণে কেন্দ্রীভূত শাসনের অধীন। সাম্রাজ্যের অধিপতি 'মহারাজা' নামে পরিচিত হলেও প্রায়শই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকত রাজ্যের মন্ত্রী বা 'মহাপ্রধান'-এর হাতে। 'মহারাজার' অধীনে থাকত প্রকাণ্ড এক রাষ্ট্র-পরিষদ, তাতে সভাসদরা ছাড়াও সদস্য হিসেবে থাকতেন প্রধান প্রধান সামন্ত-ভূস্বামী ও বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সরাসরি দায়ী থাকতেন 'মহাপ্রধান'-এর কাছে। এই শাসনকর্তাদের কাজ ছিল রাষ্ট্রীয় তালুকগুলি থেকে খাজনা আদায় করে তা' রাজকোষে জমা দেওয়া-এবং সামন্ততান্ত্রিক, 'অমরনায়ক' ভূস্বামী ও সামন্ত-রাজন্যবর্গের কাছ থেকে রাজকর আদায় করা। আদায়ীকৃত ভূমি-রাজস্বের অল্প কিছু অংশ তাঁদেরও প্রাপ্য হোত। রাজ্যের প্রদেশগুলিকে তখন ভাগ করা হয়েছিল এক একজন রাজকর্মচারীর শাসনাধীনে কয়েকটি করে জেলায়।

কিছু কিছু শর্তাধীনে রাষ্ট্রীয় জমি দান করা হোত যোদ্ধাদের, তাঁদের রাজসেবার বিনিময়ে পুরস্কার স্বরূপ। 'অমরনায়ক'দের সঙ্গে 'ইকতাদার'দের, প্রভেদ ছিল এইখানে যে 'অমরনায়ক'রা-নিজেরাই কৃষকদের ওপর ধার্য রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিতে পারতেন। এছাড়া জমি হস্তান্তর করণেরও অধিকার তাঁদের ছিল। 'অমরনায়ক'রা নিজেরা যে রাজকর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন তার সঙ্গে কৃষকদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য রাজস্বের পরিমাণের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের রাজকরের পরিমাণ নির্ভর করত রাজসভায় তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভাবের ওপর। সচরাচর 'অমর নায়করা তাঁদের তালুক থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ রাজকোষে জমা দিতেন, সৈন্যবাহিনী পোষণের যাবতীয় খরচ-খরচা তা থেকে বাদ দেবার পরেই। তবে 'অমরনায়ক'রা এ-বাবদ খরচ কমাতেন এবং ক্রমশ তারা অনেক কম সংখ্যায় পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করতে শুরু করেন। নীতিগতভাবে 'অমর-নায়ক'রা তাদের ভূসম্পত্তি বংশপরম্পরায় ভোগ দখল করার অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিজয়নগরের গোটা ইতিহাস জুড়ে এই সমস্ত ভূসম্পত্তি প্রায়শই এক একটি ভূস্বামী পরিবারের দখলে আগাগোড়া থেকে যেতে দেখা গিয়েছিল। অমরনায়কদের সেনাবাহিনীর অন্তর্গত ছোট ছোট সৈন্যদলের অধিনায়করাও হয় 'অমরনায়ক'দের কাছ থেকে আর নয়তো খোদ রাজার কাছ থেকে দান হিসেবে জমি পেতেন।

প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তির মালিকানার মধ্যে ওই সময়ে মন্দিরগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাধারণতঃ সেগুলি হয়ে দাঁড়াত আশে-পাশে এক একটা এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এক-একটি কেন্দ্র। আনুষ্ঠানিক পূজা-পার্বণ উপলক্ষ্যে তীর্থ-যাত্রীরা ভিড় করে আসতেন মন্দিরগুলিতে; তখন মন্দিরের আশে-পাশে মেলাও বসে যেত। কারুশিল্প বণিকরা মন্দিরের কাছাকাছি বাস করতেন এবং মন্দিরগুলিও কখনও কখনও ব্যবসা-বাণিজ্যে ও মহাজনী কারবারে ভূমিকা গ্রহণ করত। কিছু কিছু কারুশিল্পী সরাসরি মন্দির সংক্রান্ত নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন, বিনিময়ে দ্রব্য সামগ্রীতে

বেতন পেতেন তাঁরা, উপরন্তু মন্দিরের দেবত্র জমিরও এক এক টুকরো-লভ্য হতো তাঁদের। কার্যক্ষেত্রে এইসব জমি বংশানুক্রমে ভোগ দখল করা চলত, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের সেবার কাজটিও হোত বংশানুক্রমিক। মন্দিরগুলি ছিল শাসকশ্রেণীর ক্রমোচ্চ স্তর-বিন্যাসের একটি অংশ সেগুলি ঊর্ধ্বতম সামন্ত-ভূস্বামীকে কর দিত, আবার সেগুলিরও ছিল নিজ নিজ অনুগত ভূস্বামী যাঁরা বাধ্য থাকতেন বিদেশী সেনাবাহিনী বা দস্যুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে লোকবল যুগিয়ে মন্দির রক্ষা করতে। গ্রামীণ সমাজের বিপুলসংখ্যক সদস্য অল্পকালের মধ্যেই পরিণত হলেন মালিকের ইচ্ছাধীন ভাড়াটিয়া প্রজার ('পায়াকারি'তে) যাঁরা ফসলের একটা অংশের বিনিময়ে জমি চাষ করতেন। এই 'পায়াকারিরা' প্রায়ই ভূস্বামীর কাছে ঋণে আবদ্ধ থাকতেন এবং যে জমিতে তাঁরা চাষ আবাদ করতেন তা যখন হস্তান্তরিত হয়ে যেত তখন ভূমিদাসদের মতো তাঁরাও নূতন ভূস্বামীর প্রজায় পরিণত হতেন। অবস্থার এই অবনতির ফলে কৃষকদের মধ্যে সময়ে সময়ে অসন্তোষ দেখা দিত। সাধারণত, কৃষকদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁদের এই প্রতিবাদ প্রকাশ পেত'; তবে ১৩৭৯, ১৫০৬ ও ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে বড় বড় কৃষক বিদ্রোহ দমনের উল্লেখও পাওয়া যায়।

সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের ক্ষমতা নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয়, শহরগুলিতেও। শহরগুলির প্রশাসন তখন পরিচালনা করতেন কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষের নিযুক্ত করা শাসনকর্তারা (ইতিপূর্বে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী)। বিভিন্ন জাতির লোকজনকে নিয়ে গঠিত নগর পরিষদগুলির পরিবর্তে এবং সমুদ্র-বন্দর ও বাজারগুলির দেয় শুল্ক নির্ধারণ ও তা আদায়ের ভার নিয়েছিলেন সামন্ত ভূস্বামী ও কুসীদজীবী মহাজনরা। বিজয়নগর রাজ্যে এই সামন্ত ভূস্বামীদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা ক্রমশ ধনী হয়ে ওঠেন।

বিজয়নগরের গৌরব : বিজয়নগরের সমৃদ্ধি ও সভ্যতার বিষয়ে বহু বৈদেশিক পরিব্রাজকের বিবরণ পাওয়া যায়। এই পরিব্রাজকদের মধ্যে ইটালীয় কন্টি এবং পোর্তুগীজ নুনিজ প্রধান। পারস্যের দূত আবদুল রজ্জাকও একটি বিবরণী লিখে গেছেন। এই সকল বিবরণী থেকে জানা যায়—বিজয়নগর ছিল তখন এক বিরাট সভ্যতার কেন্দ্র। নগরটি প্রায় ৬০ বর্গ মাইল জুড়ে অবস্থিত ছিল। নগরের চারদিকে পর্বতময় বেষ্টনী ছিল। নগরের মধ্যে রাজপ্রাসাদ আবার ৭টি প্রাচীরে ঘেরা ছিল। নগর-বেষ্টনীর মধ্যে কৃষিক্ষেত্র উদ্যান, বাজার ও অট্টালিকাশ্রেণী অবস্থিত ছিল। পানীয় জল সরবরাহের জন্য তুঙ্গভদ্রা নদীতে একটি প্রকাণ্ড বাঁধ ও সেই সঙ্গে একটি বিরাট জলাশয়ও নির্মিত হয়েছিল। জলাশয়টি আয়তনে ১৫ বর্গ মাইল ছিল।

বিজয়নগরের বিপুল আয়তন ও শহরের চারিপাশে সাতটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুর্গ-প্রাকার, তার বিশাল জনসংখ্যা, বাজার ও মণিকারদের মহল্লাগুলির ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং আমোদ প্রমোদের ঢালাও ব্যবস্থা ছিল। অন্যদিকে, পোর্তুগীজ ইতিহাসবেত্তা নুনিজের ভাষায় কৃষকরা বাধ্য হচ্ছিলেন তাঁদের উৎপন্ন ফসলের নয় দশমাংশ 'অমরনায়ক'দের দিতে আর

'অমরনায়ক'রা রাজাকে দিচ্ছিলেন তাঁদের আয়ের এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক। মনে হয়, নুনিজ এখানে কৃষক বলতে 'পায়াকারি'দেরই বুঝিয়েছেন।

গ্রামগুলির একটা প্রধান অংশ ছিল ব্রাহ্মণ সভাগুলির কর্তৃত্বাধীন। প্রায়শই এই ব্রাহ্মণরা কর্তৃত্ব করতেন খুবই ছোট ছোট এলাকার উপর, এক একটি গ্রাম এমন কি একশো জন পর্যন্ত ব্রাহ্মণের এক্তিয়ারভুক্ত হতে পারত। তা সত্ত্বেও এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ ভূস্বামী, কেননা এঁদের হয়ে জমি চাষ করে দিতেন ভাড়াটিয়া প্রজা কিংবা অস্পৃশ্য জাতির লোকজন। এই খেত মজুরদের ব্রাহ্মণেরা ভূমিদাসের চেয়ে বেশি কিছু মনে করতেন না।

পূর্ববর্তী যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক বড় বড় গ্রামীণ সমাজ ইতিমধ্যে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সাধারণভাবে সেগুলি এক-একটি গ্রামের জমি জায়গার ভিত্তিতেই গঠিত ছিল। আবাদী জমিগুলি ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে গিয়েছিল, পতিত জমিগুলিই ছিল কেবল গ্রামীণ সমাজের যৌথ সম্পত্তি এবং নিষ্কর। তামিলনাড়ুতে জলসেচের ব্যবস্থাযুক্ত প্রচুর জমি ছিল এবং প্রায়শই সেগুলিকে ভাগ বাঁটোয়ারা করা হত সুরতি বা লটারীর সাহায্যে, কেননা অপেক্ষাকৃত খরার বছরে উঁচু ডাঙা জমিগুলি যথেষ্ট পরিমাণে জল পেত না।

'অমরনায়ক'রা তাঁদের আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন, ফলে খাজনার মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে মনে হয়। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সিদ্ধান্ত করা হয় যে দেয় খাজনা আদায় দিতে হবে মুদ্রায়। এর ফলে কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। প্রাপ্ত উৎকীর্ণ লিপিগুলি দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, কিছু কিছু গ্রামীণ সমাজ তখন গ্রামের জমির একাংশ বিক্রি করে দিতে কিংবা সরাসরি বাস উঠিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ওই সময়ে সমাজের সদস্যরাও তাঁদের পূর্ব অধিকার হারাতে শুরু করেছিলেন। 'অমরনায়ক'রা গ্রামের মোড়ল ও পুঁথি লেখক নিযুক্ত করতেন। গ্রামীণ সমাজের সদস্যের ('কস্যচি'র) সম্পত্তিতে সত্যিকার অধিকার ক্রমশঃ বেশি বেশি করে এই তথ্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল যে, এমন কি দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও জমিতে তাঁর অধিকার ফিরে পেতে পারেন।

বিজয়নগরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্পর্কে বিদেশী পর্যটকগণ তাদের বর্ণনায় পঞ্চমুখ ছিলেন। বিজয়নগরের অধিবাসীগণ মণিমুক্তা অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করতেন। পর্তুগীজ পর্যটক পাত্রস রাজকোষের অতুলনীয় ঐশ্বর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বিজয়নগরকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা খাদ্যদ্রব্যে সমৃদ্ধ নগরী রূপে আখ্যায়িত করেছেন। কৃষি ছিল জনসাধারণের প্রধান জীবিকা। সাম্রাজ্যের সর্বত্রই কৃষির সুবিধার্থে সেচব্যবস্থার মাধ্যমে শস্যের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। জমিদার শ্রেণীর ক্ষমতার বিস্তারে এবং শোষণ নীতির ফলে কৃষকের জীবনে তেমন স্বচ্ছলতা ছিল না। সমৃদ্ধশালী কৃষির উপর ভিত্তি করে সাম্রাজ্যে শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, খনিশিল্প প্রভৃতি জনসাধারণের জীবনযাত্রার

মানকে যথেষ্ট উন্নীত করে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্র র মূল্যও ছিল খুব কম। সোনা, রূপা ও তামার প্রস্তুত মুদ্রা ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপেও বিজয়নগর ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানকার বণিকগণ, পেগু, চ ন, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে মণি-মুক্তা, রেশম এবং মালাবার (কালিকট) থেকে কর্পূর, গোলমরিচ, চন্দন প্রভৃতি আমদানী করতেন। আব্দুর রজ্জাকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে প্রায় তিনশ' বাণিজ্য বন্দর ছিল।

বিজয়নগরের সমাজ জীবনে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সর্বোচ্চে। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। স্ত্র জাতির যথেষ্ট সম্মান ছিল। পর্তুগীজ পর্যটক নুনিজের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বিজয়গনরের সম্রাটগণ স্ত্রী মল্লযোদ্ধা পোষণ করতেন। স্ত্রী-জ্যোতিষীর সংখ্যাও ছিল প্রচুর। আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্যই অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তবে ব্রাহ্মণগণ ছিলেন নিরামিষভোজী। এখানকার অনেক রাজাই ছিলেন বৈষ্ণব কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে কোন অসহিষ্ণুতা ছিল না।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ঃ বিজয়নগর সাম্রাজ্য হিন্দু সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। সম্রাটগণের পৃষ্ঠ-পোষকতায় সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল ও কানাড়ি ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। কৃষ্ণদেব রায়ের সভায় ছিলেন অষ্ট-দিগগজ। কৃষ্ণদেবরায় নিজেও ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক। তিনি 'আমুক্ত মাল্যদা' নামে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বেদের টীকা রচয়িতা সায়নাচা , তার ভাই মাধবাচার্য এবং ভক্তিতত্ত্বের পণ্ডিত ব ভাচার্য ছিলেন বিজয়নগরের গৌরব। শিল্পস্থাপত্য ক্ষেত্রেও বিজয়নগরের উৎকর্ষ সবার প্রশংসা অর্জন করেছিল। তালিকোটার যুদ্ধের (১৫৬৫ খৃঃ) ধ্বংসাবশেষে আজও রয়েছে হাম্পিতে (হস্তিনাবতী শিল্প স্থাপত্যের নিদর্শন। কৃষ্ণদেব রায় নির্মিত বিখ্যাত 'হাজার মন্দির' স্থাপত্যশিল্পের আর এক সুন্দর নিদর্শন। বিঠল স্বামী মন্দিরটিও স্থাপত্য-উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। সম্রাটগণ নিজেরা হিন্দুধর্মাবলম্বী হলেও ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন উদার, ফলে বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান খ্রীষ্টান ও ইহুদীগণ নিজ নিজ ধর্মপালনের স্বাধীনতা ভোগ করতেন।

১০। সুলতানীযুগে ভারতে ইসলামী সভ্যতার প্রভাব :—

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় যে-শক, হুণ, পহ্লব, ব্যাকট্রিয় গ্রীক প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণকারীরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয়ী উদারতার ধারায় অবগাহন করে আপন আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে হিন্দুসমাজের মধ্যে বিল ন হয়ে গেছেন। এর ফলে হিন্দু সমাজ ও সভ্যতার সমৃদ্ধি ঘটেছে এবং এই সব জাতির আলাদা অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে তাঁরা ভারতীয় হয়ে গেছেন। কিন্তু মধ্যযুগের আদি পর্বে ইসলামধর্মী মুসলমান আক্রমণকারীদের ক্ষেত্রে ঠিক এরূপটি ঘটে নি। কারণ ইসলামীয় প্রবল প্রাণশক্তিকে হিন্দুসভ্যতার পক্ষে আত্মস্থ করা সম্ভব হ নি। হিন্দুধর্ম ও ইসলামধর্মের, হিন্দুসমাজ ও মুসলমান সমাজের আচার অনুষ্ঠান ও দার্শনিক চিন্তার মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা থাকায়,

দুই ধর্ম ও দুই সমাজ পরস্পর একাত্ম হয়ে মিলেমিশে যেতে পারে নি। দুটি সমাজই ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে সমান্তরাল গতিতে। মুসলমানগণ এদেশে যখন আসেন তখন তাঁরা এক সুনির্দিষ্ট ধর্ম, কর্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহারের সাংস্কৃতিক পসরা নিয়ে আসেন। তাঁদের বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতিও ছিল হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র। উপরন্তু মুসলমানগণ ছিলেন বিজাতীয়। ভারতীয়দের সাথে বিজয়ী মুসলমানদের রাজনৈতিক সম্পর্ক মাঝে মাঝে প্রবল সংঘর্ষে পরিণত হয়েছিল। প্রথমদিকে রাজনৈতিক বিরোধের সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম সংক্রান্ত সংঘর্ষও প্রবল আকার ধারণ করেছিল। বস্তুতঃ মুসলমানদের বিজয়-অহঙ্কার ও ধর্মান্ধতা প্রথমদিকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগের পথে অন্তরায় হয়ে উঠেছিল।

বিশ্বাস ও রীতিনীতি পালনে মিলিত হবার চেষ্টা চলেছে অবাধে। অবশ্য সমন্বয় ও সংঘাত দুই-ই পাশাপাশি চলেছে। তবে অঞ্চল বিশেষ বা সময় বিশেষে কখনও সমন্বয় কখনো সংঘাত কম বা বেশী হয়েছে।

খৃষ্টীয় তেরো শতকের গোড়ার দিকে দিল্লীতে সুলতানীর প্রতিষ্ঠা ভারতে সংস্কৃতির বিকাশে এক নূতন দিগন্তের সূচনা করে। প্রথমেই একথা বলে রাখা ভাল যে—তুর্ক-আফগান অভিযানকারীরা যদিও বাগদাদ, কায়রো, কর্ডোভার সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী ছিলেন না, তা বলে কিন্তু অসভ্য বা বর্বরও ছিলেন না। এই সময়ে আরব-পারস্য সংস্কৃতি ছিল উৎকর্ষের শীর্ষে। এই সংস্কৃতি ইসলাম জগৎ মরক্কো ও স্পেন থেকে আরম্ভ করে ইরাণ ও তার সন্নিহিত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের অবদান কম ছিল না। এদেশে তুর্কী আফগানগণ যখন আসেন তখন যে শুধুই ইসলামধর্মের প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল তাই নয়। শাসন-ব্যবস্থা, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাদের বেশ ধারণা ছিল। ভারতীয়দের যুগভর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাহিত্য শিল্প ও স্থাপত্য সম্পর্কে সমুন্নত ধ্যান-ধারণার সাথে তুর্ক-আফগান ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণে শেষ পর্যন্ত এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এই সংমিশ্রণের কাজ চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে বহু উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে। যেখানে উভয় পক্ষ তাদের মতবাদে অটল সেখানেই পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি ও সংঘাত। তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাবুঝির চেষ্টা হয়েছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন শিল্প ও স্থাপত্যে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে, এমনকি প্রথা ও উৎসব-অনুষ্ঠানে সংস্কৃতির সমন্বয় হতে থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্রে হিন্দুদের স্থানঃ মুসলমান রাষ্ট্রে অ-মুসলমান প্রজাবর্গকে জিম্মি (Zimmi) বলা হয় ; অর্থাৎ কতকগুলি সর্তাধীনে মুসলমান রাষ্ট্রে অ-মুসলমান প্রজাবর্গ বসবাসের অধিকার লাভ করত। ইসলামী আইন-প্রণেতাদের মতে, "যে জিজিয়া কর প্রদান করে এবং মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে সে জিম্মি নামে পরিচিতি লাভ করে।" মুসলমানগণ ভারত জয় করলে হিন্দুদের কাছে তিনটি পথ খোলা ছিল—যথা ধর্মান্তর গ্রহণ, জিজিয়া কর প্রদান ও মৃত্যু। এই অবস্থায় অনেকেই

প্রাণের মায়ায় জিজিয়া কর প্রদানে স্বীকৃত হয়েছিল। দিল্লীর সুলতানগণ অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে হিন্দুদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করতেন এবং একে ইসলাম ধর্মের এক প্রধান অনুশাসন বলে মনে করতেন। হিন্দুদের মধ্যে কেবলমাত্র নাবালক, বিধবা, ক্রীতদাস ও ব্রাহ্মণগণই জিজিয়া কর হতে রেহাই পেতেন। একমাত্র ফিরোজ তুঘলকের আমলেই ব্রাহ্মণদের উপর জিজিয়া কর ধার্য হয়েছিল। হিন্দু নির্যাতন কোন কোন মুসলমান আইনজ্ঞ কর্তৃকও সমর্থিত হত। হিন্দুদের উপর কিরূপ আচরণ করা উচিত আলাউদ্দিন খিলজীর এই প্রশ্নের উত্তরে কাজী মুগিসউদ্দিনের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, "হিন্দুদের একমাত্র কর্তব্য হল কর প্রদান করা, রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীগণ হিন্দুদের নিকট রৌপ্যমুদ্রা দাবী করলে হিন্দুদের উচিত কোনরূপ প্রতিবাদ না করে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা ; ঈশ্বর হিন্দুদের জন্য চরম দুর্দশা ও দুঃখই বিধান করেছেন—।"

একথা অস্বীকার করা যায় না যে আলাউদ্দিন খিলজী, ফিরোজ তুঘলক ও সিকন্দর লোদি প্রভৃতি সুলতানগণ হিন্দুদের অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন করে তাদের ধর্মের উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে সুলতানগণ হিন্দুদের সম্পূর্ণ বিনাশ করার কোন প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনা কখনও গ্রহণ করেননি। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল এই যে তাঁরা রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে হিন্দুদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করার কোন চেষ্টা করেননি। অপরদিকে উলেমাদের ধর্মান্ধতা ও সুলতানী শাসনের সংকীর্ণতা হিন্দুদের মনে গভীর বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছিল। এই কারণেই হিন্দুগণ সন্তুষ্টচিত্তে ইসলামী শাসন গ্রহণ করতে পারে নি এবং সময় সময় বিদ্রোহী হতেও দ্বিধা করেনি।

বিজয়ের পর্বে হিন্দুধর্ম নিঃসন্দেহে দুঃখ ভোগ করেছে। তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। হিন্দুমন্দির ও ঐশ্বর্য লুণ্ঠিত হয়েছে। মুসলমান আক্রমণকারী-দের ধর্মান্ধতা ও উদ্ধত আচরণ হিন্দুসমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এছাড়া মুসলমানদের ভারতীয় সমন্বয়ী ধর্মভিত্তিক একমুখী বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তাতে নমনীয়তার অভাব ছিল যথেষ্ট। অপর দিকে হিন্দুসমাজেও রক্ষণশীলতাপ্রসূত সংকীর্ণতা সংস্কৃতিকে করেছে অনমনীয়। ফলে দুই সমাজের মধ্যে সামাজিক সংমিশ্রণের পরিবর্তে পার্থক্যই বেশী দেখা দিয়েছে। শাসকদের ভূমিকা প্রথমদিকে অবশ্য হিন্দু মুসলিম সমঝোতার পথে উদ্যোগ গ্রহণে তেমন প্রশংসনীয় নয়। তাঁদের প্রথমদিকের বিজয় পর্বে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাকে অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তি সংঘর্ষই ঘটিয়েছে। সুলতান যুগে হিন্দুরা রাজকার্যে নীচু পদে বহাল ছিলেন। ফিরোজ তুঘলকের ধর্মান্ধনীতি ইসলামী বিধিমতে ন্যায়বান হলেও হিন্দুধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ শাসক ও তার শাসিত সম্প্রদায় হিন্দুদের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে হানা দিয়ে বিগ্রহকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া 'ব্রাহ্মণদের উপর প্রথম জিজিয়া' কর চাপানো প্রভৃতির প্রতিবাদে হিন্দুদের মধ্যে বিক্ষোভ ও অভ্যুত্থান দেখা দেয়। এজন্য কেবল সুলতানদের নিন্দা করাই যথেষ্ট নয়। এই ত্রুটিই

ছিল ধর্মীয় নেতাদের প্রতি আক্রমণের যুগ। আলাউদ্দিনের সময় থেকেই ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব হ্রাস করার চেষ্টা হয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব নানা কারণেই বহাল থাকে। তাই ধর্মীয় সংকীর্ণতার জন্যে কেবল সুলতানদের মানসিকতাকেই দায়ী করা যায় না।

বিজয়ের পর্বে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির ধারা সমান্তরালভাবে বয়ে চলেছিল। একে অপরের সংস্কৃতির সান্নিধ্যে আসার মনোভাবে ছিল বিরূপ ধারণা। কিন্তু বিজয় উন্মাদনা যখন কমে আসতে শুরু করল তখন থেকেই দৃষ্টিভঙ্গীতে আসতে থাকে বাস্তববোধ। যেমন সুলতানদের অনেকেই শাসনের সুবিধার জন্য শাসিতের সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকেন এবং ধীরে ধীরে রাষ্ট্রনীতিরও পরিবর্তন সাধন করেন।

এছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েও সুলতানরা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধীরে ধীরে সামাজিক মেলামেশাকে যেমন বাধা দিতে পারেন নি তেমনি অর্থনৈতিক জীবনকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতেও পারেন নি। হিন্দু রক্ষণশীলতা থেকে উদ্ভূত স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যতারূপ সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে ইসলামের সহজ সরল আচার আচরণের আকর্ষণ হিন্দুদের মধ্য থেকে বহুসংখ্যক লোককে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পথে প্রভাব ফেলেছে। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির পরস্পর নৈকট্য ঘটিয়েছে প্রাদেশিক রাজ্য যেমন—লখনৌ, জৌনপুর, মাণ্ড প্রভৃতি। মুসলমান সমাজে বিবাহাদির বিষয়ে শ্রেণীগত বৈষম্যের প্রচলন এর উদাহরণ। মুসলমান সমাজের পর্দা-প্রথা সম্ভ্রান্ত হিন্দু রমণীদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল। হিন্দু সমাজের 'সতী' প্রথা মুসলিম স্ত্রীলোকদের প্রভাবিত করেছিল। মুসলমানদের আমলে ইসলামীয় প্রভাব থেকে হিন্দুদের রক্ষার জন্য হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা আগের চেয়ে অনেক কঠোর করা হয়েছিল।

অর্থনৈতিক জীবনে ভারতের কৃষি-নির্ভর চরিত্র মুসলিম আমলে অপরিবর্তিত ছিল। মুসলমান জায়গীর ও জমিদারের পাশে হিন্দু জমিদাররাও ছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্য মূলতঃ চালিয়েছে হিন্দু বণিক ও বৈশ্য সম্প্রদায়। মুসলিমরাও নগর এলাকায় দোকানপাট সাজিয়েছে। শাসনকার্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও অধিকাংশ মুসলমান ছিলেন। সুলতানী যুগে নীচের তলায় কর্মচারী পাটোয়ার, বক্সীরা ছিলেন হিন্দু। আমীর-ওমরাহদের দলাদলি ও ষড়যন্ত্রে হিন্দুদের ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয়, কিন্তু রাজ্য শাসনের ব্যাপারে হিন্দুরা সম্পূর্ণ অপাংক্তেয় ছিলেন না। কিন্তু নীচু তলার মানুষ কৃষক ও শ্রমজীবীদের অবস্থা অসহনীয় করভারে শোচনীয় ছিল। তাঁদের বেশীর ভাগই ছিল হিন্দু। মুসলমান কবি আমীর খুসরভ বলেছেন,— রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তা যেন দরিদ্র কৃষকদের রক্তবিগলিত অশ্রুকণা"। যাই হোক সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামীয় একনায়কত্বের মধ্যেও উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে নৈকট্য সৃষ্টি হচ্ছিল।

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি দিল্লীর কেন্দ্রীয় সুলতানরা শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। হিন্দু পণ্ডিতদের ধর্মালোচনায় উৎসাহ দিতেন আলাউদ্দিন খিলজী। কর্ণাটকের হিন্দু পণ্ডিত আচার্য মহাসেন এবং দিগম্বর জৈন পূর্ণচন্দ্র এবং শ্বেতাম্বর জৈন রামচন্দ্র সুরিকে

তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ফিরোজ তুঘলকের মধ্যেও উদারতা ছিল। তিনি প্রায় তিনশত সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর সময়ে কবি রাশেখর সম্মানিত হয়েছেন। সিকন্দর লোদাও কিছু কিছু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়েছেন। কিন্তু এ-থেকে একথা মনে করার কারণ নেই যে তাঁদের শাসনে সাধারণ হিন্দুরা নির্যাতিত হননি। বরং আলাউদ্দিন ও অন্যান্য সুলতানদের আমলে হিন্দুরা নিজ দেশেই বিদেশা বলে বিবেচিত হতেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে হিন্দুরা হৃতসর্বস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রাণস্পন্দন প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ করে রাজপুতানা ও বিজয়নগরে। নির্যাতিত হয়ে ইসলামীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে তাঁরা প্রতিরোধ করেছেন দুটি পথে, একটি প্রতিক্রিয়ার পথে ; আর একটি সমন্বয়ের পথ। ডঃ রায়চৌধুরী প্রমুখ ঐতিহাসিকেরাও বলেছেন যে হিন্দুধর্ম ইসলামকে আত্মীকরণ করতে পারে নি, কিন্তু হিন্দুধর্ম ইসলাম ধর্ম দ্বারা দুটি দিক থেকে প্রভাবিত হয়েছে। প্রথমটি হল ইসলাম ধর্মের আগ্রাসী নীতির প্রতিক্রিয়ারূপে হিন্দুধর্মে আচার-অনুষ্ঠানে রক্ষণশীলতার সৃষ্টি হয়েছিল, দ্বিতীয়তঃ ইসলামের গণতান্ত্রিক নীতিগুলি (সাম্য) হিন্দুসমাজ ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় প্রবেশ করে ভক্তিবাদ প্রভৃতি ধর্মসংস্কার আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল।

রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়া ঃ রাজনৈতিক পথে হিন্দুদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা সীমিত থাকে মাঝে মাঝে হিন্দু প্রজা ও জমিদার শ্রেণীর ব্যর্থ অভ্যুত্থানের মধ্যে। আঞ্চলিকভাবে রাজপুত রাজ্যগুলিতে এবং বিজয়নগর রাজ্যে হাম্মীর, কুম্ভ, কৃষ্ণদেব রায়, রামরাজা প্রভৃতি হিন্দু রাজারা হিন্দু ধর্মীয় আদর্শকে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন ইসলামীয় প্রভাবকে প্রতিরোধ করার জন্যই। কিন্তু সমাজে সংস্কারগত প্রতিক্রিয়াই হয়েছে বেশী। এই উপায়ে হিন্দুধর্ম আত্মরক্ষার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি নূতন করে সংগঠিত করে ইসলামীয় শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। বিজয়নগরের বিখ্যাত স্মৃতি শাস্ত্রকার মাধবাচার্য, স্মৃতিগ্রন্থের রচয়িতা বিশ্বেশ্বর, স্মৃতিকার রঘুনন্দন, মনুর ভাষ্যকার কুল্লুক ভট্ট, চন্দ্রেশ্বর প্রভৃতি রক্ষণশীল পণ্ডিতরা শিথিল হিন্দু সমাজকে সামাজিক বিভিন্ন অনুশাসনের মধ্য দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে চাইলেন। কারণ জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম থাকা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের ভিত্তি অনড় ছিল না। ফলে হিন্দু সমাজে অনাচার যেমন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তেমনি সমাজের অনুন্নত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের স্বল্পায়াসেই মুসলমানরা ধর্মান্তরিত করতে পারতেন। বলপ্রয়োগের দ্বারা হিন্দুদের সর্বনাশ ত' ছিলই। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে এই বিপর্যয় ভয়াবহরূপে দেখা দিয়েছিল। পূর্বভারতে স্মার্ত বা স্মৃতি-শাস্ত্রকার রঘুনন্দন (শ্রী চৈতন্যের সমসাময়িক) তাই 'অষ্ট বিংশতি তত্ত্ব' গ্রন্থে অনেক কঠোর সামাজিক বিধান প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু জাতি-বর্ণ-আচার-বিচারের শুদ্ধতা সম্পর্কে কঠোর বিধির দ্বারা হিন্দুধর্ম আপাতত রক্ষা পেলেও, ক্রমে অস্পৃশ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষের ধর্মান্তরের পথ আরও সুগম হয়। কিন্তু এই পথে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের পক্ষে পেরে ওঠা সম্ভব হয় নি। এইভাবে দুটি শক্তিশালী সংস্কৃতি পরস্পরের সংস্পর্শে এসে মিশ্রিত ভাবধারার আদান-প্রদান শেষে সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির সমন্বয়।

সমন্বয় পথেঃ প্রতিরোধের সার্থক পথ হল সমন্বয়ের পথ। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ধর্মের মধ্যে সদ্গুণ ও মহৎ আদর্শের পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া এবং মিলন-মিশ্রণের পথেই এই সমন্বয় হতে পারে। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করার ফলে এবং মুসলমানগণের প্রাথমিক ধর্মান্ধতা কিছুটা উদার হলে ভারতীয় এবং ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হতে থাকে, যদিও উভয় সম্প্রদায়ের মৌলিক সত্তা বজায় থাকে। বরণীর ন্যায় ঐতিহাসিকগণ মুসলিম জগতে ভারতীয় স্থলতানদের গৌরব বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই ভারতে হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরের ধ্বংসসাধন, হিন্দুগণকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করণ বা উহাদের বিনাশ সাধন করার বহু অতিরঞ্জিত কাহিনীর অবতারণা করেছেন। একথা অবশ্য সত্য যে প্রথম দিকে হিন্দুগণকে নানা লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল এবং হিন্দুধর্ম নানাভাবে অসম্মানিতও হয়েছিল। মুসলমানদের বিজয়ী অহমিকা কিছুটা হ্রাস পেলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেই বিজয়ী স্থলতানগণকে বিজিত হিন্দুদের সহযোগিতা ও সমর্থন লাভে যত্নবান হতে হয়েছিল। ধর্মের ক্ষেত্রেও এইরূপ পারস্পরিক সহযোগিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। আলাউদ্দিন খিলজী ও ফিরোজ তুঘলকের ন্যায় স্থলতানগণ কর্তৃক হিন্দুধর্মের নেতাগণ সম্মানিত হয়েছিলেন এইরূপ প্রমাণ আছে।

তুর্কীদের ভারত আক্রমণের বহু পূর্বেই আরবগণ দক্ষিণ ভারতে বাণিজ্যের সূত্র ধরে সর্বপ্রথম বসবাস শুরু করে। সে সময় দক্ষিণ-ভারতে নব্য-হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। ধর্মীয় বিবাদ-বিসম্বাদ জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিহ্বল করে তুলেছিল। এই সন্ধিক্ষণে আরবগণ এক সুনির্দিষ্ট সহজ ও সরল ধর্মমত (ইসলাম ধর্ম) গ্রহণ করে দক্ষিণ ভারতে বসবাস শুরু করে। ফলে এক বিরাট সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কথিত আছে, মালাবারের হিন্দু রাজা পেরুমল স্বয়ং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর প্রজাবর্গকে এই ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করেছিলেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে মালাবারের স্থানীয় নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ-ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। তুর্কীদের আগমনের পূর্বেই পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে বিনা বাধায় ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বড় বড় কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের সময় হতে উত্তর ভারত ইসলামের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে হিন্দুধর্ম বিদেশাগত এক শক্তিশালী ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়। ইসলাম হিন্দুধর্মের দার্শনিক ভিত্তি ও সামাজিক কাঠামোর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। ইসলাম ধর্মীদের শৌর্য-বীর্য ও একেশ্বরে বিশ্বাস প্রভৃতি ক্রমেই ভারতীয়দের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে ইসলাম ধর্মের গণতান্ত্রিক আদর্শ, মুসলমান পীর ও দরবেশের নৈতিক পবিত্রতা, ও বদান্যতা, অবহেলিত ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত নিম্নবর্ণের হিন্দু জনগণকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল। শঙ্করাচার্যের সময় হতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামি ও হিন্দুধর্মের দার্শনিক মতবাদ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত অবহেলিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিম্নবর্ণের মধ্যে দারুণ

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামি হেতু সিন্ধুর বৌদ্ধগণ দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আরবদের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাতেও নি বর্ণের হিন্দুগণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য দলে দলে স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল। মুসলমান পীর, গাজ ও আউলিয়াগণ বাংলার গ্রামে গ্রামে বিধ্বস্ত হিন্দু মঠের সন্নিকটে 'দরগাহ্' স্থাপন করে নিরক্ষর ও দরিদ্র হিন্দু ও বৌদ্ধদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং ইহার ফলে হিন্দু সমাজেও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

যাহা হ'ক দুটি স্বতন্ত্র সভ্যতা পরস্পরের সংস্পর্শে এসে পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল। বস্তুতঃ ভারতে ইসলামী শক্তির আবির্ভাবের সময় হতে পরস্পরের সংস্কৃতির প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা জন্মেছিল। মুসলিম জগতের খ্যাতনামা মনস্বী ও ধর্মজ্ঞানীগণ ভারতেরই মধ্যযুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁরাই ইসলামী দর্শন ভারতে প্রচার করতে সাহায্য করেছিলেন। মুসলমান পীরদের প্রতি হিন্দুদের শ্রদ্ধা ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের প্রতি মুসলমানদের শ্রদ্ধা প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল। এই পারস্পরিক শ্রদ্ধার মনোভাব হতেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যপীরের পূজার প্রচলন শুরু হয়। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির মনোভাব হতেই মুসলিম রাজদরবারে সংস্কৃত সাহিত্যের সমাদর বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে বাংলার হুসেনশাহ্ ও কাশ্মীরের সুলতান জৈন-উল্ আবিদিনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হুসেনশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে হিন্দুধর্মগ্রন্থ মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। হুসেনশাহ ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু সুলতান। তাঁর আমলেই বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার শুরু হয়। ধর্মসহিষ্ণুতার জন্য তাঁকে বাংলাদেশের 'আকবর' বলা হয়ে থাকে। হুসেনশাহের পুত্র নসরৎ শাহ ও তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রীতির পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

হুসেন শাহের ন্যায় কাশ্মীরের সুলতান জৈন-উল আবিদিনও ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু ও উদার। তিনি হিন্দুগণকে 'জিজিয়া' কর হতে অব্যাহতি দান করেছিলেন। তাঁর ধর্মান্ধ পিতার আমলে যে সকল ব্রাহ্মণ কাশ্মীর ত্যাগ করেছিলেন জৈন-উল তাঁদেরকে পুনরায় কাশ্মীরে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত, রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থগুলি আরবী ও ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয় এবং বহু আরবী ও ফারসী গ্রন্থ হিন্দী-ভাষায় অনূদিত হয়। বাংলার হুসেনশাহের ন্যায় জৈন-উল আবিদিনকেও কাশ্মীরের 'আকবর' বলা হয়ে থাকে।

মুসলমান শাসক ও মুসলমান ধর্মপ্রচারক ও পীরগণ 'যোগ' 'বেদান্ত' প্রভৃতি হিন্দু দর্শনশাস্ত্র এবং হিন্দু চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অপরদিকে হিন্দু জ্যোতির্বিদগণও ইসলামী জ্যোতিষ শাস্ত্র হতে জ্ঞানলাভ করতে কখনও কুণ্ঠিত হননি। মুসলমান গ্রন্থকারগণ হিন্দুদের জীবন-প্রণালী ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বহু রচনা রেখে গিয়েছেন—যেমন মহম্মদ জায়সী রচিত পদ্মাবত্। হিন্দু গ্রন্থকারগণও ফার্সী ভাষায়

মুসলমানদের সাহিত্য সম্পর্কে বহু রচনা রেখে গেছেন—যেমন রায়ভানমলের গ্রন্থ। বহু মুসলমান কবি হিন্দী ভাষায় কবিতা রচনা করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে আমীর খসরুর নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে বহু হিন্দু কবিও উর্দু ভাষায় কবিতা রচনা করে গেছেন।

সামাজিক ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটেছিল। হিন্দু পরিবেশের মধ্যে বসবাস এবং হিন্দুদের সহিত বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে হিন্দু সমাজের বহু আচার-অনুষ্ঠান মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছিল। অপরদিকে রাজানুগ্রহ লাভের আশায় আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষালাভ করার ফলে হিন্দুদের মধ্যেও মুসলমান সমাজের আদব কায়দা প্রবেশ করেছিল। এইভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে উঠেছিল। স্থলতানী সাম্রাজ্যে হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় সত্তা বিনষ্ট হলেও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে হিন্দুদের সহযোগিতার প্রয়োজন মুসলমান শাসকগণ অনুভব করেছিলেন। শুধু সামরিক শক্তির সাহায্যে ভারতের ন্যায় এক বিশাল দেশকে শাসন করা যে অসম্ভব তা' মুসলমান শাসকগণ উপলব্ধি করেছিলেন। স্থতরাং রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে বহু হিন্দুকে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং হিন্দুগণও ক্রমে ক্রমে শাসন বিভাগে প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল। মালবে মেদিনী রায় ও তাঁর সহচরগণ উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ছিলেন; বাংলাদেশে হুসেনশাহের অধীনে পুরন্দর খাঁ, সনাতন, রূপ প্রভৃতি হিন্দু কর্মচারীগণ যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের স্থলতানগণের অধীনেও হিন্দু কর্মচারীগণ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন।

ভক্তিবাদের প্রসার ঃ ভক্তিবাদের সমন্বয়ী ধারাপথ দিয়েই এসেছিল ধর্মসংস্কারের আন্দোলন। এর মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে সমতা ও একেশ্বরবাদের চেতনা। স্থলতানী যুগের আগে থেকেই অর্থাৎ অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকেই প্রায় পাঁচ-ছয়শ' বছর ধরে ভারতের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে শংকরাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রমুখরা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন। শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা দুষ্কর ছিল। কিন্তু নিম্বার্ক প্রমুখদের মধ্য দিয়ে এই মতবাদ ক্রমশঃ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে চলে আসতে থাকে। সংস্কার প্রধান হিন্দুধর্মের জটিলতা ও সংকীর্ণতার জন্য সাধারণ মানুষের বোধগম্য সহজসরল ধর্মের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছিল। ইসলামের অনুপ্রবেশের জন্য এর প্রয়োজন আরও বেশী অনুভূত হল। রামানুজ, নিম্বার্কের মধ্য দিয়ে যে সংস্কার আন্দোলনের ধারা ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছিল তার পরিণতি ঘটেছিল ভক্তিবাদের উদ্ভবের মধ্যে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই অন্তরে ভক্তি থাকলে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারে এবং মানুষের প্রীতি ও ভালবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরকে ভালবাসা যায়—ভক্তিবাদ একথাই আচার সর্বস্ব হিন্দু সমাজের কাছে তুলে ধরেছিল। অবশ্য পুরাণের যুগ থেকেই এই ভক্তিবাদের স্থচনা হয়েছিল। ইসলামের একেশ্বরবাদও সমতার চেতনা ভক্তিবাদকে প্রভাবিত করেছে। এই সময় বৈষ্ণব ধর্মের জন্ম হল, সেখানে

মানবিক ধর্মের আদর্শ ই প্রাধান্য পেল। ভক্তিবাদ ও বৈষ্ণব অন্দোলনের মধ্য দিয়েই হিন্দুধর্ম আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল। ইসলাম ধর্মের গণতান্ত্রিক ও সমতার আদর্শের উত্তরে ভক্তিবাদী ও বৈষ্ণব সাধকরা হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে এই বাণী প্রচার করলেন যে সকলের উপরে মানুষ সত্য।

হিন্দু ধর্ম সংস্কার আন্দোলন এক নতুন রূপ নিয়ে এল ভক্তি আন্দোলনে। ইসলাম ধর্মে আছে সমতা ও একেশ্বরবাদ। ভক্তি আন্দোলনও এই মতের পক্ষে সাড়া জাগাল। ধর্মে কোন জাতিভেদ কিংবা বর্ণভেদ থাকবে না। কারণ ভগবানকে ভালবাসার অধিকার সকলেরই সমান। ধর্মসংস্কারকগণ ভগবানকে পাওয়ার উপায় হিসাবে মানুষকেই ভগবান মনে করে ভালবাসার কথা বললেন।

ভক্তি আন্দোলনে যাঁরা হিন্দু মুসলিম সাংস্কৃতিক মিলনের সার্থক প্রয়াসে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজন হলেন—রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, শ্রীচৈতন্য, নানক, মীরাবাঈ, নামদেব প্রভৃতি।

রামানুজ ঃ—ভক্তিবাদের মূল উৎসভূমি দক্ষিণ ভারতে এবং রামানুজ তার সার্থক বাহক ছিলেন। মাদ্রাজের কাছে শ্রীপেরুম্বুদুর নামে ছোট্ট একটি জায়গায় রামানুজের জন্ম হয়। তিনি হিন্দুধর্মে অর্থহীন অনুষ্ঠান আর আচার, এবং একই জাতিতে উঁচু নীচু প্রভেদের পরিবর্তে ভগবৎ প্রেম ও ভক্তির বাণী প্রচার করেন। এই মহাপুরুষের ভক্তির বাণী সাধারণ মানুষের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হল।

বৈষ্ণব সন্ন্যাসী রামানন্দ ছিলেন তাঁর শিষ্য। তিনি বারাণসীতে তাঁর গুরুর বাণী প্রচার করেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ভক্তি আন্দোলনের ছিল তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য—আস্তিক্যবাদ, বর্ণাশ্রমের অস্বীকৃতি এবং পারলৌকিক শান্তির জন্য প্রেমময় ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ। তিনি ব্রাহ্মণদের আধিপত্য অস্বীকার করে ঈশ্বর সাধনায় সবার অধিকারের কথা বললেন। তাঁর দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম ছিলেন মুসলিম সন্তান কবীর (জোলা)। তাঁর মতে হরি ও আল্লার বাসস্থান একই জায়গায়—মানুষের অন্তরে। তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর ভক্তিবাদী ধর্মমত প্রচারার্থে ভ্রমণ করেন।

কবীর ঃ ভক্তিবাদীদের মধ্যে কবীরের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। কবীরের রচিত ভক্তিগীতি আজও ধর্মপিপাসু হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে বিশেষ অনুপ্রাণিত করে। তিনি রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। মধ্যযুগীয় ধর্ম-সংস্কারক ও ধর্ম-প্রচারকগণের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি আছে। হিন্দু ও ইসলামীয় ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনই কবীরের প্রধান কীর্তি এবং কৃতিত্ব। তাঁর চিন্তাধারায় হিন্দু-ভক্তিবাদ ও মুসলিম সুফীবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুরা ভাগবানকে রাম ও মুসলমানগণ ঈশ্বরকে রহিম বলে ডাকলেও—ঈশ্বর এক ও অভিন্ন—তিনি এই মতবাদ প্রচার করতেন। সর্বপ্রকার গোঁড়ামি বাদ দিয়ে সকল ধর্মের মূল তত্ত্বকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এক কথায় তাঁর চিন্তায় মানবপ্রেম ও ঈশ্বরভক্তির সমন্বয় ঘটেছিল।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে বাহ্যিক আচরণগত পার্থক্য থাকলেও, দুই ধর্মের আদর্শগত বিভেদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। সাধন-ভজনের পথ যাই হোক না কেন সব ধর্মই এক,—এই ছিল কবীরের ভাবচিন্তা, ধর্ম-দর্শন। তিনি হিন্দী ভাষায় 'দোঁহার' আকারে তাঁর এই সমন্বয়ী ধর্মমত প্রচার করেন। এই দোঁহাগুলি দুইটি পদে রচিত হ'ত। তিনি উত্তরভারতে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। তখনকার উত্তর ভারতে কবীরপন্থী বহু সাধক ছিলেন।



কবীর

কবীরের মতবাদ ঃ কবীর বলতেন যে হিন্দুদের রাম আর মুসলমানদের আল্লাহ বা রহিম এক অভিন্ন। হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম ঈশ্বরের উপাসনার ভিন্ন দুটি পথ মাত্র। কবীর দুই লাইনে খুব সহজ ভাষায় দোঁহা রচনা করে তাঁর উপদেশাবলী প্রচার করেন। এই সমিল পদগুলি কবীরের 'দোঁহা' নামে পরিচিত।

জীবনকাল ঃ কবীর চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে অথবা পঞ্চদশ শতকের প্রথমে জীবিত ছিলেন। তাঁর জন্ম-জীবন রহস্যাবৃত। প্রচলিত কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, তিনি এক বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। জনৈক মুসলমান জোলার (তাঁতি) ঘরে তিনি লালিত-পালিত হন। তিনি বিবাহিত জীবনে জোলার কাজ করে জীবিকা অর্জন করতেন। তিনি পরিণত বয়সে রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

কথিত আছে যে, তিনি দেহরক্ষা করলে তাঁর দেহ সৎকারের বিধিব্যবস্থা নিয়ে হিন্দু মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। হিন্দু শিষ্যরা দাবী করেন, মৃতদেহ দাহ করা হবে ; মুসলমান শিষ্যরা প্রতিবাদে কবরস্থ করার দাবী জানাল। এইভাবে কলহ চরমে উঠলে শিষ্যরা শবদেহের আবরণ সরিয়ে দেখল সেখানে মৃতদেহ নেই, পরিবর্তে

একরাশ ফুল পড়ে আছে। তখন শেষকৃত্য সম্পাদনে কোন সম্প্রদায়ের শিষ্যদের আর কোন অসুবিধা থাকল না। এর ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। তবে এই গল্পের মধ্যে কবীরের সমন্বয়ী মতবাদের প্রতিফলন দেখা যায়।

শ্রীচৈতন্য ঃ সুলতানী শাসনের গোড়ার দিকে হিন্দুদের উপর অবিচার ও অত্যাচার চলত। জোর করে হিন্দুদের মুসলমান করা হত। অন্যদিকে তখনকার সমাজে ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার। তার উপর ছিল ছোট বড় জাতিভেদ-প্রথা, নানা ধর্মীয় কুসংস্কার। সমাজ ও ধর্মের যখন এরূপ বিকল অবস্থা, তখন বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব। তিনি একাধারে ধর্মপ্রচার ও সংস্কারের কাজে হাত দেন। তাঁর উদার ধর্মনীতি যেন 'আচণ্ডালে ধরি দেয় কোল'। এই ধর্মে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। তাঁর প্রবর্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম জাতিভেদপ্রথার প্রথম বাধা মুক্ত করেছিল। এতদিন যারা সমাজে, অস্পৃশ্য, পতিত ছিল, তারা আশ্রয় পেল বৈষ্ণবধর্মের আসরে। এমন কি যাদের জাত খোয়া গিয়েছিল তারা বৈষ্ণব-ধর্মাশ্রিত হয়ে আবার হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করল। এইভাবে সংস্কার ও সংগঠন, প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তখনকার সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের কাজ সমাধা করেছিলেন। এর প্রমাণ যবন হরিদাস। ইনি ছিলেন তাঁর অনুগত শিষ্য।

বাল্যজীবন ঃ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নানকের সমসাময়িক। বাল্যকাল হতেই তিনি অসাধারণ ধী-সম্পন্ন ছিলেন। বিদ্যাচর্চা আর ধর্মচিন্তায় তিনি বিশেষভাবে মগ্ন থাকতেন। নবদ্বীপে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর পিতার নাম ছিল জগন্নাথ মিশ্র। তাঁর মাতা শচীদেবী তাঁকে আদর করে 'নিমাই' বলে ডাকতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল **বিষ্ণুপ্রিয়া**।

শ্রীচৈতন্যের আসল নাম ছিল **বিশ্বম্ভর**। তাঁকে **গৌরাঙ্গ, নিমাই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য** প্রভৃতি নামেও ডাকা হত।

শ্রীচৈতন্যের নামকরণ ঃ মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে নিমাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। এর পর তাঁর নাম হয় **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**। তিনি ভগবৎপ্রেমে ব্যাকুল হয়ে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বাংলা, উড়িষ্যা, বৃন্দাবন ও দক্ষিণ ভারতের নানা তীর্থস্থান পরিক্রমা করে তাঁর উদার ধর্মমত প্রচার করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত' জীবনীগ্রন্থ তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের সাক্ষ্য বহন করছে। বৈষ্ণবরা মনে করেন যে তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার। তিনিই রাধার ভাব ও কান্তি নিয়ে নবরূপী কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি পুরীতে অতিবাহিত করেন। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেব ৪৮ বৎসর বয়সে পুরীর নীলাচলে দেহরক্ষা করেন।

শ্রীচৈতন্যের বাণী ঃ তাঁর প্রচারিত ধর্মমত বৈষ্ণবধর্ম নামে অভিহিত। আজও

বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম, বৃন্দাবন প্রভৃতি অঞ্চলে ঘরে ঘরে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। তিনি জাতিভেদপ্রথাকে দূর করে চণ্ডাল প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোককে তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় দেন। তাঁর প্রধান শিষ্য যবন হরিদাস ছিলেন ভূতপূর্ব মুসলমান।



শ্রীচৈতন্য

মানব-প্রেমকে তিনি সর্বোপরি স্থান দিতেন। তিনি সকল ব্যক্তি ও প্রাণীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব অনুভব করতেন। আচার-অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে কেবলমাত্র কৃষ্ণ-ভক্তির দ্বারা মানুষের মুক্তির কথা তিনি প্রচার করেন। সংকীর্তনের মাধ্যমে ভগবানে আত্মসমর্পণ ও ভগবৎ-সাধনার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম: শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ ভগবানই ছিলেন তাঁর আরাধ্য দেবতা। গভীর ভগবৎ-প্রেমের মাধ্যমেই মানুষ এই সংসার-মায়া হতে মুক্তিলাভ করতে পারে—এই হল শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী, বৈষ্ণবধর্মের মূল কথা। আর তাঁর ভগবৎ-প্রেম যেন রাধা-ভাবের সাধনা। অনেকটা যেন রাধার কৃষ্ণসাধনা।

সমাজ ও সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব: ভাগবতে রাধা-কৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গ আছে। সেই তত্ত্বকথা একদা বৈষ্ণবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি জয়দেবের গীত-গোবিন্দের মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের লীলাতত্ত্ব সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও, আমাদের সমাজ-জীবনে তার প্রভাব পড়ে নি। বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটল চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও ভাগবতের নূতন তত্ত্ব ব্যাখ্যার ফলে। তাঁর ব্যাখ্যাগুণে ও ব্যাপক প্রচারের ফলে বৈষ্ণবমতবাদ বাঙালীকে যেন বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করল। বৈষ্ণব কবিদের মনোজগতে এক গুরুতর পরিবর্তন দেখা দিল। চৈতন্যদেবের প্রেম-ভাব তৎকালীন বঙ্গদেশের সমাজ-জীবনেও আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এই মতবাদের ব্যাপক প্রসারের ফলে সৃষ্টি হল জীবনী-সাহিত্য, কড়চা এবং পদাবলী সাহিত্য। এইভাবে ব্যাপক সাহিত্য-সৃষ্টির সমারোহে দেখা দিল ভাবের বন্যা। তার ফলে যে সকল কবি ও পদকর্তাদের আবির্ভাব ঘটে, তাঁদের মধ্যে মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি কবিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময় ভাব-মধুর রসে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটে। এইভাবে বাংলাদেশের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্যদেব এক নবযুগের সূচনা করেন।

নানক

মধ্যযুগের ধর্ম-সংস্কারক ও প্রচারকদের মধ্যে নানকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গুরু নানক শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতারূপে সুপরিচিত। তিনি প্রায় শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের নিকট তালবন্দী গ্রামের এক ক্ষত্রিয় পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শিখ নামক নূতন ধর্মের প্রচারক হিসাবে তিনি ভারতের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হয়েছেন। 'শিখ' কথাটির অর্থ শিষ্য। তাই তাঁর ধর্মাবলম্বীরা শিখ নামে পরিচিত।



গুরু নানক

জীবনী ও বাল্যকাল: নানকের পিতা ছিলেন সামান্য ব্যবসায়ী। নানকও প্রথম জীবনে ব্যবসা ও রাজকার্যে অতিবাহিত করেন। প্রথমে কিছুকাল ব্যবসায়ে কাটাবার পর তিনি ধর্মকর্মে মনোযোগী হন। ব্যবসা করতে গিয়ে বহুবার তিনি নিজ অর্থ গরীব-দুঃখী, সাধু-সন্যাসীদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ধর্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ধর্মের মূল সত্য উপলব্ধির জন্য তিনি ভারতের নানা তীর্থ, বাগদাদ ও মক্কা পরিভ্রমণ করেন।

ধর্মমত: হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে ঐক্যসাধনের জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন।

নানক কোন জাতিভেদ মানতেন না। সকল ধর্মের সমন্বয় সাধনই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁর প্রচারিত ধর্ম 'শিখধর্ম' নামে পরিচিত। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল সৎভাবে জীবনযাপন এবং ঈশ্বরে অনুরাগ। তিনি ধর্মের বাহ্য আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান অপেক্ষা ভগবৎ-ভক্তি, সৎকার্য ও মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহারকেই বড় মনে করতেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিখধর্ম প্রথমে হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ বলে পরিগণিত হত। পরে শিখগণ হিন্দু সমাজ ও ধর্ম হতে পৃথক হয়ে যায়।

নানকের বাণী : নানকের বক্তব্য এই ছিল যে, আসলে হিন্দু মুসলমান বলতে কিছু নেই। সহনশীলতার কথাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। নানকের ধর্ম ছিল বস্তু এবং নীতি ভিত্তিক। তিনি উপনিষদের একেশ্বরবাদকে সহজ ও সরল ভাষায় সকলের নিকট প্রচার করেন। তিনি পৌত্তলিকতা ও পূজা-পার্বণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মের কুসংস্কারের নিন্দা করেন। এই পৃথিবী যাবতীয় অপবিত্রতার মধ্যে পবিত্র থাকে—এই ছিল তাঁর প্রধান বক্তব্য। ধর্মপথে যে গুরুর প্রয়োজনীয়তা আছে, তিনি সে কথাও উল্লেখ করেছেন। নানকের বাণী, মতবাদ সমস্তই 'গ্রন্থসাহেব' নামক শিখদের ধর্মগ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে।

মীরাবাঈ : আর একজন ভক্তিমতী মহীয়সী নারী হলেন মীরাবাঈ। ভক্তি আন্দোলনে তাঁর অবদান ছিল অসাধারণ। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর আরাধ্য দেবতা। তিনি সঙ্গীত রচনা করে তাঁর প্রাণের দেবতার উদ্দেশ্যে তা নিবেদন করতেন। সারা ভারতে আজও লোকে মীরার ভজন শুনলে মুগ্ধ হয়।

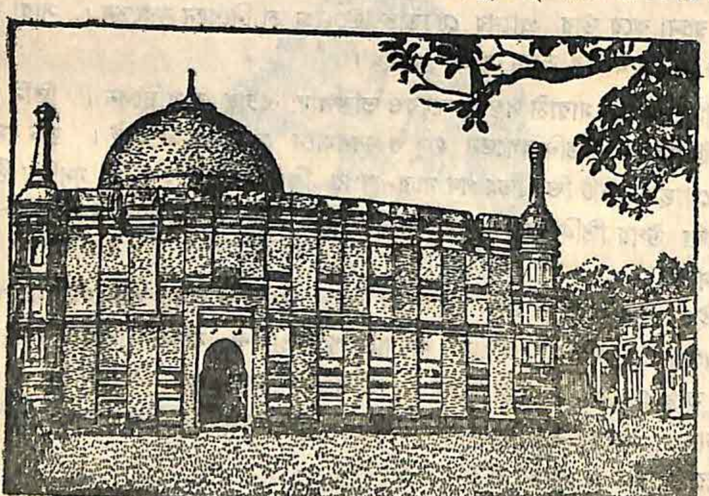
নামদেব : মারাঠী সন্ত নামদেবও ভক্তিবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। তিনি বলতেন হিন্দু ও মুসলমানে কোন প্রভেদ নেই। দুটি ধর্মই এক লক্ষ্যে পৌছবার দুটি ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র অপর কিছু নহে। হিন্দু ও মুসলিম প্রীতি ও সৌহার্দের উপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিধানের জন্য চেষ্টা করে গেছেন।

এইভাবে ভক্তিবাদের ধারা অবলম্বন করে আরও ভক্ত-সাধু-সন্ত যেমন রাজপুতনায় দাদু, মহারাষ্ট্রে নামদেব, তুকারাম, বাংলাদেশে নিত্যানন্দ, মিথিলায় বিদ্যাপতি প্রায় সারা দেশে ভক্তির জোয়ার এনেছিলেন। ভক্তিবাদী অপর এক বৈষ্ণব সাধক ছিলেন বল্লভাচার্য। এইসব ভক্ত সাধকদের জীবনের প্রধান ব্রতই ছিল হিন্দু মুসলমানদের বিরোধ দূর করে সৌহার্দ ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা।

সুফীবাদ : হিন্দুধর্মে যখন উদারনৈতিক সংস্কার চলছিল—তখন ইসলামেও উদারনৈতিক সংস্কার আন্দোলন 'সুফিবাদে' প্রকাশ পেয়েছিল। ইসলামের একেশ্বরবাদ যেমন হিন্দুধর্মকে প্রভাবিত করেছিল, তেমনি হিন্দুধর্মও ইসলামকে প্রভাবিত করেছিল। এরই ফলশ্রুতি হল ভারতের মাটিতে পারস্যের সুফিবাদের বিকাশ। বৈষ্ণবদের মতই সুফীরা গানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভজনা করেছেন। ভারতীয় বেদান্তের সর্বভূতে ব্রহ্মবাদ

এবং বৌদ্ধদের সাম্য, মৈত্রী, করুণা ও পরিব্রাজক জীবনের আদর্শ সুফী সাধকদের যেমন প্রভাবিত করেছিল, তেমনি বাইরের অন্যান্য আধ্যাত্মিক দর্শনের প্রভাবে সুফীবাদে বিশ্বমানবিকতার আদর্শ সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রতিমা পূজা সুফীদের জিকর পদ্ধতির স্বরূপ। সুফী সাধকরা ভারতে হিন্দু জনসাধারণকে ইসলামের মূল মানবিক আদর্শ ও সমতার কথা সহজ সরলভাবে শান্তি ও মৈত্রীর বাণীর মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সুফীসাধক মঈনউদ্দিন চিসতী এবং নিজামউদ্দিন আউলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন বহু হিন্দু। বাংলাদেশে সুফী সাধকদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন সুফী পীর জাফর খাঁ বা দরাপ খাঁ গাজী। এই সুফীয়ানার পথেই বাংলাদেশে মুসলমান, বৈষ্ণব কবি, আউল, বাউল, দরবেশ, ফকির প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছে। এইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও জাতিভেদ ছিল না। লালন, হাসন, মদন প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত বাউল জাতিতে মুসলমান ছিলেন। পুরাণে-কোরাণে কোনও তফাৎ নেই, একথা এঁরাই বলেছেন। সত্যপীর, মানিক পীর, ওলাবিবিকে হিন্দু, মুসলমান সবাই শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করেছিলেন। এইভাবেই ঘটেছে হিন্দু ও মুসলমান ভাবধারার সমন্বয়। এরই ফলে ভারতীয় শিল্পে সাহিত্যে তথা সংস্কৃতিতে ইসলামীয় প্রভাব পড়েছে বা ইসলামের নীতিতে হিন্দু প্রভাব পড়েছে।

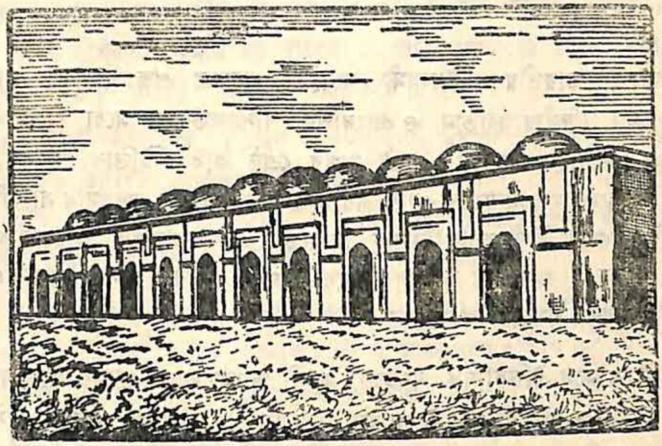
শিল্পকলা : কোন কোন শিল্পকর্ম ইসলামের অনুশাসনে নিষিদ্ধ। সুতরাং সুলতানী আমলে শিল্প সৃষ্টির প্রধান মাধ্যমই ছিল স্থাপত্য। হিন্দু ও মুসলমান প্রতিভার শিল্প ও



কদম রসুল

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে দুটি ধরণ দেখা যায়—একটি দিল্লীর ধরণ, অপরটি প্রাদেশিক ধরণ। এই দুটি ধরণের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তার কারণ হল স্থানীয় প্রভাব ও

ব্যক্তিবিশেষের রুচি। দিল্লীর শিল্প ও স্থাপত্যের নিদর্শনের মধ্যে কুওয়াৎ-উল্-ইসলাম ; কুতবমিনার, 'আলাই দরওয়াজা' 'লাল-প্রাসাদ' 'মথ-কি মসজিদ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাদেশিক শিল্প-স্থাপত্যের মধ্যে বাংলাদেশে অবস্থিত 'আদিনা-মসজিদ' (পাণ্ডুয়া) 'দাখিল-দরওয়াজা' (গৌড়) বড় ও ছোট সোনা মসজিদ (গৌড়) কদম রসুল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের স্থাপত্য-শিল্পে পাথর অপেক্ষা ইটের



বড় সোনা মসজিদ

প্রচলন অধিক ছিল। গুজরাটে অবস্থিত 'জামি-মসজিদ', মালবে অবস্থিত হিন্দোনা-মহল', 'জাহাজমহল', জৌনপুরে অবস্থিত 'আডাল-মসজিদ', 'লাল-দরওয়াজা-মসজিদ' প্রভৃতি সে যুগের স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

দক্ষিণ ভারতের বাহমনি সুলতানগণও শিল্প-স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের নির্মিত স্থাপত্য শিল্পে ভারতীয়, মিশরীয়, তুর্কী ও পারসিক প্রভাব দেখা যায়। এই অঞ্চলে স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনের মধ্যে 'জামি-মসজিদ' (গুলবর্গা) 'চান্দ-মিনার' (দৌলতাবাদ), মামুদ গাওয়ান কর্তৃক নির্মিত একটি কলেজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় ও ইসলামী শিল্প ও স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণের একাধিক কারণ ছিল। দিল্লীর সুলতানগণ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কর্তৃক হিন্দু স্থপতি ও শিল্পী নিয়োগ করার ফলে অজ্ঞাতসারে হিন্দু প্রভাব ও হিন্দুধরণ ইসলামী শিল্প-স্থাপত্যে এসে পড়েছিল।

(২) হিন্দু ও জৈন মন্দিরগুলির ভগ্নাবশেষ মসজিদ, প্রাসাদ, স্মৃতি-স্তম্ভ প্রভৃতি নির্মাণে ব্যবহৃত হওয়ায় হিন্দু ও জৈন শিল্পরীতি এতে এসে পড়েছিল। (৩) হিন্দু ও ইসলামী স্থাপত্যের মৌলিক সরঞ্জাম ছিল সেগুলোর আলঙ্কারিক কারুকার্যাদি। এই সকল বিভিন্ন কারণে হিন্দু ও ইসলামী স্থাপত্যের সংমিশ্রণ সম্ভব হয়েছিল।

সুলতানী আমলে হিন্দু রাজগণ শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা পরিত্যাগ করেননি। উত্তর ভারতের রাজপুতানা অঞ্চলে হিন্দু শিল্প স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়।

মেবারের রাণা কুম্ভ কর্তৃক নির্মিত 'বিজয়স্তম্ভ' এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-ভারতের বিজয়নগরের রাজগণও এই বিষয়ে পশ্চাদ্পদ ছিলেন না। তাঁদের নির্মিত পরিষদ-ভবন, রাজপ্রাসাদ এবং মন্দির বিদেশী পর্যটকদের প্রশংসা অর্জন করে। বিজয় নগরের 'হাজার মন্দির' ও 'বিঠলস্বামী-মন্দির' হিন্দু শিল্প ও স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিজাপুরের ওসমানী সুলতানেরা ছিলেন বিখ্যাত নির্মাতা। অনেক হিন্দু, বিশেষ করে রাজপুত রাজন্যদের প্রাসাদও সাজানো হয় দেওয়ানী খাস ও শিশ মহলের গঠনশৈলী অনুযায়ী।

সাহিত্য : ভারতীয় ও ইসলামী সংস্কৃতির পরস্পর প্রভাবের ফল সাহিত্যেও পরিলক্ষিত হয়। দিল্লীর সুলতান ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক ছিলেন আমীর খসরু। হিন্দু ধর্মের মূল আদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল গভীর। মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দী চর্চায় উৎসাহ দিয়েছেন এবং ভারতীয় কাব্যের অনুকরণে কাব্য রচনা করেন। সুলতানী আমলের অপর বিখ্যাত কবি ছিলেন হাসান দেহল্‌বি, তিনি আমীর খসরুর সমসাময়িক ছিলেন।

সুলতানী আমলে ঐতিহাসিক সাহিত্য, ফার্সী ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, হিন্দী-ভাষার উৎকর্ষ লাভে সুলতানগণ উৎসাহিত করেছেন। ফিরোজ তুঘলক ও সিকান্দার লোদীর আদেশে কিছু সংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। সিকন্দার লোদীর দরবারে হিন্দীর ব্যবহার চলত পাশাপাশি। সমসাময়িক হিন্দু মুসলমানের মিলনের ফলেই উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল। আরবী ও ফার্সী ভাষা হতে ইহার লিপি ও শব্দ উদ্ভূত হলেও ইহার ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের প্রয়োজনীয় মাধ্যমরূপে হিন্দী, তুর্কি ও ফার্সীর সমন্বয়ে সৃষ্টি হল ফৌজি ভাষা উর্দু।

আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য : বিভিন্ন ভাষার বিকাশই সুলতানি যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান। লৌকিক ধর্মের বাহন হল লৌকিক ভাষা। আবেগময় ভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টি হল রসোত্তীর্ণ কাব্য। নামদেবের রচনাগুলি মারাঠি ভাষার উৎকর্ষ বাড়িয়েছে। বিজাপুরের দরবারেও মারাঠি চালু হয়েছিল। পাঞ্জাবে প্রসার লাভ করে গুরুমুখী। বিদ্যাপতির দানে পুষ্ট হয় মৈথিলী। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুলতানি যুগ ছিল গৌরবের যুগ। বাংলাভাষা বাংলাদেশের সুলতানরা বাংলাভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হুসেন শাহের সময়ই রচিত হয় বিজয়গুপ্তের মনসা মঙ্গল। শ্রীচৈতন্য ছিলেন হুসেন শাহের সমসাময়িক। ঐ সময়ই গোপীনাথ বসু, গৌর মল্লিক, রূপ ও সনাতন গোস্বামী গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় পদে নিযুক্ত ছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতের ভূমিকায় হুসেন শাহের প্রশস্তি গেয়েছেন। নসরৎ শাহ ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দীকে আনুকূল্য দিয়েছেন। কৃত্তিবাস ওঝার 'রামায়ণ', গুণরাজ মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যও এই যুগের। বস্তুতঃ মঙ্গলকাব্য সূচনার জন্য বাংলা

সাহিত্য সুলতানী যুগের কাছে খুবই ঋণী। তাছাড়া বৈষ্ণব সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি ও সমৃদ্ধি হয় এই যুগেই।

অবশ্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে রাজ দরবারের বাইরেই। ব্রজভাষার নব জন্মের ফলে সৃষ্টি হয়েছিলেন কেশবদাস, সুরদাস, তুলসীদাস-এর মত প্রতিভাশালী কবি-সাহিত্যিকগণ। সুলতানী যুগের সূত্র ধরে বাঙ্গলাদেশে রচিত হয় কাশীরামদাসের মহাভারত, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, ক্ষেমানন্দের পাঁচালী। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরকেও এই যুগের মধ্যে ধরা উচিত। সংস্কৃত কাব্যও এই সময় সৃষ্টি হয়েছে।

রূপ গোস্বামী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছিলেন। এদের রচনা সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে যেন জোয়ার নিয়ে আসে। শ্রেষ্ঠ কাব্য প্রতিভা অবশ্য বিকশিত হয়ে উঠেছিল ব্রজভাষাকে অবলম্বন করে। হিন্দু দর্শনেও এসেছিল নতুন ধারা। বারাণসী, মিথিলা আর নবদ্বীপ হয়ে উঠেছিল শিক্ষা-দীক্ষাকেন্দ্র।

হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির এই দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে ভারত ইতিহাসের সমন্বয়ী প্রকৃতি যেমন—বহুর মধ্যে একের বিকাশ আবার একের মধ্যে বহুর প্রকাশ এই নীতির জয়যাত্রা কোন বিশেষ অবস্থায় মন্থর হলেও কখনও থেমে যায় নি। রাজনৈতিক কারণে ভারত বিভক্ত হলেও এবং সাম্রাজ্যবাদের হাতছানিতে কোথাও বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও এই সমন্বয়ের ধারা কখনও থামবে না।

নবম অধ্যায়

মুঘল যুগ ঃ (১৫২৬-১৭০৭ খ্রীঃ) The Mughal Age 1526—1707

১। মুঘল যুগের বিভিন্ন উৎস-সূত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ভারতবর্ষে মুঘল যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানের উৎস-সূত্রগুলিকে প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা যায়। (১) সাহিত্যিক উৎস (২) সরকারী নথিপত্র (৩) ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণ ও (৪) বাণিজ্য কুঠিসমূহের নথিপত্র।

সাহিত্যিক উৎস সূত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'বাবর নামা' বা 'বাবরের স্মৃতিকথা'। এই গ্রন্থ থেকে সে যুগের অনেক কিছু জানা যায়। ইহা একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। বাবর-কন্যা গুলবদন বেগম হুমায়ুনের জীবনী "হুমায়ুন নামা" গ্রন্থটি রচনা করেন। আকবর নামা ও 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থদ্বয়ের লেখক আবুল ফজল ছিলেন আকবরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর রচিত এই গ্রন্থ দুটি মুঘলযুগের, বিশেষতঃ মহামতি আকবরের সময়কার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ। প্রথমটিতে তিনি বাবর ও হুমায়ুনের শাসনকাল এবং আকবরের জন্ম সম্বন্ধে লিখেছেন। দ্বিতীয়টিতে তিনি আকবরের শাসনকালের ৪৬ বছরের ইতিহাস

লিপিবদ্ধ করেছেন। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে, এই সময়কার ইউরোপেও আবুলফজলের সমতুল্য কোন লেখক পাওয়া যায় না। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের ১৯ বছরের বিবরণের জন্য 'তুঝক্-ই-জাহাঙ্গীরী অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। আবদুলহামিদ লাহোরী রচিত 'পাদশাহনামা' নামক গ্রন্থ থেকে শাহজাহানের আমলের বহু কথা জানা যায়। মির্জামহম্মদ খাঁ রচিত 'আলমগীর নামা' আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের দশ বছরের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। মহম্মদ সাকী মুস্তায়িদের 'মাসীর-ই-আলমগীরী' থেকেও আওরঙ্গজেবের সময়কার অনেক কথা জানা যায়।

মুঘল শক্তির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শক্তির আক্রমণে দিল্লী এবং অন্যান্য স্থানে রক্ষিত এ যুগের অধিকাংশ মূল্যবান নথি-পত্র-দলিল বিনষ্ট হয়ে গেলেও প্রাপ্ত কিছু দলিলে জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের বিবরণ পাওয়া যায়।

পোর্তুগীজ ফাদার মনসেরেটের লিখিত মুঘল সম্রাট আকবর, তাঁর দরবার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিবরণ আমাদের বিশেষভাবে কাজে লাগে। ইংরেজ ভ্রমণকারীদের মধ্যে হকিন্স, স্যার টমাস রো প্রমুখ ব্যক্তির বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাচ প্রতিনিধিদ্বয় ভ্যা ল্যাং এবং পেশ স্পট-এর বিবরণও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। ফরাসী ও ইতালীয় পর্যটকদের মধ্যে তাভার্নিয়ে, ব্যের্নিয়ে ও মানুচি প্রভৃতির বিবরণ মুঘল যুগের অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান দেয়। ইউরোপীয় লেখকদের এদেশের সঙ্গে এবং এদেশের রাজনীতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের অভাব ছিল বলেই বাণিজ্যকুঠি সমূহের বিবরণও ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণ সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করা উচিত। কারণ তাঁদের বর্ণনায় কোথাও কোথাও পক্ষপাতমূলক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর ছোঁয়া রয়েছে।

২। মুঘলদের উৎপত্তি :

ভারতবর্ষে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বংশধারা মুঘল বংশ বলে সাধারণভাবে পরিচিত। মুঘলদের বংশধারার উৎস সন্ধান করতে গেলে জানা যায় মধ্য এশিয়ার যাযাবর মোঙ্গল এবং ক্যাস্পিয়ান সাগরকূলবাসী তুর্কীদের সংমিশ্রণে মুঘলদের উৎপত্তি। বাবর ছিলেন মধ্য-এশিয়ার দুই রণ-নায়কের উত্তর পুরুষ—তুর্কী বীর তৈমুর এবং মোঙ্গল বীর চেঙ্গিস খাঁ। বাবর ছিলেন তাঁর পিতা ওমরশেখ মীর্জার দিক থেকে তৈমুরের অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং মাতা খান্‌মের দিক থেকে চেঙ্গিস খাঁয়ের পরবর্তী চতুর্দশতম পুরুষ। তৈমুরের বাবা ছিলেন মধ্য এশিয়ায় বসবাসকারী বারলসীর তুর্কীদের প্রধান। তুর্কীস্তানে যে একটি অংশে মোগল উপজাতিরা বসবাস করত, তাঁরা পারস্পরিক বিবাহ সূত্রে এবং তুর্কীদের আচার-আচরণ এবং ভাষা গ্রহণের মাধ্যমে এমনভাবে তুর্কী ভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল যে তারা নিজেদের তুর্কী বলেই পরিচয় দিত। পরবর্তীকালে চেঙ্গিস খাঁ এই অঞ্চল জয় করে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। পরে এই অঞ্চল তাঁর দ্বিতীয় পুত্র চাখতাই-এর ভাগে পড়ে। তখন থেকেই এ অঞ্চলের তুর্কীরা চাখতাই তুর্কীরূপে পরিচিত।

মুঘল বাদশাহীর প্রতিষ্ঠাতা বাবর (১৫২৬-১৫৩০) : ভারতের ইতিহাসে মুঘল যুগ এক গৌরবময় যুগের সূচনা করে। এই যুগে ৬ জন পরাক্রমশালী বাদশাহ প্রায় দু'শ বছর ধরে ভারতে রাজত্ব করেন। এই বংশে প্রথম সম্রাট ছিলেন বাবর। মধ্য এশিয়ার ফরঘনা রাজ্যের অধিপতি ওমরশেখ মির্জার পুত্র বাবর ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ তৈমুরের মতই একজন আক্রমণকারী রূপে প্রথমে ভারতে আসেন, কিন্তু পরে ভারতেই স্থায়িভাবে রাজত্ব করেন। বাবর থেকেই যে নূতন রাজবংশের সূত্রপাত হয় ভারতের ইতিহাসে তা মুঘল রাজবংশ নামে গৌরবে উজ্জ্বল।

বাবরের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল ছিল। দিল্লীর সুলতানী শাসন তখন পতনোন্মুখ। শেষ লোদীসুলতান ইব্রাহিম লোদী আর আফগান আমীরদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লোদী শাসনকে নড়বড়ে করে দেয়। বিহারের দরিয়াখান লোহানী, লাহোরের দৌলত খান লোদী এবং ইব্রাহিম লোদীরই কাকা আলম খান পর্যন্ত সুলতানের বিরুদ্ধে দল করে ইব্রাহিম লোদীকে সাজা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন কাবুলের আমীর জহীরউদ্দিন মহম্মদ বাবর (সিংহ) কে।

বাবর তখন ফরঘনার শাসক, বয়সেও তরুণ। ভারত জয়ের আকাঙ্খায় তিনি ইতিমধ্যেই পাঁচবার অভিযান করেন। ১৫২৪ সনে তিনি কান্দাহার দখল করে খাইবার গিরিপথ দিয়ে ঢুকে লাহোর দখল করেন। তখনকার মত তিনি ফিরে গিয়ে আরও শক্তি সঞ্চয় করবার জন্য তিনি কামান বন্দুক, গোলাবারুদ তৈরী করে একটি গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করেন। তারপর আফগান ষড়যন্ত্রীদের আহ্বান পেয়ে বাবরের ভারত জয়ের আকাঙ্খা তীব্র হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যেই তিনি ১৫২৫ সনে পাঞ্জাব দখল করে দৌলত খাঁনকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। তারপর তিনি অভিযান করলেন ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে। ১৫২৬ সনের ২১শে এপ্রিল **পানিপথের** ময়দানে অনুষ্ঠিত হল দুই পক্ষের ভাগ্য পরীক্ষা। এই যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী হেরে যান। রাজপুত রাজারা দেখলেন দিল্লীর সুলতানী শেষ হয়েছে। কিন্তু বাবর এখানে কায়েম হতে পারলে ভারতে আর রাজপুত-প্রাধান্য স্থাপন করা যাবে না। তাই মেবার ফৌজ এগিয়ে গেল বাবরকে রুখতে। কিন্তু ১৫২৭ সনে **খানুয়ার** যুদ্ধে পরাজিত হলেন মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহও। এই যুদ্ধের ফলে উত্তর ভারতে রাজপুত-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গেল।

এই যুদ্ধের ফলে আফগান বিদ্রোহ চূর্ণ হয়ে গেল এবং বাংলাদেশের সুলতান নসরৎ শাহ তাঁর সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করলেন। এই চুক্তি অনুসারে দুইপক্ষই পরস্পরের সার্বভৌমত্ব মেনে নিলেন এবং নসরৎ শাহ বাবরের শত্রুদের আশ্রয় না দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই গোগরা বা ঘর্ঘরার যুদ্ধই ভারতবর্ষে বাবরের শেষ যুদ্ধ। এইভাবে প্রকৃতপক্ষে মাত্র তিনটি যুদ্ধের ফলে বাবর উত্তর ভারতের বিশাল অংশকে নিজের অধিকারে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন এবং অক্সাস থেকে গোগরা পর্যন্ত ও হিমালয় থেকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত ভূখণ্ডের

কর্তৃত্ব পেলেন। অবশ্য এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের এখানে ওখানে কিছু কিছু ফাঁক ছিল যেগুলি পরবর্তীকালে পূরণ করতে হয়েছিল।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাঙ্গলাদেশের আফগান নেতারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে বাবরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৫২৯ সনে গোগরা বা ঘর্ঘরার যুদ্ধে তাঁদেরও পরাজয় হয়। এভাবেই বাবর সামরিক দক্ষতায় মুঘল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কামান ছিল যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে তাঁর সহায়ক। পানিপথ, খানুয়া এবং ঘর্ঘরা—এই তিন যুদ্ধের ফলে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ গড়ে ওঠে।

এই সামরিক বিজয়গুলি পর্যালোচনা করলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বাবর সামরিক নেতৃত্বের দিক থেকে অসাধারণ ছিলেন কিন্তু গঠনমূলক কার্যক্রমে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ভারতের বিশাল অংশ জয় করলেও কিন্তু তিনি সেখানে সুসংগঠিত শাসন প্রণালী গড়ে তুলতে পারেন নি। তিনি অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে সামন্ত-নৃপতি ও অধিকারিদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অর্দ্ধ-স্বাধীন নৃপতিরূপে চলতেন। তিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটি সমেত পুরনো মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে জীইয়ে রাখলেন। এমনকি সারাদেশে এমন একটি আইনও ছিল না যা সমস্ত রাজ্যে প্রযোজ্য ছিল। একজন ঐতিহাসিকের ভাষায় "এই বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা সামান্যই ছিল।" তিনি কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য কিছুই করলেন না, জনগণের মঙ্গলজনক কার্যের কোনরকম প্রসার ঘটালেন না বা বিচার-ব্যবস্থার সংস্কারের কোন চেষ্টাই করলেন না। তাঁর আর্থিক ব্যবস্থাসমূহ ছিল নড়বড়ে। রাজকোষের অবস্থাও প্রায় দেউলিয়া ছিল।

এই সমস্ত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, "ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রথম স্থপতি তিনি, পরে তাঁর বিখ্যাত প্রতিভা-সম্পন্ন পৌত্র আকবর গড়ে তোলেন বিশাল সাম্রাজ্য।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর নিঃসন্দেহে ভারতের তথা এশিয়ার ইতিহাসে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার ফরঘনার একটি অখ্যাত পার্বত্য-উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেন। আবাল্য তিনি ভারতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেও পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ভাগ্যদেবী তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন এবং ছ'ঘণ্টারও কম সময়ে তিনি ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধই ভারতে একটি নতুন রাজবংশের ধারা সৃষ্টি করে এবং ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগে একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি হয়। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বহুবিধ সাফল্যের দ্বারা ভারতবর্ষে নতুনতর শক্তি সঞ্চার করতে সক্ষম হন। তিনি নতুন নতুন রণকৌশল প্রচলিত করেন—যেমন, মধ্য এশিয়ার রণকৌশল 'তুলঘুমা, অর্থাৎ গোপনে অবস্থান করে অতর্কিতে আক্রমণ, ও গোলন্দাজ বাহিনী ব্যবহার ইত্যাদি। এই সমস্ত রণকৌশল যুদ্ধ সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দিল এবং উত্তর পুরুষদের কাছে যুদ্ধবিদ্যায় নতুন নতুন দিককে আবিষ্কার ও ব্যবহার করার সুযোগ এনে দিল। সুতরাং আমরা স্পষ্টতঃই বলতে পারি যে, বাবর মধ্যএশিয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছিলেন।

'বাবর নামা' বা 'বাবরের স্মৃতি কথা' রচনা হিসেবে এবং মুঘল ইতিহাসের উপাদান হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'তাঁর স্মৃতিকথা' সে যুগ সম্বন্ধে শুধু যে একটি প্রামাণিক প্রবন্ধ তাই নয়, এটিকে সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কল্পনা সমৃদ্ধ সাহিত্য কীর্তি বলে অভিহিত করা হয়। দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা হয়েও তিনি ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। নিজের দেশের পাহাড় আর ফুল-ফলের স্মৃতি তাঁর মনে সর্বদা যেন কাঁটার মত ফুটত। আঙুর আর খরমুজার জন্য মন কেমন করত। এসব কথা অতি সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে লিখে গেছেন। দিগ্বিজয়ী বীর নাহলেও শুধু তাঁর "আত্মকথা"র লেখক হিসাবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আত্মকথা ছাড়াও তিনি তুর্কী এবং ফারসী ভাষায় বহু কবিতা ও গদ্য রচনা লিখে গেছেন।

(ক) **মুঘল আফগান সংঘর্ষ ঃ** বাবরের মৃতুকালে হুমায়ুনের বয়স ছিল মাত্র ২৩। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় কিন্তু অব্যবস্থিত চিত্তের অধিকারী অথচ তিনি যে উত্তরাধিকারের বোঝা কাঁধে নিলেন তার ওজন বড় কম ছিল না। পিতার অর্জিত সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ও সুযোগ তখনও মেলেনি। ১৫৩০ সনে তিনি যখন সিংহাসনে বসলেন তখন রাজ্যের প্রতিকূল অবস্থা।


বাবর


শের শাহ

পশ্চিম ভারতে গুজরাটের বাহাদুর শাহ তখন বেশ শক্তিশালী রাজা। ওদিকে পূর্বভারতে আফগানরা আবার শক্তি সঞ্চয় করেছেন। অথচ চারজন ভাইকে তিনি রাজ্যের চারি অংশে প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি হুমায়ুন কমিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ভাইয়েরা দেখিয়েছেন স্বার্থপরতা। মুঘল রাজবংশের যে দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল ভাইয়ে ভাইয়ে চরম রেষারেষি, তার ছোঁয়াচ থেকে বাঁচা

হুমায়ুনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবুও তিনি কিছু কিছু রাজ্য জয় করতে এগোলেন। কালিঞ্জর দুর্গ দখল করে তিনি চললেন পূর্ব-ভারতে। এই সময়ে হুমায়ুন চুণার দুর্গ অবরোধ করেন, কিন্তু শেরখানের মৌখিক আনুগত্য প্রদর্শনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে দমন করার চেষ্টা না করেই তিনি আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন। শেরখান হুমায়ুনের এই দুর্বলতার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। গুজরাটে হুমায়ুন যখন বাহাদুর শাহকে দমন করতে ব্যস্ত তখন শেরখান নিজ শক্তি বৃদ্ধি করে অতর্কিতে বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। বাংলার শাসক মামুদ শাহ ছিলেন দুর্বল শাসক। ১৫৩৭ সনে শেরখান পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন এবং রাজধানী গৌড় অবরোধ করেন। হুমায়ুন শেরখানকে দমন করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন এবং দীর্ঘ ৬ মাসের চেষ্টায় শের খানের প্রধান কর্মকেন্দ্র চুণার দখল করেন। অপর দিকে শেরখানও গৌড় বিজয় সম্পন্ন করেন এবং কিছুদিন পর তিনি চুণার দুর্গটি পুনরায় অধিকার করেন। তা ছাড়া বারানসী, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান অধিকার করে তিনি কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই সব সংবাদে হুমায়ুন আতঙ্কিত হয়ে সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বক্সারের নিকটবর্তী চৌসা নামক স্থানে শেরখান ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে বহু মুঘল সৈন্য হতাহত হয়। হুমায়ুন কোন প্রকারে প্রাণ নিয়ে আগ্রায় ফিরে যান। এই যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের খান "শেরশাহ" উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এরপর ১৫৪০ সনে বিল্বগ্রামের যুদ্ধেও হুমায়ুন শেরখানের নিকট পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। শেরশাহের জয়লাভের ফলে ভারতে বাবর প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের সাময়িক অবসান ঘটে এবং ভারতে পুনরায় আফগান প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

শেরশাহ : শেরশাহ ছিলেন বিহারের সাসারামের এক জায়গীরদারের পুত্র। তাঁর আসল নাম ছিল ফরিদ খাঁ। ছেলেবেলায় অনেক পারিবারিক অশান্তি সত্ত্বেও তিনি জৌনপুরে লেখাপড়া শেখেন এবং যুদ্ধে সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দেন। দিল্লীর সিংহাসনে বসে তিনি প্রথমেই রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করে রাজ্যবিস্তারে মন দেন। তিনি সহজেই সিন্ধু এবং মুলতান অধিকার করেন। বিনাযুদ্ধে পাঞ্জাব হস্তগত হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে শের শাহ বাংলার শাসনকর্তাকে গদিচ্যুত করে সেখানকার শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। ১৫৪০ থেকে ১৫৪৫ সনের মধ্যে তিনি জয় করলেন মালব, রণথম্ভোর, গোয়ালিয়র, রাইসিন দুর্গ এবং মাড়ওয়াড়। এরপর বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করতে গিয়ে বারুদের আগুনে পুড়ে ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

শেরশাহের শাসন ও রাজস্ব-ব্যবস্থা (১৫৪০-৪৫) **:** সামরিক সাফল্যের চেয়েও প্রশাসনে শেরশাহের সাফল্য ছিল বেশী আকর্ষণীয়। তাঁর রাজত্বকাল ছিল মাত্র ৫ বছর। যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে তাঁকে ক্রমাগত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এই নির্ভীক যোদ্ধা যেভাবে শাসন-কৃতিত্ব ও সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে গেছেন তা সবার কাছেই বিস্ময়কর। তিনি তাঁর স্বল্প-সময়ের শাসন ব্যবস্থায় সারা রাজ্যকে

৩৭টি সরকারে এবং প্রত্যেকটি সরকারকে পরগণায় ভাগ করে সর্বস্তরে রাজকর্মচারী নিয়োগ করেন। সামরিক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলেন। বিচার ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা কায়েম করেন। পাট্টা ও কবুলিয়তের ব্যবস্থা করে রাজস্ব আদায়ে যেমন উন্নতি করেন, তেমনি কৃষককেও বাঁচবার সুযোগ করে দেন। রাস্তাঘাট, সরাইখানাও তৈরী করিয়েছিলেন। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তাঁরই তৈরী। তাঁর আমলে ঘোড়ায় করে চিঠিপত্র আনা নেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তিনি ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।



শেরশাহের রাজস্ব সংস্কারও উল্লেখযোগ্য। সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করিয়ে তিনি প্রত্যেক প্রজার জমির সীমা নির্দিষ্ট করে দেন। উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ

রাজকর দিতে হত। প্রজাগন নিজেদের সুবিধামত ফসল কিংবা টাকা দিয়ে খাজনা দিতে পারত। জমিদারের অত্যাচার থেকে প্রজাদের রক্ষা করার জন্য কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রথা প্রবর্তিত হয়। এতে প্রত্যেক প্রজার জমির পরিমাণ ও রাজস্বের হার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। এর ফলে জমিদার প্রজাকে তার জমি থেকে জোর করে উচ্ছেদ করতে অথবা তার অনিষ্ট সাধন করতে পারতেন না। অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে শস্যহানি হলে রাজসরকার থেকে কৃষকরা অগ্রিম ঋণ পেত। শেরশাহের রাজস্ব নীতির ফলে রাজকোষে প্রচুর অর্থ আসে এবং প্রজারাও শান্তিতে বাস করতে থাকে। ঐতিহাসিক কীন্ শেরশাহের শাসন পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পরবর্তীকালে মুঘল সম্রাট আকবর রাজস্ব-নীতি রচনাকালে শেরশাহ প্রবর্তিত রাজস্ব-নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

সামরিক সংস্কার ঃ শের শাহের সৈন্য-সংগঠন-বিন্যাস ছিল বিশেষ উন্নত। তিনি আলাউদ্দীন খিলজীর সামরিক কাঠামোটির উন্নতি করেন। তিনি সৈন্যদলে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রবর্তন করেন। কারণ তিনি জানতেন যে, সেনাদলের অকপট আনুগত্যই সম্রাটের আসল শক্তির উৎস। এই কারণে শের শাহ শক্তিশালী এক বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করেন। তাঁর সেনাবাহিনীতে ছিল দেড় লক্ষ অশ্বারোহী, তিনশত হস্তী, পঁচিশ হাজার পদাতিক এবং বহু কামান ও গোলন্দাজ সেনাবাহিনী।

রাস্তাঘাট ও ও ডাক-ব্যবস্থা ঃ যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি-কল্পে শের শাহ বহু সড়ক নির্মাণ করান। তার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তৃত **গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড** আজও যেন শের শাহের অক্ষয় কীর্তির সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ ছাড়া তিনি যথাক্রমে **আগ্রা-বুরহানপুর**, আগ্রা-চিতোর, **লাহোর-মুলতান সড়ক** নির্মাণ করান। পথিকদের কষ্ট লাঘব করার জন্য পথিমধ্যে সরাইখানা নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য তিনি ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন।

ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতি ঃ ধর্ম-নিরপেক্ষতাই ছিল শের শাহের শাসননীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলকেই সমান অধিকার দিতেন। তাঁর ন্যায়-বিচারের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের কোন ভেদ ছিল না ব্রহ্মজিৎ গৌড় নামক জনৈক হিন্দু ছিল তাঁহার প্রধান সেনাপতি। এটাই তাঁর উদার নীতির পরিচায়ক। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিনামূল্যে খাদ্য ও ঔষধ বিলি করার ব্যবস্থা ছিল। সামরিক শক্তির পরিবর্তে তিনি প্রজাদের বিশ্বাস, ভালবাসা এবং আনুগত্যের উপর নির্ভর করেই রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করেন।

শের শাহের অবদান ঃ তুর্কী-আফগান পুনর্জাগরণের নায়ক শের শাহ এমন এক ব্যক্তি, যিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি তাঁর সর্বশ্রেণীর প্রজাদের কল্যাণের জন্য যে আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম দেখিয়েছেন তা'তে তাঁকে অশোকের সাথে তুলনা করা যায়। তাঁর কর্মজীবন বাবরের চেয়ে কম আকর্ষণীয় ছিলনা এবং উদার শাসক

হিসাবে, প্রতিভাবান সৈন্যাধ্যক্ষরূপে, তীক্ষ্ণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞরূপে তিনি বিখ্যাত ছিলেন। ইতিহাসে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁর ভালই দখল ছিল। সৌধ নির্মাণের ব্যাপারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বৃত্তিতে যোদ্ধা না হয়েও শেরশাহ একজন সফল সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সামরিক বিজেতা ছিলেন। তিনি কখনও শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করেন নি। তিনি ছিলেন রণনীতিতে অসাধারণ এবং এই রণনীতি ও রণকৌশলই তাঁকে সাফল্য এনে দিত। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের এক বিরাট অংশকে নিজের আয়ত্তে ও অধিকারে আনতে পেরেছিলেন। তিনি গঠনমূলক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং কার্যকর শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর অন্তরে রাজার এক মহান আদর্শ জাগ্রত ছিল। ঐতিহাসিক কীন যথার্থভাবেই বলেছেন যে, "No Government not even the British has shown so much wisdom as this Pathan."।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে আকবরের আগে এমন খ্যাতিমান শাসক আর দেখা যায় না। শের শাহের অক্লান্ত পরিশ্রম, কর্তব্য-নিষ্ঠা, বহুতর উন্নয়ন-মূলক কার্য এবং নীতি-নিষ্ঠা তাঁকে ভারতের ইতিহাসে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান দান করেছে। শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা ছিলেন অক্ষম শাসক এবং পারস্পরিক ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যতিব্যস্ত থাকায় মুঘলদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন নি।

মুঘল শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা ঃ শের শাহের কাছে হেরে গিয়ে হুমায়ুনকে প্রায় ১৫ বছর সিংহাসনচ্যুত হয়ে কাটাতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পারস্যের শাহের কাছ থেকে ১৪০০০ সৈন্য ধার করে নিয়ে হুমায়ুন আবার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হলেন। ১৫৪৭ সালে কাবুল দখল করেন। ১৫৫৫ সনে তিনি যুবরাজ আকবর আর তার অভিভাবক বৈরাম খাঁকে নিয়ে পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চল হস্তগত করেন। এরপর তিনি সিরহিন্দ-এর যুদ্ধে সিকন্দার শূরকে পরাজিত করে দিল্লীতে প্রবেশ করেন। এতদিন বাদে তিনি প্রকৃতই ভাগ্যবান (হুমায়ুন) হয়েছিলেন কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান (জানুয়ারী ১৫৫৬ খ্রীঃ)।

'হুমায়ুন কথাটির অর্থ ভাগ্যবান হলেও তিনি ছিলেন মানব ইতিহাসে অন্যতম হতভাগ্য নৃপতি। সামরিক প্রতিভা, কূটনৈতিক বুদ্ধি এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা তাঁর প্রায় একেবারেই ছিল না। তিনি শের শাহের শক্তিকে ছোট করে দেখেছেন। অপর দিকে শের খাঁনের শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও সামরিক প্রতিভা বা অন্য কোনদিক থেকেই হুমায়ুন তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। রাজা ও প্রশাসক হিসাবেও তিনি ছিলেন ব্যর্থ। জীবনের শেষ দিকে তিনি দিল্লীর মসনদ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হলেন বটে, তবে তার চাইতেও

হুমায়ুনের সৌভাগ্য হল যে তিনি মহামতি আকবরের ন্যায় খ্যাতিমান পুত্রের পিতা ছিলেন।



হুমায়ুন



মহামতি আকবর

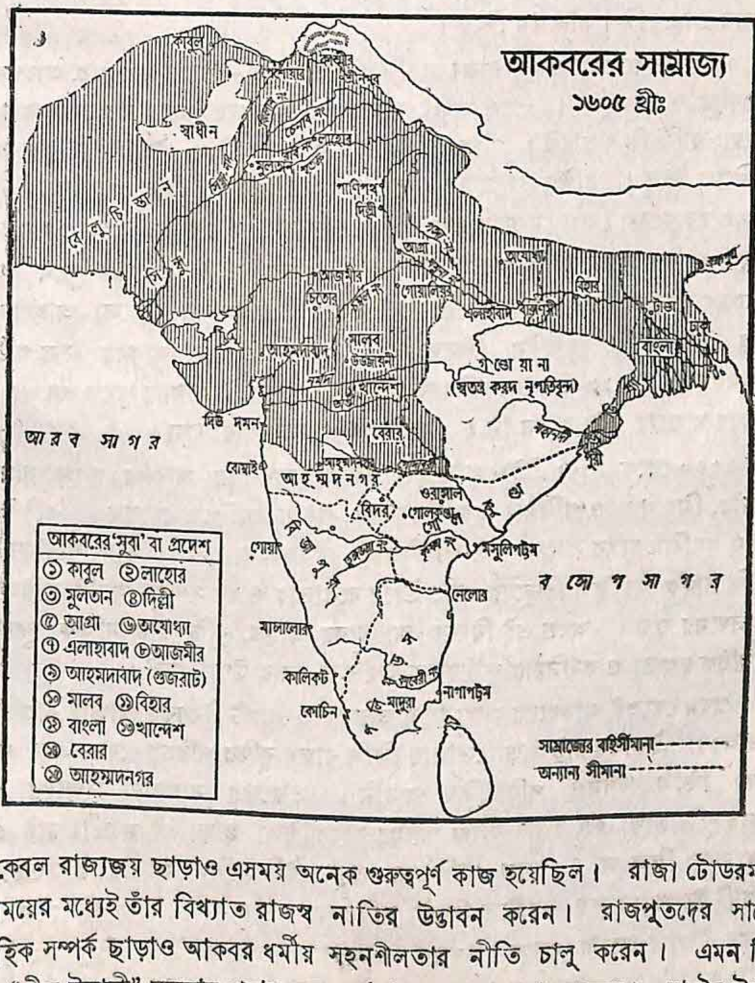
(খ) আকবর কর্তৃক মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ও উহার সুদৃঢ়করণ :

শের শাহের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যে আসে বিশৃঙ্খলা। এই সুযোগে হুমায়ুন আবার দিল্লী দখল করলেও অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা যান। সিংহাসনে বসেন তাঁর নাবালক ছেলে আকবর। ১৫৪২ খ্রীঃ সিন্ধুদেশের অমরকোট নামক স্থানে আকবরের জন্ম হয়। আফগানরা কিন্তু অত সহজে ক্ষমতা হারাতে রাজী ছিলেন না। ১৫৫৬ সনে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হল হিমু এবং আকবরের অভিভাবক বৈরামখানের মধ্যে। বৈরামের জয় হল। তাঁর অভিভাবকত্বও চললো ১৫৬০ সন পর্যন্ত। তারপর আকবর নিজেই সাম্রাজ্যের হাল ধরলেন।

প্রথম অবস্থায় দিল্লী এবং তার চারপাশে সামান্য জায়গাতেই সীমাবদ্ধ ছিল তখনকার মুঘল শাসন। কিন্তু আকবর সারা ভারতে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য গড়তে চাইলেন। বৈরামখানের শাসনকালেই গোয়ালিয়র, আজমীর, জৌনপুর জয় করা হয়েছিল। বৈরামের পরে হয়েছিল মালব জয়। রাজপুতদের সম্বন্ধে তার নীতিও আকবর ঠিক করে ফেলেছিলেন। অম্বরের মেয়ে যোধবাঈয়ের সাথে তাঁর বিয়ের মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয় মুঘল রাজপুত সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়।

রানী দুর্গাবতীর প্রতিরোধ চূর্ণ করে আকবর গণ্ডোয়ানা জয় করলেন ১৫৬৪ সনে। ১৫৬৭ সনে করলেন চিতোর অবরোধ। জয়মল, পুত্তের বীরত্বপূর্ণ বাধা সত্ত্বেও চিতোরের

পতন হল। চিতোরের সামন্ত সুর্যরায়ের কাছ থেকে মুঘলরা রনথম্বরও অধিকার করলেন, ১৫৬৯ সনে। দখল করলের কালিঞ্জার। উত্তর ভারতের পর বাকি রইল কেবল গুজরাট ও বঙ্গদেশ। গুজরাট-সুরাট দখল হল ১৫৭২ সনে। তারপর দু'দুবার অভিযান করে বঙ্গদেশ দখল করলেন ১৫৭৬ সনে। এখানে বারো ভুঁইয়াকে জব্দ করলেন সেনাপতি মানসিংহ। মেবার কিন্তু স্বাধীনতার আশা ছেড়ে দেয়নি। পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে লড়াই করে চললেন রানাপ্রতাপ। কিন্তু ১৫৭৬ সনে হলদিঘাটের যুদ্ধে তাঁরও পরাজয় হল।



কেবল রাজ্যজয় ছাড়াও এসময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছিল। রাজা টোডরমল এই সময়ের মধ্যেই তাঁর বিখ্যাত রাজস্ব নীতির উদ্ভাবন করেন। রাজপুতদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছাড়াও আকবর ধর্মীয় সহনশীলতার নীতি চালু করেন। এমন কি তিনি "দীন ইলাহী" মতবাদ প্রচার করে সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেন। রাষ্ট্রের উপর মোল্লাদের কর্তৃত্ব আর থাকে না। এরপর মোল্লাচক্রের উস্কানীতে রাজ্যের মধ্যে

বিদ্রোহ দেখা দেয়। কাবুলের শাসনকর্তা, আকবরের ভ্রাতা মির্জা হাকিমও উচ্চাশা নিয়ে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে ধরেন। কিন্তু ১৫৮৫ সনে কাবুলকেও সাম্রাজ্যের মধ্যে আনা হয়।

কাবুল দখল করায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তার প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিল। কাশ্মীর, সিন্ধু, কান্দাহার এবং সীমান্তের উপজাতি এলাকা নিয়েই সৃষ্টি হল সমস্যা। তাই কাশ্মীর ও সিন্ধু দখল হল যথাক্রমে ১৫৮৬ ও ১৫৯১ সনে। কান্দাহারও দখল করা হল কূট-কৌশলে। এইভাবে উত্তর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত হল পশ্চিমে কাবুল কান্দাহার থেকে পূর্বে বঙ্গদেশের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত। তখন স্বাভাবিক ভাবেই নজর গেল দক্ষিণ ভারতের দিকে।

দক্ষিণ ভারতের বাহমনি রাজ্য হয়েছিল পাঁচ টুকরো—খান্দেশ, বেরার, আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। এরও মধ্যে আবার আহমদনগর গ্রাস করে নেয় বেরারকে। সুতরাং বাকি ছিল চারটি। কিন্তু বাকি চারটি রাজ্যই ছিল ঐশ্বর্যশালী এবং ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নত। দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ দুর্গ অসিরগড়ও ছিল খান্দেশে। সম্রাট আকবরের বশ্যতা মেনে নেওয়ার জন্য এদের প্রত্যেকের কাছে চিঠি গেল ১৫৯১ সনে। কেবল খান্দেশ ছাড়া বাকি সবাই এই দাবি অগ্রাহ্য করল। ১৫৯৩ সনে আকবর আক্রমণ করলেন আহমদনগর। বেরার ছেড়ে দিয়ে আপস করলো আহমদনগর। কিন্তু এই শান্তি বেশীদিন টিকলো না। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর সৈন্য পাঠালেন আহমদনগরে। ১৬০১ সনে অসিরগড় দুর্গের পতন হল। আকবর অবশ্য এর পর আরও দক্ষিণে যাওয়ার চেষ্টা করেন নি। তিনি ১৬০৫ সনে মারা যান।

১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার, নিরাপত্তা ও প্রতিষ্ঠার জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। এদিক থেকে তাঁকে মুসলিম যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য বিজয়ী শাসক বলা যায়। তাঁর সাম্রাজ্য বিজয় নীতি সার্থক হয়েছিল হিন্দুদের প্রতি উদার মনোভাব ও ধর্ম সম্পর্কে অসাম্প্রদায়িক নীতি অবলম্বনের জন্য। অবশ্য এই বিষয়ে আকবরের বাস্তব, বুদ্ধি রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সামরিক দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার ভূমিকাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রথম থেকেই আকবরের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাজতন্ত্র গড়ে তোলা। ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে তোলায় তিনি বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দেন এবং ধর্মান্ধতা দ্বারা তিনি কখনও পরিচালিত হননি। ভারতের সম্প্রদায় হিন্দুদের প্রত্যক্ষ সহানুভূতি ছাড়া এবং রাষ্ট্রীয় কাজে তাদের সহযোগিতা ছাড়া এই জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। অবশ্য পানিক্কর প্রমুখ ঐতিহাসিক জাতীয় রাজতন্ত্র বা রাষ্ট্র কথাটি উল্লেখ করলেও কথাটিতে কিছুটা অতিরঞ্জন আছে বলে অনেকেই মনে করেন। কারণ "জাতীয়তা"র ধারণা তখনও ভারতবর্ষে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ অতিশয়োক্তি নয় একথাও মনে রাখতে হবে। যাই হোক আকবরের রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রী নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজশক্তির সহযোগিতা লাভ করা। তাঁর এই

মৈত্রী নীতি ছিল বাস্তব রাষ্ট্রনীতি নির্ভর, আবেগ নির্ভর নয়। মানসিংহ ও ভগবান দাসের মত রাজপুতরা, যারা তার বিশ্বাসভাজন হতে পেরেছিলেন, তিনি তাদের শুধু যোগ্য রাজ-মর্যাদাই প্রদান করেন নি, বিশ্বাস করে তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্বও দিয়েছিলেন। মানসিংহকে সেনাপতিত্ব দেওয়া ছাড়াও মুসলমান অধ্যুষিত কাবুলের শাসনভার যখন তাঁর উপর দেওয়া হল তখন বোঝা যায় যে আকবরের রাষ্ট্রনীতি ও হিন্দুনীতি কতখানি বাস্তব নির্ভর। আকবরের রাজপুত বংশবদগণ সর্বতোভাবে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেছিল কিন্তু যারা আত্মসম্মান বজায় রেখে দিল্লীশ্বরের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গেও আকবর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু যারা কিছুতেই মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী হয়নি, তাদের তিনি সর্বতোভাবে চূর্ণ করেছেন। আসল কথা হল রাজপুত শক্তিকে তাঁর সাম্রাজ্যের অনুকূলে আনার অন্য অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার নীতিই তিনি অনুসরণ করেছিলেন। সকলপ্রকার গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা ও কাণ্ডজ্ঞানহীন উচ্চাকাঙ্খার উর্দ্ধে উঠে এক বলিষ্ঠ বাস্তবপন্থী রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছিলেন বলেই অহঙ্কারী রাজপুতদের বশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে সুলতানী আমল থেকেই আমলাতন্ত্রে নিম্নস্তরের হিন্দুরাই আধিপত্য করত। কিন্তু উচ্চস্তরের কর্মচারী হিসাবে হিন্দুদের কোন স্থান ছিল না। উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী হিসাবে হিন্দুদের নিয়োগে আকবরই অগ্রণী হন। ফলে আকবরের এই অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রনীতি এক পুরুষের মধ্যে মুঘল সরকারকে একটি বৈদেশিক সরকার থেকে একটি জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করে ছিল। অর্থাৎ এই নীতি ও কথার মধ্যে খানিকটা অতিরঞ্জন থাকতে পারে কিন্তু একথা ঠিক যে মুসলমানের রাজত্বকালে হিন্দুরা তাদের প্রতিভা, যোগ্যতা, বংশগৌরব যথাযথ মর্যাদা পাবে এই আস্থা তাঁরা ফিরে পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আকবরের আমলে মানসিংহের মত অভিজাত ও রাজবংশীয়রাই যে শুধু উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন তা নয়, টোডরমল, বীরবল প্রমুখরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত হয়েও উচ্চপদ পেয়েছিলেন। প্রতিভা, যোগ্যতা ও সামর্থের ভিত্তিতে সর্বশ্রেণীকে সমান সুযোগই আকবর দিতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয়তঃ, আকবরের ছিল অসাধারণ নৈতিক সাহস যা তাঁর রাষ্ট্রনীতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। সেইজন্য তিনি হিন্দু গুণী-পণ্ডিতদের সমাদর করতেন, হিন্দুর অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিতেন এবং হিন্দুদের সতীদাহ প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কার বিলোপ সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। এতে তাঁর রাজোচিত কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা, মানবোচিত উদারতা ও সংকীর্ণতামুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীই প্রতিফলিত হয়েছে।

চতুর্থতঃ, আকবর শুধু রাজপদের মর্যাদা দিয়ে হিন্দুদের সাথে সম্প্রীতি স্থাপন করেন নি। রাজপুতদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে এই সম্প্রতিকে দৃঢ় করেছিলেন। যুদ্ধ-বন্দীদের বা বলপ্রয়োগের দ্বারা হিন্দুদের ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার রীতি তিনি বাতিল করে দেন। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর কর এবং ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কুখ্যাত জিজিয়া করও তুলে দেওয়া হয়।

আকবরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁর ধর্মনীতিতে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই নীতি আধ্যাত্মিক হলেও আকবরের ধর্মনীতি এক অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের বিকাশে সাহায্য করেছিল। ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষক আব্দুল লতিফের প্রভাবে তিনি ধর্ম সম্পর্কে উদারনীতি পোষণ করতেন। আজীবন তিনি ইসলাম ধর্ম আচরণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ধর্মচিন্তা এই ব্যক্তিগত গণ্ডী অতিক্রম করে অনেক উর্ধ্বে সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথে চালিত হয়েছিল। ফতেপুর সিক্রীতে ইবাদতখানা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমান উলেমারা এবং বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, পার্সী, খ্রীষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধু ও পণ্ডিতরা স্বাধীনভাবে ধর্মালোচনা করতেন। এখানে বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত কোরাণ প্রভৃতির বাণী ফার্সী ভাষায় অনুবাদের অনুলিপি সংরক্ষিত ছিল। মুক্ত ও উদার পরিবেশে মানুষের আচরিত সকল ধর্মের মূলগত ঐক্যের সন্ধান করাই এর উদ্দেশ্যে ছিল। একথা ঠিক নয় যে, আকবর ইসলামধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। ধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার, মৌলবীদের বিধান ও অপরধর্মকে হেয় করা এবং নিজধর্মকে শ্রেষ্ঠ ভাবা এই সব তিনি গুরুত্ব দেননি। আকবর নিজে যে ধর্মমত প্রচার করেছিলেন তার নাম দীন-ই-ইলাহী। এই ধর্মমতে জীবের একাত্মতা ও সর্বজীবে সমভাবের আদর্শ প্রতিফলিত—সুফীবাদ, ভক্তিবাদ, সমন্বয়বাদ প্রভৃতি আকবরের এই ধর্মমতকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু দীন-ই-ইলাহী কখনও ইসলাম বিরোধী বা কোরাণ বহির্ভূত ছিল না। ধর্মান্ধতা ও পরধর্ম বিদ্বেষ থেকে ইসলামকে মুক্ত করতে না পারলে ভারতে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয় একথা আকবর বুঝেছিলেন। আকবরের এই অসাম্প্রদায়িক বলিষ্ঠ নীতি তাঁর সাম্রাজ্যকে 'জাতীয় সাম্রাজ্যে' পরিণত করেছিল।

আকবর তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য রাষ্ট্রনীতির তিনটি আদর্শ উপস্থাপিত করেছিলেন—(১) জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ। (হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত), (২) হিন্দুদের সাথে সম্প্রীতি স্থাপনের আদর্শ, (৩) ঐক্যবদ্ধ ভারতের আদর্শ। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান আন্তরিকভাবে না হলেও বাহ্যিকভাবে এই আদর্শ অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব এর প্রতিটি নীতিই ভঙ্গ করেছেন।

আকবরের শাসন ব্যবস্থা : আকবর প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং, মন্ত্রীরা সম্রাটের আজ্ঞাবহ ছিলেন। সম্রাটের কাজে সাহায্য করতেন ভকিল বা প্রধান মন্ত্রী, 'দেওয়ান' বা রাজস্বমন্ত্রী, 'মীরবক্সী' বা সৈন্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মীর, সামান' বা সরকারী কারখানাসমূহের অধ্যক্ষ এবং 'সদর' ধর্ম, বিচার ও দাতব্য বিভাগের অধ্যক্ষ।

আকবরের সাম্রাজ্য ১৫টি সুবায় বিভক্ত ছিল। ১৫টি সুবা হল—কাবুল, লাহোর, মূলতান, দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ; আজমীর, গুজরাট, মালব, বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যা, খান্দেশ, বেরার, আহম্মদনগর। সুবার শাসনভার ছিল সিপাহশালার বা সুবাদারের উপর। সুবা সরকারে এবং সরকার পরগণায় বিভক্ত ছিল। প্রদেশের রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন দেওয়ান ; আমিন ছিলেন রাজস্ব আদায়কারী।

আকবরের শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মনসবদারী প্রথা। ইহা ছিল সেনা-বিভাগের ভিত্তি। প্রত্যেক রাজকর্মচারীকে সামরিক সাহায্যের শর্তে 'মনসব' দেওয়া হত। আকবর ৩৩টি শ্রেণীতে মনসবদারদের বিভক্ত করেছিলেন, সাধারণতঃ রাজ পরিবারের সভ্যদের মধ্যে মনসবদারী সীমাবদ্ধ থাকত। সম্রাটই সরাসরি মনসবদারদের নিযুক্ত করতেন। মনসবদারদের অধীনে দশ, সাত, পাঁচ হাজার প্রভৃতি সংখ্যার সৈন্য থাকত। যুদ্ধের সময় এরা সম্রাটকে সৈন্য সাহায্য দিত। সেনাবাহিনী তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল—অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ। এছাড়া সম্রাটের নিজস্ব স্থায়ী সেনাদল, রণহস্তী, গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। আকবর তার শাসন নীতিতে সম্প্রদায় নির্বিশেষে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুদের সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার চেষ্টা করেন ও জিজিয়া কর তুলে দেন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে দেখা যায় যে নগরের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের উপর। বিচার ব্যবস্থায় শীর্ষে অবস্থান করতেন সম্রাট স্বয়ং। আইনের ক্ষেত্রে সম্রাটের ভাষ্যই ছিল শেষ কথা।

আকবর অসীম দক্ষতার সাথে মুঘল সাম্রাজ্যকে একটি শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে আবুলফজল লিখেছেন যে তিনি শাসন কার্যের খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। আকবরের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি তার শাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। হাভেলের মতে যদিও আকবরের রক্তে ভারতীয় রক্ত ছিল না তবু তিনি ছিলেন ভারতীয় অপেক্ষা বেশী ভারতীয়।

রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ 'শেরশাহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আকবর এক সুশৃঙ্খল রাজস্ব ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন। ভূমি-রাজস্বই ছিল রাজকোষের প্রধান অবলম্বন। রাজস্ব-ব্যবস্থা স্বভাবতঃ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রাজস্ব ব্যবস্থার সংগঠনের ক্ষেত্রে আকবরের প্রধান সহায়ক ছিলেন দেওয়ান-ই আসরফ টোডরমল। তাঁর সাহায্যে ১৫৮২ সনে আকবর ভূমি ব্যবস্থার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করেন। টোডরমলী ব্যবস্থার প্রধানতঃ তিনটি বৈশিষ্ট্য, যথা—জমি জরিপের ব্যবস্থা, বিভিন্ন শ্রেণীতে জমি ভাগ করা এবং খাজনার হার নির্দিষ্ট করা। জমি চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হল—'পোলজ' (polaj বা প্রতি বৎসরে চাষযোগ্য জমি, পরৌটী (Parauti) বা চাষযোগ্য করিবার জন্য যে জমি কিছুকাল অনাবাদী থাকত ; 'চচর' (Chachar) বা পাঁচ বছর যে জমিতে চাষ হয় নাই। যে জমিতে চাষ-বাস হত কেবল উহার উপরই খাজনা ধার্য হত। খাজনার হার ফসলের এক-তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট হল। শস্যে বা টাকায় খাজনা দিতে হত। উত্তর ভারত, গুজরাট এবং দক্ষিণ ভারতে 'রায়তওয়ারি' ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল মনে হয়। জমির বন্দোবস্ত সরাসরি রায়তদের সঙ্গে করা হত। বাংলায় সম্ভবতঃ 'জমিদারি' প্রথা চালু ছিল। এখানে জমিদারদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত হত এবং জমিদারগণ সরকারকে 'পেশকস' (tribute) দিতেন। অবশ্য 'খালসা' বা সরকারের খাস জমিও ছিল। 'খালসার' আয় সরাসরি রাজকোষে জমা হত।

জায়গিরদার প্রথা ঃ মুঘলরাষ্ট্রে সম্রাট এবং তার পারিষদবর্গ নিজেরাই শোষক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। যে অঞ্চলের রাজস্ব আমলাদের মধ্যে বিতরণ করা হতে, তার নাম ছিল জায়গির। এই জাতীয় রাজস্বের অধিকারীকে বলা হতো জায়গিরদার। 'মনসব' বা পদের মাধ্যমে এই সমস্ত জায়গিরদারদের স্থান নির্ণয় হতো। মনসবদারগণ সময়ে সময়ে নগদ অর্থে বেতন পেত, তখন তাদের বলা হতো 'নগদি'। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় সরাসরি বেতনের পরিবর্তে সাম্রাজ্যের একটি অংশের রাজস্ব তাদের মধ্যে বণ্টন করা হতো। সেই অংশের ভূমি রাজস্ব ও সম্রাটের অনুমোদিত বিভিন্ন করের অধিকারী হতো এই মনসবদাররা। এই জাতীয় মনসবদারদের নামই ছিল জায়গিরদার। সাম্রাজ্যের বেশীর ভাগ রাজস্বই জায়গিরদারদের আওতায় থাকত। জায়গিরের মধ্যেও দুটো ভাগ ছিল—তনখা জায়গির ও ওয়াতন জায়গির। বেতনের পরিবর্তে যে জায়গির দেওয়া হত তার নাম 'তনখা জায়গির' এবং 'ওয়াতন জায়গির' ছিল আসলে হিন্দু-সামন্তরাজার রাজ্য, যাদের অবস্থিতি মুঘল সাম্রাজ্যের আগে থেকেই ছিল এবং যারা আকবরের সময় থেকে মুঘল শাসন ব্যবস্থার সামিল হয়েছিল। একটি পরিবার বা গোষ্ঠীর বংশানুক্রমিক আনুগত্য পাওয়ার জন্য যাতে করে সাম্রাজ্যের প্রতি একটি আনুগত্যের ধারা সৃষ্টি করা যায়—সেটাও মুঘল সম্রাটদের একটা উদ্দেশ্য ছিল। এর ফলে রাজপুতদের মধ্যে বিভিন্ন রাজপরিবার 'ওয়াতন' জায়গিরের মাধ্যমে মুঘল শাসকদের কাছে বাঁধা পড়েছিলেন। তত্ত্বগতভাবে জায়গিরদারের মৃত্যুর পরই তার সমস্ত সম্পত্তি রাজপরিবারে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেলেও সাধারণতঃ জায়গিরদারদের বিশেষ কোন সন্তান রাজ দরবারে মনসব পেতেন। রাজস্বের পাঁচ ভাগের চার ভাগই জায়গিরদাররা পেতেন। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায় যে আকবরের সময় রাজস্বের ৮২ শতাংশ ভোগ করত ১,৫৭১ জন মনসবদার। বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা জায়গিরদারদের ইউরোপের সামন্তদের অনুরূপ বলে মনে করতেন।

শিল্পসাহিত্যের উন্নতি ঃ মহামতি আকবর নিরক্ষর হলেও তিনি একেবারেই অশিক্ষিত ছিলেন না। সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে তাঁর রুচি ছিল অসামান্য। তাঁর স্মৃতি-শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর, জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাঁর গ্রন্থাগারের তুলনা জগতে খুব অল্পই মিলত। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল যথেষ্ট। ভারতীয় ভাষা, কলা, শিল্প ও স্থাপত্য সকল ক্ষেত্রেই তাঁর দান অসামান্য। তাঁর উৎসাহে উর্দু ভাষার যথেষ্ট প্রসার হয়। তুলসীদাস, বীরবল এবং আব্দুর রহিম খান-ই-খানান আকবরের আমলেই তাদের বিখ্যাত রচনাবলী লিপিবদ্ধ করেন। তানসেন ছিলেন সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক। ফৈজী ছিলেন বিখ্যাত কবি এবং বাদাওনি ছিলেন অপর এক পণ্ডিত। আবুলফজল **'আইন-ই আকবরী'** এবং 'আকবর-নামা' নামে দুখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সময় তুলসীদাস হিন্দীতে **'রামচরিত মানস'** নামক রামায়ণ রচনা করেন। দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি, আকবরের নির্মিত ফতেপুর সিক্রীর প্রাসাদগুলি অপূর্ব শিল্পরীতির সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর আমলে চিত্রাঙ্কন রীতিও

উন্নতি লাভ করে। ঐতিহাসিক শ্লীম্যান ইতিহাসে আকবরের স্থান নিরূপণে বলেছেন তাঁর কাছে কবিদের মধ্যে যেমন সেক্সপীয়র, রাজাদের মধ্যে তেমনি আকবর।* আকবরের আদেশে অথর্ব বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ করা হয়।

আকবরের রাজসভা : আকবরের রাজ দরবারে ছিল পণ্ডিত, শিল্পী এবং অন্যান্য গুণী ব্যক্তিদের সমাহার। তিনি যখন তাঁদের সাথে বসে আলোচনা করতেন তখন তাঁকে খুব প্রফুল্ল দেখাতো। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেছেন যে, ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের ইতিহাসে একজন রাজাকে কেন্দ্র করে এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এত জ্ঞানী, কবি ও দার্শনিকের সমাবেশ আর কখনো হয়নি। আকবরের রাজসভা ছিল পাণ্ডিত্য ও শিল্প সাহিত্যের সুষমায় মণ্ডিত। বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কে আকবর যখন এদের সাথে যোগ দিতেন তখন কল্পনা করা যেত না যে, তিনি নিরক্ষর। তাঁর রাজসভা অলংকৃত করে থাকতেন নয় জন গুণী ব্যক্তি। এই ন'জন গুণী পণ্ডিত ব্যক্তিকে আকবর বলতেন নবরত্ন। আকবরের নবরত্ন সভায় ন'জন গুণী ব্যক্তির নাম ছিল হাস্যরসিক বীরবল, রাজস্ব সচিব তোডরমল, সেনাপতি মানসিংহ, মোল্লা দো পিয়াজ, রাজ প্রাসাদের কর্মচারী হাকিম হুকুম, কবি ফৈজী, ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্ আবুল ফজল, আবদুর রহিম খান-ই-খানান এবং সংগীতাচার্য তানসেন।

ধর্মীয় বিষয়ে আকবরের উদার মতামত ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। একটি বিশেষ পরিবেশের মধ্যে তাঁর উদার ধর্মমত গড়ে উঠেছিল। শৈশবে তাঁর মাতা তাঁকে ধর্মীয় বিষয়ে সহিষ্ণু মনোভাব অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কাবুলে অবস্থান করবার সময় তিনি সেকালের সুফীবাদের সংস্পর্শে আসেন। বুদ্ধের ধর্মমত, বেদান্ত এবং ভক্তিধর্ম সম্পর্কে সুফীবাদ শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে। সুফী সাধুরা তখন পারস্য থেকে পলায়ন করে কাবুলে বাস করছিলেন। এই সময়ে শিক্ষক আবদুল লতিফের উদার মতামত তাঁর মনে গভীর ছাপ ফেলে। যৌবনে রাজপুত পত্নী এবং হিন্দু সভাসদদের প্রভাব তাঁর চরিত্রের উপর পড়ে। সত্যের সন্ধানের জন্য তাঁর মন উদগ্রীব হয়। এতকাল সম্রাট ছিলেন সুন্নী মুসলমান। এখন থেকে তিনি এক নূতন ধর্মমতের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন।

দীন-ই-ইলাহী : রাজধানী ফতেপুর সিক্রীতে সম্রাট 'ইবাদতখানা বা একটি উপাসনা মন্দির স্থাপন করে দার্শনিক এবং ধর্মীয় তত্ত্বের আলোচনার আয়োজন করেন। তিনি প্রথমে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী পণ্ডিতদের আহ্বান করেন, কিন্তু তাঁদের গোঁড়ামি এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ তাঁর ভাল লাগে না। এর পরে তিনি হিন্দু, জৈন ও খৃষ্টান ধর্মের বিভিন্ন পণ্ডিতদের আলোচনার জন্য আহ্বান করেন। হিন্দু পণ্ডিতদের মধ্যে পুরুষোত্তম ও দেবী, জৈনদের মধ্যে হরীবিজয় সুরী ও বিজয় সেন সুরী প্রসিদ্ধ। সুদূর গোয়া থেকে

*"Akbar appears to me among the kings what Shakespeare among the poets"—Sleeman.

আসেন খ্রীষ্টান পাদরীরা। প্রসিদ্ধ পর্তুগীজ পাদ্রী মনসারেট আকবরের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আকবর পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করতেন, পরম ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের বক্তব্য শুনতেন। আলোচনার সময় সকল ধর্মের পণ্ডিতদের মনে হত যে সম্রাট তাঁর মতে বিশ্বাসী হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোন ধর্মমতেই পুরোপুরি বিশ্বাসী হতে পারেন নি। এ অবস্থায় আকবর এক নূতন ধর্মমত প্রচার করেন। উহাই দীন-ই-ইলাহী নামে খ্যাত। জেস্যুইট লেখক বার্তোলি (Bartoli) বলেছেন যে মহম্মদের কোরাণ, ব্রাহ্মণদের ধর্মশাস্ত্র এবং খ্রীষ্টের বাণী থেকে কিছু কিছু ধর্মমত সংগ্রহ করে আকবরের দীন-ই-ইলাহী মতবাদ গঠিত। বিচক্ষণ আকবর এই নূতন মতবাদ প্রজাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই। ইহা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়নি। মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে এর প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। সম্ভবতঃ আকবর তাঁর নূতন ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে পরীক্ষা চালাতে উদগ্রীব ছিলেন।

গোঁড়া মুসলমান বদাউনী আকবরের এই নূতন ধর্মমতের কঠোর সমালোচনা করেছেন। অনুরূপভাবে আরও অনেক ঐতিহাসিক আকবরের ধর্মমতের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় আকবর একজন উদার মতাবলম্বী সর্বপ্রকার গোঁড়ামির বিরোধী সত্য-সন্ধানী সম্রাট হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মুঘল সাম্রাজ্য ও তাঁর ধর্মমত : রাজনীতির দিক থেকে বিচার করলেও মনে হয় যে আকবরের উদার ধর্মমত মুঘল সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। বিভিন্ন ধর্ম মতাবলম্বী মানুষের দেশ হিন্দুস্থানকে একটি সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে ধর্মীয় বিষয়ে উদার মনোভাবই উপযোগী। পরবর্তীকালে আকবরের উদার ধর্মমত বিসর্জন দিয়ে গোঁড়া সুন্নী মুসলমান আওরঙ্গজেব অ-মুসলমানদের সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে ধর্মীয় বিষয়ে পরমতসহিষ্ণু মনোভাব অবলম্বন করে আকবর ইতিহাসের একজন মহান সম্রাট হিসাবে খ্যাত হয়ে আছেন। তদানীন্তন ইউরোপে ধর্মকে কেন্দ্র করে যে নিরবছিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহ এবং দেশে দেশে দমননীতি শুরু হয়েছিল তার পটভূমিতে বিচার করলে আকবরের মহত্ব আরও উজ্জ্বল রূপে দীপ্তিমান।

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত নির্মাতারূপে আকবর : আকবরের আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের যে শক্তি হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই প্রজাসাধারণের সম্মতি ও সমর্থন ছাড়া হয়নি। বহু ধর্মের দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রয়োজন আকবর বুঝেছিলেন। তাই তিনি ছিলেন ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত। তাঁর রাজপুতনীতিও সেইভাবে গড়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ আকবরকেই বলা হয় ভারতের প্রথম আধুনিক মনোভাবাপন্ন রাজা।

মনের আবেগে তিনি রাজপুতদের প্রতি সম্মান দেখান নি। অনুগত রাজপুত রাজাদের সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সহৃদয়, যেমন অম্বর রাজপরিবারের প্রতি। মোটামুটি আত্মসম্মান রক্ষা করে যাঁরা তার সার্বভৌমত্ব মেনেছেন তাঁদের সঙ্গে তিনি করেছেন

আপস, যেমন বুন্দির সাথে। আবার বাধা পেলে তাকে চূর্ণও করেছিলেন যেমন করেছিলেন মেবারকে।

ধর্মের নামে উন্মাদনাকে আকবর বরদাস্ত করেন নি। যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস এবং মুসলমান বানানোর পুরানো নীতিও তিনি বাতিল করেন ১৫৬৩ সনে। তিনি হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে তীর্থকর আদায় নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং পরের বছর জিজিয়া করও তুলে দেন। কিন্তু আকবরের সময় বহু হিন্দু পেয়েছিলেন সর্বোচ্চ পদ, যেমন মানসিংহ, টোডর মল, বীরবল। জ্ঞানীগুণী হিন্দুদের তিনি সমাদর করেছেন। সতীদাহ বন্ধ করতেও তিনি চেষ্টা করেছেন।

ধর্মবিশ্বাসে আকবর ছিলেন অনেকটা সংস্কারমুক্ত। তাছাড়া ধর্মের ঝগড়া দূর হলে রাষ্ট্রে মঙ্গল হবে, একথাও তিনি বুঝেছিলেন। সব ধর্মের প্রতি সমান সম্মান দেখিয়ে তিনি ধর্মমতের আদান-প্রদানকেই উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর ইবাদৎখানায় বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতরা তত্ত্বকথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। দীন-ইলাহী প্রবর্তন করতে কাউকে এই ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করতে আকবর বাধ্য করেন নি। মোট কথা ধর্মীয় উদারতা, সহনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে তিনি ভারতের ঐক্য আনতে চেষ্টা করেছিলেন।

মুঘল শাসনব্যবস্থাও আকবরের সময়েই সুগঠিত হয়েছিল। ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং যোগ্যতার সমাদর ছাড়াও কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বে শাসন ব্যবস্থার ঐক্যই ছিল আকবরের শাসন বৈশিষ্ট্য। কোন্‌টা আইন আর কোনটা আইন নয়, এ ব্যাপারটাও আকবরের আমলে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। সারা দেশে একই মুদ্রা; ওজন, সরকারী ভাষা ও আইন প্রচলনের ফলে এসেছিল রাষ্ট্রীয় ঐক্য। জনসাধারণের কল্যাণকর স্বৈর শাসনই ছিল আকবরী নীতি। অবশ্য বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের পরামর্শকে তিনি গুরুত্ব দিতেন। তার স্বৈরাচার ছিল জ্ঞানদীপ্ত।

আকবরী অভিজাতদের মধ্যে তুর্কি, তাতার, পার্সীর সাথে হিন্দুও ছিলেন। দক্ষতার জোরেই অনেকে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান পেয়েছিলেন। নীচু থেকে উপর পর্যন্ত মনসবদারীর কম-বেশী দায়িত্ব সব রাজকর্মচারীকেই নিতে হত। অপেক্ষাকৃত উন্নত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা এবং নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার সাহায্যে আকবর পেয়েছিলেন প্রজাদের আনুগত্য। তাই সম্রাট আকবরের সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য উঠেছিল গৌরবের শীর্ষে।

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭)ঃ আকবরের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে তাঁহার পুত্র সেলিম 'জাহাঙ্গীর' নাম গ্রহণ করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অভিষেকের পরেই তিনি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য 'দ্বাদশটি অনুশাসন' প্রচার করেছিলেন। সেলিম স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বের প্রারম্ভে তাঁহার পুত্র খসরুও পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। খসরু পরাজিত ও বন্দী হন। পরে তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। খসরুকে সাহায্য করার অপরাধে শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুনকেও বন্দী করা হয় ও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। নিরপরাধ গুরু অর্জুনের

হত্যাতে শিখগণ মুঘল-সাম্রাজ্যের চিরশত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এর পর হতেই শিখ-সম্প্রদায় একটি প্রবল সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়।

সম্রাজ্ঞী নূর-জাহান : জাহাঙ্গীর দুর্বল চিত্তের লোক ছিলেন। তারই সুযোগ নিয়ে শাসন ব্যাপারে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন তাঁর পত্নী সম্রাজ্ঞী নূর-জাহান। নূর-জাহান অসামান্য সুন্দরী ও গুণবতী নারী ছিলেন। জাহাঙ্গীরের খামখেয়ালীপণায় বাদশাহের রাজোচিত গুণের যে অভাব ছিল তা পূরণ করার মত বিচক্ষণতার অধিকারিণী ছিলেন এই পারস্য রমণী। তিনি তাঁর অভিনব প্রভাবে মানসিক দ্বিধাগ্রস্ত স্বামীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। সম্রাটের আদেশপত্র বা 'ফারমানে' নূর-জাহানের স্বাক্ষর না থাকলে আদেশপত্র কার্যকরী হত না। নূর-জাহানের আদেশে তাঁহার পিতার নামে মর্মর-নির্মিত একটি অতি সুদৃশ্য সমাধিভবন আগ্রাতে নির্মিত হয়। মুঘল-স্থাপত্যশিল্পে ইহা-অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। সাম্রাজ্যে নূর-জাহানের এরূপ অপ্রতিহত প্রাধান্যে আমীরগণের মধ্যে অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজ্যবিস্তার : আকবরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে মুঘল-সাম্রাজ্যের করতলগত হয় নি। জাহাঙ্গীরের সময়ে বাংলার বিদ্রোহী জমিদারগণ মুঘল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করেন। বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকা নগরীতে স্থানান্তরিত হয়। ঢাকা নগরী তখন 'জাহাঙ্গীরাবাদ' নামে অভিহিত হত। এরপর কোচবিহার রাজ্য ও আসামের কতকাংশ মুঘল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রধান কীর্তি মেবার-জয়। মেবারের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীর রাজপুত্র খুর্‌রমকে প্রেরণ করেছিলেন। প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অমর সিংহ তখন মেবারের রাণা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুঘলের সাথে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন এবং জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর মেবারের মর্যাদা রেখেছিলেন। মেবারের সাথে সন্ধির সর্ত ছিল যে, মেবারের রাণাদের মুঘল-দরবারে সামন্ত-রাজা রূপে উপস্থিত থাকতে হবে না। আর মেবারের রাণা-পরিবারের কোন দুহিতাকে বাদশাহের অন্তঃপুরবাসিনী হতে হবে না।

১৬১৬ সনে রাজপুত্র খুর্‌রমের অধিনায়কত্বে দাক্ষিণাত্যে আহমদনগর রাজ্যের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করা হয়। আহমদনগরের এই দুর্দিনে মালিক অম্বর নামে একজন হাবসী বা আবিসিনীয় সুদক্ষ মন্ত্রী ছিলেন। মুঘল সৈন্য আহমদনগর-দুর্গ দখল করলেও আহমদনগর-রাজ্য সম্পূর্ণভাবে জয় করতে পারে নাই। ১৬২০ সনে পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে দুর্ভেদ্য কাংড়া দুর্গ মুঘলদের হস্তগত হয়। আহমদনগর বিজয়ের পর জাহাঙ্গীর পুত্রের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'শা-জাহান' উপাধি দেন। ১৬২২ সনে পারস্যাধিপতি মুঘল-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কান্দাহার প্রদেশটি জয় করেন। কান্দাহার তখন একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও ভারত-প্রবেশের একটি দ্বার ছিল। কান্দাহার অঞ্চল থেকে মুঘল সম্রাট্‌গণ সৈন্য সংগ্রহ করতেন। কান্দাহার পুনরুদ্ধার করবার জন্য জাহাঙ্গীর শা-জাহানকে আদেশ করলেন। শা-জাহান পিতার আদেশ অমান্য করে

তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু ১৬২৫ সনে তিনি পিতার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ১৬২৭ সনে জাহাঙ্গীর মারা যান। কান্দাহারে এখনও তাঁর সমাধি বিদ্যমান।

পোর্তুগীজদের শাস্তিঃ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুঘল-সাম্রাজ্যের সাথে পোর্তুগীজদের সংঘর্ষ হয়। তাঁরা সমুদ্রপথে বণিকদের জাহাজ লুটপাট করত। পোর্তুগীজদের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে জাহাঙ্গীর খ্রীষ্টধর্মের প্রকাশ্য অনুষ্ঠান ভারতে নিষিদ্ধ করে দেন ; সাম্রাজ্যের সমস্ত পোর্তুগীজ অধিবাসীদের মুঘল রাষ্ট্রের বণিকদের সাথে বাণিজ্য করার অধিকার কেড়ে নেন। পর্তুগীজরা ক্ষমা প্রার্থনা করে মুক্তি পায়।

মুঘল দরবারে ইংরাজ দূতঃ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম ভাগে ১৬১৫ সনে ইংলণ্ডের রাজা জেমস্ জাহাঙ্গীরের দরবারে সার টমাস রো নামে একজন ইংরাজ দূত পাঠিয়েছিলেন। রো জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রায় তিন বৎসর কাল ছিলেন। তাঁর পর হকিন্স নামে আর একজন ইংরেজও ভারতবর্ষে আসেন। ইঁহাদের দুজনের বিবরণ হতে তখনকার ভারত সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।

শাসকরূপে জাহাঙ্গীরঃ

ভারতবর্ষে মোঘল যুগে জাহাঙ্গীর ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য শাসক। অবশ্য তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সব ঐতিহাসিক একমত নন। কয়েকজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের মতে তাঁর মধ্যে কয়েকটি পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশ ঘটেছিল—তিনি ছিলেন একাধারে কোমল ও নিষ্ঠুর, ন্যায়বান ও খামখেয়ালী, রুচিবান ও বর্বর, পরিণত ও শিশুসুলভ। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মতে তিনি ছিলেন একজন ন্যায়বিচারক ও মহান রাজা যিনি নিরপেক্ষতা ও ন্যায় বিচারকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন। অভিষেকের পরই প্রজার মঙ্গলের জন্য জাহাঙ্গীর যে অনুশাসন প্রচার করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে তার মানবতার পরিচায়ক।

শাসক হিসাবে জাহাঙ্গীর সফল বলে গণ্য হলেও এ বিষয়ে তাঁর আকবরের মত প্রতিভা ছিল না। তাঁর আমলে কোন উল্লেখযোগ্য আইন তৈরী হয়নি বা কোন শাসন-সংস্কার ঘটে নি। তিনি তাঁর পিতার শাসন-ব্যবস্থাকে কোন রকম পরিবর্তিত করেন নি। কিন্তু জাহাঙ্গীরের এই ক্ষমতা ছিল না এবং ফলত, তিনি সর্বসময়েই অন্যের দ্বারা চালিত হতেন।

তার রাজত্বকাল মোটামুটি শান্তি ও সমৃদ্ধির কাল ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। তাঁর সময়ে ভাস্কর্য-শিল্পেও অসাধারণ উন্নতি হয়, এছাড়া অঙ্কন এবং সাহিত্য শিল্পেরও বিকাশ হয়েছিল। এই সময়েই তুলসীদাস রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তাঁর কৃতিত্ব তাঁর মহান পিতা ও উজ্জ্বল পুত্রের কৃতিত্বে অনেকখানি ঢাকা পড়ে গেছে। এ কথা সত্য যে তাঁকে মহান রাজা বা রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ বলা যায় না ; তাঁকে অসাধারণ প্রতিভাবান প্রশাসক বা কূটনীতিবিদ

বলা যায় না। ইহা সত্ত্বেও জাহাঙ্গীরের বিদ্যানুরাগ ছিল প্রবল। তিনি নিজেই নিজের জীবন চরিত লিখে গিয়েছেন। তাঁর স্বলিখিত আত্মজীবনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী খুবই আকর্ষণীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ।



জাহাঙ্গীর



শাহজাহান

শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রীঃ)ঃ সম্রাট জাহাঙ্গীরের চার পুত্রের মধ্যে খুররম্ বা শাহজাহান ছিলেন তৃতীয়। তাঁর প্রথম দুই পুত্রের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর শাহজাহানকে সিংহাসনের জন্য মনোনীত করেন। শাহজাহানও দাক্ষিণাত্য হতে এসে আগ্রাতে অভিষিক্ত হলেন এবং সিংহাসন দাবি করলেন।

পোর্তুগীজ দমনঃ বাংলাদেশে পোর্তুগীজদের সাথে শাহজাহানের এক সংঘর্ষ হয়। জাহাঙ্গীর পোর্তুগীজগণকে শাস্তি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাদের অত্যাচার একেবারে বন্ধ করতে পারেন নি। পোর্তুগীজগণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও ধর্মান্ধ ছিল। তারা জলদস্যু-বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে হানা দিয়ে বহু লোককে বন্দী করে অন্যদেশে দাস হিসাবে বিক্রয় করত। তাদের অত্যাচারে বাংলাদেশ জর্জরিত হয়ে উঠেছিল। শাহজাহান বাংলাদেশের সুবাদারকে পোর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে আদেশ দেন। পোর্তুগীজ-অধিকৃত হুগলী দুর্গ মুঘলদের হস্তগত হয় এবং সেখানকার সমস্ত পর্তুগীজদের বন্দী করে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীরূপে আগ্রায় পাঠান হয়। এরপর মুঘল-সাম্রাজ্যের ভিতর পোর্তুগীজগণের অত্যাচার অনেক কমে যায়।

রাজ্য-বিস্তারঃ আকবর ও জাহাঙ্গীরের মত শাহজাহানও ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। সিংহাসনে বসে তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। দাক্ষিণাত্যে

তখন খান্দেশ, আহমদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা—এই চারিটি সুলতানী রাজ্য ছিল। আকবর খান্দেশ, ও আহমদনগরের এক অংশ—বেরার, জয় করেছিলেন। জাহাঙ্গীর চেষ্টা করেও সমগ্র আহমদনগর-রাজ্য অধিকার করতেপারেন নাই। অবশেষে ১৬৩৩ সনে শাহজাহান আহমদনগর মুঘল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এর পরে তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করার জন্য মনোনিবেশ দিলেন। এই দুটি ছিল 'সিয়া' মুসলিম রাজ্য। শাহজাহান ছিলেন 'সুন্নী' সম্প্রদায়ের মুসলমান। ১৬৩৬ সনে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর মুঘল-সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হল। শাহজাহান তাঁর তৃতীয় পুত্র অষ্টাদশ বর্ষীয় আওরংজেবকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেন। আওরংজেব দুবারে প্রায় ১২ বৎসর কাল দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী করেন। দুইজন পারস্যদেশীয় আমীর তাঁর দক্ষিণ ও বামহস্তস্বরূপ ছিলেন—একজনের নাম মুর্শিদকুলী খাঁ ও অপর জনের নাম মীর জুমলা। মীর জুমলা ব্যবসায়ী হিসাবে ভারতে আসেন। তারপর স্বীয় বুদ্ধি ও অধ্যবসায় গুণে তিনি গোলকুণ্ডার মন্ত্রী হন। পরে আওরংজেবের প্ররোচনায় ও উৎকোচের লোভে তিনি গোলকুণ্ডার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। আওরংজেবের সিংহাসন-প্রাপ্তির পর মীর জুমলা ও মুর্শিদকুলা খাঁ দুই জনেই উচ্চপদ লাভ করেন।

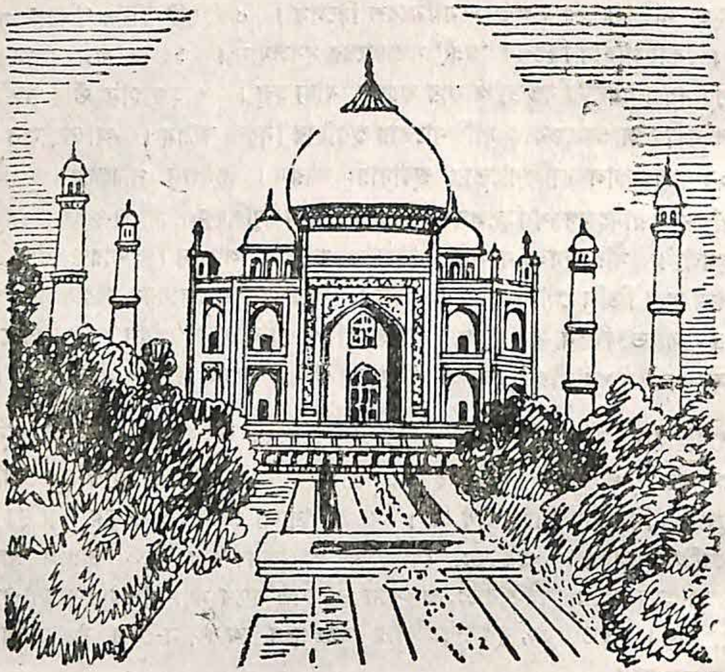
শাহজাহান মধ্য এশিয়া জয় করে পূর্বপুরুষদের রাজধানী সমরখন্দ পুনরুদ্ধার করবার স্বপ্ন দেখতেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে তিনবার কান্দাহার অভিযান হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়। মুঘল-সাম্রাজ্য থেকে কান্দাহার বিচ্ছিন্ন হবার ফল হয়েছিল গুরুতর। প্রথমতঃ, বৈদেশিক আক্রমণকারীর পক্ষে ভারতে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ, স্থলপথে ভারতের সাথে মধ্য-এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ, মুঘল-বাহিনীর জন্য দুর্ধর্ষ আফগান-সৈন্য সংগ্রহ করা আর সম্ভবপর হল না।

কান্দাহারে ব্যর্থতা—জাহাঙ্গীরের সময়ে কান্দাহার হস্তচ্যুত হওয়ায় সাম্রাজ্যের বিপুল ক্ষতি হয়। ১৬৩৭ খ্রীঃ শাহজাহান কান্দাহার পুনরাধিকার করেন; কিন্তু ১৬৪৮ খ্রীঃ পারস্যরাজ পুনরায় উহা জয় করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বালখ অভিযানে ভারতে অজস্র অর্থব্যয় ও প্রভূত লোকক্ষয় হলে শীঘ্রই ইহা হস্তচ্যুত হয়। গোলকুণ্ডার সুলতান কর দিতে অস্বীকার করায় তাঁর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ বহু অর্থ ও রত্নগির জেলা নিয়ে সন্ধি করা হল। পরে বিজাপুর আক্রমণ করে শাহজাহান বিজাপুর রাজ্যের কতক অংশ নিয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন।

শাহজাহানের ঐশ্বর্য্য ঃ শাহজাহানের শাসনকাল মোঘল শাসনের **সুবর্ণ যুগ** বলে বিখ্যাত। তাঁর মত সৌন্দর্য্য ও আড়ম্বরপ্রিয় নরপতি ভারতে আর ছিল না। তাঁর রাজত্বকাল শিল্পের ইতিহাসে গৌরবময় যুগ। স্থাপত্যশিল্পে তার অনুরাগ ছিল গভীর। আগ্রা ও দিল্লীকে সমৃদ্ধিশালী করবার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে তিনি দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে বহু সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, সমাধি

ও মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। ফরাসী দেশীয় পর্যটক বার্নিয়ে ও তাভার্নিয়ে তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

শিল্পকলা: আগ্রার ভুবনবিখ্যাত **তাজমহল** তাঁরই প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতি চিরস্মরণীয় করবার জন্য মমতাজের সমাধির উপর নির্মিত হয়েছিল।



তাজমহল

ইহা ইন্দো-পারসিক স্থাপত্য-রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। এটা তৈরী করতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল এবং একুশ বৎসর সময় লেগেছিল। দিল্লীর **জাম-ই-মসজিদ** এবং আগ্রার **মতি মসজিদও** শাহজাহানের অন্যতম কীর্তি। দিল্লীর অতি নিকটে শাহজাহান এক নূতন নগরী নির্মাণ করেন। তাঁর নাম অনুসারে ইহা **শাহজাহনাবাদ** নামে পরিচিত। এখানে বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। এখানে নির্মিত **দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম** প্রভৃতির কারুকার্য দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

শাহজাহানের বিখ্যাত **ময়ূর সিংহাসনও** অতি অপূর্ব্ব। অসংখ্য মণিমাণিক্য-খচিত এই সিংহাসন অগণিত অর্থব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল। বিশ্ববিখ্যাত **কোহিনূর মণি** শাহজাহানের শিরস্ত্রাণে শোভা পেত। ১৭৩৯ খ্রীঃ পারস্যরাজ নাদির শাহ এই দুটি অমূল্য সম্পদ লুণ্ঠন করে পারস্যে নিয়ে যান। শাহজাহানের রাজত্বকালে চিত্রশিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়।

শিল্পকলার দিক দিয়ে দেখলে শাহজাহান মুঘল সম্রাটগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাবার যোগ্য। ভারতের কলা এবং শিল্পের ইতিহাসে শাহজাহানের রাজত্বকাল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর রাজত্বকালে স্থাপত্যশিল্প গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল।

শাসকরূপে শাহজাহান ঃ ১৬২৭ থেকে ১৬৫৮ পর্যন্ত শাহজাহানের ত্রিশ বছর রাজত্বকে ভারতবর্ষের মুঘল শাসনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। ডঃ স্মিথের ভাষায় শাহজাহানের রাজত্বকালে বাহ্যতঃ মুঘল সাম্রাজ্য সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। তাঁর রাজত্বকালে সমগ্র সাম্রাজ্যে সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করত। তার সময়ে কোন বিদেশীশক্তি রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করেনি। শাহজাহানের সময়ে দাক্ষিণাত্যে বিপুল জয়লাভ সম্ভব হয় এবং সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের চরম সমৃদ্ধি ঘটে এবং পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে নতুন নতুন বাণিজ্যের দিক উন্মুক্ত হয়। বহুবিধ ভাস্কর্যের অনিন্দ্য সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যে এই রাজত্বকাল ছিল অতুলনীয়। তাঁর রাজত্বকাল অনেকদিক থেকে সুখী ও সমৃদ্ধ হলেও এর পাশাপাশি কয়েকটি অন্ধকার দিকও ছিল।

শাহজাহান যথেষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। ফার্সী, হিন্দী ও তুর্কীভাষা জানতেন। কাব্য, সংগীত ও চিত্রকলায় তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি সে-সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা বলে বিবেচিত হন। মোগল সাম্রাজ্যকে তিনি গৌরবের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শাহজাহান সুদক্ষ শাসক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ ছিলেন। তিনি বিজিত প্রদেশসমূহে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করতে ও তার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করতে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তিনি প্রশাসনকে, বিশেষত, মনসবদারী প্রথাকে ঢেলে সাজাতে পেরেছিলেন। তিনি মনসবদারদের বেতন হার কমিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের পদানুযায়ী সৈন্যসংখ্যা সীমিত রাখতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের প্রতি দেয় রাজস্বকে এক তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক অংশে পরিণত করে ভূমি রাজস্বের আদায় বৃদ্ধি করেছিলেন। সদয় প্রশাসক হিসাবে তিনি জনগণের দুঃখদুর্দশা লাঘব করার বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। নতুন রাস্তা ও নালা তাঁর আমলে নির্মিত হয়েছিল। কৃষক সমাজকে রক্ষা করার জন্য তিনি অনেক সময়ে নিজের ও শাসক প্রশাসকদের পদচ্যুত করেছিলেন। এসব সত্ত্বেও প্রদীপের তলায় যেমন থাকে অন্ধকার, শাহজাহানের রাজত্বকালও তেমনি প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির পাশে ছিল অভাব ও ক্লেদ। মেহনতী মানুষের জীবন অভিজাতবর্গের বিলাস-ব্যসনের বোঝা বইতে এবং সম্রাটের শিল্প-প্রীতির বাস্তবায়নে তার শ্রমের মাধ্যমে যে সাফল্য পেত তা থেকে তাঁদের জীবনে উঠেছিল হাহাকার। বস্তুতঃ শাহজাহানের রাজত্বকালেই মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ রোপিত হয়। তবু নানা গুণের আলোকে শাহজাহানের শাসনকালকে মুঘল শাসনের স্বর্ণযুগ বলে বর্ণিত হয়ে থাকে।

আওরঙগজেব ঃ (১৬৫৯-১৭০৭)

শাহজাহানের উত্তরাধিকারী নিয়ে বিরোধ—সম্রাট শাহজাহানের চারিপুত্র ছিলেন—দারা, সুজা, আওরঙগজেব ও মুরাদ। জ্যেষ্ঠ দারা পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং রাজধানীতে থাকতেন। ধর্মে উদার ছিলেন বলে গোঁড়া মুসলমানরা তাঁকে ধর্মদ্রোহী মনে করত। দ্বিতীয় পুত্র সুজা প্রায় সপ্তদশ বৎসর বাংলার সুবাদারী করেছিলেন। তিনি অলস ও বিলাসী ছিলেন। তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব দৃঢ়চেতা, কার্যদক্ষ, কৌশলী, রণ-নিপুণ এবং ইসলাম ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। কৌশলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে তিনি পশ্চাৎপদ হতেন না। ইসলাম ধর্মে অবিচলিত বিশ্বাস তাঁকে গোঁড়া মুসলমানগণের প্রিয়পাত্র করেছিল। চতুর্থ পুত্র মুরাদ সরল প্রকৃতি; বিলাসপ্রিয় এবং উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন।



আওরঙ্গজেব

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে শাহজাহান কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলেন। তখন সুজা বঙ্গদেশে, আওরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে এবং মুরাদ গুজরাটে ছিলেন। পিতার পীড়ার সংবাদে সকলেই দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। দারা ছিলেন পিতার মনোনীত উত্তরাধিকারী। কাজেই সকলেই ভেবেছিল যে সম্রাট জীবিত নাই এবং সিংহাসন নির্বিবাদে অধিকার করার জন্য দারা পিতার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করেন নাই।

আওরঙগজেব দাক্ষিণাত্য থেকে সসৈন্যে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং পথে মালবে মুরাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্ধি করলেন। দারা আওরঙগজেব ও মুরাদের গতিরোধ করার জন্য যশোবন্ত সিংহ এবং কাসিম খাঁকে পাঠালেন। দারার পুত্র সুলেমান শিকো এবং জয়সিংহ সসৈন্যে সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মাতের যুদ্ধে ও সামুগড়ের যুদ্ধে দারা আওরঙগজেব কর্তৃক পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। আওরঙগজেব আগ্রা অধিকার করে শাহজাহানকে বন্দী করলেন এবং মুরাদকে বন্দী করে পরে তাঁর শিরচ্ছেদ করানো হয়। আওরঙগজেব এর পর সুজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন এবং ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে খানুয়ার যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করলেন। সুজা শেষে সপরিবারে আরাকানে পালিয়ে গেলে আরাকান রাজের আদেশে নিহত হন। দারা পাঞ্জাব থেকে মুলতান এবং শেষে রাজপুতানায় পালিয়ে ছিলেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে দেওরাইর যুদ্ধে দারা আবার আওরঙ্গজেব কর্তৃক পরাজিত হন। পরে তিনি ধৃত হয়ে ধর্মদ্রোহের অভিযোগ দ্বারা আওরঙগজেবের আদেশে নিহত হলেন। এইভাবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধের সমাপ্তি ঘটে।

আওরঙ্গজেব ঃ ১৬৫৮ সনে আওরঙ্গজেব রক্তক্ষয়ী গৃহবিবাদের মাধ্যমে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। আওরঙ্গজেবের সামনে সমস্যার অন্ত ছিল না। বাংলাদেশে মগ জলদস্যুদের উৎপাত, আসামে আহোমদের সাথে সংঘর্ষ, মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য রক্ষা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উপজাতিদের বিদ্রোহ, রাজপুতদের সাথে অসদ্ভাব, শিখদের অসন্তোষ এবং দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার ছিল কয়েকটি বিশেষ সমস্যা। বঙ্গদেশে তিনি মগ দস্যুদের দমন করেন। আহোমদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন অভিযান করে (সেনাপতি) মীর জুমলা কামরূপ অধিকার করেন। পূর্ব দিকে সাম্রাজ্যের সীমানা এইভাবে আরও বাড়ে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গোলমালও তার হস্তক্ষেপে প্রশমিত হয়, সাময়িকভাবে কমে যায়।

শাহজাহানের সময়ই আওরঙ্গজেব ছিলেন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার। সে সময়ই তিনি গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুর আক্রমণ করেছিলেন। ঐ দু'টি রাজ্যই বশ্যতা স্বীকার করে সেলামী দিতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেব যখন সিংহাসনে বসলেন, তখন দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তিও মাথা তুলেছে। মারাঠাদের উত্থানে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডাও সাহস পেয়ে গেল। সুতরাং মারাঠা দমন হল আওরঙ্গজেবের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে রাজ্যবিস্তার—আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর জুমলাকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে আহোম ও আরাকানী মগদিগের সাথে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে মীরজুমলা সসৈন্যে পূর্বদিকে অগ্রসর হলেন। মুঘল বাহিনী কোচবিহার অধিকার করে ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে আহোমগণের রাজধানী গড়গাঁও হস্তগত করে। আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিলেন এবং মুঘল সম্রাটকে বার্ষিক কর দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। মীরজুমলা সসৈন্যে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করলে পথে তাঁর মৃত্যু হল (১৬৬৩ খ্রীঃ)। চার বৎসর পর আহোমগণ মুঘল সেনাদলকে বিতাড়িত করে গৌহাটি অধিকার করে। এরপর দীর্ঘকাল আহোমদিগের সহিত মুঘল সরকারের যুদ্ধ চলেছিল, কিন্তু এতে কোন স্থায়ী ফল হয়নি।

মীরজুমলার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেবের মাতুল **শায়েস্তা খাঁ** বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি মগদিগকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেছিলেন (১৬৬৬ খ্রীঃ)। পর্তুগীজ জলদস্যুদিগকে দমন করে তিনি পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে শান্তি স্থাপন করেছিলেন।

উত্তরপশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধ—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসী আফ্রীদি, ইউসুফজাঈ প্রভৃতি দুর্দান্ত উপজাতিসমূহ নামে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন হলেও কার্যতঃ স্বাধীন ছিল। তারা সুযোগ পেলেই কাবুলযাত্রী বণিকদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করত এবং সমতলভূমির অধিবাসিগণের বাড়ি-ঘর বিনষ্ট করত। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউসুফজাঈগণ এবং ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রীদিগণ বিদ্রোহী হয়েছিল এবং তাদের উপদ্রবে কচ্ছ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে হাহাকার উঠেছিল। আওরঙ্গজেবের সৈন্যদল এইসব বিদ্রোহ দমন করেছিল এবং মুঘল সরকার উপজাতিসমূহের নেতৃগণকে উৎকোচ দানে বশীভূত করেছিল। তথাপি সীমান্ত প্রদেশে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয়নি।

উত্তর ভারতে হিন্দুগণের বিদ্রোহ—উত্তর ভারতে হিন্দুদের বিদ্রোহের মধ্যে রাজপুতদের বিদ্রোহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যোধপুরের (মাড়বার) রাজা **যশোবন্ত**



সিংহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জামরুদ নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই আওরঙ্গজেব যোধপুর রাজ্য অধিকার করলেন। যশোবন্ত সিংহের কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র না থাকায় কেহ বাদশাহী ফৌজকে বাধা দিতে পারল না। যশোবন্তের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে তার এক পুত্রের জন্ম হয়। তার নাম **অজিত সিংহ**। রাঠোর-সর্দার দুর্গাদাস নাবালক রাজপুত্র ও রাণীকে নিয়ে যোধপুরে উপস্থিত হলেন। তখন

আওরঙ্গজেব স্বয়ং সসৈন্যে আজমীর উপস্থিত হলেন এবং নিজপুত্র আকবরকে মারবাড় বিজয়ের ভার দিলেন।

মারবাড়ে যখন মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তখনই আওরঙ্গজেব জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করলেন (১৬৭৯)। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে মেবারের পরাক্রান্ত রাণা **রাজসিংহ** রাঠোরদের সাথে যোগদান করলেন। মুঘল বাহিনী মেবার আক্রমণ করে চিতোর অধিকার করে। রাজসিংহ সসৈন্যে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। রাজসিংহকে দমন করার জন্য আওরঙ্গজেব শাহাজাদা আকবরের অধীনে এক বিরাট সৈন্যদল পাঠালেন। রাজপুতরা গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করে মুঘল শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে থাকে। এমতাবস্থায় আকবর রাজসিংহকে দমন করতে না পারায় আওরঙ্গজেব অসন্তুষ্ট হয়ে অপর পুত্র আজমকে মেবার বিজয়ের ভার দিলেন। এই সময়ে রাঠোরদের সঙ্গেও যুদ্ধ চলছিল। আকবর পিতার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে এবং রাজপুতগণের সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে পারবেন মনে করে বিদ্রোহী হলেন (১৬৮১ খ্রীঃ) কিন্তু আওরঙ্গজেবের কূটনীতির ফলে রাজপুতগণ আকবরের পক্ষ ত্যাগ করে। আকবর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব দেখে দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যান এবং মারাঠারাজ শম্ভুজীর দরবারে উপস্থিত হলেন। অতঃপর আওরঙ্গজেব সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হলে হতভাগ্য আকবর জলপথে পারস্য দেশে পালিয়ে যান এবং ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আকবরের বিদ্রোহ ঘোষণার পূর্বেই মেবারের রাণা রাজসিংহের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর পুত্র জয়সিংহ ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন। কিন্তু মারবাড়ের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুকাল (১৭০৭ খ্রীঃ) পর্যন্ত মারবাড়ে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। তাঁর পুত্র বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে অজিত সিংহ যোধপুর অধিকার করে পৈতৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

আওরঙ্গজীব শিখদিগের গুরু তেগ বাহাদুরের প্রাণদন্ড বিধান করে পাঞ্জাবে দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি করেন। তেগ বাহাদুরের পুত্র **গুরু গোবিন্দ সিংহ** শিখদিগকে একটি সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত করেন।

মারাঠা নায়ক শিবাজী ও সম্রাট আওরঙ্গজেব :

সপ্তদশ শতকে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থান ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উত্তর ভারতে রাজপুতদের জীবন সন্ধ্যার পরে দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের জীবন প্রভাতের শুরু। এই মারাঠা জাতির প্রভাত-সূর্য শিবাজী।

কতকগুলি ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে মারাঠাদের মধ্যে নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হয়েছিল। মারাঠাদের ধর্মগুরু একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মহাপুরুষদের প্রচার এই নবীন জাতির মধ্যে এক নবজাগরণের সূত্রপাত করেছিল। ধর্ম এবং কর্মের সাধনার আদর্শে মারাঠারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। রামদাসের 'মঠ' গুলি এবং তাঁর 'দশবোধ' মারাঠাদের মধ্যে বিপুল উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। মারাঠা সাহিত্য এবং

ভাষার বিকাশ মারাঠা জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানও মারাঠাদের উত্থানের সহায়ক ছিল। পর্বত, নদী এবং অসংখ্য গিরি-দুর্গে পরিবেষ্টিত হবার ফলে আক্রমণকারীর পক্ষে সহজে এবং দ্রুত মহারাষ্ট্র জয় করা এবং উহা শাসনে রাখা দুঃসাধ্য ছিল। এই অনুকূল পরিবেশেই শিবাজী মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন করেছিলেন।

শিবনের গিরিদুর্গে ১৬৩০ সনে শিবাজীর জন্ম। তাঁর মাতা জিজাবাঈ দেবগিরির প্রসিদ্ধ যাদব বংশের কন্যা, পিতা শাহজী মেবারের শিশোদিয়া বংশের সন্তান। জিজাবাঈ এবং দাদাজী কোণ্ডদেবের অভিভাবকত্বে পুনায় শিবাজীর শৈশব জীবন কাটে। শৈশবেই তিনি অশ্বারোহণ এবং অস্ত্রচালনায় দক্ষতা অর্জন করেন। মাওলী নামে পার্বত্য জাতির সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ছিল। পরবর্তীকালে মাওলীগণই তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও সেরা সৈনিক হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের তখন ভগ্নদশা, মোঘলগণ উত্তর ভারত নিয়েই ব্যস্ত। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে শিবাজী একটি স্বাধীন রাজ্য গঠনে উদ্যোগী হলেন। ১৬৪৬ সনে মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি তোরনা নামে দুর্গ জয় করেন। এর পাঁচ মাইল পূর্বে তিনি বিখ্যাত রায়গড় দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৬৪৭ হতে ১৬৫৬ সনের মধ্যে তিনি আরও কয়েকটি দুর্গ জয় করেন। বিজাপুরের সুলতান শিবাজীকে দমন করার জন্য আফজল খাঁর নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত আফজল খাঁ নিহত হলেন এবং শিবাজীর অনুচরেরা তাঁর শিবির লুঠ করে। ১৬৬৪ সনে শিবাজী সমৃদ্ধ-শালী বন্দর গুজরাট লুণ্ঠন করে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার মত ধনসম্পত্তি লাভ করেন। স্থানীয় ইংরেজ এবং দিনেমার বণিকদের তিনি কিন্তু স্পর্শ করেননি।

মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষ ঃ শিবাজীর শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত হয়ে মুঘল-সম্রাট আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান করবার আদেশ দেন (১৬৫৩ খ্রীঃ)। শিবাজী একদিন রাত্রে পুণায় শায়েস্তা খাঁর শিবির অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন। শায়েস্তা খাঁ আহত হন ও কোন মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যান। এরপর ১৬৬৪ সনে শিবাজী মুঘলদের প্রধান বন্দর সুরাট লুণ্ঠন করেন। আওরঙ্গজেব এবার শিবাজীর বিরুদ্ধে অম্বরের (জয়পুরের) রাজা জয়সিংহ ও সেনাপতি দিলীর খাঁকে পাঠালেন। শিবাজী তাঁদের কাছে পরাজিত হয়ে মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং অনেকগুলি দুর্গ মুঘলদের হাতে ছেড়ে দিলেন (১৬৬৫ খ্রীঃ)। তারপর রাজা জয়সিংহের অনুরোধে শিবাজী সম্রাট আওরঙ্গজেবের সঙ্গে দেখা করতে আগ্রা গেলেন। কথা ছিল, শিবাজীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু মুঘল-দরবারে পৌঁছালে তাঁকে বন্দী করা হয়, পরে চতুর শিবাজী সেখান থেকে পালিয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

ছত্রপতি শিবাজী ঃ তারপর মুঘলদের সাথে তার আবার সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। শিবাজী তাঁর হৃত দুর্গগুলি সমস্তই পুনরুদ্ধার করেন ও মুঘল-অধিকৃত প্রদেশের উপর হানা দিয়ে 'চৌথ' অর্থাৎ রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ আদায় করেন। ১৬৭৪ সনে তিনি 'ছত্রপতি'

উপাধি ধারণ করেন এবং রায়গড় দুর্গে মহাসমারোহে তাঁর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তারপর তিনি দাক্ষিণাত্যে বহুদূর পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন।

ইতিমধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ব্যাপারে মুঘলগণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে শিবাজী গোলকুন্ডার সুলতানদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে ১৬৭৭ সনে জিঞ্জি, ভেলোর এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি জয় করেন। এর তিন বছর পরে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে শিবাজীর মৃত্যু হয় (১৬৮০ সন)। শিবাজী যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তার সীমা উত্তরে ধরমপুর থেকে পর্তুগীজ অধিকৃত দমন, সলসেট, বেসিন, গোয়া এবং দক্ষিণে কারোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কর্ণাটকের কিছু অংশ এবং মহীশুরের একটি বড় অংশ তাঁর অধিকারে এসেছিল।

মারাঠা সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঃ মৃত্যুর সময় শিবাজীর রাজ্য ভারতের পশ্চিম উপকূলে উত্তরে 'রামনগর থকে দক্ষিণে কারওয়ার পর্যন্ত' এবং পূর্বে 'বোলগানা থেকে পশ্চিমে কোল্হাপুর পর্যন্ত' বিস্তৃত ছিল। ইওরোপীয়দের অধিকৃত অঞ্চলগুলি—গোয়া, দমন, সালসেট, বেসিন, জাঞ্জিরা ও বোম্বাই—তাঁর রাজ্যের সীমানার বাইরে অবস্থিত ছিল। নাসিক ও পুণা তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পশ্চিম কর্ণাটকের কতকাংশ ও বর্তমান মহীশূর রাজ্যের কতকাংশ তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিল।

শাসন-ব্যবস্থা ঃ শুধু সমর বিদ্যাতেই নয়, রাজ্যশাসনেও শিবাজীর যোগ্যতা এবং সংগঠন প্রতিভা ছিল ক্ষুরধার। ঐতিহাসিক রলিনসন বলেন—"প্রায় সকল মহান যোদ্ধাদের মত—যাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নেপোলিয়ন—শিবাজীও একজন মহান শাসন ব্যবস্থার পরিচালক।"

শিবাজীর শাসনপদ্ধতি ঃ শিবাজী সামান্য কয়েক বৎসর মাত্র রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেই তিনি যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন তা তাঁর অপূর্ব শাসন-দক্ষতার পরিচয় দেয়। শিবাজীর শাসন-পদ্ধতিও মুঘল-শাসনপদ্ধতির ন্যায় স্বৈরতন্ত্র ছিল। কিন্তু রাজ্যশাসনে রাজা আটজন মন্ত্রীর সাহায্য নিতেন। তাঁদের বলা হত 'অষ্টপ্রধান'। এই আটজনের মধ্যে 'পেশোয়া' ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। 'অমাত্য' ছিলেন অর্থসচিব। রাজসভা ও রাজার দৈনিক কাজের যিনি হিসাব রাখতেন, তাঁকে বলা হত 'মন্ত্রী'। রাজার চিঠিপত্র লেখার বিষয়ে এবং প্রদেশের হিসাবপত্র রাখবার বিষয়ে সাহায্য করতেন 'সচিব'। পররাষ্ট্র বিভাগের প্রধানের নাম ছিল 'সামন্ত'। সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন 'সেনাপতি'। 'পন্ডিত রাও' ছিলেন রাজার প্রধান পুরোহিত। রাজ্যের প্রধান বিচারপতিকে বলা হইত 'ন্যায়াধীশ'।

শিবাজীর রাজ্য কয়েকটি 'প্রান্ত', 'পরগণা' এবং 'তরফে' বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রান্তের শাসককে সাহায্য করবার জন্য আবার 'অষ্টপ্রধান' ছিল। রাজস্ব আদায় করবার প্রচলিত ব্যবস্থা—নিলামে খরিদ করবার প্রথা, শিবাজী রহিত করেছিলেন। তিনি সমস্ত জমি জরীপ করিয়াছিলেন এবং কৃষকগণ সরাসরি রাজকোষে রাজস্ব জমা দিত। উৎপন্ন শস্যের শতকরা ত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ শস্যে অথবা নগদ অর্থে রাজস্ব দিতে হত। নিজ

রাজ্যের উৎপন্ন শস্য থেকে রাজস্ব ছাড়া মুঘল-সাম্রাজ্য এবং বিজাপুর রাজ্যে শিবাজী 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' আদায় করতেন। 'চৌথ' অর্থ রাজস্বের চারিভাগের একভাগ। বিজিতদের কাছ থেকে সামরিক বিভাগের ব্যয়-সংকুলানোর জন্য মোটামুটিভাবে এই 'চৌথ' আদায় হত। 'সরদেশমুখী'-র অর্থ 'চৌথ' ছাড়া রাজ্যের রাজস্বের এক-দশমাংশ।

সামরিক ব্যবস্থা ঃ শিবাজীর নৌবাহিনী ঃ শিবাজীর সামরিক ব্যবস্থা ছিল উন্নত ধরণের। তাঁর রীতিমত বেতনভুক স্থায়ী সৈন্যদল ছিল। এছাড়া তাঁর নৌ-বাহিনীও ছিল। বোম্বাই উপকূলের হিন্দু নাবিকগণ এই নৌ-বাহিনী পরিচালনা করত। শিবাজীর নৌ-বাহিনীর সমসাময়িক পোর্তুগীজ, এমন কি, ইংরাজদের নৌ-বাহিনী অপেক্ষা হীনবল ছিল না। শিবাজীর সৈন্যদলে ৩০/৪০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও ১০ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। শিবাজীর দুর্গসংখ্যা ছিল ১৫০। প্রত্যেক দুর্গের রক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল তিনজন সৈন্যাধ্যক্ষের উপর। সৈন্যবাহিনীতে কামান ছিল। ক্ষিপ্রতায় মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য ছিল তখন ভারতে অদ্বিতীয়। অশ্বারোহী-বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—বর্গী ও 'শিলাদার'। বর্গীগণ রীতিমত বেতন পেত। শিলাদারগণ নিয়মিত বেতন পেত না। তাদের খরচ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া হত। ২৫ জন অশ্বারোহীর অধ্যক্ষকে বলা হত হাবিলদার। ৫ জন হাবিলদারের উপর ১ জন 'জুমলাদার'। আবার ১০ জন জুমলাদারের উপর ১ জন 'হাজারী' ছিল। হাজারীর উপর 'পাঁচ-হাজারী' ও তাঁর উপর সৈন্যাধ্যক্ষ থাকতেন। সেনাদলে শিবাজী কঠোর শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। সৈন্যশিবিরে স্ত্রীলোক বা নর্তকীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

শিবাজীর বংশধরগণ ঃ ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শম্ভুজী রাজা হন। তিনি মুঘলদের কাছে পরাজিত হয়ে বন্দী হন ও পরে নিহত হন। শম্ভুজীর শিশুপুত্র শাহু শম্ভুজীর সঙ্গে বন্দী হন ও মুঘল-অন্তঃপুরে লালিত-পালিত হন। শম্ভুজীর পর শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পত্নী তারাবাই শিশুপুত্রের অভিভাবিকা হিসাবে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহুকে মুক্তি দেওয়া হয়। শিবাজীর বংশধরগণের মধ্যে উত্তরাধিকারের দাবি নিয়ে গৃহ বিবাদ আরম্ভ হবে—এই আশায় শাহুকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। মুঘল-দরবারের সে আশা ফলবতীও হয়েছিল। মুক্তি পাবার পর শাহুর সঙ্গে বীররমণী তারাবাই ও তাঁর পুত্রের কলহ আরম্ভ হয়। এই কলহের ফলে শিবাজীর রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু মারাঠা-শক্তি দুর্বল হয়নি।

পেশোয়া ঃ রাজবংশে গৃহবিবাহের ফলে মারাঠাগণের নায়ক হিসাবে 'পেশোয়া'দের অভ্যুত্থান হয়। উত্তরাধিকারের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত শাহু জয়লাভ করেন। তাঁর এই সাফল্যে তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন কোঙ্কণ প্রদেশের একজন ব্রাহ্মণ—তাঁর নাম বালাজী বিশ্বনাথ। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ 'পেশোয়া' পদে নিযুক্ত হলেন। তখন মারাঠার ইতিহাসে পেশোয়াদের যুগ আরম্ভ হল। ছত্রপতি শিবাজীর বংশধরেরা নামে মাত্র রাজা থাকলেন।

ভারতের ইতিহাসে শিবাজীর স্থান ঃ মারাঠা জাতির জনক এবং স্বাধীন মারাঠা

রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ছত্রপতি শিবাজী ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মারাঠাদের তিনি একটি স্বাধীন রাজ্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। ধর্মগুরুদের প্রচার এবং মারাঠা সাহিত্যের বিকাশের ফলে মারাঠাদের মধ্যে যে জাগরণ স্থায়ী হয়েছিল, উহা তাঁরই শাসনকালে পরিণতি লাভ করে। ইতিহাসে এই নেতার অবদান উপেক্ষণীয় নয়। মারাঠাদের মোঘল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা এবং একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য একজন নেতার প্রয়োজন ছিল। শিবাজী এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণ করেছিলেন। নবীন মারাঠা জাতির মধ্যে তিনি যে শৃঙ্খলাবোধ এবং উন্মাদনার সঞ্চার করেছিলেন, এর ফলেই মারাঠারা অমিত বিক্রমে ও দোর্দণ্ড প্রতাপে মুঘল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে পেরেছিল। আওরঙ্গজেব "তাঁকে পার্বত্য মূষিক" বলে অবজ্ঞা করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে দমন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও মারাঠাজাতি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের শেষ দৃশ্যে ভারতের ভাগ্যদেবতারূপে শিবাজী অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মারাঠাদের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গৌরবজনক হলেও তা সাফল্যের সাথে পালন করতে পারেনি।

শিবাজী জানতেন যে, জাতিগঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান শৃঙ্খলাবোধ এবং নীতিবোধ। সৈনিকদের মধ্যে তাই কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। সেনানিবাসে স্ত্রীলোক বা নর্তকীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক কাফি খাঁ লিখেছেন যে, শিবাজী সৈন্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা কখনই মসজিদ, পবিত্র কোরাণ বা নারীদের অসম্মান করবে না। হিন্দু বা মুসলমান নারী বন্দী হলে তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেই যুগে এরূপ নীতিবোধ সত্যই বিরল। গুরু রামদাসের প্রতি অকপট ভক্তির মধ্যেও তাঁর নীতিবোধ প্রতিফলিত।

রাজপুতবীর প্রতাপ সিংহের মত মারাঠাবীর শিবাজীও তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। মারাঠা জাতির জনক হিসাবে তাঁর কীর্তি চিরকাল অম্লান থাকবে।

আওরঙ্গজেব কর্তৃক বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অভিযানের পটভূমি :

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদে নিযুক্ত হয়ে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য জয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শাহজাহানের নির্দেশে তাঁকে শেষ পর্যন্ত অভিযান বন্ধ করতে হয়েছিল। যৌবনে দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্যের বিজয় পতাকা প্রোথিত করবার যে স্বপ্ন আওরঙ্গজেবকে বিভোর করেছিল সম্রাট হয়ে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। রাজত্বের প্রথম ভাগে উত্তর ভারত নিয়েই তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়, রাজত্বের শেষ ভাগ তিনি দাক্ষিণাত্যেই অতিবাহিত করেন। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের অভ্যুত্থানের ফলে ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যে বিপদের সংকেত দেখা দিয়েছিল। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার প্রতিও তাঁর লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বার্থ এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁর দাক্ষিণাত্য-নীতি প্রভাবিত করেছিল।

আরঙ্গজেব কর্তৃক বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অভিযান : গোঁড়া সুন্নী মুসলমান সম্রাট

ঔরংজেব শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের প্রতিও ক্রুদ্ধ ছিলেন। পিতার রাজত্বকালে তিনি ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন। তিনি পুনরায় এদের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন। ১৬৮৫ সনে মুঘলগণ বিজাপুর অবরোধ করল। পরের বছর সম্রাট নিজে বিজাপুরে উপস্থিত হলেন। ঐ বৎসরই দুর্গের পতন ঘটল এবং বিজাপুর মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। ১৬৮৭ সনে সম্রাট নিজে গোলকুণ্ডায় অভিযান করলেন। ক্রমাগত আট মাস দুর্গের অবরোধ চলল। কিন্তু দুর্গের পতন হল না। অবশেষে এক আফগান সৈনিকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে দুর্গের পতন ঘটল। গোলকুণ্ডা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল।

এলফিনস্টোন এবং স্মিথ মন্তব্য করেছেন যে, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করে আওরঙ্গজেব ভুল করেছিলেন, কেননা স্বাধীন বিজাপুর ও স্বাধীন গোলকুণ্ডা মারাঠা শক্তির বিকাশের পথে অন্তরায় ছিল। আবার যদুনাথ সরকার এই মত গ্রাহ্য করেন না। তাঁর মতে পতনোন্মুখ বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের পক্ষে মারাঠা শক্তিকে খর্ব করা সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ আকবরের সময় থেকে দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি। শাহজাহানের রাজত্বকালেও এদের বিরুদ্ধে মুঘল অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের নীতি এই প্রচেষ্টারই পরিণতি মাত্র।

দাক্ষিণাত্য-অভিযানের সমালোচনা ঃ বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির সময়ে আওরঙ্গজেব গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিলেন। কাবুল থেকে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর থেকে কাবেরী পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ভারতের তিনি অধীশ্বর হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর সৌভাগ্য-সূর্য অস্তাচলে গমন করছিল। দাক্ষিণাত্য অভিযান হতেই তাঁর পতনের শুরু। সুবিশাল মোঘল সাম্রাজ্য শাসন করা ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে পড়ে। দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করবার ফলে উত্তর ভারতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। আগ্রায় চরম বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। দাক্ষিণাত্যের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের বিপুল ব্যয় মিটাতে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে যায়। বেতন বাকী পড়তে থাকায় বিক্ষুব্ধ সৈনিকেরা বিদ্রোহ করে। মারাঠাদের বিরুদ্ধেও তিনি কোন স্থায়ী সাফল্য লাভ করতে পারলেন না। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সখেদে বলেছিলেন, "স্পেনের ক্ষতই আমাকে ধ্বংস করেছে" আওরঙ্গজেব সম্পর্কেও বলা চলে যে, দাক্ষিণাত্যের ক্ষত তাঁর সাম্রাজ্য ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়েছিল।

কোন বিশাল সাম্রাজ্য সুষ্ঠভাবে শাসন করা কোন একজনের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয় তা সে যতই প্রতিভাবান হোক না কেন। কারণ একটি বিশাল সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিরাট সংখ্যক দক্ষ কর্মচারীর প্রয়োজন। আকবরের প্রশাসন ছিল অতি সুন্দর। কিন্তু আওরঙ্গজেব ছিলেন সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত এবং তিনি পুত্র মিত্র কাউকেই বিশ্বাস করতেন না। তিনি বুঝতে পারেননি যে এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসনের খুঁটিনাটি একজন ব্যক্তির পক্ষে চালনা করা অসম্ভব। তাঁর আমলে মন্ত্রীরা কেরাণীতে পর্যবসিত হয়েছিল। ফলে তাঁর উত্তরাধিকারী ও পুত্র বাহাদুর শাহ প্রবীণ বয়সে

সিংহাসনে আরোহণ করলেও অক্ষম ও অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁর পক্ষে প্রশাসনের অধঃপতন রোধ করা সম্ভবপর হয়নি।

মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা ঃ আওরঙ্গজেবের সময় মুঘল শাসনের কাঠামো আকবরের সময় থেকে এলেও তাঁর শাসন নীতিতে এসেছিল অনেক পার্থক্য। পুরোপুরি স্বৈরতন্ত্রী সম্রাটরূপে হিন্দুদের প্রতি গৃহীত নীতিতে তিনি আকবর থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা। আওরঙ্গজেব পবিত্র কোরাণের নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সব কিছুই স্বয়ং পরিচালনা করতেন। ভারতের মত নানা জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত দেশ শাসন করার মত দূরদৃষ্টি ও অন্তরের উদারতা তাঁর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মুঘল শাসনব্যবস্থা ছিল প্রবল আমলাতান্ত্রিক। এক-এক বিষয়ের ভার এক-একটি বিশেষ বিভাগীয় মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। সম্রাটের প্রাসাদের যাবতীয় ব্যবস্থার প্রধান কর্তা ছিলেন 'খান-ই-সামান'। রাজকোষের কর্তা ছিলেন 'দেওয়ান'—আধুনিক কালের অর্থসচিবের মত। 'মীর বক্সী'র উপর সৈন্য-বিভাগের বেতন এবং হিসাব-নিকাশের ভার ছিল। বিচার বিভাগের কর্তা ছিলেন 'প্রধান কাজী'। 'মীর আরজ' নামক একজন কর্মচারী প্রজাদের অভিযোগ শুনতেন। এইরূপ আরও অনেক বিভাগীয় মন্ত্রী ছিলেন। আকবরের সময় তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রী টোডরমল রাজস্ব-বিভাগের আমূল সংস্কার করেন। তিনি সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরীপ করিয়ে উর্বরতা হিসাবে শ্রেণী-বিভাগ করেছিলেন। কৃষকগণকে উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব দিতে হইত। ইহা শস্যে অথবা নগদ অর্থে দেওয়া যেত। এতে কৃষকদের সাথে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। অর্থাৎ কৃষক ও রাষ্ট্রের মাঝখানে অন্য কোনও জমিদার বা জায়গিরদার শ্রেণী ছিল না এবং রাষ্ট্রের কর্মচারিগণই কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। আকবরের পূর্বে 'জায়গির-প্রথা' ছিল। আকবর তা রহিত করেছিলেন।

মুঘল শাসন-ব্যবস্থার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 'মনসবদারী প্রথা'। প্রত্যেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সামরিক কর্তব্য ছিল, এবং সেই হিসাবে কর্মচারীদের শ্রেণী-বিভাগ করা হত। প্রত্যেকের পদমর্যাদা অনুযায়ী অশ্বারোহী সৈন্য রাখতে হত এবং তার পরিবর্তে তাঁকে বেতন দেওয়া হত। আকবরের পরবর্তীকালে বেতনের পরিবর্তে 'জায়গির' দিবার প্রথা পুনরায় প্রবর্তিত হন। মনসবদারদের মধ্যে ৩৩টি বিভিন্ন শ্রেণী ছিল। এক এক জনের অধীনে ১০ হইতে ১০,০০০ পর্যন্ত অশ্বারোহী সৈন্য থাকত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেতন অথবা জায়গির অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য কেহ রাখতেন না। মনসবদারগণ রাষ্ট্রের কর্মচারী-বিশেষ ছিলেন। তাঁদের অধিকার ও পদমর্যাদা বংশপরম্পরা সন্তান-সন্ততিতে বর্তাত না। মুঘল সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন স্থায়ী সৈন্য-বাহিনী ছিল অতি ক্ষুদ্র। প্রয়োজনমত মনসবদারদের সৈন্য যোগাতে হত। এই প্রথার প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, সম্রাটের সাথে সৈন্যদের সম্পর্ক ছিল পরোক্ষ এবং মনসবদারদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ। স্বভাবতঃই কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা শিথিল হলে মনসবদারগণের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেত।

মুঘল সাম্রাজ্য কয়েকটি 'সুবা'য় বিভক্ত ছিল। আকবরের সময় 'সুবা'র সংখ্যা ছিল ১৫। জাহাঙ্গীরের সময়ে ১৭। সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে আওরঙ্গজেবের সময় সুবার সংখ্যা দাঁড়ায় ২১। 'সুবা'র শাসনকর্তাকে বলা হত 'সুবাদার' বা 'সিপা-সলার'। কখনও কখনও তাহাকে 'নাজিম'ও বলা হত। সুবার শাসন ও শান্তিরক্ষার ভার ছিল সুবাদারের হাতে। আর রাজস্বের ভার ছিল 'দেওয়ান'-এর হাতে। এই ক্ষমতা বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল যাতে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ অত্যাচারী বা অত্যধিক শক্তিশালী না হতে পারেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উপর নজর রাখবার জন্য 'ওয়াকায়নবীশ' নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিল —তাঁদের কাজ ছিল স্বাধীনভাবে প্রদেশের সমস্ত খবরাখবর সম্রাটের নিকট পাঠানো। এমন কি, সুবাদার ও দেওয়ানের বিরুদ্ধেও তাঁরা লিখতে পারতেন। প্রত্যেক সুবা কয়েকটি 'সরকার' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। সরকারের শাসনকর্তাকে বলা হত 'ফৌজদার'। আবার প্রত্যেক সরকার কতকগুলি 'পরগণায়' বিভক্ত ছিল। সকলের নীচে ছিল 'গ্রাম'। গ্রামের মণ্ডলকে 'মুকাদ্দাম' বা 'পাটোয়ারী' বলা হত। প্রত্যেক বড় বড় শহরে শান্তিরক্ষার ভার ছিল একজন 'কোতয়াল'-এর উপর। শুধু রাজধানী এবং বড় বড় শহরে রাজকীয় বিচারালয় ছিল। অন্যত্র—বিশেষ করে হিন্দুদের বিচার হ'ত তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী এবং নিজেদের 'পঞ্চায়েৎ' দ্বারা।

আকবর যে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর হতে তা ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে থাকে। প্রথমতঃ সরকারী কর্মচারীদের নগদ বেতন দেবার পরিবর্তে 'জায়গির-প্রথা' প্রবর্তিত হয়। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে কমে যায় এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং মুঘল সম্রাটগণের বিলাসপ্রিয়তার জন্য রাষ্ট্রের ব্যয় ক্রমশঃই বেড়ে যায়। সেজন্য কৃষকদের দেয় রাজস্বের হার এক-তৃতীয়াংশ হতে অর্ধভাগ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। তার ফলে কৃষকদের অবস্থা হয়ে পড়ে অত্যন্ত শোচনীয়। বহু কৃষক গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় এবং কৃষির অবনতির ফলে নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান এবং পরধর্ম বিদ্বেষী। সুতরাং শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান, সুফী মতাবলম্বী মুসলমান এবং হিন্দুগণকে তিনি বিধর্মী কাফের বিবেচনা করতেন। তাঁর তরবারির নাম ছিল রাফিজ-কুশ অর্থাৎ বিধর্মী-হন্তা। বিধর্মী অপরাধে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে এবং সুফি সাধু সরমদকে হত্যা করেন। তিনি মনে করতেন ভারতীয় রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্র, এ রাজ্য ইসলামের অনুশাসনে শাসিত হবে, ইসলামের ধর্মরাজ্যে বিধর্মীদের সম্মানজনক স্থান নেই। সমস্ত ভারতবর্ষকে সুন্নী মুসলমানের দেশে পরিণত করাই ছিল তাঁর রাজ্য শাসনের প্রধান লক্ষ্য। আওরঙ্গজেব সর্বাগ্রে মুসলমান, পরে ভারতের সম্রাট—এই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। সম্রাটের এই অনুদারতায় কর্মচারীগণ তাঁর নির্দেশে হিন্দু প্রজাদের উপর নানারূপ নির্যাতন করে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য চেষ্টা করতে শুরু করেন। তাঁর আদেশে জিজিয়া কর পুনঃস্থাপিত হয়, হিন্দুকর্মচারীগণ পদচ্যুত হন এবং কাশী, মথুরা, গুজরাট প্রভৃতি

তীর্থস্থানের প্রধান মন্দিরগুলো ধ্বংস করা হয়। তিনি হিন্দুর মেলা, শোভাযাত্রা, ধর্মোৎসব প্রভৃতি বন্ধ করেন, রাজপুত ব্যতীত কোন হিন্দুর পক্ষে হস্তী, অশ্ব বা পাল্কী ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। হিন্দু বণিকদের উপর দ্বিগুণ কর স্থাপিত হয়, রাজস্ব ও হিসাব বিভাগেও হিন্দুকর্মচারী নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়। তিনি মুদ্রার পৃষ্ঠে আল্লাহ্‌র নামবন্ধন নিষিদ্ধ করেন, কারণ অপবিত্র হিন্দুগণ পবিত্র আল্লাহ্‌র নাম স্পর্শ করে কলঙ্কিত করবে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য তিনি হিন্দুদের পুরস্কার ও উচ্চ রাজসম্মানের প্রলোভনও প্রদর্শন করতে শুরু করেন যেমন করেছিলেন অজিত সিংহের সিংহাসনে বসবার সর্ত-রূপে।

বাদশাহের ধর্ম বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেশময় অসন্তোষ ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। রাজপুতনা, মালব, বুন্দেলখন্ড ও খান্দেশের বিভিন্ন অংশে হিন্দুদের অসন্তোষ প্রকাশ পায়। অনেক স্থলে মোল্লাদের চক্ষু উৎপাটন করা হয় এবং জিজিয়া কর আদায়কারী কর্মচারীরা প্রহৃত হয়। ১৬৫৯ সনে গোকুলের নেতৃত্বে জাঠগণ মথুরা অঞ্চলে বিদ্রোহ করে। বহু সৈন্য ক্ষয় করেও আওরঙ্গজেব এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত আওরঙ্গজেব লক্ষাধিক সৈন্য প্রেরণ করে গোকুলকে সপরিবারে বন্দী করেন। গোকুলকে প্রকাশ্য রাজ সভায় প্রতি অঙ্গ ছেদন করে হত্যা করা হয় এবং তাঁর কন্যা ও স্ত্রীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। বুন্দেলখন্ডের রাজা চম্পৎ বিদ্রোহী হয়ে দুবার মোগল সৈন্য পরাজিত করেন এবং আওরঙ্গজেবের সময়ই একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ১৬৭২ সনে পাতিয়ালার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সতনামী সম্প্রদায়ের অনুন্নত কৃষকগণও আওরঙ্গজেবের অনুদার নীতির ফলে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। গুরুর শুভনাম কীর্তনই ছিল তাঁদের ধর্মাচরণের মূলমন্ত্র। যুদ্ধবিদ্যায় তাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং নেতৃত্বের অভাবে তারা মোগলবাহিনী কর্তৃক পরাজিত হয় এবং বহু সতনামী হিন্দুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

আওরঙ্গজেবের আচরণে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তি এবং অসন্তোষ দেখা দেয়। নবম শিখ গুরু তেগ বাহাদুরকে আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির বিরোধিতার অপরাধে বন্দী করে দিল্লীতে আনয়ন করা হয়। আওরঙ্গজেব তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অথবা মৃত্যু বরণ করতে আদেশ দেন। ১৬৭৫ সনে তেগ বাহাদুর মৃত্যু বরণ করেন। গুরুর এই আত্মত্যাগে শিখদের মধ্যে এক অভিনব শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চারিত হয় এবং সুযোগ উপস্থিত হলেই তারা সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে।

আওরঙ্গজেবের অদূরদর্শিতা, সন্দিগ্ধচিত্ততা ও অনুদার ধর্মনীতির ফলে মোগল সাম্রাজ্যের শক্তিস্তম্ভ রাজপুতগণও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। মাড়বার রাজ যশোবন্ত সিংহের সন্দেহজনক মৃত্যু, আওরঙ্গজেবের পক্ষ থেকে যশোবন্ত সিংহের রাণী মহামায়া ও পুত্র অজিত সিংহকে হস্তগত করে মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত করা এবং মাড়বার রাজ্য মোগলদের অধিকারভুক্ত করার সংকল্প রাজপুতদের বিক্ষোভের প্রধান কারণ। রাঠোর সর্দার দুর্গাদাসের কৌশলে সম্রাটের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আওরঙ্গজেব মাড়বার আক্রমণ করে

হিন্দুদের বহু মন্দির ধ্বংস করেন এবং ঐ ধ্বংসাবশেষের উপর মসজিদ নির্মাণ করেন। মাড়বারের এই দুর্দিনের সময় মেবার রাজ রাজসিংহ অজিত সিংহের পক্ষ সমর্থন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনঃ স্থাপন করায় রাজসিংহ আওরঙ্গজেবের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, সুতরাং সুযোগ পেয়ে এবার তিনি মোগল সৈন্যদের নানাভাবে বিব্রত করে তোলেন। বিশেষতঃ পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে রাজপুত বাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ করে মোগলদের শক্তি ধীরে ধীরে ধ্বংস করার সুযোগ লাভ করে।

আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতিতেও সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। হিন্দু ধর্মের রক্ষক রূপে পরিচিত উদীয়মান মারাঠা শক্তি দমন এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শিয়া মতাবলম্বী সুলতানগণকে ধ্বংস সাধনই ছিল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির মূল কথা। শাসনকর্তারূপে দাক্ষিণাত্যে অবস্থানের সময় তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করেন। কিন্তু পিতা শাহজাহানের বাধাদানের ফলে তিনি সেই জয় সমাপ্ত করতে পারেননি। সিংহাসনে আরোহণের পর অর্ধসম্পন্ন কার্য সম্পন্ন করার জন্য তিনি জীবনের ছাব্বিশটি বছর (১৬৮১-১৭০৭ সন) দাক্ষিণাত্যে অতিবাহিত করেন। একাধিক মারাঠা শক্তির উত্থান অপরদিকে কুশাসন ও অন্তর্দ্বন্দ্বে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার পতন তখন আসন্ন। ফলে শিয়ারাজ্য বিজাপুর ১৬৮৬ সনে এবং গোলকুণ্ডা ১৬৮৭ সনে মোগলদের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু এই সাফল্য ছিল প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশূন্য। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ধ্বংস করা আওরঙ্গজেবের জীবনে অদূরদর্শিতার অন্যতম পরিচারক। এই মুসলিম রাষ্ট্রদ্বয় ধ্বংসের ফলে দক্ষিণ ভারতে উদীয়মান মারাঠা শক্তির আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী অবশিষ্ট ছিল না। হয়ত এই দুই মুসলিম রাজশক্তির সহায়তায় দিল্লীর মুসলিম সম্রাট মারাঠাদিগকে দমন করতে পারতেন। অপরদিকে দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতির ফলে আর্যাবর্তের রাজকর্মচারীদের উপর সম্রাটের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়ে এবং কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। আওরঙ্গজেবের অনুপস্থিতির সুযোগে মারাঠাগণ দুবার আগ্রা লুণ্ঠন করে। দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধে বহু সৈন্যনাশ ও অর্থব্যয়ে দিল্লীর রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। মারাঠা শক্তি দমনে ব্যর্থ হয়ে আওরঙ্গজেবের দেহ ও মন ভেঙ্গে পড়ে এবং ১৭০৭ সনে ভগ্নহৃদয়ে আহম্মদনগরে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। দাক্ষিণাত্য কেবল তাঁর দেহেরেই সমাধিক্ষেত্র নয়, কীর্তিরও সমাধিক্ষেত্র।

শিখ, সতনামী, জাঠ, রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি জাতির সহিত আওরঙ্গজেবের দ্বন্দ্বের মূল কারণ সম্রাটের অনুদার ধর্মনীতি। শিয়া মতাবলম্বী বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সঙ্গেও ধর্মীয় কারণেই তাঁর সংঘর্ষ শুরু হয়। এইসব শক্তির বিরোধিতার ফলেই আওরঙ্গজেবের আমলে মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। বিশেষতঃ মন্দির ধ্বংস ও তাদের উপর জিজিয়া কর পুনঃস্থাপনে হিন্দু সম্প্রদায় মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য একান্তভাবে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ১৬৯৯ সনে আওরঙ্গজেব বেনারসের বিশ্বনাথের

মন্দির ধ্বংস করে তার ধ্বংসাবশেষের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বীর সিংহ বুন্দেলা নির্মিত কেশব রায়ের মন্দিরটিও আওরঙ্গজেব ধ্বংস করেন। ফলে মথুরার জাঠগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং সিকান্দ্রায় অবস্থিত আকবরের কবর খুঁড়ে তাঁর অস্থিকঙ্কাল বের করে আড়ম্বরে তা দাহ করে। ঔরংজেবের প্রতি হিন্দুদের বিদ্বেষ কত গভীর ছিল এই ঘটনাই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই ঘটনার পরও আওরঙ্গজেব তাঁর সংকীর্ণ ধর্মনীতি পরিত্যাগ করতে সম্মত হননি। অপর দিকে উত্তর ভারতের এক বিরাট অঞ্চল ধীরে ধীরে মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করে। ফলে সাম্রাজ্যের আয় অনেক পরিমাণে হ্রাস পায় এবং বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য রাজকোষের ব্যয় বাড়তে শুরু করে। হিন্দুদের শোভাযাত্রা, মেলা প্রভৃতি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সরকারী রাজকোষে অর্থাগমের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু গোঁড়া সুন্নী মতাবলম্বী আওরঙ্গজেব ধর্মের জন্য আর্থিক ক্ষতি কেন জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। রাজনৈতিক অসন্তোষ, প্রজাদের বিক্ষোভ, রাজকোষের আর্থিক ক্ষতি প্রভৃতির কথা চিন্তা করে ধর্মনীতির পরিবর্তন করা আওরঙ্গজেবের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এমন কি ধর্মের জন্য তিনি ব্যক্তিগত জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না।

কূটনীতিবিদ ও শাসক হিসাবে ঃ আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি, সাহসী যোদ্ধা, সুকৌশলী কূটনীতিবিদ, চক্রান্ত ও কৌশলে অদ্বিতীয়, ন্যায়-বিচারক ও কর্তব্য কর্মে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু মানুষের নেতৃত্ব করার বা সফল শাসক হওয়ার সহজাত প্রতিভা তাঁর ছিল না। আকবর যখন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এবং তাদের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখতেন আওরঙ্গজেব তখন সুন্নী নিয়মাধীন ঐশ্লামিক রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত জীবন ও কার্য একাই এই একটি আদর্শে পরিচালিত হয়েছিল। তিনি হিন্দু ও পারসীক শিয়াদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বৈষম্য মূলক আচরণ করতেন ও তাদের সর্বপ্রকারে নিপীড়িত করতেন। সেই জন্য আকবরের আমলে হিন্দুরা শ্রদ্ধা ও অনুরাগসহ আকবরের সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরাই আওরঙ্গজেবের আমলে এই তৈমুর বংশীয় শাসনের ভিত্তিমূলকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতি ছিল অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। তিনি শিবাজীকে অবমূল্যায়ন করেছিলেন।

আওরঙ্গজেবের চরিত্রের সর্বাপেক্ষা ত্রুটি হল তিনি কাউকে, এমনকি নিজের সন্তানদের বিশ্বাস করতেন না। তাঁর আমলে মোঘল সাম্রাজ্য একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা এবং কারুর এমন ক্ষমতা বা স্পর্ধা ছিল না যে তাঁকে উপদেশ দেয় বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে। একথা তিনি বুঝতে পারেননি যে, যত ক্ষমতাবানই—হোন তাঁর একার পক্ষে প্রশাসনের প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাপারে দৃষ্টি রাখা অসম্ভব। তাঁর মন্ত্রীরা কেরাণীর কার্য করতেন মাত্র। তাঁরা কোন পদ্ধতি নির্ধারণ করতে অথবা কোন আপৎকালীন সিদ্ধান্ত

কুঠির পরিচয়

ইংরেজ কোম্পানীর কুঠিগুলিকে তাঁরা 'ফ্যাক্টরী' বলেও উল্লেখ করতেন। কিন্তু এখানে কোন কারখানাই ছিল না। সমুদ্র কিংবা বড় নদীর পাড়ে একটা জায়গা বেড়া দিয়ে তৈরী করা হত মালগুদাম। জাহাজ থেকে মাল নামিয়ে রাখা হত। গুদাম থেকে ভারতীয় পণ্য জাহাজে তুলে দেওয়া হত। ওখানেই কর্মচারীরা প্রায় হোস্টেলের মত একসাথে থাকতো। ভারতীয় বানিয়া আর দালালরা আমদানী করা পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করে দিত এবং রপ্তানীর জন্যেও ব্যবস্থা করে দিত। কুঠিগুলো হতো এমন জায়গায় যেখান থেকে সহজেই দেশের মধ্যে ঢোকা যায় আবার গোলমাল বাধলে জাহাজে চড়ে সমুদ্রেও পালানো যায়।

পূর্ব ভারতে ইংরেজ কোম্পানী প্রথম কুঠি তৈরী করে ওড়িষ্যায়, ১৬৩৩ সনে। ক্রমে ক্রমে পাটনা, বালেশ্বর, ঢাকাতেও বাণিজ্য কেন্দ্র তৈরী হয়। তারা ভেবেছিলেন রক্তচক্ষু দেখিয়ে আরও কাজ হাসিল করবেন। তাই বাদশাহী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তারা ১৬৮৬ সনে হুগলী আক্রমণ করেন। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেব তখনও জীবিত। তাই কোম্পানীর সাজা হল দারুণভাবে। বাংলাদেশ থেকে তাদের পাততাড়ি গুটোতে হল। সুরাট, মসুলীপত্তম, বিশাখাপত্তমের কুঠিগুলোও দখল করা হল। বোম্বাইও হল অবরুদ্ধ।

নানাভাবে ক্ষমা চাওয়ার পরে সম্রাট আওরঙ্গজেব দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করে তাঁদের আবার বাণিজের অনুমতি দেন। বাৎসরিক মোট তিন হাজার টাকা দিয়েও বাংলা দেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করবার সুযোগ কোম্পানী পেল। আবার গঙ্গা নদী বেয়ে ১৬৯৮ সনে কোম্পানীর জাহাজ সুতানুটিতে এল। ১৬৯০ সনে ১২০০ টাকা খাজনায় বাঙ্গলার নবাবের কাছ থেকে সুতানুটি, কলিকাতা আর গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারী পেল ইংরেজ কোম্পানী। গড়ে উঠল কুঠি আর দুর্গ—ফোর্ট উইলিয়াম। ঐ তিনটি গ্রাম মিলেই সৃষ্টি হল আদি কলকাতা শহর।

৩। **মুঘল যুগে ভারত**—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য আকবরের রাজত্বকালেই সুদৃঢ় হয়ে উন্নতির চরমশীর্ষে আরোহণ করে। সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় দুই শতাব্দ যাবৎ মুঘল শাসন সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে একই রকম সরকারী ভাষা, শাসন পদ্ধতি, আইন ও বিচার পদ্ধতি প্রচলিত থাকে। এমন কি এই ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের দ্বারা মোগলদের শাসন পদ্ধতি, দরবারের আদব কায়দা, মুদ্রা নির্মাণ পদ্ধতি প্রভৃতিও গৃহীত হয়।

একুশটি সুবায় বিভক্ত মোগল সাম্রাজ্যে একই প্রকার শাসনযন্ত্র, নিয়মকানুন এবং একই প্রকার ক্ষমতাসম্পন্ন এবং একই উপাধিপ্রাপ্ত শাসনকর্তাদের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করা হত। সরকারী দলিল-দস্তাবেজ, ফরমান, সনদ, চিঠিপত্র, রসিদ প্রভৃতিতে একই ফারসী ভাষা ব্যবহার করা হত। একই রকম মুদ্রা সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত ছিল। এই সব মুদ্রায় একমাত্র মুদ্রানির্মাণকারী টাকশাল যে শহরে অবস্থিত তার নাম ছাড়া

বিভিন্ন স্থানে মুদ্রার মধ্যে ধাতুর বিশুদ্ধতা, মূল্য ও শ্রেণী বিভাগের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য ছিল না। সরকারী কর্মচারী ও সামরিক বিভাগের কর্মচারীদের এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে নিয়মিতভাবে বদলি করা হত। এর ফলে এক প্রদেশের অধিবাসীরা অন্য প্রদেশ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করার সুযোগ পেত এবং বিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অঞ্চলকেই তারা নিজেদের দেশ বলে মনে করার চেষ্টা করত। আরব, পারস্য ও সমরখন্দের প্রতি স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে মুঘল সম্রাটগণ ভারতের সম্পদ শোষণ করে বিদেশে পাঠান নি। বিশ্বজনীন ইসলামেরও তাঁরা স্বপ্ন দেখেন নি, ফলে ভারতের ইতিহাসে মুঘল যুগেই সর্ব প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্যবোধের সূত্রপাত হয়।

আওরঙ্গজেব ভিন্ন প্রায় সকল সম্রাট-ই ভারতবর্ষকে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত দেশ বলে মনে করতেন। মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রজা হলেও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় হিন্দুদের ছিল মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। তারা প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবাদাররূপে, প্রধান সেনাপতি বা মনসবদাররূপে বা রাজস্ব ব্যবস্থাপক রূপে নিযুক্ত হতেন। বিবাহসূত্রে বহু রাজপুত পরিবারের সঙ্গে মুঘল পরিবার সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। অনেক হিন্দু পরিবার দরবারে সম্মান লাভ করেছিল। পৃথিবীর সকল মুসলমান রাজ্যে অ-মুসলমানদের স্থান অতি সংকীর্ণ ছিল ; অমুসলমানকে ধর্মের ক্ষেত্রে বহু অসুবিধা ভোগ করতে হ'ত। কিন্তু মুঘল রাজত্বে হিন্দুগণ অন্য মুসলমান রাজ্যের তুলনায় অনেকটা সুবিধে ও সুযোগ লাভ করেছিল। ১৫৬১ হইতে ১৬৭৯ সন পর্যন্ত হিন্দুগণ জিজিয়া কর, তীর্থস্থান কর ও কেশ মুণ্ডন কর থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। হিন্দুগণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বহুক্ষেত্রে উপভোগ করত ; তারা ধর্মানুষ্ঠান, মন্দির নির্মাণ ও শাস্ত্রালোচনার নানাবিধ সুযোগ লাভ করত। বিচার ও ধর্ম ভিন্ন অন্যান্য বিভাগে হিন্দুগণ উচ্চ ও নীচ কার্যে নিযুক্ত হতে পারত। আকবর ও আওরঙ্গজেবের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যে মুঘল সাম্রাজ্যে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাতে প্রমাণিত হয় যে, ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্ভব ও সুফলপ্রদ।

মুঘলসাম্রাজ্যে নানাদিক দিয়ে সর্বভারতীয় ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। পূর্বে আসাম, পশ্চিমে কাবুল, দক্ষিণে রামেশ্বর, উত্তরে কাশ্মীর পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এক সম্রাট ; এক রাষ্ট্র ; এক শাসন, এক বিধান, এক রাষ্ট্রভাষা, এক মুদ্রা এবং এক মিলিত সংস্কৃতি, ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ঐক্য সূচিত করে।

মুঘল সম্রাটগণ কৃষির উন্নতি সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। কৃষির সম্প্রসারণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান, উচ্চমানের শস্য প্রবর্তন, দুর্দিনের সময় কৃষকদের মধ্যে বীজ ও তাকভি (কৃষি ঋণ) বিতরণ প্রভৃতি সরকারীনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের যথাসম্ভব বেশী জমি চাষ করতে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনে বাধ্য করার জন্য সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া হত।

মুঘল শাসনে জায়গীর সঙ্কট :

মুঘল আমলে রাজকর্মচারীরা বেতন পেত দুই ধরনে—কখনও কখনও নগদ টাকা তাদের দেওয়া হত ; আবার মাঝে মাঝে তারা জায়গীর পেত। জায়গীরের অন্তর্গত জমির মালিকানা দেওয়া হত না ; শুধু যতদিন কাজ আছে, ততদিন সেখানকার খাজনা

থেকে নিজের বেতন তারা নিত। নিয়ম ছিল এই খাজনা যদি বেতনের পরিমাণের চেয়ে বেশী হয় তো উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারে জমা দিতে হবে। এই উদ্বৃত্ত অর্থ অনেক সময় জায়গীরদার হজম করে ফেলত বলে প্রায়ই জায়গীর এক মনসবদারের কাছ থেকে নিয়ে অন্য মনসবদারের হাতে দেওয়ার রীতি ছিল। আকবর, শের-শাহ্-র মত বুঝেছিলেন যে অনাচার বন্ধ করতে হলে নগদ টাকায় বেতন দিতে হবে, জায়গীরগুলোকে যেখানে সম্ভব সরকারের খাস জমিতে পরিণত করতে হবে। কিন্তু এই ব্যাপার উপলক্ষ করে অনেক সময় যে অনাচার ঘটত তা—নিঃসন্দেহ। ফলে জায়গীর প্রথায় সংকট দেখা দেওয়ার পর শাহজাহান রাজকর্মচারীদের বেতনহার পুনর্বিন্যাস করেন। শাহজাহানের দরবার পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আড়ম্বরপূর্ণ বলে খ্যাত ছিল এবং অভিজাত শ্রেণীর অনেকেই এই সময় প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়। কিন্তু শাহজাহানের সংস্কার অর্থ সঙ্কটকে প্রশমিত করলেও তাঁর সমাধান করতে পারে নি। ব্যয় সঙ্কোচ, অনাড়ম্বর প্রিয়তা, নতুন করের প্রবর্তন এবং কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য অভিজাতদের উপর অবিরত নির্দেশ প্রেরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিন্তু আওরঙ্গজেব অর্থ সঙ্কটের সমাধান করতে পারেন নি। যে সব রাজকর্মচারী সম্রাটের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন তাদের পদোন্নতি এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের বরখাস্ত করা অথবা শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

অপর দিকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক অসন্তোষ দেখা দিলে আওরঙ্গজেবের জায়গীরদারগণ আরও একটি নতুন সমস্যার সম্মুখীন হন। সম্রাটের অনুদার ধর্মনীতি ও হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপনের ফলে শিখ, সতনামী, জাঠ, রাজপুত প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু-সম্প্রদায়ের লোকেরা মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফলে এই সব অঞ্চলের জায়গীরদারগণ নতুন একটি সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাদের আয়ও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়। অনেক ক্ষেত্রে জায়গীরদারদের নতুন জায়গীর দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। তা'ছাড়া বিদ্রোহ ঘোষণা ও বিদ্রোহ দমনের ফলে বিভিন্ন স্থানের কৃষিকার্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং জায়গীরদারদের পক্ষে প্রাপ্য অর্থ আদায় করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

তাছাড়া সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক অনুসৃত হিন্দু বিদ্বেষী ও সংকীর্ণ নীতির ফলে জায়গীরদার নিয়োগ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতার ফলে জাতি ধর্মের যুক্ত বিরোধিতার মনোভাব পুনর্জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং হিন্দুদের অভিজাত সমাজ থেকে বহিষ্কার করার দাবি জোরদার হয়। মনসবদারের সংখ্যাবৃদ্ধিও এই সঙ্কটকে আরও তীব্রতর করে তোলে। ১৬৫৯ সনে মুঘল সম্রাটের মনসবদারের সংখ্যা ছিল আট হাজার, ১৬৯০ সনে চৌদ্দ হাজার পাঁচশ ছাপান্নে পরিণত হয়।

জায়গীর প্রথার সঙ্কট দূর করার জন্য দক্ষিণ ভারতের শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত রাজ্যগুলি জয় করার জন্য রাজদরবারের প্রভাবশালী সুন্নী ব্যক্তিগণ আওরঙ্গজেবের উপর চাপ দেওয়ায় ধর্মীয়-অর্থনৈতিক কারণ অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণেই তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করেন। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ ঘাটতি অঞ্চল। ইহা ছাড়াও

অপশাসন, উপদল ও গোষ্ঠী অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য দ্রুত উৎপাদনের আশা ছিল কম এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় ব্যক্তিদের উচ্চাভিলাষ, মারাঠাদের সঙ্গে সন্তোষজনক বিলির সমস্যা এবং মারাঠা শক্তির ক্রমবৃদ্ধি উপেক্ষণীয় ছিল না। সামরিক অভিযান সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয় বহুল হওয়ায় আওরঙ্গজেব দক্ষিণী অভিজাতদের মনসব ও অন্যান্য চাকুরি দিয়ে দলে টানার চেষ্টা করলে উত্তর ভারতের বিশৃঙ্খল অবস্থা ও মারাঠাদের উপদ্রব এই কাজকে আরও দুরূহ করে তোলে। এই অবস্থায় দাক্ষিণাত্যের অভিজাত শ্রেণী—অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের মনসব পাওয়ায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। প্রায় প্রত্যেক মনসবদার উত্তর ভারতে কিংবা দেশের সুনিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অগণিত জায়গীরের অভিলাষী ছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই তারা তদ্বির করত। এইরূপ পরিস্থিতিতে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীরাও খুবই বিপন্ন বোধ করত। প্রকৃতপক্ষে জায়গীর প্রথার সংকট দূর করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারত জয় করে, আওরঙ্গজেব জায়গীর প্রথাকে অধিকতর সংকটময় করে তোলেন এবং আওরঙ্গজেবের রাজত্বে শেষ ২৯ বছর সাম্রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ দমন ও বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের ব্যয় বাবদ রাজভাণ্ডারের উপর যে চাপ পড়ে তার ফলস্বরূপ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। ফলে জিনিষের দাম বেড়ে যায়। জায়গীরদারদেরও জীবনযাত্রার মান বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের টাকার চাহিদাও বেড়ে যায়। জায়গীরদারদের অনেকেই তাই 'জমা'র (ধার্য রাজস্ব) চাইতে হাসিল (রাজস্ব আদায়) বেশী করার জন্য নির্মম শোষণ চালায়।

এছাড়া গড়পড়তা দু' থেকে আড়াই বছর জায়গীর ভোগের পর জায়গীর বদলের ঘন ঘন বাদশাহী আদেশের ফলে জায়গীরের কৃষি কাজ সম্বন্ধে জায়গীরদারের আগ্রহ অনেকাংশে কমে যায়। জমিকে ফলপ্রসূ করতে হলে যে অর্থ ও সময় ব্যয় প্রয়োজন সে সম্বন্ধে জায়গীরদারগণ তেমন উৎসাহ দেখাতেন না। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে পণ্য-সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উপরোক্ত সমস্যা ছাড়াও নতুন নতুন জায়গীরের অভাব, উৎকৃষ্ট জায়গীরের জন্য রেষারেষি বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে জায়গীরের বদলে উত্তর ভারতে জায়গীরের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি জায়গীরদারি সঙ্কটকে তীব্রতর করে তোলে। সাম্রাজ্যের স্বার্থ ভুলে নিজেদের স্বার্থ নিয়েই শাসকশ্রেণী মগ্ন হয়ে পড়েন। এমন কি সামরিক দায়িত্ব পালনেও দেখা দেয় চরম শৈথিল্য। ফলে জায়গীরদারি সংকট সাম্রাজ্যের সংহতিকে আঘাত করে শাসিতের জীবনে নিয়ে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ। ফলে মুঘল রাষ্ট্রশক্তির স্বার্থ যে জায়গীরদারি স্বার্থের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়েছিল তার বিচ্ছেদ সাম্রাজ্যের উপর অশুভ ছায়া ফেলে।

মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ

মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থা অনেকাংশে শের-শাহ-এর রাজস্ব ব্যবস্থার অনুরূপ। প্রত্যেক পরগণায় থাকতেন একজন "আমীর", একজন "শিকদার", একজন "খাজাঞ্চী", একজন হিন্দীতে অপরজন ফারসীতে লেখবার ভারপ্রাপ্ত "কারকুন"। শের-শাহের-ই মত প্রতি বৎসর ফসল তোলার সময় জমি মেপে জমির পরিমাণ এবং উৎপন্ন শস্যের অনুপাত অনুযায়ী খাজনা সংগৃহীত হত। খাজনা আদায়কারী কর্মচারী "মুকদ্দম", "চৌধুরী" "আমিন" যেন

কৃষকদের উপর অত্যাচার না করে অঞ্চল-শাসকের প্রতি সম্রাটের এরূপ আদেশ ছিল। রাজস্ব নির্ধারণের সময় কঠোর না হয়ে সংগ্রহের সময় মমতা না দেখানোর কথা বলা হয়েছে। তাই একাধারে মমতা ও নির্মমতার ভিত্তিতে রাজস্ব সংগ্রহকে রাজ্যের উন্নতির পূর্ব শর্তরূপে বলা হয়েছে। 'আমিন' বা আমিনদের প্রত্যেক রায়তের স্বাক্ষর সমেত "কবুলিয়ত" বা চুক্তিপত্র নিয়ে আসতে হত। এই চুক্তিপত্রে রায়তের জমি এবং খাজনা স্পষ্ট করে লেখা থাকত। আর রায়তের কাছে থাকত পাট্টা বা জমিতে তার অধিকারের দলিল। উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশের মধ্যে খাজনা দিতে হত আবার কখনও নগদ টাকাতেও খাজনা নেওয়া হত। বিভিন্ন কৃষিতে খাদ্যশস্য, কার্পাস, তুঁত, নীল, তামাক প্রভৃতি চাষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত।

বিচক্ষণ দেওয়ান টোডরমল্ল ও মুজফ্ফর খাঁনের সহায়তায় আকবর এই ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করলেন। আকবরের সময় জমি জরিপের ক্ষেত্রে বাঁশের (ইলাহী গজ) ব্যবহার করা হয় এবং এক্ষেত্রে জমি চার প্রকারের ধরা হয় (১) যে জমিতে সারা বৎসরের চাষ; (২) যে জমিতে তিন-চার বৎসর ধরে চাষ হয় নি; (৩) যে জমি বৎসরের কিয়দংশ অকর্ষিত; (৪) যে জমি পাঁচ বৎসর বা তারও বেশী সময় পোড়ো রয়েছে। আকবরের নির্দেশে চাষের জমি বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দেওয়া হত এবং চাপ দিয়ে কর আদায় নিষিদ্ধ ছিল। চাষীদের জমিতে স্থায়ী অধিকার ছিল। কৃষি ঋণ দেওয়া হত। ভিনসেন্ট স্মিথের ভাষায়, সংক্ষেপে বলা যায় যে, এ ব্যবস্থা ছিল প্রশংসনীয়। রাজস্ব নীতি ছিল নির্ভুল এবং কর্মচারীদের প্রতি যে নির্দেশ দেওয়া হত তা ছিল খুব ভালো"।

জমির মালিকানা তিন রকম: (১) **খালসা**—ইহা বাদশাহের খাসজমি, (২) **'জায়গীর'**—ইহা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নগদ বেতনের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি যার কর্তৃত্বে ছিলেন জায়গীরদার, (৩) **'ময়ূরখল'**—যে জমি বিদ্বান ও ধার্মিকদের দেওয়া হয়েছিল।

মুঘল রাজকোষে ভূমিরাজস্ব বাবদ অর্থাগম হত সর্বাধিক। ইহা ছাড়া আমদানী, রপ্তানী, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক, লবণ প্রস্তুতের অধিকার, টাকশাল, জরিমানা, উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি হস্তান্তর কর, যুদ্ধ বিগ্রহ উপলক্ষে লুণ্ঠন। আওরঙ্গজেবের জিজিয়া কর এবং তীর্থ যাত্রীদের উপর কর থেকে বহু অর্থ সংগৃহীত হ'ত। স্থানীয় কর্মচারীরা অনেক সময় নিষিদ্ধ "আবওয়াব" (অতিরিক্ত কর) প্রজার কাছ থেকে আদায় করত; বাদশাহেরা হয়তো ইচ্ছা সত্ত্বেও মুঘল যুগের পরবর্তী অধ্যায়ে এ ধরণের কুকর্ম বন্ধ করতে পারেন নি। আওরঙ্গজেবের আমলে হিন্দুদের দুর্ভোগ বেড়েছিল এই কারণে যে মুসলমানদের চেয়ে তাদের উপর করভার পড়ল বেশী। আওরঙ্গজেব নাকি কৃষকদের (৮০) আশীরকম কর মকুব করেছিলেন, কৃষি ঋণের দাদনও আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে চাষ না হলে খাজনা মকুব করতেন। ১৭৬৮-৬৯ সনের ফরমানে আওরঙ্গজেব নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'খাজনা এমনভাবে আদায় করতে যাতে রায়তের সর্বনাশ না হয়। আর কিছুতেই যেন খাজনা শস্যের অর্ধেকের বেশী না হয়। রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি

সুবাকে কয়েকটি সরকারে, এবং সরকারকে 'পরগণায়' (কয়েকটি গ্রাম নিয়ে) বিভক্ত করা ছিল। গ্রামের 'মুকদ্দম' (মোড়ল) ও পাটোয়ারী পল্লী সমাজ কর্তৃক নিযুক্ত হত। সরকারী, কর্মচারী হিসাবে থাকতেন 'কারকুনে' (জমি জরিপের জন্য), 'কানুন গো', 'পোতদার' (জেলার খাজাঞ্চী)।

মুঘল আমলে রাজস্ব আদায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা যায় আওরঙ্গজেবের আমলে। তাঁর আমলে খাজনা কমেছে আবার বেড়েছে। শাহজাহান বিপুল অর্থ ব্যয় সত্বেও হিসাবী ছিলেন। আওরঙ্গজেবের সময় অবিরাম যুদ্ধের ফলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হলে পরবর্তী বাদশাহদের তা পূর্ণ করার ক্ষমতা কারও ছিল না।

সাম্রাজ্যকে আকবর প্রথমে যে বারোটি "সুবা" বা প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন সে সুবার সংখ্যা তাঁর রাজত্বকাল যখন শেষ হয়ে আসছে তখন বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল পনেরো, জাহাঙ্গীরের আমলে সুবার সংখ্যা সতেরো, আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যকে ২১টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশের রাজ্যপালকে বলা হত "নাজিম" (বা সুবাদার)।

সমাজ ও অর্থনীতি ঃ মুঘল আমলের সমাজ ও অর্থনীতি সুলতানী যুগ থেকে খুব বেশী এগিয়ে যায় নি। তবে হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলমান সমাজে স্তর ভেদ আরও প্রকট হয়েছে। হিন্দু আচার, অনুষ্ঠান, বেশভূষা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতির প্রভাব অভিজাত মুসলমানদের উপর পড়েছে। কিন্তু বৃহত্তর হিন্দু সমাজে রক্ষণশীলতা তখন অক্ষুণ্ণ রয়েছে। মুসলিম যুগের অভিজাত মহলের বিলাস-ব্যসন হিন্দু সমাজেও অনুপ্রবেশ করে। আকবরের উৎসাহে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ও আদান প্রদান বেড়ে যায়। ভারতীয় কৃষিনির্ভর অর্থনীতি মুঘল যুগেও একই অবস্থায় ছিল। কিন্তু মুঘল সম্রাটরা বিশেষ করে আকবর ভারতীয় কুটিরশিল্পকে উৎসাহিত করেছেন। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ও কৃষকের তখন শোচনীয় অবস্থা। মুঘল অর্থনীতি ছিল মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। মুঘল সম্রাটগণ কৃষির উন্নতি সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। কৃষির সম্প্রসারণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান উচ্চমানের শস্য প্রবর্তন, দুর্দিনের সময় কৃষকদের মধ্যে বীজ ও তকবি বা কর্জ বিতরণ প্রভৃতি সরকারী নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের যথাসম্ভব বেশী জমি চাষ করতে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনে বাধ্য করার জন্য সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া হত।

কৃষি ছাড়াও বাণিজ্য হত উত্তর-পশ্চিমের স্থলপথ এবং পশ্চিমে সমুদ্র দিয়ে। সমুদ্রপথে প্রথম মশলা, কাপড়, সোনা, মুক্তো, ঔষধাদির লাভজনক বাণিজ্য করে পর্তুগীজরা।

মুঘলযুগে বেশ কিছুদিন অভ্যন্তরীণ শান্তি থাকায় কারিগররা শিল্প নিপুণতা দেখাতে পেরেছেন। আঞ্চলিক বিশেষত্ব নিয়ে কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছে। বড় বড় রাজপথ তৈরী হওয়ায় বাণিজ্য আরও বেড়েছে, দিল্লী, আগ্রা, আজমীর, এলাহাবাদ, কাশীর বিবরণ রয়েছে বৈদেশিক পর্যটকদের লেখায়। আগে ছিলেন প্রধানতঃ আরবী বণিকরা। কিন্তু বিরাট চাহিদা নিয়ে মুঘল যুগে এলেন ইউরোপীয় বণিকরা। কুঠিতে কুঠিতে উঠেছে বাণিজ্যের গুঞ্জন। নানা ধরণের কাপড় চালান হয়েছে বিদেশে। আকবর

নিজে কাশ্মীরী শাল আর কার্পেটকে জনপ্রিয় করেছেন। রেশম শিল্প গড়ে উঠেছে কাশী আর মুর্শিদাবাদে। মীনার কাজ, হাতীর দাঁতের কাজ, সোনা রূপোর জরির কাজ আর নানাধরণের সুগন্ধ জিনিষ গিয়েছে বিদেশে, বিনিময়ের বদলে মুদ্রার প্রচলন হয়েছে ব্যাপকভাবে। বাণিজ্যের এই উন্নতি সত্ত্বেও দেশের মূল অর্থনীতি কিন্তু রয়ে গেল কৃষিভিত্তিক। কৃষজাত জিনিসের দামও ছিল খুবই কম। সুতরাং কৃষকের অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। তাঁরা দুর্ভিক্ষ হলে মরতো কাতারে কাতারে। গ্রাম্য জীবন পড়তো সম্পূর্ণ ভেঙ্গে। রোগ মহামারীতে মরতো আরও মানুষ। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ব্যবস্থাও ছিল না।

শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ঃ শিল্পের উন্নতির জন্য মুঘল-যুগে ভারত বিখ্যাত ছিল। বাংলার রেশম ও তুলাজাত বস্ত্র পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের শাল, গালিচা এবং পশমী বস্ত্র ভারতের গৌরব ছিল। এ সকল বস্ত্র দেশ-বিদেশে চালান যেত। স্থলপথে লাহোর থেকে কাবুলের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য চলত। পূর্ব-উপকূলে 'চট্টগ্রাম', 'সপ্তগ্রাম', ও 'সোনার গাঁ', প্রাচ্যদেশের সাথে জলপথে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। পশ্চিম-ভারতে বিশেষ করে গুজরাটে, অনেক বন্দর ও পোতাশ্রয় ছিল। সুরাট, ব্রোচ, বেসিন ও গোয়া ছিল এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। মালাবার উপকূলের প্রধান বন্দর ছিল কালিকট ও কোচিন। এই সকল বন্দর থেকে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য আরব-বণিকদের সাহায্যে পশ্চিম এশিয়া, মিশর ও ইউরোপে পৌঁছত। ভারতের সহিত সাক্ষাৎ ব্যবসাগত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ইউরোপীয় বণিকগণও খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে এদেশে আসতে আরম্ভ করেছিলেন। মানুচি (ইতালী) তাদের অন্যতম।

তিনি আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। প্রথমে তিনি ছিলেন দারা শিকোর একজন গোলন্দাজ কর্মচারী পরে চিকিৎসকের ব্যবসা করেন। তাঁর মতে দিল্লীর সম্রাট ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী। মানুচি রাজকর্মচারীদের অত্যাচার, কৃষকগণের দুরবস্থা এবং মুঘল অন্তঃপুরের অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। মানুচি পরিবেশিত মুঘল অন্তঃপুরের কুৎসা গ্লানিকর।

মুঘল যুগে সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ধর্মগতভাবে মুঘলযুগে ভারতবর্ষে দুইটি প্রধান বিভাগ ছিল হিন্দু ও মুসলমান। এই দুই বিভাগের প্রত্যেকটির মধ্যে তিনটি করে শ্রেণী ছিল। বাদশাহ ও বাদশাহের নিজ পরিবার ছিল সকল শ্রেণীর উর্দ্ধে। প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন বাদশাহের আত্মীয়বর্গ ও আমীরগণ। অবশ্য তাঁদের মধ্যে তুর্ক, তাতার, পারসিক, ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান সকলেই ছিলেন মনসব, জায়গীর বা উচ্চ রাজপদের অধিকারী।

ভারতবর্ষের ধনরত্ন ছিল প্রচুর। কিন্তু ধনরাশি জনসাধারণের হস্তে ছিল না। ধনী ছিল অত্যন্ত ধনী, দরিদ্র ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। প্রাসাদতুল্য বাসগৃহ, বহুমূল্য বসন-ভূষণ, আহারে বিলাস ও বিহারে সমারোহ ছিল মুঘলযুগের বৈশিষ্ট্য। মুঘলযুগে মৃত কর্মচারীদের সম্পত্তি ও জায়গীর রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত হত। উচ্চরাজপদ বংশানুক্রমিক ছিল না। মুঘল আমীরগণ বিলাসব্যসন, বসন-ভূষণ, আহার, বিহার, প্রাসাদ,

মসজিদ, সরাই নির্মাণ, নৃত্যগীতে যথাসর্বস্ব ব্যয় করতেন এবং স্বভাবতই তাঁরা উচ্ছৃঙ্খল ও অমিতব্যয়ী হয়ে উঠতেন। অন্তঃপুরে অসংখ্য মহিলার অবস্থিতি মুঘল বাদশাহ ও আমীরদের আভিজাত্যের নিদর্শন ছিল।

এ যুগে বহু ইউরোপীয় পর্যটক ভারতে এসেছিলেন। ফ্রান্সের ব্যের্নিয়ে ও তাভার্নিয়ে ইংলণ্ডের রালফ ফিচ, হকিন্স, টমাস রো, কার্টরাইট, ইতালীর মানুচি ছিলেন এদের মধ্যে প্রধান। রালফ ফিচ দিয়েছেন ফতেপুর সিক্রি আর আগ্রার বিবরণ। হকিন্স বলেছেন মনসবদারীর কথা। কার্টরাইট দিয়েছেন জগন্নাথ ক্ষেত্রের বিবরণ। তাভার্নিয়ের লেখা থেকে পাওয়া যায় মুঘল আড়ম্বরের কথা।

বিদেশী পর্যটকরা লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, বারাণসী, মসুলীপত্তম এবং অন্যান্য শহরের জৌলুস দেখে অবাক হয়েছেন। আবার তাঁরাই দেখেছেন প্রদীপের নীচের অন্ধকার, অর্থাৎ জাঁকজমকের নীচে চাপা পড়া দারিদ্র ও দুঃখ।

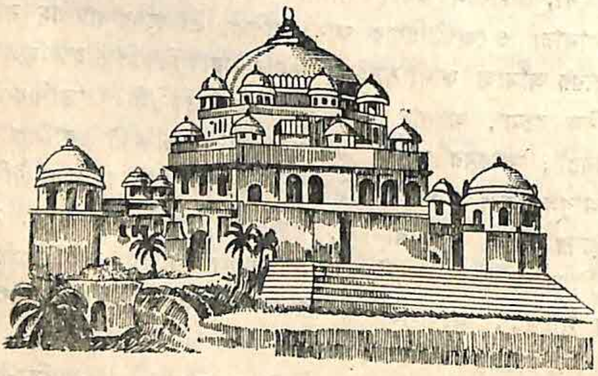
মুঘল-যুগে ভারতে বংশগত কোন অভিজাত সম্প্রদায় ছিল না। তার কারণ আইনতঃ সম্রাট্ ছিলেন তাঁর রাজ্যের সকলের উত্তরাধিকারী। কোন সরকারী পদের উপর বংশপরম্পরা দাবি ছিল না। মনসবদারের পুত্রকেও নূতন করে জীবন আরম্ভ করতে হত এবং একমাত্র সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করলেই তিনি 'মনসবদার হতে পারতেন। ভাগ্যান্বেষী বহু বৈদেশিক কপর্দকশূন্য অবস্থায় এদেশে এসে সম্রাটের অনুগ্রহে অভিজাত-সম্প্রদায়ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আবার অভিজাত-বংশের সন্তান-সন্ততিগণও চরম দারিদ্রে পড়তেন।

মুঘল আমলে দিল্লীর দরবার হয়েছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় প্রাণকেন্দ্র। সুলতানী আমলে তা হয় নি। প্রথমতঃ ফার্সী সাহিত্যের যথেষ্ট বিকাশ হয়। বাবরের রচিত আত্মজীবনী, গুলবদনের হুমায়ুন নামা, জাহাঙ্গীর রচিত আত্মজীবনী, সালিমা সুলতানা, জাহানারা ও জেবউন্নিসার ফার্সী কবিতা এই যুগের বাদশাহী সাহিত্য বলা যায়। আকবরের আমলে ফার্সী সাহিত্য তিনটি ধারায় বিকশিত হয়েছিল। এগুলি হল ঐতিহাসিক রচনা, অনুবাদ এবং কাব্য সাহিত্য সৃষ্টি। 'তারিখ-ই-আলফি ; 'আইন-ই-আকবরী ; 'আকবর নামা' 'মাসির-রহিমী' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। আবুল ফজল ও আবদুর রহিমখান-ই খানান, বদাউনী প্রমুখ ঐতিহাসিক ও লেখকরা এই যুগের। এই যুগে রামায়ণ, মহাভারত, অথর্ববেদ, গীতা, নল-দময়ন্তী উপাখ্যান, উপনিষদ ফার্সীতে অনূদিত হয়। আবুল ফজলের ভাই ফৈজী, ঘিজালী, মোহম্মদ হুসেন নাজিরী, জামালউদ্দিন, উরফি আকবরের আমলের বিখ্যাত কবি। টোডরমল, পৃথ্বীসিং রাঠোরও এই যুগের লোক।

জাহাঙ্গীরের সময়ে রচিত "ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী" "মা-আসির-ই-জাহাঙ্গীর" "জবদ-উৎ-ওয়ারিখ" শাহজাহানের আমলে রচিত 'পাদ-শাহ-নামা', শাহজাহা নামা' ; আওরঙ্গজেবের আমলে রচিত আলমগীর নামা, মুন্তাখাব-উল-লুবাব প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। আবদুল হামিদ লাহোরী, ফেরিস্তা, এনায়েৎ খাঁন, কাফী খাঁন, মীর্জা মোহম্মদ কাজিম প্রমুখ ঐতিহাসিকগণই এই যুগের অদ্বিতীয়। এই যুগে

হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, বাংলা প্রভৃতি মাতৃভাষার অভূতপূর্ব বিকাশ হয়েছিল। মালিক মোহাম্মদ জায়সী, বীরবল, রাজা মানসিংহ, রাজা ভগবান দাস, রহিম খানই খানান, বাদশাহী যুগের বিখ্যাত হিন্দী কবি। হিন্দুস্থানী ব্রজভাষার নব জন্মের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল তুলসীদাসের রামায়ণ, সুরদাসের সঙ্গীত, রামদাসের কীর্তন ও পৃথ্বীরাজের মহাকাব্য। কৃষ্ণলীলা ও রামলীলার ভক্তিস্রোতে এই সব সাহিত্য ও সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছিল। এই সব ধারার সঙ্গে বাংলার শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিধারা মিলিত হয়ে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য দ্বারা বাংলাভাষাও সমৃদ্ধ হয়। বাংলাদেশে সংস্কৃত, ফার্সী ও বাংলা তিনটি ভাষার চর্চার ফলে বাংলা ভাষাই বেশী সমৃদ্ধ হয়। সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার উৎস। সংস্কৃতের অনুশীলনে বাংলা ভাষার উন্নতি ঘটে। মুঘল দরবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার জন্য বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ফার্সীর অনুশীলন করেন এবং বাংলা ভাষা ও ফার্সীকে যথাসম্ভব আত্মস্থ করে সাহিত্য সৃষ্টি করেন। অষ্টাদশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পণ্ডিত ও কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্য রচনায় বাংলা ও ফার্সীর মিশ্রণের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বৈষ্ণব সাহিত্যেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, ত্রিলোচন দাস, নরহরি চক্রবর্তী প্রভৃতি বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের নাম উল্লেখযোগ্য। মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গল ; মনসামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য, কাশীরামদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি সাহিত্য সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র, বীরভূমের জমিদার আসাদুল্লা বাংলা সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

মুঘল যুগে সংস্কৃত সাহিত্যেরও বিকাশ হয়েছে। আকবরের সভাতেই সংস্কৃত কবিরা সম্মানিত হয়েছেন। শাহজাহান সংস্কৃত কবি জগন্নাথ পণ্ডিতকে রাজ-সম্মান দিয়েছেন। এইভাবে দেখা যায় মুঘল যুগে এক জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলামের প্রভাবে

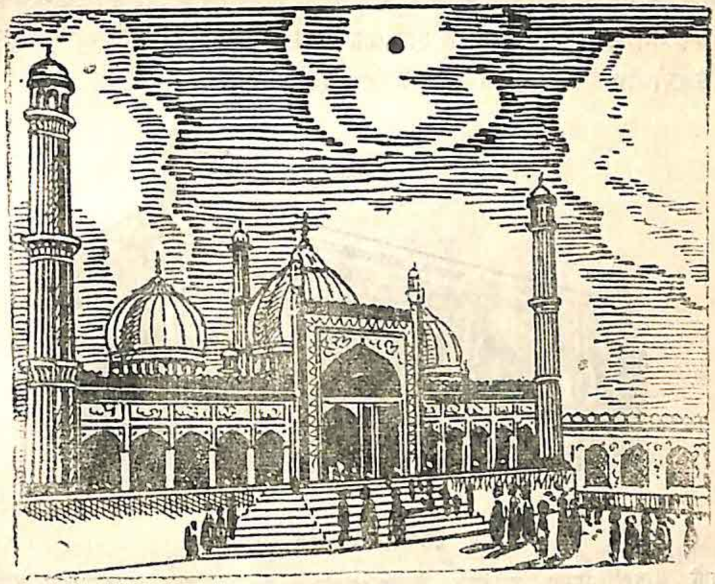


শের শাহের সমাধি

ও আনুকূল্যে সংস্কৃত, ফার্সী, হিন্দী ও আঞ্চলিক ভাষাগুলি একটি জাতীয় সাহিত্য গড়ে তুলেছিল এই মুঘল যুগেই।

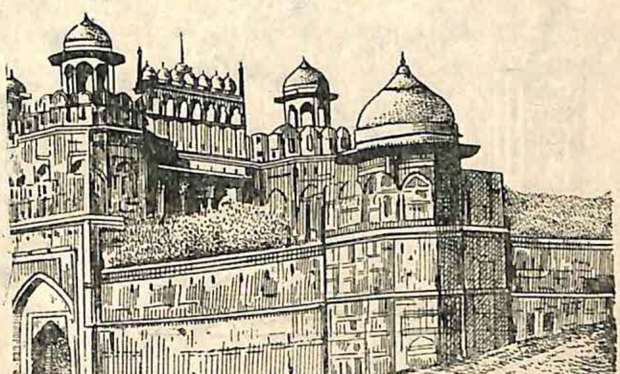
শিল্প : মুঘল আমলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহের ফলে শিল্প সৃষ্টিতে

হিন্দু-মুসলমান রীতির সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত হয়। এই যুগের স্থাপত্য শিল্পরীতিকে 'ইন্দো-পারসিক' রীতি বলে অভিহিত করা হয়। সাসারামে শের-শাহের সমাধি সৌধের গড়ন-



জুম্মা মসজিদ

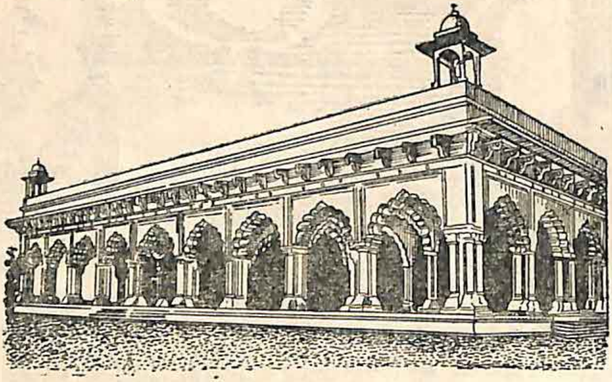
মাধুর্য খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু মুসলমানী রীতিই বেশী সুস্পষ্ট। বাবর ও হুমায়ুনের আমলে তৈরী মসজিদ ও সমাধি সৌধগুলির পারসিক রীতির ছাপই বেশী। কিন্তু আকবরের রাজত্বকালে মুঘল শিল্পকলায় হিন্দু শিল্পরীতির প্রয়োগ খুব সুস্পষ্ট। তাঁর



লাল কেল্লা

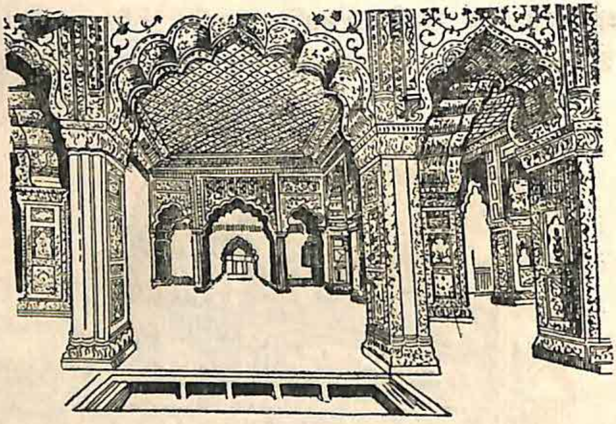
নির্মিত হুমায়ুন স্মৃতি সৌধটির নির্মাণ কৌশল পারসিক হলেও এটি থেকে বোঝা যায় যে আকবরের আমলের শিল্পীরা এক স্বতন্ত্রধারায় হিন্দুমুসলমান শিল্পরীতি বিকাশে সচেষ্ট

হয়েছিলেন। আকবরের আমলে তৈরী 'জাহাঙ্গীর মহলে' (আগ্রার কেল্লায়) হিন্দুয়ানী শিল্পের ছাপ প্রকট। ফতেপুর সিক্রীর নির্মাণে বেলে পাথরের সাথে মার্বেলের ব্যবহার ইন্দো-পারসিক রীতি অব্যাহত থাকে। তাঁর আমলে মুসলমান শিল্পরীতির সঙ্গে রাজপুত শিল্পরীতির সংমিশ্রন ঘটেছিল। জাহাঙ্গীরের সময়ে সেকেন্দ্রায় নির্মিত আকবরের সমাধি, ইত্‌মদ্‌উদ্‌দৌলার সমাধি মুঘল সম্রাটের শিল্পানুরাগের পরিচায়ক।



দেওয়ান-ই-আম

সম্রাট শাহজাহানের আমলে ইন্দো-পারসিক শিল্পরীতির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে। শাহাজাহানের সময়ে আগ্রার দুর্গে নির্মিত দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, শীশমহল,

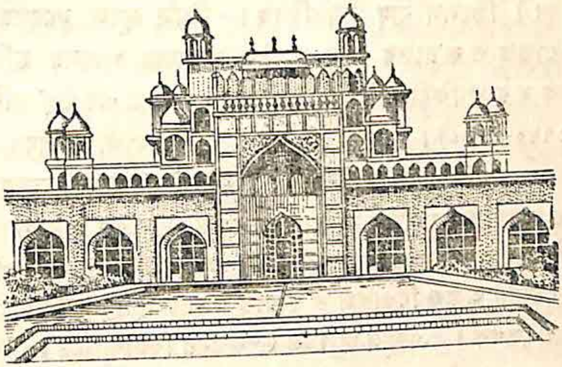


দেওয়ান-ই-খাস

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'তাজমহল', 'মতি মসজিদ', লালকেল্লা ইন্দো-পারসিক রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন। বিশুদ্ধ পারসিক রীতির তিনি সংস্কার সাধন করেন।

স্থাপত্য শিল্পের মতই মুঘল চিত্রকলায় হিন্দু ও রাজপুত শিল্পরীতির সাথে চৈনিক, ইরাণীয়, গ্রীক ও মোঙ্গলীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বিশেষভাবে ভারত, পারস্য,

চীনা শিল্পের সংমিশ্রণে এক নূতন শিল্পকৌশল লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে মুঘল শিল্পকলা মূলত সূক্ষ্ম চিত্র কলা (Miniature Painting) এবং এর মূল উৎস পারস্যের চিত্রশিল্প। আকবরের আমলে চিত্রশিল্পের উপর ভারতীয় শিল্পরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। হিন্দু শিল্পীদের সান্নিধ্যে যেমন পারসিক চিত্ররীতির পরিবর্তন হয়েছিল, তেমনি হিন্দু শিল্পরীতিতে পারসিক চিত্র শিল্পেরও প্রভাব পড়েছিল। ফতেপুর সিক্রীর



আকবরের সমাধি

দেওয়াল চিত্র, অর্থাৎ মহাভারত রামায়ণের ফার্সীতে অনুবাদিত পুঁথিচিত্র, আকবরনামা, পাদ-শাহনামা ইত্যাদির পুঁথিচিত্র মুঘল চিত্রশিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন। হিন্দুশিল্পীরা মুঘল আমলে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন একথা বলাই বাহুল্য। হিন্দু শিল্পীদের মধ্যে যশোবন্ত, কেশব, তারা, মাধো, মুকুন্দ, জগন্নাথ, মহেশ, রাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই যুগে রাজপুত শিল্পেও পারসিক প্রভাব পড়েছিল। কারণ হিন্দু ও মুসলিম শিল্পীরা পারসিক রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মুঘল ও রাজপুত উভয় শিল্পে তাই পারসিক প্রভাব সুস্পষ্ট।

সঙ্গীত শিল্পেও উভয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটি বিশিষ্ট ভারতীয় রীতি গড়ে উঠেছিল এবং গজল ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অভূতপূর্ব সুরমূর্চ্ছনার সৃষ্টি হয়েছিল। তানসেন, রাজবাহাদুর, সুরদাস এই যুগেরই সঙ্গীত বিশারদ।

মুঘল যুগে রাজপুত শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'রাজপুত চিত্র' নামে অভিহিত এক বিশেষ ধরণের চিত্র শিল্পরীতির উদ্ভব হয়েছিল। পাঞ্জাব এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, বিশেষ করে কাংড়ার পাহাড়ী অঞ্চলে অপর এক চিত্রাঙ্কন রীতির বিশেষ অনুশীলন হত। অনেকে এই চিত্রর তিকে 'পাহাড়ী রীতি' বলে অভিহিত করে থাকেন।

হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার উন্নতি : মুঘল যুগে শুধু ফারসী নহে, মারাঠী, গুরুমুখী এবং বাংলাভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। আকবরের সভাসদ সুবিখ্যাত হাস্যরসিক বীরবল হিন্দী ভাষায় সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারতেন। হিন্দী-সাহিত্যের অমূল্য রত্ন তুলসীদাসের রামায়ণ, 'রামচরিত মানস', এই যুগেই রচিত হয়েছিল। সুরদাসের ভজনাবলীও এই সময়ে রচিত হয়। মোগল যুগের প্রথম দিকে জয়সী হিন্দী ভাষায় 'পদ্মাবত্' কাব্য রচনা করে হিন্দী সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ

করেছিলেন। মারাঠী ভাষার উন্নতিসাধনে তুকারামের ভক্তিমূলক গীতি এবং রামদাসের রচনাবলী বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। পাঞ্জাবে গুরুমুখ ভাষার প্রবর্তন হয় এবং এই ভাষায় শিখদের আদিগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব' এবং গোবিন্দ সিংহের গ্রন্থাবলী রচিত হয়। বাংলাভাষায় কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' এবং কাশীরামদাসের 'মহাভারত এই যুগেই রচিত হয়। বিদ্যাপতির দানে পুষ্ট হয় মৈথেলী। উর্দু সাহিত্যে সাউদা (১৭১৩-১৭৮১ খৃঃ) ছিলেন ব্যঙ্গ সাহিত্যিক। তিনি মুঘল দরবারে অর্থ ও ক্ষমতা লোলুপ আমীর-ওমরাহ ও ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পতনের ছবি এঁকেছেন। তাঁর সমসাময়িক মীর তাকিমীর ছিলেন গীতিকার। অপর এক উর্দু কবি ছিলেন কবি আকবরাবাদ (১৭৪০-১৮৩০)। সেকালের শ্রেষ্ঠতম লেখক মীর্জা গালিব (১৭৯৬-১৮৬৯) উর্দু সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় প্রতিভা। তিনি উর্দু গদ্যের জনক বলে প্রসিদ্ধ। আঠারো শতকের প্রথমার্দ্ধের তামিল কবি তায়ুমানভার মানবিক সাম্যের ধারা প্রচারে প্রয়াস হন। উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে এই ধারা বলসুন্দরম পিলাই এবং পরবর্তী কালে রামলিঙ্গ স্বামীর রচনায় আরও বিকাশলাভ করেছে। আরু মুগা নাভেলার (১৮২২-১৮৭৪) ছিলেন প্রধান গদ্য লেখক। এ যুগে তামিল উপন্যাসের বিকাশ ঘটে।

আঠারো শতকে মারাঠী ভাষায় অনেকগুলি বীরগাথা রচিত হয়েছিল। এগুলিতে শিবাজীর সময়কার অনেক মারাঠী ইতিহাস রচিত আছে। এ যুগের বিখ্যাত কবি হলেন রাম যোশী (১৭৫৮-১৮১২) ও আনন্দ কান্দো। ইঙ্গো-মারাঠী 'বোম্বাই দর্পণ' পত্রিকার সামাজিক সমস্যার প্রবন্ধকার ছিলেন রামশাস্ত্রী জামভেকার। অতীত ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক রামকৃষ্ণ রমানাথ ও প্রভাকর সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মারাঠা সাহিত্য তৎকালীন ভারতবর্ষে সমৃদ্ধতম ভাষা হয়ে ওঠে। সেকালের বিখ্যাত মারাঠা ভাষাবিদ ছিলেন দাদা পাণ্ডুরাঙ্গা (১৮১৪-১৮৮২)।

শিক্ষাব্যবস্থা : মুঘল যুগে বর্তমানের ন্যায় কোন শিক্ষাব্যবস্থা না থাকলেও শিক্ষা দানের জন্য মক্তব, টোল ও মাদ্রাসা ছিল। মক্তব ও মাদ্রাসায় মুসলমানগণ আর টোল বা হিন্দুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে (পাঠশালায়) হিন্দুগণ শিক্ষালাভ করতেন। হিন্দুগণ সরকারী চাকরি লাভের জন্য ফার্সী ভাষা শিক্ষা করতেন। মুসলমানগণের মধ্যেও অনেকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। আওরঙ্গজেব বহু মক্তব, মাদ্রাসা প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। মুঘল যুগে নারীশিক্ষাও অপ্রচলিত ছিল না। এই প্রসঙ্গে বাবরের কন্যা গুলবদন বেগম, সম্রাজ্ঞী নুরজাহান ও শাহজাহানের কন্যা জাহানারার উল্লেখ করা যেতে পারে। লক্ষ্ণৌ, জৌনপুর, কাশ্মীর, নবদ্বীপ, বিজাপুর, প্রভৃতি স্থান শিক্ষার কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধিলাভ করে।

সাফল্যের মধ্যেও দুর্বলতা : বাদশাহী যুগের সমন্বয়ে গড়া মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম একদিকে যেমন আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে রূপ দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তি গড়েছে। কিন্তু শত সাফল্য সত্ত্বেও সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কিন্তু রয়েই গেল। মধ্যযুগীয় অর্থনীতি এবং সমাজ সংগঠন থেকে যেমন বেরিয়ে আসা গেল না, তেমনি সাহিত্য, স্থাপত্যের চর্চা হলেও বিজ্ঞান চর্চা হল না। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এই বিরাট দুর্বলতাই ধরা পড়ল।

দশম অধ্যায়

ভারতের ইতিহাস : ১৭০৭-১৭৪৭ সন

History of India : 1707-1747

১. মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও ভাঙ্গনের পটভূমি

ইতিহাসের মৌলিক সত্য হল পরিবর্তন। উন্নতি ও অধোগতি, দুই-ই পরিবর্তনের চিহ্ন। এই পরিবর্তন ঘটে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। সুতরাং ঐতিহাসিক নিয়মেই কোন সাম্রাজ্যের উত্থান কিম্বা পতন ঘটে ঘটনার ধারাবাহিকতার পথে। মুঘল সাম্রাজ্যের অধোগতির পেছনে রয়েছে তেমনি এক ধারাবাহিকতার সূত্র। আমরা এই ধারাবাহিকতার সূত্র ধরেই জানব সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে কিভাবে সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হতে হতে শেষ পর্যন্ত তা ভেঙ্গে পড়তে থাকে।

মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবময় উত্থানের কৃতিত্ব যেমন একা আকবরেরই নয়, তেমনি পতনের দায়িত্বও একা আওরঙ্গজেবের নয়। মুঘল সাম্রাজ্যের অধোগতি হচ্ছিল আওরঙ্গজেবেরও আগে থেকে। তবে তাঁর অনুসৃত ভ্রান্ত নীতি পতনের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

মুঘল বিপর্যয় সম্বন্ধে ভিনসেণ্ট স্মিথ-এর একটি মন্তব্য এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এমন আকস্মিকভাবে হয়েছিল যে প্রথম দৃষ্টিপাতে তাকে বিস্ময়কর মনে করা যেতে পারে। কিন্তু যে ছাত্র ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি নির্ভুল ধারণা করতে পেরেছে সে আশ্চর্য হয়ে ভাববে যে ঐ সাম্রাজ্য অতদিন চলেছিল কেমন করে!" প্রকৃতপক্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটছিল বহুকাল ধরে, শুধু যে বাদশাহদের বিড়ম্বনা তা নয় সারা দেশকেই বহুদিন যন্ত্রণা সহ করতে হয়েছিল। এই অধঃপতনের কথা ঠিকভাবে বুঝতে হলে অনেক বিষয়ের অন্ততঃ কয়েকটির উল্লেখ না করলেই নয়।

সর্বপ্রথমে মনে রাখা দরকার যে রাজবংশে উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার রীতি যদি থাকত তা হলেও কোন উপায়েই নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় যে পুরুষানুক্রমে রাজাদের চরিত্রবল ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকবে। ইতিহাসে সর্বদেশে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। মুঘল রাজবংশের সৌভাগ্য বলতে হবে যে প্রথম ছয়জন সম্রাটেরই প্রভূত সামর্থ্য ও প্রতিভা ছিল, কিন্তু পূর্ববর্তীদের তুলনায় সিংহাসনের শেষ অধিকারীদের চরিত্র একেবারেই রাজোচিত ছিল না।

এদেশে মুঘল রাজবংশের একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল এই যে জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে কিন্তু ঐ ধরনের কোন নির্দিষ্ট বিধান সে আমলে মানা হত না। তাই প্রায় প্রত্যেক রাজত্ব শেষ এবং শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃযুদ্ধ; পিতৃহত্যা থেকেও সিংহাসন লোলুপেরা নিরস্ত হত না। তখন যেন এক নিয়ম ছিল : "তখ্‌ত য়া তখ্‌তা!"—হয় সিংহাসন, নয় কবরে নিয়ে যাবার কফিন!"

সুলতান-বাদশাহরা যেখানে ব্যর্থ, সেখানে অভিজাত শ্রেণী থেকে কর্মঠ লোকেরা এগিয়ে এসে একটা ব্যবস্থা করতে পারে, কিংবা যদি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়ে থাকে তো তাদের

চেষ্টায় রাষ্ট্রের চেহারা বদলাতে পারে। কিন্তু মুঘল যুগে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সংগঠন ছিল এমন যে নিজেদের শক্তিতে আস্থাবান অভিজাতেরা দল বেঁধে রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে তুলে নেওয়ার কথা ভাবতে পারত না—নিজেরা কেউ কেউ রাজা হতে চাইত কিংবা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো সিংহাসনে না বসে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়তে ইচ্ছা করত, কিন্তু একত্রিত হয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অন্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারত না। মধ্যবিত্ত বলতে যাদের বোঝায়, তাদের অস্তিত্ব কিয়ৎ পরিমাণে মুঘল যুগে যে লক্ষ্য না করা যায় তা নয়; ব্যবসা এবং মহাজনী প্রভৃতি পেশায় অর্থ উপার্জন করার সুযোগ তখন কিছু ছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে সমাজে একটা স্বতন্ত্র শক্তির উদ্ভব তখনও হয় নি—অভিজাতদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনাও তাদের কাছে দেখা দেয় নি। অভিজাতদের মধ্যে আবার অনেক ভাগাভাগি ছিল। সামান্য কিছু হিন্দু (প্রধানতঃ রাজপুত) অভিজাত দলে স্থান পেয়েছিল। মনসবদারীর উঁচু স্তরে এদের দেখা যেত। কিন্তু আমীর ওমরাহের দল ছিল প্রধানতঃ বিদেশী। আর এদেশের কল্যাণ সম্পর্কে তাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। বাদশাহেরা যখন বিরাট ব্যক্তি, তখন এই বিদেশী অভিজাতেরা মোটের উপর যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা দেখিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু যখন বাদশাহেরা অপদার্থ প্রতিপন্ন হল, তখন স্বদেশী ও বিদেশী নির্বিশেষে অভিজাতেরা স্বার্থসিদ্ধির প্রতিযোগিতায় নামল। মুঘল দরবারে অভিজাতদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মুঘল শাসনের কাঠামোকে নড়বড়ে করে দিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের অগ্রগতির যুগে সৈন্যবাহিনীর কৃতিত্ব ছিল অসামান্য। আওরঙ্গজেব পর্যন্ত বাদশাহগণ যেমন যুদ্ধ বিদ্যায় হীন ছিলেন না, তেমন যোদ্ধাদেরও শৃঙ্খলা ও সংগঠন ছিল চমৎকার। কিন্তু সাম্রাজ্যের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনীতে এল বিশৃঙ্খলা, বিলাসিতা ও অকর্মণ্যতা।

এর পর অবশ্য অন্ধ ধর্মাবেগে আওরঙ্গজেব যে নীতি অনুসরণ করেন তার ফলে দেশের অধিকাংশ অধিবাসী মুঘল শাসনের প্রতি আনুগত্য হারিয়ে শত্রুতাই বোধ করতে লাগল। হিন্দুমনে যে আঘাত আওরঙ্গজেব হেনেছিলেন তারই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রাজপুত, শিখ, জাঠ এবং মারাঠাদের অভ্যুত্থান ঘটল। হিন্দুরাজাদের প্রতি তার বিসদৃশ ব্যবহার মুঘল সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছিল। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য কার্যতঃ ছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এরূপ রাষ্ট্রের নীতি ছিল যে তারা কারও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেবেন না। এছাড়া বহুদিন থেকে মেনে চলা সামাজিক প্রথাগুলি অব্যাহত ছিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছে আর সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পদগুলিতে কারও একচেটিয়া ছিল না। যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির ঐসব পদ পেতে কোন বাধা থাকত না। এই উদার রাষ্ট্রনীতি মুঘল ও রাজপুত জাতির সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছিল। জিজিয়া কর প্রবর্তন, উত্তরভারতের কয়েকটি মন্দির ধ্বংস এবং হিন্দু প্রজাদের প্রতি 'কিছু বিধিনিষেধ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আওরঙ্গজেব এতদিনের অনুসৃত উদার রাষ্ট্রনীতিকে পাল্টে দিতে প্রয়াসী হন। এইভাবে

তিনি হিন্দুসমাজের আস্থা হারিয়ে তৎকালীন সমাজে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সঞ্চার করেন। ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর মধ্যে একটি ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল।

শাহজাহানের শাসনকাল থেকেই সাম্রাজ্যের পতনের বীজ রোপিত হয়। শাহ-জাহানের আড়ম্বরপ্রিয়তা, বিলাস-ব্যসন ও স্থাপত্য-প্রীতি মুঘল রাজকোষের উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ছিল সীমাহীন। এই দারিদ্র্য সাম্রাজ্যের বাহ্যিক ঐশ্বর্যের আড়ালে চাপা পড়ে যায়।

মুঘল রাজবংশের শক্তিধর সম্রাটদের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন আওরঙ্গজেব। তাঁর গোঁড়া ধর্মান্ধ ও বৈষম্যমূলক নীতি সাম্রাজ্যের জাতীয় ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেয়। যে রাজপুত শক্তির সহায়তায় আকবর মুঘল শক্তিকে সুদৃঢ় করেছিলেন, সেই রাজপুতগণই আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আকবরের সময়কার বন্ধু হল আওরঙ্গজেবের সময়কার শত্রু। এছাড়া শিখ, জাঠ, বুন্দেলাগণও বিদ্রোহে বিদ্রোহে সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করে, আঘাতে আঘাতে সাম্রাজ্যের দেহকে জর্জরিত করে তোলে।

দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে তিনি বীজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করেন। এরপর তিনি মারাঠা শক্তির মুখোমুখি হলেন। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও অর্থাভাব দেখা দিতে থাকে। আচার্য যদুনাথ সরকার আওরঙ্গজেবের এই দাক্ষিণাত্য নীতিকে তার পতনের পিছনে মারাত্মক ক্ষতরূপে ক্রিয়াশীল ছিল বলে অভিহিত করেছেন। আওরঙ্গজেব যদি দমনমূলক আচরণের পরিবর্তে মারাঠাদের স্বায়ত্বশাসন ও অন্যান্য অধিকার দিতেন তাহলে হয়ত শিবাজীর নেতৃত্বে মুঘল সাম্রাজ্যের উপর মারাঠা বাহিনীর বারংবার আঘাত হানবার প্রয়োজনই হত না।

দীর্ঘ ২০ বছর সম্রাটের দাক্ষিণাত্যে থাকার ফলে দিল্লীতে তাঁর অনুপস্থিতি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে শিথিল করে তোলে। এই দুর্বলতার সুযোগে সামন্ততান্ত্রিক স্বর্ণলতা তথা পরগাছা দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে। তাঁদের বসন-ব্যসন ও যথেচ্ছাচার সাম্রাজ্যের শক্তিকে দিয়েছিল প্রায় নিঃশেষ করে। আওরঙ্গজেবের জীবদ্দশাতেই রাজকোষে অর্থাভাব দেখা দেয়। এমনকি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দুর্গগুলি মেরামত করার অর্থও পাওয়া যেত না।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কট সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে টলিয়ে দেয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল যে ভূমিরাজস্ব ছিল মুঘল রাজকোষের প্রধান অবলম্বন, তা' জায়গিরদারদের দ্বারা ঠিকমত আদায় হত না। মুঘল আমলাদের মধ্যে যাদের বেতনের পরিবর্তে কোন অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হত তাদের বলা হত জায়গিরদার। জায়গির থেকে পাওয়া রাজস্বের পাঁচভাগের চারভাগই তাঁরা পেতেন। এছাড়া দক্ষিণাত্যের জায়গিরগুলিতে মারাঠা হামলার জন্যে রাজস্ব আরও অনেক কমে যায়। রাজস্বের সিংহভাগ জায়গিরদারগণ নিজেদের জন্য খরচের পর রাজস্ব থেকে মোট আয়ের সামান্য অংশই মাত্র রাজকোষে জমা হত।

সুতরাং নানাভাবে আওরঙ্গজেবের দীর্ঘস্থায়ী ও দৃঢ় শাসনকালেই সাম্রাজ্যের ঐক্য ও স্থায়িত্বের ভিত্তি কেঁপে উঠছিল। তথাপি আওরঙ্গজেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন রোধ করেছিলেন। কিন্তু অমিতাচার ও দুর্নীতি

থেকে মুক্ত তাঁর ব্যক্তিগত চারিত্রিক দৃঢ়তা যতই থাকুক না কেন, তার অন্ধ ধর্মীর নীতি ও উদারতার অভাব দীর্ঘ শাসনকালকে একটি 'মহান ব্যর্থতায়' পরিণত করেছে।

মুঘল দরবারে অভিজাত বা আমীর ও ওমরাহদের প্রভাব বরাবরই ছিল। কিন্তু আওরঙ্গজেব পর্যন্ত শক্তিমান মুঘল সম্রাটগণ আমীর ও ওমরাহদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন। সাম্রাজ্যের স্বার্থে, কখনও নিজেদের স্বার্থে আমীর ও ওমরাহদের ক্ষমতা বাদশাহগণ সীমিত রাখতেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাদশাহ যখন অপদার্থ তখন আমীর ওমরাহদের মধ্যে পূর্বতন সম্পর্কে বিরাট ফাটল ধরে। এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ পরবর্তী সম্রাটদের দুর্বলতা। এছাড়া সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নানা বিশৃঙ্খলা তাঁদের ক্ষমতা লাভের উচ্চাকাঙ্খায় ইন্ধন যোগায়। এখন থেকে তারা নিজেদের স্বার্থে নতুন নতুন সম্রাট সৃষ্টির খেলায় মেতে ওঠেন। আড়ালে চলত আমীর-ওমরাহদের দলীয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। মুঘল রাজসভায় এই কুচক্রী দল ছিল প্রধানতঃ তিনটি—(ক) ভারতীয় বা দীর্ঘকাল ভারতবাসী উচ্চপদস্থ মুসলমানগণ ছিলেন হিন্দুস্তানী দলভুক্ত, (খ) পারস্য থেকে আগত ইরানীদল এবং (গ) মধ্য এশিয়া থেকে আগত তুরানীদল ; তাঁরা সাম্রাজ্যের সংহতির বদলে স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপনে বেশী তৎপর হয় ; দৃষ্টান্তরূপে তুরানীদলের অন্যতম শক্তিশালী নেতা হিসাবে নিজাম-উল-মুল্‌কের নাম করা যেতে পারে।

মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ ঃ ১৭০৭ সনে সম্রাট আওরঙ্গজেব মারা গেলেন। মুঘল সাম্রাজ্য তখনই নিশ্চিহ্ন না হলেও দুরারোগ্য দুর্বলতার ফলে সাম্রাজ্যের গাঁথুনি গেল একেবারে নড়বড়ে হয়ে। জরাজীর্ণ, শক্তিহীন এবং জৌলুসহীন মুঘল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

বাহাদুর শাহ ঃ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর তিন ছেলের মধ্যে লড়াইতে জয়লাভ করে "বাহাদুর শাহ" নাম নিয়ে মোয়াজ্জেম বসলেন সিংহাসনে (১৭০৭ সনে)। তিনি নিজে ছিলেন পণ্ডিত, বিচক্ষণ, কর্মদক্ষ এবং আচার ব্যবহারে ভদ্র। কিন্তু তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। আর চারপাশে ছিল শত্রুতা আর বিদ্রোহ। তাই নরম সুরে আপসের নীতিতে তিনি সাম্রাজ্য পরিচালনা করলেন।

কিন্তু নানাবিধ সমস্যার মধ্যে দোটানায় পড়ে তিনি অনেক সময়ই হলেন দ্বিধাগ্রস্ত। বুন্দেলখণ্ডের ছত্রশাল, জাট সর্দার চূড়ামণ এবং শিখ গুরু গোবিন্দ সিংহের সাথে তিনি আপস করলেন। কিন্তু পরবর্তী শিখ নেতা বন্দা বাহাদুরের সাথে বাধালেন বিবাদ। অম্বরের রাজা জয়সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর ভাই বিজয়সিংহকে বসাতে চাইলেন। মাড়ওয়ারের রাজা অজিত সিংহকে তিনি চাইছেন বশ্যতা স্বীকার করাতে। দু'টি কাজেই তিনি ব্যর্থ হলেন এবং আপস করলেন। কিন্তু আপস করা সত্ত্বেও মুঘল দরবারে উচ্চ পদ এবং মালব ও গুজরাটে সুবাদারির জন্যে তাঁদের দাবি অগ্রাহ্য করলেন। তেমনি দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসিত অঞ্চল থেকে মারাঠাদের সরদেশমুখী আদায় করতে দিলেন। কিন্তু চৌথ আদায় করতে দিলেন না। আবার মারাঠা রাজ্যের অধিকার নিয়ে শাহু এবং তারাবাঈয়ের মধ্যে লড়াইকে তিনি জিইয়ে রাখলেন।

এইসব দোদুল্যমান অবস্থার ফলে নিজের সিংহাসন বাঁচাবার জন্য তিনি অযাচিতভাবে

জায়গির দিয়েছেন। সরকারী কর্মকর্তাদের সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন। তার ফলে শাসন ব্যবস্থা হয়ে পড়লো আরও দুর্বল। তবুও মোটামুটি সফলতার সাথে কয়েক বছর সম্রাট থেকে তিনি ১৭১২ সনে মারা গেলেন।

জাহান্দার শাহঃ আবার শুরু হল সিংহাসনের জন্য গৃহযুদ্ধ। এখন থেকে রাজপুত্রদের তুলনায় আমীর-ওমরাহরাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এক একজন রাজপুত্রকে শিখণ্ডি দাঁড় করিয়ে এক একটি আমীরগোষ্ঠী লড়াই করতে লাগলেন। বিজয়ী দল নিজেদের মনোনীত রাজপুত্রকে পুতুলের মত সিংহাসনে বসিয়ে নিজেরাই হলেন শাসক। অসুবিধা হলে একজন পুতুল-সম্রাটকে সরিয়ে আর একজন পুতুল-সম্রাটকে বসালেন।

সবচেয়ে প্রভাবশালী আমীর জুলফিকার খানের সাহায্যে সিংহাসনে বসলেন জাহান্দার শাহ। জুলফিকার খান হলেন উজির। নিজেদের ক্ষমতাকে স্থায়ী করবার উদ্দেশ্যে এঁরা জিজিয়া কর তুলে দিলেন। জয়সিংহ এবং অজিত সিংহের দাবি মেনে নিয়ে তাঁদের সাথে আপস করলেন। শাহুকে সরদেশমুখীর সাথে চৌথ আদায়ের ক্ষমতা দিলেন। ছত্রশাল এবং চূড়ামণের সাথে বন্ধুত্বও রাখলেন। অথচ শিখদের সাথে শত্রুতা আগের মতই চললো।

মজার ব্যাপার এই যে জুলফিকার খানের ক্ষমতায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্দার শাহও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। কিন্তু ১৭১৩ সনে আগ্রার একটি যুদ্ধে নিজের ভাইপো ফররুখসিয়রের কাছে জাহান্দার শাহ নিজেই পরাজিত হলেন।

ফররুখসিয়ারঃ ফররুখয়িরকে সিংহাসন পেতে সাহায্য করেছিলেন দু'জন আমীর —আবদুল্লা খান এবং হোসেন আলি খান। এঁরা ছিলেন দুই ভাই। এই 'সৈয়দ ভাইয়েরাই' হলেন সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা। এঁরাও রাজপুত, মারাঠা এবং অজিত সিংহের সাথে মিত্রতা রক্ষা করলেন। শাহুকে চৌথ ও সরদেশমুখী তো দিলেনই তদুপরি তাঁর স্বরাজ্যও স্বীকার করে নিলেন। জিজিয়া এবং তীর্থকরও তুলে দিলেন।

কিন্তু সাম্রাজের মধ্যে যে ঘুণ ধরেছিল, তাকে দূর করবার ক্ষমতা এঁদের ছিল না। জমিদারদের বিদ্রোহ, চুরি ডাকাতি, অরাজকতা, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ঘুষ ও দুর্নীতির ফলে শাসন ব্যবস্থাই হয়ে পড়লো একেবারে পঙ্গু। এই অবস্থার সুযোগেই ফররুখসিয়রের কাছ থেকে ১৭১৭ সনে ইংরেজরা অনেক সুযোগ সুবিধার এক ফার্মান যোগাড় করে নিলেন। তা ছাড়া ফররুখসিয়র নিজেও ছিলেন ধূর্ত, কপট এবং হিংস্র। সৈয়দ ভাইদের সাথেও তাঁর মনোমালিন্য হল। তাঁরাই তাঁকে ১৭১৯ সনে সিংহানচ্যুত এবং হত্যা করলেন। একের পর এক দু'জন অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাবার পর তাঁরা ১৮ বৎসর বয়স্ক মহম্মদ শাহকে ১৭১৯ সনেই সিংহাসন দিলেন।

কিন্তু ততদিনে সৈয়দ ভাইদের বিরুদ্ধে অন্যান্য আমীরদের বেশ একটি শক্তিশালী দল তৈরী হয়ে গেছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ 'নিমক হারাম' সৈয়দদের সাজা দিতে চাইলেন। বাদশাহ মহম্মদ শাহও গোপনে এঁদের উস্কানি দিলেন। আমীরদের চক্রান্তে ১৭২০ সনে হোসেন আলি খান নিহত হলেন। আবদুল্লা খান আগ্রার কাছে যুদ্ধে পরাজিত হলেন। সৈয়দ ভাইদের শাসন শেষ হল।

সাম্রাজ্যের অধঃপতন : সৈয়দ ভাইদের পতন হল। কিন্তু মুঘল সম্রাটের অপশাসন দূর হল না। ১৭১৯ সন থেকে ১৭৪৮ সন পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর ধরে মহম্মদ শাহ সম্রাট রইলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের শক্তি গেল, গৌরব গেল, নীতিজ্ঞান গেল। ঘুষ আর দুর্নীতির টাকায় সম্রাটও ভাগ বসাতে লাগলেন। যাঁরা সৈয়দ ভাইদের সরিয়েছিলেন, সেই আমীরদের নেতা নিজাম-উল-মুল্‌ক হয়েছিলেন উজির। ক্ষমতাহীন সম্রাটের উজিরের পদ ত্যাগ করে তিনি ১৭২৪ সনে দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদ রাজ্যের পত্তন করলেন।

অন্যান্য রাজকর্মচারীরাও বসে রইলেন না। ভেঙ্গে পড়া সাম্রাজ্যে সম্রাটের বেনামে শাসন করতে গিয়ে নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনবার বদলে অনেকেই স্বাধীন রাজ্য গড়বার দিকে মন দিলেন। সৃষ্টি হল অযোধ্যা আর বাঙ্গলায় স্বাধীন নবাবী। মারাঠাদের শক্তিও ক্রমেই বেড়ে চললো। শিখদের শত্রুতাও থামলো না। এই অবস্থাতেই এল পারস্য-সম্রাট নাদীর শাহের আক্রমণ।

নাদীর শাহের আক্রমণ : মেষপালক এক বালক নিজের কর্মক্ষমতা এবং বীরত্বের গুণে হয়ে উঠেছিলেন সামরিক নেতা। প্রতিবেশীদের আক্রমণ থেকে পারস্য সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে তিনিই ১৭৩৬ সনে বসলেন পারস্যের সিংহাসনে—সম্রাট নাদীর শাহ নামে। যুদ্ধ বিগ্রহে তাঁর রাজাকাষ শূন্য হয়ে গিয়েছিল। অর্থের সন্ধানে তিনি ভারতভূমিতে প্রবেশ করলেন ১৭৩৮ সনে। লাহোর দখল করে এগোলেন দিল্লীর দিকে। হৃতবল মহম্মদ শাহ সামান্য আঘাতেই ১৭৩৯ সনে পানিপথের অদূরে কর্ণালের যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত এবং বন্দী হলেন। বিজয়ী নাদীর শাহ এলেন দিল্লীতে। অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করলেন। ৭০ কোটি টাকা, কোহিনুর মণি এবং শাহজাহানের রত্নখচিত ময়ূর সিংহাসন নিয়ে গেলেন। এত সম্পদ তিনি নিলেন যে নিজের রাজ্যে পরবর্তী তিন বছরের জন্য প্রজাদের খাজনা মকুব করে দিলেন। সিন্ধু নদের পশ্চিমে সমস্ত অঞ্চল বর্তমান আফগানিস্তান পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ রেহাই পেলেন। তারপর মারা গেলেন ১৭৪৮ সনে।

নাদির শাহর আক্রমণের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের দৈন্যদশা পুরোপুরি প্রকাশ হয়ে পড়লো। এর ফলে দিল্লীর সিংহাসনের দিকে মারাঠাদের নজর পড়লো। এই আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যের যে আর্থিক ও সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হয় তা থেকে উৎসাহ সঞ্চয় করে এতদিন মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে যাঁরা বাণিজ্য করছিলেন, সে সব বিদেশী বণিকদের মনেও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা জাগলো। আর মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের উপর গড়ে ওঠা খণ্ড রাজ্যগুলি শক্তিশালী ও স্বাধীন হয়ে উঠলো।

২। (ক) মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের উপর খণ্ড খণ্ড রাজ্য—

মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর কয়েকটি স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন আঞ্চলিক রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। এগুলি ছিল বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, জাঠ, শিখ, মহীশূর, রাজপুত এবং মারাঠা রাজ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই শক্তিগুলি ভারতে বৃটিশের সার্বভৌম শক্তি বিস্তাররোধে চেষ্টা চালিয়েছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে কোন কোনটি

মুঘল সুবাদারদের কেন্দ্রীয় শাসন উপেক্ষা করে স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল। অপরগুলি ছিল মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে সৃষ্ট। কয়েকটি রাজপুত রাজ্য এবং মারাঠা রাজ্য অবশ্য আগে থেকেই ছিল কিন্তু এখন এগুলো হল অনেক বেশী শক্তিশালী।

মুঘল শক্তির দুর্বলতার সুযোগে প্রধান প্রধান রাজপুত রাজ্যগুলি নিজেদের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকে। এছাড়া সাম্রাজ্যের অন্যত্রও নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করে। মুঘল সম্রাট ফাররুকসিয়ার ও মহম্মদ শাহের আমলে অম্বর ও মাড়োয়ারের দুই রাজা আগ্রা, গুজরাট ও মালবের মতন প্রধান প্রধান প্রদেশে সুবাদার বা গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন। রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে সংহতির অভাব থাকায় বড় রাজ্য ক্ষুদ্র রাজ্য-গুলিকে গ্রাস করে ফেলত। মুঘল সাম্রাজ্যের-ই মত বড় বড় রাজপুত রাজ্যগুলিতে গৃহযুদ্ধ ও কলহ বিবাদ লেগেই থাকত। এই সব রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা মুঘল দরবারেরই মত দেখা যেত। সাধারণ প্রজার উপর শোষণও চলত অবাধে। কেবল অম্বরের সোয়াই জয়সিংহ (১৬৮১-১৭৪৩) ছিলেন শিল্প, স্থাপত্য, ও বিজ্ঞান চর্চায় স্বনামধন্য। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট কূটনীতিজ্ঞ, আইন প্রণেতা ও সংস্কারক। তবে সবগুন ছাপিয়ে তার বিজ্ঞানমুখী জ্যোতির্বিদ চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি জাঠ অধিকৃত ভূখণ্ড ছিনিয়ে নিয়ে বর্তমান জয়পুর শহরের পত্তন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে মানমন্দির স্থাপন করেন।

জাঠগণ—কৃষিজীবি জাঠদের বাসস্থান ছিল দিল্লী, আগ্রা ও মথুরা অঞ্চলে। মুঘল শাসনকর্তাদের অত্যাচারে মথুরা অঞ্চলের জাঠগণ বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয় (১৬৭৯)। প্রায় দশ বছর পর তারা আর একবার বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ সাময়িকভাবে দমিত হলেও এই অঞ্চলের অবস্থা অশান্তই থেকে গিয়েছিল। আওঙ্গজেবের মৃত্যুর পর জাঠগণ দিল্লীর চারদিকে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেয়। ভরতপুরের জাঠ রাজ্যটি চূড়ামণ এবং বদনসিংহের পরিচালনায় বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা ছিলেন সুরজমল (১৭৫৬-৬৩)। তাঁর রাজত্বকালেই জাঠশক্তি গৌরবের চরম সীমায় পৌঁছেছিল। তিনি অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক, রাজনীতিজ্ঞ ও নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। পূর্বে গঙ্গা ও দক্ষিণে চম্বল নদী, পশ্চিমে আগ্রা ও উত্তরে দিল্লী প্রদেশের অন্তর্বর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর জাঠ রাজ্যের পতন শুরু হয়। রাজ্যটি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ছোট ছোট জমিদারদের অধীনে চলে গিয়েছিল।

বাংলা—ভারতের পূর্ব প্রান্তে মুর্শিদকুলী খাঁন ১৭০০ সন থেকেই দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে কার্যতঃ বাংলার সুবাকে স্বাধীন করে ফেলেছিলেন। প্রথমে বাংলা সুবার দেওয়ান এবং তারও বেশ কিছু পরে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার সুবাদার হন। নিয়মিতভাবে সম্রাটকে নজরানা পাঠালেও কার্যত তিনি ছিলেন স্বাধীন। তার আমলে জমিদারশ্রেণীর বিদ্রোহ থেকে বাংলা প্রদেশ প্রায় মুক্ত হয়। ১৭২৭ সনে তার মৃত্যু হলে তার জামাতা সুজাউদ্দিন নবাব হন। এরপর ১৭৩৯ সনে তিনি মারা গেলে তার পুত্র সরফরাজ খানকে গিরিয়ার যুদ্ধে হত্যা করে আলিবর্দী খান বাংলার নবাব হন। এই তিনজন নবাবের শাসনকালে বাংলার শাসন ব্যবস্থা ছিল শৃঙ্খলাপূর্ণ। ফলে দেশের

শিল্প বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়েছিল। মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব নির্ধারণের জন্য নতুন করে জমির বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন (ইজারাদারী)। কৃষকদের দুঃসময়ে তিনি তাদের কৃষি ঋণ (তাক্কাভি) দেওয়ার ব্যবস্থা করায় কৃষকেরা সময়মত খাজনা পরিশোধ করার সময় পেত। বাংলা সরকারের রাজকোষের আমদানী বৃদ্ধি হলেও তার ইজারাদারী প্রথা কৃষকদের পক্ষে বেশ দুঃসহ হয়ে পড়ে। মুর্শিদকুলী, সুজাউদ্দিন ও আলিবর্দী এই তিনজন নবাবই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের উপর গুরুত্ব দিতেন। আলিবর্দী থেকেই প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাবী স্বাধীন নবাবীতে পরিণত হয়।

এইসব শাসকরা নামমাত্র দিল্লীর বাদশাহের সার্বভৌমত্ব মানলেও প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই স্বাধীন ছিলেন। নিজেদের শক্তিকে সংহত করবার জন্য তাঁরা শাসনের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের সমানাধিকারও দিয়েছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উন্নত করে প্রগতিশীল রাষ্ট্র তৈরীর উদ্যোগ কেউ নিতে পারেন নি। তাই বিদেশীদের উন্নত সামরিক শক্তি, কূটকৌশল এবং অর্থনৈতিক শক্তির কাছে সকলেই পরাজিত হয়েছিল। দিল্লীর মসনদ দখল করবার মত শক্তি এদের কারও ছিল না। সেই সম্ভাবনা ছিল একমাত্র মারাঠাদের।

হায়দ্রাবাদ—নিজাম-উল-মুল্‌ক আসফজা (১৭২৪) হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী যুগে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট অভিজাত ওমরাহ। তিনি দাক্ষিণাত্যে রাজপ্রতিনিধিরূপে তার প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন (১৭২০-২২)। তারপর দু'বছর পর্যন্ত তিনি মুঘল দরবারের উজির পদের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সম্রাট মহম্মদ শাহের ব্যবহারে খুব বিরক্ত হয়ে উজির পদ ত্যাগ করেন এবং দাক্ষিণাত্যে ফিরে গিয়ে হায়দ্রাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং দৃঢ়ভাবে রাজ্য শাসন করেন। যদিও প্রকাশ্যে তিনি তাঁর রাজ্যকে স্বাধীনরূপে ঘোষণা করেন নি কিন্তু কার্যত তিনি স্বাধীন শাসক হিসাবেই রাজত্ব চালিয়েছেন। দিল্লীর নির্দেশের অপেক্ষা না করেই তিনি যুদ্ধ বা সন্ধি স্থাপন করতেন। হায়দ্রাবাদ রাজ্য যেমন দিল্লীকে অগ্রাহ্য করত, তেমনি নিজামের অধীন কর্ণাটকে নবাব সাদাউল্লা খানও নিজামকে গ্রাহ্য করতেন না। তিনি হিন্দুদের প্রতি ছিলেন উদার। তাঁর দেওয়ান ছিলেন পুরানচাঁদ নামে একজন হিন্দু। তিনি সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর হায়দ্রাবাদ রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এরপর তাঁর গদি নিয়েও শুরু হয় গৃহযুদ্ধ।

মহীশূর—হায়দ্রাবাদের পরই দাক্ষিণাত্যে যে রাজ্য মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটি ছিল মহীশূর। বিজয়নগরের ধ্বংসের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই রাজ্যটি। হায়দর আলি নামে এক কৃতী সৈনিকের উত্থানের সঙ্গে মহীশূরের গুরুত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ে। হায়দার আলির পিতা ফতে মহম্মদ ছিলেন এই রাজ্যের একজন সামান্য সিপাহীমাত্র। তাঁর সুযোগ্য পুত্র হায়দার আলি দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধে যোগ্যতা দেখিয়ে ডিণ্ডিগলের ফৌজদার ও পরে মারাঠাদের প্রতিহত করে মহীশূরের সেনাপতির পদ লাভ করেন। তারপর মহীশূর রাজকে পদচ্যুত করে তিনি সিংহাসন অধিকার করেন (১৭৬১)

সন)। পাশ্চাত্য দেশের রণনীতির কৌশলগুলি আয়ত্ব করে তিনি নিজের সৈন্যবাহিনীকে সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। ফরাসী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ডিণ্ডিগলে একটি আধুনিক অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে নাঞ্জরাজকে পরাজিত করে তিনি মহীশূর রাজ্যের কর্তৃত্ব লাভ করেন। বিদ্রোহী পলিগার (জমিদার) দের সায়েস্তা করে তিনি বিদনুর, সুণ্ডা, সেরা, কানাড়া ও মালাবার অঞ্চল জয় করেন। তিনি যখন মহীশূরের শাসন কর্তৃত্ব হাতে পান তখন মহীশূর ছিল একটি কলহ-পূর্ণ দুর্বল রাজ্য। অল্পকালের মধ্যেই হায়দার আলি মহীশূরকে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। হায়দার আলি পরধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর প্রধান দেওয়ান ও অন্যান্য বহু রাজকর্মচারী ছিলেন হিন্দুধর্মাবলম্বী।

অযোধ্যা—উত্তর ভারতে অযোধ্যা স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। ১৭২২ সনে সদৎখান এখানে সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাকে অযোধ্যার নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে। তিনি ছিলেন সাহসী, উদ্যোগী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। এই সময়ে অযোধ্যার সর্বত্র জমিদারদের বিদ্রোহ তিনি দমন করতে সমর্থ হন। তিনি জমিদারদের জব্দ করে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় বাড়াতে পেরেছিলেন। তার ভ্রাতুষ্পুত্র সফদরজং কিছুকাল দিল্লীতে উজির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, আবার একই সঙ্গে অযোধ্যার সুবাদার ছিলেন। পুত্র সুজা-উদ্-দৌলা যখন নবাব এবং তার পরে ইংরাজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে অযোধ্যার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সমগ্র দেশের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান নিয়ে ছিল। বাংলার নবাবদের মতই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিনি কোন পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন না। সাদাৎ খান-এর শাসন ব্যবস্থাও ছিল বেশ দক্ষ। তার ভূমি বন্দোবস্ত ও রাজস্ব ব্যবস্থা বেশ কার্যকরী হয়েছিল। ১৭৫৪ সনে সফদরজং-এর মৃত্যু হয়। ১৭৭৫ সনের পর লক্ষ্ণৌ অযোধ্যার নবাবদের রাজধানী হয়। কলা ও সাহিত্য চর্চায় হস্তশিল্পে ইহা দিল্লীর সমকক্ষ হয়ে ওঠে।

শিখ-শক্তির উত্থান—ভারতে আফগান শাসনের অবসানকালে সমাজ ও ধর্ম-জীবনে উদার সংস্কারের ফলে যে সব নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল শিখগণ তাঁদের অন্যতম। শিখ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নানক। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে নানক দেহত্যাগ করেন। নানকের দুই পুত্রের ধর্মে বিশেষ মতি ছিল না। এইজন্য দেহত্যাগের পূর্বে তিনি অঙ্গদ নামে তাঁর এক শিষ্যকে নিজ উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে যান। অঙ্গদ তাঁর গুরু নানকের মহান আদর্শকে অনুসরণ করে গিয়েছিলেন। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করার পূর্বে তিনি অমর দাস নামক একজন ভাল্লা ক্ষত্রীকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে অমরদাস মারা গেলে তাঁর জামাতা গুরু রামদাস শিখ সমাজের কর্ণধার হলেন। এই সময়ে দিল্লীর বাদশাহ্ ছিলেন মহামতি আকবর। তিনি গুরু রামদাসকে অতীব সমীহ ও শ্রদ্ধা করতেন। আকবর রামদাসকে একখণ্ড ভূমি দান করেন। এই ভূমিখণ্ডেই রামদাস অমৃতসরে বিরাট পুকুর খনন করিয়ে হর-মন্দির নামে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এই পুকুর ও মন্দিরের পাশে একটি নগরী গড়ে উঠে ও মন্দিরটি ক্রমে ক্রমে শিখদের ধর্মজীবনের প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৫৮১ খৃষ্টাব্দে গুরু রামদাস পরলোক গমন করেন ও তাঁর পুত্র অর্জুন সিংহ গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। গুরু অর্জুনের পর থেকেই শিখ সম্প্রদায়ের গুরুগণ বংশপরম্পরায় গুরুপদে অধিষ্ঠিত হতে লাগলেন ও তাঁরা দৈবশক্তি ও রাজকীয় মর্যাদার অধিকারী বলে বিবেচিত হলেন। অর্জুন সিংহের গুরুপদে আরোহণ শিখ জাতির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শিখ-গুরুগণের মধ্যে তিনিই প্রথম উত্তর ভারতের রাজনৈতিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিখ অধিবাসীদের কাছ থেকে ধর্মসমাজে দেয় চাঁদা ও দান তিনি নিয়মিত সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। পরিষদ ও মন্ত্রীবর্গ দ্বারা সর্বদাই পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি এক ধর্মীয় নরপতির মহিমায় শিখ-সমাজে শোভা পেতে লাগলেন। অর্জুন সিংহ শিখ-সম্প্রদায়কে সংগঠিত ও শক্তিশালী করেছিলেন। তিনি শিখদের পবিত্র আদিগ্রন্থ সংযোজিত করেন। অর্জুন সিংহের জীবদ্দশায় মুঘল বাদশাহদের সহিত শিখ জাতির বিরোধের সূত্রপাত হয়। শাহ্‌জাদা খসরু বিদ্রোহ ঘোষণা করলে গুরু অর্জুন অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবেই তাঁর প্রতি সমবেদনা পোষণ করেছিলেন। খসরু ছিলেন সৎ, উদার ও পরধর্মসহিষ্ণু। কিন্তু খসরুর পতন হলে বাদশাহের রোষ সমগ্র শিখ জাতির উপর এসে পড়ল। অর্জুন সিংহের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল ও জাহাঙ্গীর তাঁকে কারাগারে বন্দী করে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলেন। গুরু অর্জুনের মৃত্যুতে শিখজাতি ক্ষুব্ধ হয়ে মুঘলদের শত্রুতে পরিণত হল।

গুরু অর্জুনের পর হরগোবিন্দ সিংহ গুরুপদে অধিষ্ঠিত হলেন। হরগোবিন্দ সিংহ সামরিক মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিখগণকে একটি সমরকুশল সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। প্রথম জীবনে তিনি মুঘল-শাসনের প্রতি বিরোধ না দেখিয়ে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অধীনে কার্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু পরলোকগত গুরু অর্জুনের উপর ন্যস্ত শাস্তিমূলক কর পরিশোধ করতে অস্বীকার করলে তাঁকে প্রায় বারো বৎসর কাল গোয়ালিয়র দুর্গে মুঘলের বন্দী হয়ে থাকতে হয়। পরবর্তী বাদশাহ শাহজাহান হরগোবিন্দকে পুনরায় কার্যভার প্রদান করেন। কিন্তু গুরু হরগোবিন্দ অচিরেই মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অমৃতসরের কাছে একটি স্থানে মুঘলবাহিনীকে পরাজিত করলেন। এই জয়ের গৌরব বেশীদিন রইল না। মুঘল আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে হরগোবিন্দ সিংহকে কাশ্মীরের কিরাতপুরে আশ্রয় নিতে হল। এখানে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পৌত্র হরিরাইকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে পরলোক গমন করেন। গুরু হরগোবিন্দের জীবিতকালে শিখগণ সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পেল। সামরিক ও রাজস্ব সংস্কার করে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি পৃথক শিখ রাজ্যের সূচনা করলেন। হরগোবিন্দের পরবর্তী দুজন শিখগুরু হরিরাই ও হরকিষণের সময় কালে শিখজাতির ইতিহাসে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।

গুরু হরকিষণের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনে কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হয়। অবশেষে শিখগণের অধিকাংশই গুরু হরগোবিন্দের দ্বিতীয় পুত্রকে গুরুপদে নির্বাচিত করলেন। শিখদের এই নবম গুরু ছিলেন তেগ বাহাদুর। তিনি কিরাতপুরের কাছে আনন্দপুরে তাঁর আবাস স্থানান্তর করেন। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা রাম সিংহের

সঙ্গে আসাম-যুদ্ধে যোগদান করেন। তাঁর অনুচরগণ তাকে 'সাচা পাদশাহ্' বা খাঁটী বাদশাহ নামে অভিহিত করতেন। গুরু তেগ বাহাদুরের সহিত অচিরেই বাদশাহ আওরঙ্গজেবের বিবাদ শুরু হল। তেগ বাহাদুর শিখ-সম্প্রদায়ের উপর বাদশাহের হামলার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং কাশ্মীরের হিন্দুগণকে তিনি বাদশাহের নীতির বিরোধিতা করতে উৎসাহ দান করেছিলেন। এতে বাদশাহ খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে দিল্লীর দরবারে নিয়ে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু শিখ-গুরু তা'তে অস্বীকার করলে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে নানা নির্যাতনের পর তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

গুরু তেগ বাহাদুরের আত্মদান শিখ-সম্প্রদায়কে আরও মুঘল-বিদ্বেষী করে তুলল। তেগ বাহাদুরের পুত্র, শেষ এবং দশম গুরু, গোবিন্দ সিংহ পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হলেন। তিনি প্রথমেই সামরিক শক্তি বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করলেন। শক্তিশালী মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধনের জন্য গোবিন্দ শিখ জাতিকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি শিখ-সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের নিগূঢ়তার চিহ্ন স্বরূপ 'খালসা' গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সম্প্রদায় তামাক সেবন বা গ্রহণ বর্জন করল এবং দীর্ঘকেশ, কাচ্চা (পরিধেয়), কঙ্কণ, কৃপাণ ও কাঙ্গা (চিরুণী) দেহে ধারণ করতে লাগলেন। তিনি দশম গুরুর গ্রন্থ সংযোজিত করেন। গুরু গোবিন্দ শুধুমাত্র যে সৈন্যবাহিনী গঠন বা 'খালসা' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা নয়। তিনি কয়েকটি পার্বত্য দুর্গ নির্মাণ করান ও ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর পাঞ্জাবের কয়েকজন পার্বত্য নরপতি, মুঘল কর্মচারী ও মুসলমান-প্রধানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু সিরহিন্দের মুঘল-বাহিনীর কাছে গুরু গোবিন্দ পরাজিত হন। তাঁর দুই পুত্র সিরহিন্দের মুঘল ফৌজদারের কাছে অশেষ নির্যাতন ভোগের পর নিহত হন। গুরু গোবিন্দ পলাতকের জীবন যাপন করতে লাগলেন। অবশেষে বাদশাহ আওরঙ্গজেব জীবনের শেষপ্রান্তে এসে গুরু গোবিন্দকে সম্মানজনক ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাক্ষাৎ করবার নির্দেশ পাঠালেন। গুরু গোবিন্দ বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হলে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে পথিমধ্যে সম্রাটের মৃত্যু সংবাদ শুনলেন। কথিত আছে পরবর্তী বাদশাহ বাহাদুর শাহকে মুঘল সিংহাসন অধিকারে গুরু গোবিন্দ সাহায্য করেছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে বাহাদুর শাহের সঙ্গে থেকে তিনি যুদ্ধে বাদশাহের পক্ষে যোগদান করেন। কিন্তু ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে একজন উগ্র আফগান মুসলমানের হাতে তিনি নিহত হন।

(খ) মারাঠা শক্তির উত্থান ও পতন (১৭৬১ সন পর্যন্ত)

মারাঠা শক্তি: মারাঠা শক্তির উত্থান হয়েছিল শিবাজীর নেতৃত্বে। শিবাজীর বাবা ছিলেন বিজাপুরের সুলতানের অধীনে একজন সামন্ত জায়গিরদার। কিন্তু বিজাপুর বাহিনীকেই শিবাজী নানাভাবে গেরিলা কায়দায় নাজেহাল করেন। মাওলী নামক

পার্বত্য জাতির চাষীদের নিয়ে একটা ছোট কিন্তু সুদক্ষ সৈন্যদল গঠন করেন, তাঁর সুদক্ষ সৈন্যদল কয়েকটি দুর্গ দখল করেন। কয়েকটি দুর্গ তৈরীও করেন।

বিজাপুর সুলতান চাইলেন বাবাকে শাস্তি দিয়ে ছেলেকে জব্দ করতে। কিন্তু কিছুদিন চুপচাপ থেকে শিবাজী আবার হাঙ্গামা সুরু করেন। শিবাজীকে দমন করবার জন্য সুলতান পাঠালেন তাঁর সেনাপতি আফজল খানকে। কিন্তু আফজল খান নিজেই নিহত হলেন। আফজল খাঁর মৃত্যুতে শিবাজীর ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি কোলাপুর ও দক্ষিণ কোঙ্কন অধিকার করেন। এবার মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব এতদিন ভেবেছিলেন বিজাপুরের সুলতান একটু কাবু হলে তাঁরই সুবিধা হবে। কিন্তু এখন বুঝলেন যে শিবাজী আরও বড় হয়ে উঠলে তাঁরই ক্ষতি হবে। তাই তিনি সেনাপতি জয়সিংহকে পাঠালেন শিবাজীকে শায়েস্তা করতে। অবস্থা বুঝে শিবাজী সন্ধি করলেন এবং জয়সিংহের অনুরোধ ও আশ্বাসে গেলেন ঔরঙ্গজেবের দরবারে।

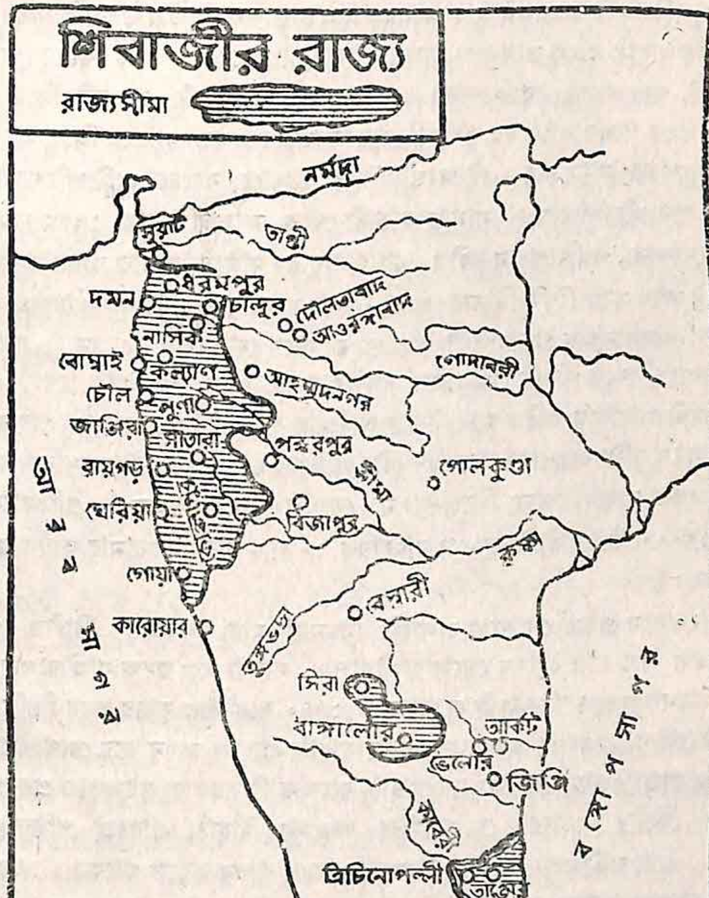


শিবাজী

কিন্তু সেখানে আপস হওয়ার বদলে বিবাদ আরও বেড়েই গেল। জয়সিংহের প্রতিশ্রুতি ভেঙে আওরঙ্গজেব শিবাজীকে বন্দী করলেন। শিবাজীও কৌশলে কারগার থেকে পালিয়ে এলেন। তারপর আর কোন আপস হয়নি। শিবাজী জয় করেছেন একের পর এক দুর্গ। গড়েছেন শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী। ১৬৭৪ সনে রায়গড়ে স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের সার্বভৌম রাজা হিসাবে সিংহাসনে বসলেন ছত্রপতি শিবাজী। অতঃপর তিনি কর্ণাটক আক্রমণ করেন এবং জিঞ্জি, ভেলোর এবং মহীশূরের কিছু অংশ জয় করে শিবাজী বিশাল এক স্বাধীন রাষ্ট্রের অধীশ্বর হলেন। তাঁর রাজ্য উত্তরে সুরাটের নিকটস্থ ধরমপুর থেকে দক্ষিণে কারওয়ার (কানাড়া), পূর্বে কলগানা থেকে কোলাপুর। পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পর্তুগীজ অধিকৃত সলসেটি, বেসিন, গোয়া, দমন প্রভৃতি বন্দরগুলো তাঁর শাসনাধীনে ছিল না। ১৬৮০ সনে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি এই রাজ্যকে সবদিকে শক্তিশালী করে গেছেন। আওরঙ্গজেবের শত চেষ্টাও এই রাজ্যের ক্ষতি করতে পারেনি।

মারাঠাদের অপরাজেয় সংগ্রাম ঃ শিবাজীর মৃত্যুর পর আওরঙ্গজের ভাবলেন এবার তাঁর কাজ সহজ হবে। নিজে তিনি ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে আসেন। কিন্তু তখন তাঁর লড়াই কোন একজন রাজার বিরুদ্ধে নয়, নবজাগ্রত মারাঠা জাতির বিরুদ্ধে। এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে শিবাজীর বড় ছেলে শম্ভুজী মুঘল সৈন্যের হাতে ১৬৮৯ সনে নিহত হন। তাঁর শিশুপুত্র শাহুকেও আওরঙ্গজেব বন্দী করে রাখেন। মারাঠাদের

এই দুঃসময়ে শম্ভুজীর ভাই রাজারাম নিলেন রাজ্যের শাসনভার। সান্তজি ঘোরপাড়ে এবং ধনাজি যাদবের মত দেশপ্রেমিক নায়কদের সাহায্যে তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু রাজারামও মারা গেলেন ১৭০০ সনে। তখন নিজ শিশুপুত্র তৃতীয়



শিবাজীকে সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর অভিভাবক হিসাবে রাজারামের স্ত্রী তারাবাঈ মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান।

মুঘল দরবারের নুতন নীতিঃ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সম্রাট বাহাদুর শাহ বুঝলেন যে যুদ্ধ করে মারাঠাদের কাবু করা যাবেনা। তিনি কূটকৌশলে তাঁদের জব্দ

করতে চাইলেন। শিবাজীর কারারুদ্ধ পৌত্র শাহুকে তিনি মুক্তি দিলেন, কিন্তু তাঁকে মারাঠাদের রাজা বলে স্বীকার করলেন না। অনেকদিন পর্যন্ত তারাবাঈ ছিলেন প্রকৃত নেত্রী। তাঁর চারপাশেও কিছু কিছু সর্দার জড়ো হয়েছিলেন। মারাঠা সিংহাসনে তাঁর ছেলের দাবি তিনি ছাড়লেন না। আবার শাহুও ছাড়লেন না তাঁর উত্তরাধিকারের দাবি। দুটি ভাগে মারাঠা রাজ্য ভাগ হয়ে গেল। কোহ্‌লাপুর থেকে শাসন করতে লাগলেন তারাবাঈ, আর সাতারা থেকে শাহু। দেশপ্রেমকে অনেকখানি জলাঞ্জলি দিয়ে মারাঠা সর্দাররা উভয় পক্ষের সাথে দর কষাকষি করে নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিতে লাগলেন।

পেশোয়া শাসন ঃ এই অবস্থায় শাহুর দরবারে সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হলেন বালাজী বিশ্বনাথ। সামান্য কর্মচারী থেকে ক্রমোন্নতি করে ১৭১৩ সনে তিনি হলেন পেশোয়া, অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী। কোহ্‌লাপুরের দক্ষিণে সামান্য অঞ্চল ছাড়া সমস্ত মহারাষ্ট্রে ক্রমে ক্রমে তিনি নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করলেন। দিল্লীর সম্রাটদের দুর্বলতা বুঝে তিনি সেখানকার প্রভাবশালী ওমরাহদের সাথে যোগাযোগ করলেন। জুলফিকার খানের কাজ থেকে তিনি আনলেন দাক্ষিণাত্যের মুঘল অঞ্চলগুলি থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার। সৈয়দ ভাইয়েরা যখন দিল্লীতে ক্ষমতায় এলেন তখন তাঁদের সাথে চুক্তি করে চৌথ ও সরদেশমুখীর অধিকার তো রাখলেনই, তদুপরি মারাঠাদের যে সব অঞ্চল মুঘলরা কেড়ে নিয়েছিলেন, সেগুলিও ফিরে পেলেন। প্রতিদানে অবশ্য তাঁকে ১৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং বাৎসরিক ১০ লক্ষ টাকা নজরানার অঙ্গীকার করতে হয়েছিল।

১৭২০ সনে প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ মারা গেলেন। দ্বিতীয় পেশোয়া হলেন তাঁর বিশ বছর বয়সের ছেলে বাজীরাও। সাহসী এবং সুদক্ষ বাজীরাও মুঘলদের বিরুদ্ধে অনেক খণ্ডযুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন। ১৭৪০ সনে তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি মালব, গুজরাট এবং বুন্দেলখণ্ডের এক অংশের উপর মারাঠা প্রাধান্য স্থাপন করে রেখে গেলেন।

কিন্তু রাজ্যবিস্তারের সাথে সাথে মারাঠা রাজ্যের ভিতরকার দুর্বলতাও প্রকাশ পেতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের চেয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মারাঠা সর্দাররাই শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। প্রায় স্বাধীনভাবেই তাঁরা নিজেদের অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। বস্তুতঃ মূল মারাঠা রাজ্যের বাইরে মারাঠা শক্তির প্রসার হয়েছে এইসব সর্দারদের চেষ্টাতেই। বহুসংখ্যক স্থানীয় সর্দার যাদের মধ্যে বরোদার গায়কোয়াড়, ইন্দোরের হোলকার, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া এবং নাগপুরের ভোঁসলেই হলেন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। পেশোয়া কিম্বা রাজার কাছে এঁদের আনুগত্য ছিল নাম মাত্র।

১৭৪০ সনে বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তৃতীয় পেশোয়া হলেন তাঁর ১৮ বছর বয়সের ছেলে বালাজী বাজীরাও। ১৭৩৯ সনে নাদির শাহের আক্রমণের সময় দিল্লীর দরবারের দেউলিয়া অবস্থা সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে পড়ে। মুঘলদের স্থান দখল করে মারাঠারাই সর্ব-ভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে, এই আকাঙ্খা দানা বাঁধে মারাঠাদের মনে। তাই মূল মারাঠাভূমি ছাপিয়ে দিকে দিকে বাহিনী ছড়িয়ে পড়ে।

বাঙ্গলাদেশে ক্রমাগত বর্গীর আক্রমণ হতে থাকে। পরিণামে ১৭৫১ সনে আলিবর্দি

খান মারাঠাদের হাতে ওড়িষ্যা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। অযোধ্যা এবং রোহিলাখণ্ডের উপর মারাঠাদের চাপ সৃষ্টি হয়, মহীশূর এবং দাক্ষিণাত্যের ছোটখাট রাজ্যগুলি মারাঠাদের কর দিতে বাধ্য হয়। হায়দারাবাদের নিজামও রাজ্যের এক বড় অংশ মারাঠাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। সর্বোপরি ১৭৫২ সনে মারাঠাবাহিনী দিল্লীতে পৌঁছে ইমাদ-উল-মুলক্‌কে উজিরের গদি পেতে সাহায্য করে। বস্তুতঃ দিল্লীর দরবার তখন মাঠারাদের হাতের মুঠোয়। পাঞ্জাব থেকেও আহমদশাহ আবদালীর প্রতিনিধিকে তাঁরা তাড়িয়ে দেন। এই অবস্থাতেই সৃষ্টি হল বৃহত্তর সংঘর্ষের পরিস্থিতি।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ : নাদির শাহ দিল্লী অধিকার করেও ছেড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেনাপতি আহমদ শাহ্ আবদালী আফগানিস্থানে রাজ্য গড়লেও মাঝে মাঝেই ভারতের মধ্যে হানা দিচ্ছিলেন। মৃতপ্রায় মুঘল সাম্রাজ্যের উপর আহমদ শাহের অধিকার থাকবে কিম্বা মারাঠাদের অধিকার কায়েম হবে—এই হলো প্রশ্ন।

মারাঠাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত অযোধ্যা এবং রোহিলাখণ্ডের সাথে বন্ধুত্ব করলেন আবদালী। কিন্তু শক্তি মদমত্ত মারাঠারা শিখ, জাট কিম্বা রাজপুত রাজাদের বন্ধুত্ব পেলেন না। ১৭৬১ সনের ১৪ই জানুয়ারী পাণিপথের প্রান্তরে আবদালীর বাহিনীর সাথে লড়াই হলো মিত্রহীন মারাঠা বাহিনীর। পেশোয়ার অল্পবয়সী ছেলে বিশ্বাস রাও এই যুদ্ধে নামেমাত্র সেনাপতি হলেও প্রকৃত সেনাপতি হলেন সদাশিব রাও। এই যুদ্ধই ভারতের ইতিহাসে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হিসেবে খ্যাত। চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলো মারাঠা বাহিনী। নূতন বাহিনী নিয়ে স্বয়ং পেশোয়া যাচ্ছিলেন পাণিপথের পথে। কিন্তু ততদিনে সব শেষ। তৃতীয় পেশোয়ার জীবনেরও হল শেষ। ১৭৬১ সনের জুন মাসে তিনিও মারা গেলেন।

পাণিপথে পরাজয়ের ফল : এই শোচনীয় পরাজয়ে সারা ভারতে সাম্রাজ্য গড়বার মাঠারা স্বপ্ন মুছে গেল। আঘাত সামলে নিয়ে তাঁরা আবার সৈন্যবাহিনী নিয়ে পৌঁছেছিলেন দিল্লীতে। কিন্তু তখন আর মুঘল নয়, আবদালী নয়, ভিন্নতর শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁদের। সেটি হল ইংরেজ শক্তি।

বস্তুতঃ পাণিপথে জয়লাভ করেও আহমদ শাহ্ এই জয়ের সুযোগ নিতে পারলেন না। মারাঠারাও পিছিয়ে এলেন। এই দুইয়ের মধ্যে কোন শক্তিই সারা ভারতে সাম্রাজ্য গড়তে পারল না, এই হল পাণিপথের সিদ্ধান্তটি। এই সিদ্ধান্তটি বুঝতে ভুল করলেন না ইংরেজরা। ততদিনে তাঁরা বাঙ্গলাদেশ ও মাদ্রাজ অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলেন। এবার সুরু হল উত্তর ভারতে অভিযান করে তাঁদের সারা ভারতের সাম্রাজ্য গড়বার পালা।

৩। ইউরোপীয় বাণিজ্যের ক্রমবৃদ্ধি এবং বণিক সংস্থাগুলির মধ্যে সংঘর্ষ

মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের উপর ইংরেজরা সাম্রাজ্য গড়তে আরম্ভ করলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। কিন্তু তার আগে দেড়শ বছর ধরে তারা এদেশে বাণিজ্য

করেছেন। মুঘল সাম্রাজ্যকে ক্ষয় পেতে দেখেছেন। অবস্থা অনুকূল ছিল বলেই শুধু ইংরেজ নয়, ফরাসীদের মনেও ভারতে সাম্রাজ্য গড়বার সাধ জেগেছিল। এদেরও আগে ইউরোপের পর্তুগীজ এবং ওলন্দাজ বণিকশক্তি ভারতে তাদের বাণিজ্যিক কার্যাবলী ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পারস্পরিক সংঘর্ষ বাধে। পর্তুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ছাড়াও ১৬১৬ সনে দিনেমাররা (ডেনমার্ক), বেলজিয়াম-এর অষ্টেণ্ড কোম্পানী বাণিজ্য করে। শেষ পর্যন্ত ওলন্দাজ-ইংরেজ আর ইংরেজ-ফরাসী সংঘর্ষই এদেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় তৈরী করে। অবশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে ইংরেজরাই জয়লাভ করেছেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে ইংরেজরাই জয়লাভ করেছেন।

বর্হিবাণিজ্যের প্রাচীন পথ ঃ প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সাথে বাইরের জগতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। ইউরোপের সাথেও বাণিজ্য চলতো কয়েকটি ভিন্ন পথে। (১) পশ্চিম ভারত থেকে পারস্য উপসাগর পেরিয়ে পণ্য নেওয়া হতো ইরানে। যেখান থেকে স্থলপথে ইরাক ও তুর্কিদেশ অতিক্রম করে পণ্য যেত ভূমধ্যসাগরের পারে। তারপর জাহাজ যেত ইতালীর ভেনিস্ ও জেনোয়া বন্দরে। (২) লোহিতসাগর বেয়ে পণ্য যেত মিশরের আলোকজান্দ্রিয়াণ। যেখান থেকে জাহাজ পৌঁছতো ভেনিস্ ও জেনোয়াতে। (৩) স্থলপথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ দিয়ে উটের বহর পাড়ি দিত মধ্য এশিয়ার প্রান্তর। পণ্য পৌঁছত রাশিয়ায় ; এমনকি বালটিক সাগর পর্যন্ত।

পারস্য উপসাগর এবং লোহিত সাগরের পথে যে বাণিজ্য হতো, তার সিংহভাগ ছিল আরবীয় ও ইতালীয় বণিকদের হাতে। ইতালীয় বণিকরা ইউরোপে প্রায় একচেটিয়া বাণিজ্যই করতেন। স্পেন এবং পর্তুগালের বণিকেরা এই বাণিজ্যের তেমন ভাগ পেতেন না বলে তাঁরা ভিন্ন পথে ভারতে আসবার চেষ্টা করতে থাকেন। এছাড়া তুর্কিরা এশিয়া মাইনর দখল করায় এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকে তাঁদের একাধিপত্য স্থাপিত হওয়ায় ইতালীয়দের পক্ষেও আর এই পথে বাণিজ্য করবার উপায় রইল না। মরিয়া হয়ে আটলান্টিক সাগরপার থেকে আফ্রিকা ঘুরে ভারতে আসবার পথ খোঁজা হতে থাকে। আটলান্টিক পারের দুটি দেশ—স্পেন এবং পর্তুগাল এই কাজে এগিয়ে এল।

ভাস্কো-দা-গামা ঃ পর্তুগাল থেকে আফ্রিকা মহাদেশ এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভাস্কো-দা-গামা ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছেন ১৪৯৮ সনে। নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার সময় যে পণ্য তিনি নিয়ে যান, তার দাম ছিল তাঁর সমুদ্র অভিযান ব্যয়ের ৬০ গুণ। বণিকদের লোভ হওয়াই তো স্বাভাবিক।

ভাস্কো-দা-গামার দেখানো পথে বাণিজ্য সুরু হওয়ার পরে পর্তুগীজদের শক্তি অনেক বাড়িয়ে তোলেন আলফন্সো দ্য-আলবুকার্ক। তিনি ১৫১০ সনে গোয়া দখল করেন। সুরাট অঞ্চলেও পর্তুগীজ একাধিপত্য স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে দমন, দিউ, কোচিন এবং পূর্ব ভারতে হুগলী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি কেন্দ্রেও তাঁদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। আলবুকার্কের চেষ্টায় সমগ্র আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলে পর্তুগীজ একাধিপত্য সৃষ্টি হয়। আরবীয় বণিকদের তাঁরা হটিয়ে দেন।

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে পর্তুগীজদের বাণিজ্যিক আধিপত্য অব্যাহত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ ও অন্যান্য বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এই আধিপত্য ক্রমশই কমতে থাকে। গোয়া, দমন, দিউ, নগরহার্ভেলি প্রভৃতি কয়েকটি জায়গা ছাড়া বাকি সব জায়গাই তাদের হস্তচ্যুত হয়। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিবর্তে জলদস্যুতা লুটপাট, দাস-ব্যবসা প্রভৃতি কাজে তারা লিপ্ত হয়। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সম্রাট শাজাহান বাংলার সুবাদার কাশিম খাঁকে বাংলায় তাদের ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। কাশিম খাঁ হুগলীতে পর্তুগীজদের দমন করেন এবং বাংলা থেকে কার্যতঃ তাদের তাড়িয়ে দেন। ভারতীয় জনসাধারণের কাছে পর্তুগীজরা প্রিয় হতে পারেননি। বণিকদের সাথে এসেছেন পাদরীরা। তাঁরা ধর্মপ্রচার করেছেন, স্কুল খুলেছেন। কিন্তু বাইবেলের বাণী সত্ত্বেও পর্তুগীজ বণিকরা বাণিজ্যের সাথে সাথে দস্যুবৃত্তিও করেছে। জলদস্যু হিসেবে এরা ছিল নৃশংস। কখনও কখনও সমুদ্র কিম্বা নদীতীরের গ্রামে ঢুকে সর্বস্ব লুট করে জাহাজ ভর্তি মানুষ নিয়ে দূর দেশে বিক্রি করেছে। তাই নিরীহ গৃহস্থরা সর্বদাই থাকতো বোম্বেটের ভয়ে ভীত।



ভাস্কো-দাগামা

ওলন্দাজ বণিকের দল ঃ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে চাকা ঘুরতে থাকে। মসলা, কাপড়, রেশম, সোনা, মুক্তো, ওষুধ, চীনেমাটির জিনিস ইত্যাদি যেসব মূল্যবান পণ্যের পর্তুগীজরা ব্যবসা করতেন, সেগুলি ওলন্দাজদের লোভও জাগিয়ে তুললো। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ নৌ-শক্তি হয়ে ওঠে খুবই প্রবল। ভারত মহাসাগর অঞ্চল থেকে তাঁরা পর্তুগীজদের হটিয়ে দেন। পশ্চিম সমুদ্রতীরে সুরাট, ব্রোচ, ক্যাম্বে, আহমদাবাদে, কেরালার কোচিন, মাদ্রাজের নাগপত্তমে, অন্ধ্রের মসলীপত্তমে, উত্তর প্রদেশের আগ্রাতে, বিহারের পাটনায় এবং বাংলা দেশের চঁচুড়াতে ওলন্দাজ কুঠি গড়ে ওঠে। ১৬৫৮ সনে তারা পর্তুগীজদের কাছ থেকে সিংহলও দখল করেন। ভারতবর্ষ থেকে ওলন্দাজ বণিকরা নিয়ে যান নীল, রেশম, সুতিকাপড়, সোডা, আফিম প্রভৃতি।

ভারতের বাজার থেকে পর্তুগীজদের হটিয়েও কিন্তু ওলন্দাজরা স্বস্তিতে থাকতে পারেননি। এবার তাঁদের লড়তে হল আরও শক্তিশালী প্রতিযোগী ইংরেজ বণিকদের সাথে।

ইংরেজদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীঃ স্পেনের নাবিকরা আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইংরেজ বণিকরাই আমেরিকায় বিরাট আকারের ব্যবসা করেন। সারা ষোড়শ শতাব্দী ধরে স্পেনীয়দের সাথে খণ্ডযুদ্ধের পরে ১৫৮৮ সনে ইংরেজরা স্পেনের নৌবাহিনী (স্প্যানিশ আর্মাডা) সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। আমেরিকার বাণিজ্যে ইংরাজদের প্রাধান্য হয়।

কিন্তু ইংরেজদের নজর কেবল আমেরিকাতেই ছিল না। ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনের দিকেও তাঁদের নজর ছিল। ১৫৯৯ সনে কিছু ইংরেজ বণিক গঠন করেন 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'। ১৬০০ সনের ৩১শে ডিসেম্বর ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ ঐ কোম্পানীকে ইংলণ্ডের তরফে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার দিয়ে একটি সনদ অনুমোদন করেন। কোম্পানীটি খুবই শক্তিশালী হয়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬০৮ সনে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি গড়তে চান। ক্যাপ্টেন হকিন্সকে পাঠানো হয় আগ্রাতে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে। হকিন্স প্রথমে কিছু আশা ভরসা পেলেও পর্তুগীজদের চক্রান্তে সেখান থেকে বিতাড়িত হন। ইংরেজরা বুঝলেন যে পর্তুগীজদের ঘায়েল করতে না পারলে ভারতে তাঁদের সুবিধে হবে না। ১৬১২ এবং ১৬১৪ সনে সুরাটের কাছে দুটি নৌযুদ্ধে ইংরেজরা পর্তুগীজদের হারিয়ে দেয়। বাদশার দরবারও আর ঝামেলা না করে পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি বাণিজ্য কেন্দ্র গড়তে ইংরেজদের অনুমতি দেন।

স্যার টমাস্ রোঃ এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আরও সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য ইংরেজ প্রতিনিধি স্যার টমাস্ রো ১৬১৫ সনে গেলেন বাদশাহী দরবারে। সাথে সাথে নিজেদের শক্তি দেখানোর উদ্দেশ্যে কোম্পানীর জাহাজগুলি সমুদ্রপথে মুঘল বণিক এবং মক্কা তীর্থযাত্রীদের নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে। অনুরোধ উপরোধের সাথে সাথে জুলুম ও ভয় দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করাই হল ইংরেজ কোম্পানীর নীতি। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় কুঠি বানিয়ে বাণিজ্য করবার এক বাদশাহী 'ফার্মান' আনলেন টমাস রো। পর্তুগীজরা আরও ক্ষেপে গেলেন। কিন্তু ১৬২০ সনে আরও একটি নৌ-যুদ্ধে ইংরেজরা পর্তুগীজ নৌশক্তিকে একেবারে পরাস্ত করে ফেললেন। ১৬৩০ সন নাগাদ পর্তুগীজদের কোন ক্ষমতাই আর রইল না। ইংরেজদের পথ থেকে একটি কাঁটা দূর হল।

ইংরেজ-ওলন্দাজ সংঘর্ষঃ ভারতের বাণিজ্যে ঢুকলেও ইংরেজ কোম্পানী কিন্তু সহজেই সুমাত্রা, যবদ্বীপ অঞ্চলের লাভজনক মশলার ব্যবসা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়নি। কিন্তু সেখানে জেঁকে বসেছিল ওলন্দাজ কোম্পানী। ১৬২৩, ১৬৫৪ এবং ১৬৬৭ সনে হল ইঙ্গ ওলন্দাজ যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা ওখান থেকে হাত গুটোতে বাধ্য হন। ঐ অঞ্চলে ওলন্দাজরা গড়ে তোলেন তাঁদের উপনিবেশ, আজ যার স্বাধীন নাম "ইন্দোনেশিয়া"। ইংরেজ ইতিমধ্যে ভারতে বেশ সুবিধে করে নিয়েছে। সুতরাং ভারতেই তৈরী হয় ইংরেজ

সাম্রাজ্য। এখানে ওলন্দাজদের কুঠিগুলি এবং কিছু কিছু বাণিজ্য তখনও টিকে থাকে। কিন্তু ভারতকে ইংরেজরা দখলে নেওয়ার পর ১৭৯৫ সন নাগাদ শেষ ওলন্দাজ কুঠির বিলোপ ঘটে।

ফরাসীদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী : পর্তুগীজ এবং ওলন্দাজদের ইংরেজরা হটিয়ে দিলেন কিন্তু নূতন এক বিপদ এল—ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এই কোম্পানীটি গঠিত হয় ১৬৬৪ সনে। ফরাসী সরকার এবং ফ্রান্সের বড় বড় ধনীদের সাহায্যপুষ্ট এই কোম্পানী খুব তাড়াতাড়ি ব্যবসা গুছিয়ে নেয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি ঘাঁটি এবং ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপেও ছিল তাঁদের অধিকার। আর ছিল সুরাট, পণ্ডিচেরী, মাহে, কারিকলে কুঠি। পণ্ডিচেরী ছিল বেশ সুরক্ষিত। বাংলাদেশে এদের প্রধান কেন্দ্র ছিল চন্দননগর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতে অনুকূল পরিবেশের সুযোগে এখানে আধিপত্য স্থাপনের জন্য ইংরেজ ও ফরাসী শক্তি পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় নামে। ১৭৪০ থেকে ১৭৬৩ সন পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে ইউরোপে এবং অন্যত্র যে যুদ্ধ চলেছিল, তারই এক পরিচ্ছেদ হল ভারতে ফরাসী-ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ

মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শেষদিন পর্যন্ত কোন বিদেশী কোম্পানী রাজনৈতিক অধিকার কায়েম করতে পারেনি। কিন্তু তার মৃত্যুর পরে রাজনৈতিক অরাজকতার সময়েই আসে সুযোগ। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট আঞ্চলিক রাজ্যের শাসকরা দেশপ্রেমের বদলে নিজেদের স্বার্থকেই তখন বড় করে দেখেছেন। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করেছেন। বিদেশীদের সাহায্য নিয়েছেন। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এইসব লড়াইয়ে কোন না কোন পক্ষে যোগ দিয়ে বিদেশীরা নিজেদের কাজ হাসিল করেছেন।

নাদীর শাহের ভারত আক্রমণের পরে অবস্থা হল আরও অনুকূল। মারাঠারা প্রায়ই হায়দরাবাদ আক্রমণ করতে থাকেন। ১৭৪৭ সনে নিজাম-উল-মুলক মারা যাওয়ার পর হায়দবারাদেও আসে রাজনৈতিক অস্থিরতা। আর কর্ণাটকে বাধে গৃহযুদ্ধ। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানী নিজ নিজ রাজনৈতিক আশা পূরণ করতে চায়।

করমণ্ডল উপকূলে ইংরাজদের প্রধান ঘাঁটি ছিল মাদ্রাজ, আর ফরাসীদের ছিল পণ্ডিচেরী : নৌশক্তি এবং বাণিজ্য বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষীয়দের এই বিদেশীরা নিষ্প্রভ করে রেখেছিল। ১৭৪০ সনে ইওরোপে যখন অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধ বাধল এবং ফ্রান্স প্রাশিয়ার পক্ষে আর ইংলণ্ড অস্ট্রিয়ার পক্ষে থাকায় উভয় শক্তিতে যখন বিরোধ তুঙ্গে উঠল, তখন এদেশেও তাদের যুদ্ধে নামা হল স্বাভাবিক। কর্ণাটকের পরিস্থিতি তাদের রাজ্য লিপ্সার আগুনে ইন্ধন দিয়েছিল বলে যুদ্ধ আরও অনিবার্য হয়ে উঠল।

প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ : ১৭৪২ সনে ইউরোপে যুদ্ধ বাধে। ইংরেজ ও ফরাসীদের কোম্পানী ভারতেও যুদ্ধে নামে। ১৭৪৫ সনে ইংরেজরা ফরাসীদের জাহাজ আটক করে

এবং পন্ডিচেরী অবরোধ করে। ফরাসী কোম্পানীর সুযোগ্য প্রধান দ্যুপ্লে পাল্টা আক্রমণ করে ১৭৪৬ সনে মাদ্রাজ দখল করেন। মাদ্রাজ ছিল কর্ণাটকের নবাবের এলাকায়। মাদ্রাজ রক্ষার জন্য ইংরেজরা তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করে। কিন্তু নবাবের ১০ হাজার সৈন্যের বাহিনী মাত্র ২৩০ জন ইউরোপীয় এবং ৭০০ জন ভারতীয় নিয়ে গড়া সুশিক্ষিত ফরাসী বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হয় ১৭৪৮ সনে। ভারতেও দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়। ইংরেজরা মাদ্রাজ ফেরত পান। কিন্তু কর্ণাটক যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত সাফল্যই দ্যুপ্লের মনে সাম্রাজ্য গড়বার বাসনা জাগিয়ে তোলে। ভারতীয় রাজাদের বিবাদে সুশিক্ষিত ফরাসী বাহিনী নিয়ে পক্ষাবলম্বন করলে বিজয়ীর কাছ থেকে জমি, অর্থ এবং বাণিজ্যের সুযোগ পাওয়া যাবে। ইংরেজদেরও কোণঠাসা করে তাড়ান যাবে।

কর্ণাটকের দ্বিতীয় যুদ্ধ ঃ ১৭৪৮ সনেই দ্যুপ্লের সুযোগ এল। নবাবী গদির দাবি নিয়ে কর্ণাটকের নবাব আনোয়ার উদ্দিনের সাথে বিবাদ হয় চন্দাসাহেবের। ১৭৪০ সনে মারাঠারা নবাব দোস্ত আলিকে পরাজিত ও হত্যা করে তাঁর জামাতা চন্দাসাহেবকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন। নিজাম ১৭৪৩ সনে আনোয়ার উদ্দিনকে ঐ শূন্য গদিতে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু মুক্তির পরে চন্দাসাহেব ঐ গদির দাবি তোলেন। অন্যদিকে হায়দরাবাদের নিজাম আসফজার মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে নাসিরজং এবং নাতি মুজফফর জংয়ের মধ্যেও গৃহযুদ্ধ বাধে। দুই দাবিদার চন্দাসাহেব এবং মুজফফরের সাথে দ্যুপ্লে করেন গোপন চুক্তি, সম্মিলিতভাবে তাঁরা আনোয়ার উদ্দিনকে হারিয়ে দেন। আনোয়ারের ছেলে



মহম্মদ আলি



দ্যুপ্লে

মহম্মদ আলি আশ্রয় নেন ত্রিচিনপল্লীতে। গদি পেয়ে চন্দাসাহেব ফরাসীদের দিলেন পণ্ডিচেরীর কাছে ৮০টি গ্রাম।

ইউরোপে তখন অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে একদিকে ফ্রান্স অপরদিকে ইংল্যান্ড প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রজোট গড়ে তোলে। ১৭৪০ থেকে ১৭৪৮ সন পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে। ১৭৪৮ সনের 'আই-লা-স্যাপ্‌ল'-এর সন্ধি দ্বারা সাময়িকভাবে শান্তি ফিরে এলেও মূল সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পূর্বে ছিল তা যুদ্ধের পরও না কমে আরও বেড়ে গেল। এই সকল কারণে ১৭৫৬ সনে এই দুই দেশ অর্থাৎ ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এবং তৎসহ তাদের নিজ নিজ সমর্থক দেশগুলির মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ 'সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩ সন) নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের প্রভাব ভারতবর্ষেও এসে পড়ে ; ফলে এই সময় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বাণিজ্যিক অধিকার নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়। ভারতে কর্ণাটক যুদ্ধ, পলাশীর যুদ্ধ, চন্দননগর ধ্বংস ইত্যাদি এই সময়কারই ঘটনা। ১৭৬৩ সনে প্যারিসের শান্তি চুক্তি দ্বারা সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড প্রাশিয়া জোট জয়লাভ করে পক্ষান্তরে ফ্রান্স অস্ট্রিয়া জোট পরাজিত হয়। ভারতের কুঠিগুলি ফরাসীরা ফিরে পায় তবে তাদের সামরিক ঘাঁটি গঠনের অধিকার বিলোপ করা হয়। ইউরোপে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ এবং সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রভাবে ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী বণিকদের মধ্যে যে সংঘর্ষ দেখা দেয় তারই চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতে ফরাসীদের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং ইংরেজদের ভারতে সাম্রাজ্য জয়ের পথ সুগম হয়।

এদিকে, হায়দরাবাদের লড়াইতেও নাসির জং পরাজিত হলেন। সুবাদারী পেয়ে নূতন নিজাম মুজফফর জং ফরাসীদের দিলেন অনেক জমি আর টাকা। কৃষ্ণা নদী থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হল ফরাসী প্রভাব। ফরাসী স্বার্থকে পাকা করবার জন্য সেনাপতি বুসিকে দুপ্লে হায়দরাবাদেই রাখলেন। মুজফফর জং নিহত হওয়ার পর কোন দেরী না করে সালাবৎ জংকে বুসি বসালেন গদিতে। কৃতজ্ঞতার প্রমাণ হিসেবে অন্ধ্রের চারটি জেলা নিয়ে গঠিত 'উত্তর সরকার' নামে পরিচিত বিরাট অঞ্চলটি তিনি ফরাসীদের দিলেন ; বস্তুত দক্ষিণ ভারতে তখন ফরাসীদের অবস্থা অনেকটা অনুকূলে আসে।

ইংরেজদের পাল্টা আক্রমণ ঃ ইংরেজরা প্রমাদ গুণলেন। ফরাসীদের বিরুদ্ধে কিছু করতে না পারলে তাঁদের ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার। তারা যোগাযোগ করলেন নাসির জং এবং মহম্মদ আলির সাথে। যথেষ্ট দূরদৃষ্টি এবং সাহস দেখিয়ে তরুণ ইংরেজ কর্মচারী রবার্ট ক্লাইভ অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে কর্ণাটকের রাজধানী আর্কট আক্রমণ করেন (১৭৫১ সনে)। আর্কট রক্ষার তাগিদে ফরাসীরা ও চন্দা সাহেব ত্রিচিনপল্লীর অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হলেন। এই প্রথম সংঘর্ষের পরে আরও কয়েকটি সংঘর্ষে ফরাসীরা পরাজিত হয়। দুপ্লে কোনভাবেই আর অবস্থা সামলাতে পারেন না। দুপ্লের কর্ণাটকে ফরাসী আধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। বেগতিক দেখে ফরাসী সরকার সন্ধি করেন এবং ইংরেজদের চাপে দ্যুপ্লেকেও ভারত থেকে সরিয়ে নেন (১৭৫৪ সন)।

কর্ণাটকের তৃতীয় যুদ্ধ ঃ এই সাময়িক শান্তি আবার ভাঙলো ১৭৫৬ সনে ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথেই। যুদ্ধের প্রথম দিকেই ইংরেজরা বাংলাদেশের চন্দননগরে ফরাসী কুঠি ও ঘাঁটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত

করে নিজেদের তাঁবেদার মীরজাফরকে বাঙ্গলার নবাবী গদিতে বসান। বাঙ্গলার অজস্র সম্পদও ইংরেজদের হাতে আসে। এর ফলে দক্ষিণ ভারতেও ফরাসীদের বিপর্যয় ঘটে। ফরাসী সরকার কাউণ্ট-দ্য-লালীর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী এবং নৌবহর ভারত মহাসাগরে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেটিও বিতাড়িত হয়। কর্ণাটকেও ফরাসীরা পরাজিত হন। নিজামের দরবারেও ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হয়। মসুলীপত্তম এবং উত্তর সরকার এবার আসে ইংরেজদের হাতে। পরিশেষে ১৭৬০ সনে বন্দিবাসের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি আয়ারকুটের হাতে লালী চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন।

১৭৬৩ সনে ইউরোপের প্যারিসে ইঙ্গ-ফরাসী সন্ধি হয়। ভারতের কুঠিগুলি ফরাসীরা ফিরে পেলেন। কিন্তু সেখানে কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রাখতে দেওয়া হল না। ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা নিশ্চিহ্ন হল।

কর্ণাটক যুদ্ধের ফলাফল ঃ কর্ণাটক যুদ্ধের ফলাফলের মধ্যে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল দ্যুপ্লে ও ক্লাইভের মত তীক্ষ্ন বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের কাছে এদেশের সামরিক দুর্বলতার চিত্রটি একেবারে স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠল। এই অভিজ্ঞতাই, তাদের পক্ষে দুঃসাহসী নীতি অবলম্বন করে ভারতে বিদেশী আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াসকে স্বাভাবিক করে তোলে। এদেশে দ্যুপ্লের স্বাভাবিক ইচ্ছা ছিল রাষ্ট্র ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে নিজের মুন্সীয়ানা জাহির করা। কর্ণাটকে লব্ধ অভিজ্ঞতা তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে তাঁকে ব্যাকুল করে তোলে। ফরাসী নেতৃত্বে মুষ্টিমেয় সৈন্য নবাব আনোয়ার উদ্দিনের বিপুল বাহিনীকে পরাজিত করতে দেখে ইওরোপীয় সামরিক সংগঠনের উন্নততর মান ভবিষ্যতে কাজে লাগিয়ে এদেশে সাম্রাজ্য গঠনের সম্ভাবনা দ্যুপ্লের মনে উদয় হয়। এইভাবে কর্ণাটক যুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হলো দ্যুপ্লের মনে ভারতে ফরাসী কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নের বাস্তবায়নে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ; এছাড়া এদেশে টিকে থাকা এবং যুদ্ধে জয়লাভ করার পূর্ব শর্তরূপে নৌবহরের সান্নিধ্য ও সাফল্য ছাড়া যে সম্ভব নয় এ কথাটির সত্যতা উভয় বিবদমান শক্তিই উপলব্ধি করে। এদিক থেকে অবশ্য ফরাসীদের চেয়ে ইংরেজদের অবস্থা ছিল অনুকূল। ফরাসীরা কেবল করমণ্ডল উপকূলে শক্তি সঞ্চয় করেছিল। কিন্তু বোম্বাই এবং বাংলাতে ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যের শাসকবর্গ নিজেদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তাঁরা ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বে কোন একটি শক্তি শিবিরে নিজেদের সামিল করেছে। শাসকদের গৃহ-বিবাদের সুযোগ নিয়েছে বিদেশী বণিক সম্প্রদায়। তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির পরিকল্পনায় মদত দিয়েছে কখনও ইংরেজ কোম্পানী কখনও বা ফরাসী কোম্পানী। কর্ণাটকের শাসকদের গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ থেকেই দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের লক্ষ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত করে। এইভাবে ইঙ্গ-ফরাসী বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্ণাটকের শাসকদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদকে প্রকট করে তোলে। আবার এই বিবাদই রাজ্যলিপ্সার আগুনে ইন্ধন যুগিয়ে ইঙ্গ-ফরাসী বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজনৈতিক প্রভুত্বের প্রয়োজনে পারস্পরিক যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। দৃষ্টান্তরূপ বলা যায় যে প্রতিদ্বন্দ্বিদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাতে

লিপ্ত থেকে নবাব আনোয়ার উদ্-দিনের অসহায় অবস্থা দেখেও বিদেশী বণিকদের রাজ্য-লিপ্সা উৎসাহিত হয়।

ফরাসী শক্তির ব্যর্থতার কারণ ঃ ইংরেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ফ্রান্সের ব্যর্থতার কারণ বহুবিধ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হল নৌ শক্তির দিক থেকে ফ্রান্সের দুর্বলতা। আর্কটের যুদ্ধে ক্লাইভের কৃতিত্ব ফুটে উঠলেও স্থলযুদ্ধে ফরাসীদের উৎকর্ষ তখন অনস্বীকার্য। কিন্তু জলপথে ইংলন্ডের ক্ষমতা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে দুপ্লের মত নায়কের পক্ষেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। বাংলাদেশের চন্দননগর থেকেও ফরাসীদের যখন ক্লাইভ এবং ওয়াটসন সরিয়ে দিলেন তখন থেকেই ফরাসী শক্তির দুর্যোগ ঘনীভূত হতে থাকে। এখানেও ইংরেজদের সরবরাহ ঘাঁটি অতি নিকটে থাকার সুবিধা. অন্যদিকে ফরাসী সরবরাহ ঘাঁটি বহু দূরে থাকায় প্রয়োজনের সময় তাদের শুধু হতাশ হতে হয়েছে। ১৭৫৭ সন থেকে বাংলার অপরিসীম সম্পদ ইংরেজদের হাতে আসে, অপর দিকে অর্থের অভাবে ফরাসীদের ক্রমাগত দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। আবার ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ অথচ ফরাসীদের ব্যবসার চেয়ে যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে দেশজয়ের আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে বেশী দুঃসাহসী করে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী সরকারের কাছ থেকে সৈন্য বা অর্থ সাহায্য না পাওয়ায় ফরাসী চেষ্টা ফলবতী হয়নি। যুদ্ধ করেও ইংরেজ এদেশে ব্যবসা থেকে লাভ করেছে এবং বাংলাদেশের রাজা হয়েও ইংরেজরা ভোলেনি যে তাদের আসল কাজ হল ব্যবসা। অপরদিকে রাজ্যজয়ের নেশায় আচ্ছন্ন দুপ্লের পরিকল্পনা সাফল্যলাভ না করার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল ফরাসীদের ব্যবসায়ে অবনতি। এছাড়া ভারতে বাণিজ্য বিস্তার অপেক্ষা ইওরোপের বৃহৎ রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি সমাধানের দিকে ফরাসী কর্তৃপক্ষের অধিকতর দৃষ্টি ছিল। তাই স্বদেশের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিজের পরিকল্পনা বিষয়ে সমর্থন ও সহায়তা না পেয়ে দুপ্লের আন্তরিক প্রয়াসও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। সর্বশেষে ইংল্যান্ডের সমরনায়ক যথা—সন্ডার্স, আয়ার কুট, ফোর্ড, ক্লাইভ প্রভৃতির তুলনায় ফরাসীদের মধ্যে প্রতিভাবান সেনানায়কের ছিল স্বল্পতা। বুশী প্রতিভাবান হলেও হায়দ্রাবাদে তার কর্মক্ষমতার মধ্যে অলসতা আশ্রয় করেছিল. ফলে ইংরেজের বাণিজ্য সমৃদ্ধি, নৌ শক্তি, স্থানীয় উদ্যোগ, সামরিক দক্ষতা, নিজেদের রাষ্ট্রের সহানুভূতি ও আনুকূল্য, ফরাসীদের চেয়ে ইংরেজদের বেশী ছিল বলেই ভাগ্য-পরীক্ষায় ইংরেজদের জয় হয়েছিল।

৪। বাংলাদেশে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বিস্তার ও শক্তিবৃদ্ধি (১৭৬৫ সন পর্যন্ত)

ভারতে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পত্তন হয়েছিল অতি সামান্যভাবে। ১৬৮৭ সন পর্যন্ত সুরাট ছিল এদের ব্যবসায়ী ঘাঁটি বা কেন্দ্র। শুরু থেকেই ইংরেজ ব্যবসায়ী কোম্পানীর লক্ষ্য ছিল শুধু ব্যবসায় নয়, সে সঙ্গে ব্যবসার কেন্দ্রগুলি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেসব অঞ্চলে যুদ্ধ বা কূটনীতি প্রয়োগের দ্বারা প্রভুত্ব স্থাপন করা। বস্তুতঃ মুঘল দরবারে প্রেরিত ইংলন্ডের রাজদূত স্যার টমাস রো ইংরেজ বণিকদেরকে যে পরামর্শ দিয়ে

গিয়েছিলেন তা হল—'দৃঢ়তা সহকারে আমি আপনাদের এই উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি যে, একহাতে তরবারি আর একহাতে লাঠি এদেশের মানুষের সাথে ব্যবহারে প্রয়োজন হবে।' বস্তুত বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গির ইহা এক নিষ্ঠুর নির্দেশনা।

১৬৯০ খৃষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত নানারূপ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে থাকে। অবশেষে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মোগল সরকার ও ইংরেজদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ায় সম্রাট আওরঙ্গজেব ইংরেজদের আগের মত বাংলায় অবাধে বাণিজ্য করবার অনুমতি দিতে আদেশ দিয়ে বাঙলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁকে এক পত্র দেন। সেই বৎসরেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী জব চার্ণক ইব্রাহিম খাঁর আমন্ত্রণে ভাগীরথীর তীরে সুতানুটি গ্রামের জলাভূমিতে কলকাতার পত্তন করেন। পরে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে আরও দুটি পার্শ্ববর্তী গ্রাম, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর কলকাতার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইব্রাহিম খাঁ বাৎসরিক মাত্র ৩০০০ টাকার বিনিময়ে বাঙলায় বাণিজ্যের উপর শুল্ক দেওয়ার দায় হতে অব্যাহতি দিয়ে কোম্পানীকে ফরমান দেন, অথচ বাঙলাদেশে ব্যবসারত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীকে বাণিজ্য-দ্রব্যের মূল্যের শতকরা তিনভাগ শুল্ক হিসাবে দিতে হত।

শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বেই মোগলদের অবনতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শেষ পনের বছরের অধিককাল সম্রাট আওরঙ্গজেব নিজে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন, তবুও জয়ী হয়ে দিল্লীতে ফিরতে পারেননি। সর্বত্রই স্বেচ্ছাচারী শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ইব্রাহিম খাঁর অলস ও শৌর্যহীন চরিত্র ও তাঁর দুর্বল শাসনের সুযোগ নিয়ে মেদিনীপুরের ঘাটাল চন্দ্রকোনা অঞ্চলের জমিদার শোভা সিং বিদ্রোহ করে। সম্রাট শাহজাহানের মসনদের আরোহণের সময় থেকে যে গভীর শান্তি বাঙলায় বিরাজ করছিল তার বিঘ্ন ঘটালেন। যখন জন-শৃঙ্খলা অন্তর্হিত হল এবং মোগল প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ল, তখন বাংলা দেশের কলকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়া এই তিনটি স্থানে যে যে ইউরোপীয় উপনিবেশ ছিল তারা নিজ নিজ কুঠি সুরক্ষিত করার জন্য ইব্রাহিম খাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেন। সুবাদার কোন শর্ত আরোপ না করেই তাদের আত্মরক্ষা করার ব্যবস্থা করতে অনুমতি দিলেন। এইভাবে ফোর্ট উইলিয়াম, ফোর্ট ডি অরবাঁস ও চুঁচুড়া কেল্লার গোড়াপত্তন হল। আরও কথা, বাঙলার নূতন সুবাদার আজিমুদ্দিন, (যিনি আজিম-উস-সান নামেই সমধিক পরিচিত) অলস ও লোভী প্রকৃতির ছিলেন। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ঐ বাদশাজাদা ইংরেজদের কাছে ১৬০০ টাকা নিয়ে তৎকালীন মালিকদের কাছ থেকে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামগুলি খাজনায় ইজারা নেওয়ার অধিকার দিয়ে তাদের ফরমান দেন এবং এইভাবে কলকাতার নিরাপত্তা নিশ্চিত হল।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাংলার শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খাঁন ছিলেন বেশ শক্তিশালী। তিনি ইংরেজদের কোন অতিরিক্ত সুযোগই দেননি। ইংরেজদের সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ বা ঘনিষ্টতা করতে তার প্রজাদের নিষেধ করে দিলেন। তিনি কলিকাতার দুর্গকে শক্তিশালী করতে বা স্বাধীনভাবে কলিকাতা শহরকে শাসন করতে তিনি দেননি। বাঙলায় ইংরেজদের অবস্থা ও অধিকার সুনির্দিষ্ট ছিল না। যদিও তাদের কলকাতায়

জমিদারি স্বত্ব ও সুরক্ষিত উপনিবেশ ছিল, তা হলেও তারা বুঝেছিল যে, যে ফরমানগুলি তারা পেয়েছিল সেগুলির বলে তারা তাদের বাণিজ্যের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব রক্ষা করতে পারবে না। প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষরা নানা অছিলায় ফরমান পরোক্ষভাবে না মেনে অস্বীকার করতেন। স্বভাবতই ইংরেজরা দিল্লী থেকে এমন এক ব্যাপক ফরমান আদায় করতে আগ্রহী ছিল, যার বলে তারা সমগ্র দেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার ও অন্যান্য সুবিধা পেতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে সম্রাট ফারুকসিয়ারের দরবারে একদৌত্য পাঠান ইংরেজরা। দৌত্যের প্রধান ছিলেন কলকাতার এক অল্পবয়স্ক কুঠিয়াল জন সুরমান; তাঁর সঙ্গে ছিলেন হিউগ বার্কার ও এডওয়ার্ড ষ্টিফেনসন। তাঁরা সঙ্গে নিয়েছিলেন বহু মূল্যবান উপঢৌকন, যেগুলির দাম ছিল প্রায় তিন হাজার পাউন্ড। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁরা দিল্লীতে সাদরে অভ্যর্থিত হন। ১৭১৭ সনে বহু চেষ্টায় ফারুকসিয়রের কাছ থেকে ইংরেজ কোম্পানী যে ফর্মান পেয়েছিল তার শর্তগুলি হল—

(১) রাজকোষে বার্ষিক ৩০০০ টাকা কর হিসাবে প্রদানের বিনিময়ে কোম্পানী অবাধ বাণিজ্য করতে পারবে :

(২) বার্ষিক ১১৯৫ টাকা ৬ আনা খাজনায় কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের ইজারা অনুমোদন করা হল। সন্নিহিত আরও ৩৮টি গ্রামের ইজারা দেওয়া হল, যার জন্য বার্ষিক ৮১২১ টাকা ৮ আনা খাজনা মোগল সরকারকে দিতে হবে। এই গ্রামগুলির স্বত্ব তাদের তৎকালীন মালিকদের কাছে ক্রয় করতে হবে।

(৩) মাদ্রাজী টাকা, সুরাটী টাকার মত উৎকৃষ্ট হলে, বিনা বাট্টায় বাঙলায় চলবে।

(৪) সকল ইউরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি, যারা কোম্পানীর কাছে ঋণী বা যাদের কাছে কোম্পানীর হিসাব পাওনা আছে, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের কুঠির প্রধানের জিম্মায় সমর্পণ করতে হবে।

অন্যান্য শর্তের মধ্যে আছে এই বিশেষ সুবিধাগুলি ঃ

(১) কুঠির প্রধানের দস্তক বা অনুমতি থাকলে নবাবের শুল্ক কর্মচারীরা সংশ্লিষ্ট মাল আটক করবে না বা পরীক্ষা করবে না।

(২) বাঙলা সরকার মুর্শিদাবাদের টাকশালে কোম্পানীকে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা তৈয়ারী করার সুবিধে দেবেন এবং কোম্পানী তার কুঠি সুরক্ষিত করতে পারবে।

বাঙলার শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খাঁ প্রথম থেকে সুরমানের নেতৃত্বাধীন দৌত্যের প্রতি অত্যন্ত বিমুখ ছিলেন। কিন্তু যে ফরমান সম্রাট দিয়েছেন তার শর্তগুলি প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করতে তিনি সাহসী হননি। কিন্তু ফরমানের শর্তগুলির মধ্যে যে সব ছিদ্র ছিল সেগুলির সুযোগ নিয়ে তিনি ইংরেজ কোম্পানীর আশাভঙ্গ করতে চেষ্টা করলেন। তাহলেও, এই ফরমানকে যথার্থ কারণেই ভারতে ইংরেজদের বাণিজ্যের 'ম্যাগ্নাকার্টা' বা মহাসনদ (অধিকার পত্র) বলা হয়েছে। এই ফরমান ইংরেজদের পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ জয়ের সমান। যে অধিকারগুলি ইংরেজরা দাবি করছিল এবার সেগুলির আইনের সমর্থন ছাড়াও একটি নৈতিক সমর্থন পাওয়া গেল। সংক্ষেপে বলা যায় এই ফরমানপ্রাপ্তি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্বের সর্বাপেক্ষা

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সন্দেহ নেই যে এই ফরমানই ইংরেজদের সম্মুখে সেই পথ অবধারিত করেছিল, যে পথে অগ্রসর হয়ে তারা ব্যবসায়িক লেনদেনে তাদের ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের বহু পশ্চাতে ফেলে শেষে বাঙলায় বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম চার দশকে বাঙলার অর্থনীতিতে ইংরাজদের গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। কোম্পানীর অভূতপূর্ব ব্যবসায়িক সাফল্যের একটি দৃষ্টান্ত হল ১৭০৮ সনে ৫ লক্ষ পাউন্ড পর্যন্ত মূল্যের পণ্য স্বদেশ থেকে আমদানী করেছিল। ১৭৪০ সনে এটা বেড়ে টাকার অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ১৭ লক্ষ ৯৫ হাজার পাউন্ড।

সম্রাট তো ফারমান দিয়েই খালাস! স্থানীয় কর্মচারীদের উপরই নির্ভর করতো বাদশাহী আদেশ মেনে চলা। কিন্তু প্রভাবশালী সুবাদাররা সব সময় বাদশাহী আদেশও মানতেন না। বাংলা দেশে মুর্শিদকুলি খান ছিলেন তেমন নবাব। ফারমানের সুবিধে নিয়ে মুদ্রা তৈরী করতে কিম্বা দুর্গ সুরক্ষিত করতে তিনি দেননি। দস্তকের অপব্যবহারও তিনি সহ্য করেননি। কিন্তু সৎভাবে বাণিজ্য করতে তিনি কখনও বাধা দেননি।

আলিবর্দী খানের আমলে অবস্থার সামান্য হেরফের হল। মারাঠা বর্গীদের আক্রমণে বাংলার পশ্চিমাঞ্চল তখন তছনছ হচ্ছিল। বর্গীদের বাধা দিতেই আলিবর্দীকে বেশী ব্যস্ত থাকতে হয়। এই সুযোগে ইংরেজ কোম্পানী কলকাতার ঘাটিকে আর একটু শক্তিশালী করে নেন। কিন্তু দস্তকের অপব্যবহার আলিবর্দীও সহ্য করেননি। ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ লাগার পর তিনি দু'পক্ষকেই সাবধান করে দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশে দু'দলের লড়াই যেন না হয়। অর্থের প্রয়োজন হলে তিনি চাপ দিয়ে কোম্পানীর কাছ থেকে টাকাও আদায় করেছেন। কিন্তু ইংরেজদের ব্যবসার তিনি ক্ষতি করেন নি। তাছাড়া নিজের একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীর অভাবও তিনি অনুভব করেছিলেন। যাই হোক ইংরেজদের ক্ষমতা বিস্তারকে তিনি আমল দেন নি। তিনি বরং নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে ইংরেজ কোম্পানীকে আটকে রেখেছিলেন।

১৭৪০ সনের পর মুঘলদের কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা যখন নগ্নরূপে প্রকাশ পেল তখন ইংরেজরা তাদের রাজ্য ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাংলার নবাব আলিবর্দীর প্রতাপে এখানে কোম্পানীর রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন সুদূর পরাহত ছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে অবস্থাটা ছিল অন্যরকম। কেন্দ্রীয় সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা এই অঞ্চল থেকে প্রায় লুপ্ত হয়েছিল। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে কর্ণাটকের গৃহযুদ্ধ ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের পটভূমি বলা চলে। কর্ণাটকের যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ হয় বিজয়ী। এই যুদ্ধ পলাশী যুদ্ধের একটা প্রস্তুতি মাত্র ছিল। এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে বাংলার যুদ্ধে ইংরেজরা কাজে লাগালো। ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের হঠিয়ে দিয়ে এবার ভারতজয়ের প্রাথমিক স্তর বাংলার দিকে পুরো মনঃসংযোগ করে।

১৭১৭ সনে প্রদত্ত ফর্মানের যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে মুর্শিদকুলি খান থেকে নবাব আলিবর্দী খান-এর সময় পর্যন্ত কোম্পানীর সঙ্গে বিবাদ চলেছিল। এরা কোম্পানীকে নবাবের রাজকোষে মোটা টাকা করস্বরূপ দিতে বাধ্য রেখেছিল, দস্তকের বেআইনী ব্যবহারও এরা কড়া হাতে দমন করে ছিল, কিন্তু ১৭৫৬ সনে কোম্পানীর সঙ্গে বাংলার

নবাবের মনোমালিন্য একটা চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল। এই সময় আলিবর্দীখানের দৌহিত্র তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলা তার উত্তরাধিকারীরূপে বাংলার নবাব হন। তিনি চাইলেন মুর্শিদকুলির আমলে কোম্পানী যে সব সর্তে ব্যবসা করত এখনও তাদের সেই সব সর্ত মেনে চলতে হবে। কিন্তু কোম্পানী দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের পরাজিত করে নিজেকে আগের চাইতে এখন অনেকবেশী শক্তিমান মনে করে। তাই ঔদ্ধত্বও আগের চাইতে তাদের অনেক বেশী বেড়েছে। কলকাতাকে তাদের অধিকারভুক্ত মনে করে তারা এমন নিয়ম করে দিয়েছিল যে কলিকাতার মধ্যে কোন ভারতীয় মাল আনতে হলে কোম্পানীকে শুল্ক দিতে হবে। এছাড়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নবাবকে কোনরূপ কর



সিরাজউদ্দৌলা



ক্লাইভ

দিতে তারা অস্বীকার করে। স্বাভাবিক কারণেই তরুণ নবাব এই সব ঘটনায় ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত বোধ করছিলেন। তার মনে এই সন্দেহও জেগেছিল যে কোম্পানী তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং বাংলার মসনদে বসার জন্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আগুনে ইন্ধন দিচ্ছে। এদিকে বাংলা দেশে ফরাসীরা ছিলেন সিরাজের সমর্থক। আর সিরাজ ছিলেন ইংরেজ কোপানীর বাণিজ্যিক প্রয়োজনে এক পথের কাঁটা। সুতরাং এখানে একঢিলে দুইপাখী মারবার পরিকল্পনা কোম্পানী করলেন। ফরাসীদের ধ্বংস করে যদি নিজেদের মনের মত কোন লোককে নবাবী গদিতে বসান যায়, তবে বাংলা দেশে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হবে। নিজেদের মনোনীত নবাবকে শিখণ্ডি বানিয়ে দেশের আসল প্রভু হবেন ইংরেজরাই। এই আশা সফল হওয়ার সুযোগও উপস্থিত হল। কারণ মুর্শিদাবাদে সিরাজের দরবারেই কয়েকজন বড় কর্মচারী নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলেন।

সিরাজের সাথে সংঘর্ষের কারণ বার করতেও কষ্ট হলনা। (১) ইংরেজরা বাদশাহী ফারমানের অপব্যবহার করে অন্যান্য বণিকদের তুলনায় অনেক বেশী সুবিধাজনক বাণিজ্য করছিলেন। সিরাজ এটি মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। (২) কথা ছিল শুধু মাত্র কোম্পানীর আমদানী রপ্তানীর বিদেশী বাণিজ্যই দস্তকের জোরে শুল্কহীন থাকবে।

কিন্তু ইংরেজরা এখন আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও দস্তক ব্যবহার করতে লাগলেন। এর ফলে অন্যান্য বণিকরা হলেন ক্ষতিগ্রস্ত। আর রাজকোষে বাণিজ্য শুল্কের আদায়ও কমে গেল। দস্তকের অপব্যবহার সিরাজ বন্ধ করতে চাইলেন। (৩) ইংরেজরা তাঁদের কলকাতা দুর্গকে আরও শক্তিশালী করতে উদ্যত হলেন। সিরাজ এ ক্ষেত্রেও বাদ সাধলেন। অবশ্য প্রভু হওয়ার বদলে ইংরেজরা বণিক হয়ে থাকলে তাঁর আপত্তি ছিল না। বস্তুতঃ নবাবের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপকে বাধা দিতে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। আইন মেনে চলতে তিনি ইংরেজদের বাধ্য করতে চাইলেন।

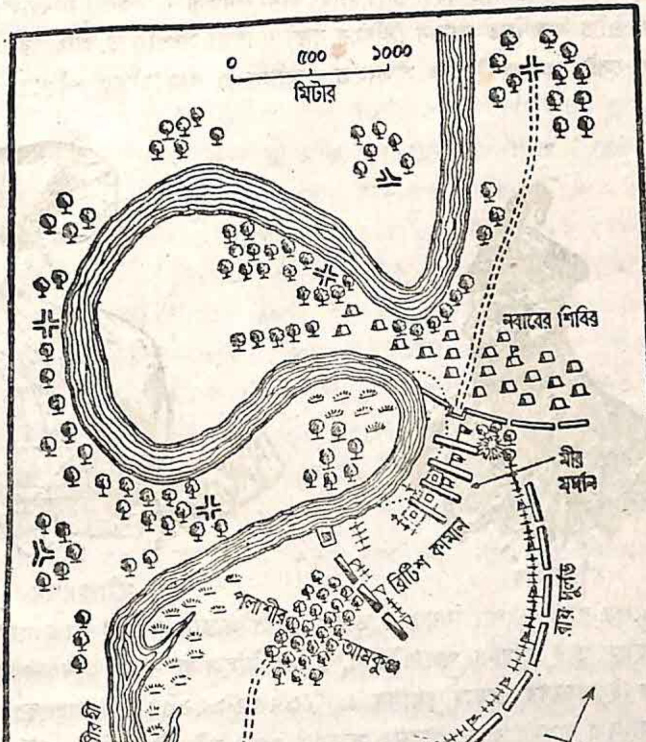
ইংরেজরাও ছিলেন বিবাদ বাধিয়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর। নবাব শাসনাধীন অঞ্চল থেকে কলকাতায় আমদানী করা পণ্যের উপর তাঁরা উঁচু হারে শুল্ক আদায় করতে লাগলেন। নবাব বিরোধী লোকজনকে কলকাতায় আশ্রয় দিতে লাগলেন। তাই যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়াই সিরাজ দ্রুত আঘাত হানলেন।

কাশিম বাজারের ইংরেজকুঠি অধিকার করে তিনি কলকাতা পৌঁছলেন। স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধে জয়লাভ করে ১৭৫৬ সনের ২০ শে জুন সিরাজ ইংরেজদের ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করে কলকাতা অধিকার করলেন। কিন্তু পলায়নপর শত্রুদের পিছু ধাওয়া করলেন না। জাহাজে করে ইংরেজরা ফলতায় পৌঁছে মাদ্রাজ থেকে সাহায্যের অপেক্ষায় রইলেন। এই পরিস্থিতিতেই ইংরেজরা নবাব দরবারের কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির সঙ্গে একটি ষড়যন্ত্র জাল বিস্তরে উদ্যোগ নিলেন।

সিরাজের বিরুদ্ধে প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, কলকাতার দুর্গরক্ষক মানিকচাঁদ, বণিক উমিচাঁদ, সুদের ব্যবসায়ী জগৎশেঠ এবং সেনাপতি খাদিমখান, রায়দুর্লভ প্রভৃতির ষড়যন্ত্র বেশ পাকিয়ে উঠেছে। সিরাজ তখন প্রমাদ গুণলেন। এই অবস্থাতেই মাদ্রাজ থেকে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজবাহিনী এসে মানিকচাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগে আবার কলকাতা দখল করলেন। তাছাড়া একটি সন্ধির (আলিনগরের সন্ধি) সাহায্যে অসহায় সিরাজকে দিয়ে তাঁদের অনেকগুলি দাবী স্বীকার করিয়ে নিলেন।

ইংরেজরা কিন্তু এতেও খুশী হলেন না, তাঁরা বাংলার নবাবরূপে এমন একজনকে পেতে চাইছেন যে সিরাজের মত তিনি শক্ত হবেন না আর কোম্পানীর পছন্দই তার পছন্দ বলে মনে করবেন। এজন্য চাই একটা যুদ্ধ অন্ততঃ পক্ষে 'তামাসাযুদ্ধ'। আলিনগরের সন্ধির পর সিরাজের দুর্বলতা বুঝতে পেরে ইংরেজদের উচ্চাশা আরও জেগে উঠল। সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন তাঁরা। নবাবের ডান হাত ভাঙবার জন্য তাঁরা চন্দন-নগরে ফরাসীকুঠি ধ্বংস করলেন। সিরাজের কাছে মেনে নেওয়া অসম্ভব এমন আরও কতকগুলি দাবী উপস্থিত করে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজরা যুদ্ধের জন্য তৈরী হলেন। যুদ্ধছাড়া গত্যন্তর নেই একথা সিরাজও বুঝেছিলেন। ১৭৫৭ সনের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে হল সেই যুদ্ধ। বিশ্বস্ত সেনাপতি মোহনলাল, মীরমদন প্রভৃতির আত্মোৎসর্গ সত্ত্বেও প্রধান সেনাপতি, বড় বড় সেনাধ্যক্ষ আর অন্যান্য ষড়যন্ত্রীদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় সিরাজ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ষড়যন্ত্রীদের হাতে নিহত হলেন। সিরাজের প্রতিরোধ ব্যর্থ হল। বাংলার স্বাধীন নবাবী শেষ হল।

পলাশীর প্রান্তরে যদি প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধ হত তা হলে তার পরিণাম যে সম্পূর্ণ বিপরীত হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রকৃত প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকেই যুদ্ধের নিষ্পত্তি হল। উভয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা ছিল সামান্য। ইংরেজদের নাকি মাত্র ২৯ জনের মৃত্যু হয় ৪৯ জন আহত হয় আর নবাবের ক্ষতির সংখ্যা প্রায় পাঁচশো। তাই যুদ্ধ না বলে একে একটা সাধারণ মারামারি মনে করলে খুব অন্যায় হবে না। কিন্তু তা



সত্ত্বেও ইতিহাসের বহুবিখ্যাত যুদ্ধের চেয়ে পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল অনেক বেশী গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলেই ইংরেজদের পক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষে প্রভুত্ব স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। পলাশীতে ইংরেজ সেনাপতিদের সমর কৌশলের কোন পরিচয় না পাওয়া গেলেও এদেশের রাজা, প্রজা সকলেরই মনে ইংরেজদের ক্ষমতা ও চাতুর্য সম্বন্ধে একটা নিদারুণ ভয় ঢুকেছিল, ভয়ে ভক্তিও দেখা দিয়েছিল। ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি অন্যান্য বিদেশীরাই ইংরেজদের পূর্বের চেয়ে বেশী সমীহ করতে লাগল। মীরজাফর নবাব হয়ে বসার পর যখন ঢাকা, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে ছোট খাটো অভ্যুত্থান ঘটে কিংবা মারাঠাদের আক্রমণ যখন চলতে থাকে তখন মুঘল বাদশাহের পুত্র (পরবর্তী-

কালে দ্বিতীয় শাহ আলম) যখন বাংলা ও বিহার দখলের উদ্দেশ্যে পাটনা অবরোধ করেন, তখন ইংরেজদের কাছেই নবাবকে সাহায্যের জন্য মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে। স্বভাবতঃই, এর ফলে ইংরেজদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানী এদেশে এক বিরাট ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আইনের চোখে তখনও কোম্পানী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হলেও এ দেশেরই কর্তৃপক্ষের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখিয়ে যারা বাণিজ্য সম্পর্কিত অধিকার অর্জনেই ছিল আগ্রহশীল সেই কোম্পানী এক সুসংহত সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে



মীরজাফর



মীরকাশিম

লাগল। এদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে তারাই অবলীলাক্রমে অগ্রসর হতে পারল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাই সামান্য পলাশীর যুদ্ধ এক অসামান্য স্থান অধিকার করে আছে।

বাংলায় ইংরেজদের প্রভুত্ব স্থাপন ঃ (১৭৫৭-১৭৬৫) ইংরেজদের সাহায্যেই মীরজাফর বাংলার মসনদ লাভ করেন। সুতরাং প্রথম হইতেই তিনি রবার্ট ক্লাইভ তথা ইংরেজ কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তিনি কোম্পানীকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দিলেন। কলকাতা সংলগ্ন ২৪টি পরগণায় জমিদারী কোম্পানী উপঢৌকন পেল। এছাড়া, সিরাজ কর্তৃক কলকাতা আক্রমণের ক্ষয় ক্ষতিবাবদ কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছিল। কারণ, ক্লাইভ নিজেই ২০ লক্ষ টাকা নিয়ে হিসেব করে বলেছেন যে কোম্পানী ও তার কর্মচারীগণ 'পুতুল' নবাবের কাছ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা নিয়েছে। ইংরেজদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ, নবাবের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন, নানাভাবে অর্থশোষণ এবং শাসনকার্যে তাদের নিয়ত হস্তক্ষেপ প্রভৃতি কারণে মীজাফরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তিনি ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের শত্রু ওলন্দাজদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। মীরজাফর ওলন্দাজদের প্রতি সহানুভূতি দেখালে তারা উৎসাহিত হয়ে হুগলী আক্রমণ করে। কিন্তু ১৭৫৯ সনে বিদারার যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে ওলন্দাজরা পরাজিত হয়।

ইতিমধ্যে নবাবের পুত্র মীরনের অকালমৃত্যু, নবাবের শাসন ক্ষমতায় অযোগ্যতা এবং

মুর্শিদাবাদের শূন্য রাজকোষ প্রভৃতি কারণে বাংলার শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে। ক্লাইভের পর ফোর্ট উইলিয়ামের পরবর্তী গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট সত্যমিথ্যা বহু অভিযোগে মীরজাফরকে অভিযুক্ত করে তাকে সিংহাসনচ্যুত করেন (১৭৬০ সনের অক্টোবর মাসে)। এক নতুন সন্ধি বলে ভ্যান্সিটার্ট মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে বসান। (১৭৬০ সন) মীরকাশিম ছিলেন দূরদর্শী, রাজনীতিক ও সুদক্ষ শাসক। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে মীরজাফরের পতনের অন্যতম কারণ হল নবাবের আর্থিক দুরবস্থা, সামরিক দুর্বলতা এবং ইংরাজদের অর্থগৃধ্নুতা। অর্থাভাবের জন্যই যে মীরজাফর ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন, মীরকাশিমের তা অজানা ছিল না। সুতরাং সিংহাসনে আরোহণ করেই চুক্তি অনুযায়ী মীরকাশিম ইংরেজ কোম্পানীকে (ক) বর্ধমান মেদিনীপুর, চট্টগ্রামে রাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রদান করেন, (খ) কোম্পানীর সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য দশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন এবং (গ) কোম্পানীকে নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের অধিকার প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ভ্যান্সিটার্ট ও অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীগণকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার হিসাবে প্রদান করেন।

এর পর মীরকাশিম বিভিন্ন উপায়ে অর্থসংগ্রহ করেন এবং রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কার প্রবর্তন করে রাজকোষ পূর্ণ করতে প্রয়াসী হন। মীরজাফরের আমলের কোম্পানীর নিকট প্রাপ্য আদায় করা হয় ; সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করার কারণে বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও অভিজাতদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় ; শেঠ পরিবারের কাছে থেকে বলপূর্বক প্রচুর ধন আদায় করা হয় এবং শাসন ব্যাপারে যথাসম্ভব ব্যয় সংকোচ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজের অর্থাভাব দূর করে কোম্পানীর কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হতে প্রয়াসী হন।

মীরকাশিম ইংরেজদের হাতে মীরজাফরের ন্যায় পুতুল হয়ে থাকতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা নবাব এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই শাসন কার্য পরিচালনা করতে দৃঢ় সংকল্প। তিনি ইংরেজদের নিকট হতে মুক্ত হবার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যথা—(১) বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকার রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করে মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সমর্থন লাভ করেন, (২) ইংরেজদের প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন এরূপ সকল কর্মচারী ও জমিদারগণকে কঠোর হস্তে দমন করেন, (৩) ইংরেজদের প্রভাব হতে দূরে থাকবার জন্য মুর্শিদাবাদ হতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করে এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন এবং (৪) ইউরোপীয়দের সাহায্যে সামরিক বাহিনী গঠন করেন।

একদিকে ইংরেজদের মীরকাশিম বিরোধী মনোভাব এবং অপরদিকে মীরকাশিমের কার্যকলাপ ও সামরিক প্রস্তুতি উভয়ের মধ্যে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অনতিকাল পরে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্কের ব্যাপারে ইংরেজদের সাথে মীরকাশিমের বিরোধ উপস্থিত হয়।

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফারুকশিয়ারের 'ফরমান' অনুসারে ইংরেজ কোম্পানী বাণিজ্য বিষয়ে কতকগুলি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন। ইংরেজ কোম্পানী

'দস্তক' বা ছাড়পত্রের বলে বিনা শুল্কে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য করছিলেন ; কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীগণকে ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য এই সুবিধা কখনও দেওয়া হয়নি। পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানীর কর্মচারীগণ 'দস্তকের' অপব্যবহার করে তার সাহায্যে বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত বাণিজ্য করতে থাকে। এর ফলে নবাবের আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও দেশীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে ধ্বংস হবার উপক্রম হয়। কারণ দেশীয় বণিকগণকে বাণিজ্যের জন্য শুল্ক দিতে হত। মীরকাশিম কোম্পানীর কর্মচারীদের অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করবার জন্য দেশীয় বণিকদের উপর হতে শুল্ক উঠিয়ে নেন। ইংরেজ কোম্পানী নবাবের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে পাটনা শহর দখল করে। নবাব পাটনা পুনর্দখল করে ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি ধ্বংস করেন। ফলে মীরকাশিমের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে।

মীরকাশিমের অধীনে প্রায় পনেরো হাজার সৈন্য ছিল বটে কিন্তু তাদের সামরিক দক্ষতা ছিল না। মীরকাশিম ক্রমান্বয়ে কাটোয়া, গিরিয়া ও উধুয়া নালার যুদ্ধে পরাজিত হন। ইংরাজ সেনাপতি এ্যাডামস্ মুঙ্গের অভিমুখে অগ্রসর হলে মীরকাশিম পাটনায় এসে সমস্ত ইংরেজ বন্দীকে হত্যা করেন। ইংরেজ সৈন্য মুঙ্গের দখল করে পাটনা অভিমুখে অগ্রসর হলে মীরকাশিম অযোধ্যায় পালিয়ে গিয়ে নবাব সুজা-উদ্-দৌলার সাহায্যপ্রার্থী হন। অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম যুগ্মভাবে মীরকাশিমের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রীঃ) ইংরেজ সেনাপতি অযোধ্যা বিধ্বস্ত করে এবং শাহ আলম ইংরেজদের নিকট পরাজিত হন। মীরকাশিম পালিয়ে যান এবং পলাতক জীবন যাপনের পর ১৭৭৭ খ্রীঃ তার মৃত্যু হয়।

মীরকাশিম ছিলেন বাংলার শেষ পরাক্রান্ত নবাব। বক্সারের যুদ্ধের ফলে (১) মীরকাশিম সিংহাসনচ্যুত হন এবং মীরজাফর বাংলার মসনদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। নানারূপ শর্ত আরোপ করে মীরজাফরের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হয়। তার সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করা হয় এবং তার দরবারে একদল ইংরেজ প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা হয় (২) অযোধ্যার নবাবের ক্ষমতা হ্রাস করে ৫০ লক্ষ টাকা এবং কোরা ও এলাহাবাদ জেলা দুটি ইংরেজরা লাভ করে। জেলা দুটির উপর কোম্পানীর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তার নাবালক পুত্র নিজামউদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসানো হয়। (৩) পলাশীর যুদ্ধের চরম পরিণতি হল বক্সারের যুদ্ধ। পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ যে ক্ষমতা লাভ করেছিল তা পরিপূর্ণতা লাভ করে বক্সারের যুদ্ধের পর। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় ইংরাজ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুনিশ্চিত হয়।

এরপর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ পুনরায় এদেশে এসে কোম্পানীর ক্ষমতা সুদৃঢ় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কোম্পানীর ক্ষমতা আইনসঙ্গত করবার জন্য তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। আগে থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রত্যেক সুবা (প্রদেশ) দুজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী দ্বারা শাসিত হত। 'সুবাদার' বা 'নাজিম' সৈন্যদল পরিচালনা, শাসনকার্য নির্বাহ এবং ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করতেন। 'দেওয়ান' রাজস্ব বিভাগের পরিচালক এবং দেওয়ানী মোকদ্দমায় বিচারক ছিলেন। উভয়েই সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং সরাসরি

তাঁর নিকট দায়ী থাকতেন। 'নিজামত', বিভাগের ভার আগের মতই নবাবের হাতেই রাখা হল। দেওয়ানী প্রাপ্তির এই অনুগ্রহের পরিবর্তে কোম্পানী মুঘল সম্রাটকে কোরা ও এলাহাবাদ প্রদান করে এবং বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে প্রতিশ্রুত হয়। ফলে নবাব রইলেন নগণ্য হয়ে আর রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে গেল। অর্থের জন্য নবাব সম্পূর্ণই ইংরেজদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লেন। কোম্পানীর এই দেওয়ানী লাভের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের কর্তৃত্ব কেবলমাত্র যে একটা আইনসম্মত রূপ পেল তাই নয়, সম্রাটকে বার্ষিক কর পাঠিয়ে দিয়ে উদ্বৃত্ত সব অর্থই কোম্পানীর হাতে রইল।

কোম্পানীর শিক্ষা ঃ এইসব লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে ইংরেজরা কয়েকটি কথা বেশ বুঝেছিলেন, যেমন—(ক) ভারতে জাতীয়তাবাদের অভাব থাকায় ভারতীয় রাজাদের ঝগড়াঝাটির সুযোগে ইংরেজরা ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। (খ) আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী সহজেই এখানে জয়লাভ করতে পারবে। (গ) ভারতের সিপাইদের উপযুক্ত শিক্ষা দিলে তারাও ভাল সৈন্য হতে পারবে। (ঘ) জাতীয়তাবাদের অভাব থাকায় এদেশের মানুষকে ভাড়াটে সিপাই বানিয়ে সাম্রাজ্য গড়া চলবে।

এই শিক্ষা নিয়ে এবং বাংলাদেশের সম্পদ করায়ত্ত করে তাঁরা ধীরে ধীরে সারা ভারত জয়ের দিকে এগোলেন।

৩। ব্রিটিশ রাজশক্তির সম্প্রসারণ ॥

(১৭৬৭ খৃঃ—১৮৫৭ খৃঃ)

ভারতবর্ষে শাসন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইংরেজ মনোভাব ঃ বিখ্যাত ইংরেজ অধ্যাপক সীলি বলেছিলেন যে ইংরেজরা আকস্মিকভাবে এবং বিনা অভিপ্রায়েই ভারতবর্ষে রাজত্ব স্থাপন করেছিল; "আমরা (ইংরেজরা) সেখানে এক কাজ করছি ভেবে অন্য কাজ করেছি।" এই কথাটিই আর এক সাজে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেঃ ইংরেজরা নিজেদের অজ্ঞাতেই যেন হোঁচট খেয়ে ভারতবর্ষের শাসনভার পেয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসে কিন্তু এমন আকস্মিকভাবে কোন বৃহৎ ঘটনা ঘটে না; "ইংলণ্ডের রাজমুকুটে উজ্জ্বলতম রত্ন" বলে যে ভারতবর্ষ বর্ণিত হত, সেই রত্ন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে ইংরেজদের হস্তগত হয়ে গেল! অপ্রত্যাশিত সুযোগ ইংরেজরা অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে পেয়েছিল, কিন্তু সুবিধাবাদের ও নির্লজ্জতার পরিচয় বহুদিন ধরে দিয়েছিল বলেই ইংরেজ এদেশে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজদণ্ড লাভ করার লোভ বারবার সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই রাজদণ্ডের লোলুপতার জন্য এক বাংলাদেশেই ইংরেজরা নবাব সিরাজদ্দোলার সাথে চুক্তিভঙ্গ করেছে বারবার। তাই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের পক্ষে নতুন কিছু বিষয় নয়. বাঙলায় ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার শুরুতেই নবাব সিরাজউদ্দৌলা সে পরিচয় বারবারই পেয়েছিলেন। তাই তিনি ইংরাজদের চুক্তিভঙ্গে বিরক্ত হয়ে এবং মারাঠা বর্গীদের চুক্তি রক্ষা স্মরণ করিয়ে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে পত্র দিয়েছিলেন—'মারাঠাদের বাইবেল নাই, কিন্তু তারা তো চুক্তিভঙ্গ করে নাই!" কিন্তু সীলি যখন বলেন যে, "অন্ধকূপ

হত্যার জন্য দায়ী মুসলমান নবাবকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এবং ফোর্ট-উইলিয়ম কেল্লা বাঁচাবার প্রয়োজনেই" ইংরেজকে বাংলার কর্তৃত্ব স্বহস্তে ধারণ করতে হয়েছিল তখন তার ভুল ধরা পড়ে। আসলে বাংলার অতুল ঐশ্বর্য ইংরেজ বণিকদের লোভমত্ত করে তুলেছিল ; বাংলার শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে অনৈক্য ও পরস্পর বিদ্বেষ তাদের ধূর্ত স্বার্থ-বুদ্ধিকে প্রবলভাবে প্ররোচিত করেছিল ; ছলে, বলে, কৌশলে বাংলায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তারা আকুল হয়ে উঠেছিল ; মান লজ্জা, ভয় বিসর্জন দিয়ে লক্ষ্য সিদ্ধির প্রচেষ্টায় নামতে তাঁদের বিন্দুমাত্র সংকোচ হয়নি। অবচেতন পদক্ষেপে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন অলীক কাহিনী মাত্র।

দাক্ষিণাত্য ও বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিযোগিতায় সাফল্যের পরে খুব তাড়াতাড়ি ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্য বাড়াতে পারলেন। কতগুলি সুবিধাও ছিল। উত্তর ভারতে অযোধ্যার মত যে কয়টি দুর্বল, সামন্ততান্ত্রিক এবং আত্মস্বার্থান্বেষী রাজ্য ছিল, তাদের একে একে ঘায়েল করতে ইংরেজদের তেমন অসুবিধা হয়নি।

দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে হায়দরাবাদ, মহীশূর ও মারাঠাদের রাজ্যগুলি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী। কিন্তু এদের মধ্যে রেষারেষির অন্ত ছিল না। ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, পরস্পরের লড়াইতে এরা ইংরেজদের সাহায্য নিয়েছে। ইংরেজরাও একে একে সব কয়টিকে ঘায়েল করেছেন। মারাঠাদের শক্তিও তখন ছিল নামে মাত্র পেশোয়ার অনুগত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন কয়েকটি মারাঠা রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত। এই বিভেদই এনেছে মারাঠাদের সর্বনাশ। আর মারাঠা শক্তি পতনের পরে রাজপুতনা এবং মধ্যভারতে মারাঠাদের তাঁবেদার রাজ্যগুলিও ইংরেজদের অধীনতা মেনে নিয়েছে।

হায়দরাবাদ রাজ্যটি প্রথম থেকেই ইংরেজদের কাছে মাথা নত করেছিল। সুতরাং হায়দরাবাদকে অধীনতা পাশে বাঁধতে ইংরাজদের কোন বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতের কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যকে একটির পর একটি যুদ্ধে পরাজিত করে রক্ত ক্ষয়ের মধ্য দিয়েই সাম্রাজ্য প্রসার করা সম্ভব হয়েছিল। প্রধান বাধা এসেছিল মহীশূর, মারাঠা এবং শিখরাজ্যের কাছ থেকে।

(ক) **মহীশূরের প্রতিরোধ ও পরাজয় :** বিজয়নগরের ভগ্নস্তূপের উপর কোনক্রমে দাঁড়িয়েছিল মহীশূর রাজ্যটি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে সেখানকার দুর্বল রাজাকে সরিয়ে দিয়ে দু'জন মন্ত্রী ক্ষমতা দখল করেন। হায়দার আলি আবার তাঁদের সরিয়ে মহীশূরের সিংহাসনে বসেন।

হায়দার আলির পিতা ফতে মহম্মদ মহীশূর রাজ্যের একজন সামান্য সিপাহী ছিলেন। প্রথম জীবনে হায়দার মহীশূরের হিন্দু রাজার অধীনে কাজ করেন। পরে তিনি রাজ্যটি দখল করেন (১৭৬১ খ্রীঃ) এবং রাজ্যের সর্বেসর্বা হন। হায়দার নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু সাহস ও কূটবুদ্ধিতে তিনি ছিলেন অসাধারণ। অল্প সময়ের মধ্যে হায়দার দক্ষিণ ভারতের বহু অঞ্চল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। মহীশূরে হায়দার আলির উত্থানের ফলে মারাঠা, নিজাম এবং ইংরাজ শঙ্কিত হয়। হায়দার আলিকে দমন করবার জন্য এই

তিনটি শক্তি মৈত্রী স্থাপন করে। এই সময় লণ্ডনের কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নির্দেশ দিয়েছিল, —"আমরা দেখতে চাই যে, ভারতীয় রাজারাই একে অন্যের প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছেন।" তীক্ষ্মবুদ্ধি হায়দারও ভারতীয় শক্তিগুলিকে ইংরেজদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, ইংরেজই প্রধান শত্রু। প্রথমে মারাঠারা মহীশূর আক্রমণ করে। হায়দার টাকা দিয়ে মারাঠাদের শান্ত করেন। নিজাম একবার ইংরেজ পক্ষে, আবার হায়দারের পক্ষে এবং পরে আবার ইংরেজ পক্ষে যোগ দেয়।



ওয়ারেন হেস্টিংস



টিপু সুলতান

নিজাম হায়দারের পক্ষ ত্যাগ করলেও হায়দার ইংরাজদের বিরুদ্ধে মাদ্রাজের নিকট সসৈন্যে উপস্থিত হন। প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে হায়দার ইংরেজ সৈন্যদলকে পরাজিত করে ম্যাঙ্গালোর অধিকার করেন (১৭৬৯ খ্রীঃ)। ইংরেজগণ বিপদ বুঝে হায়দারের সঙ্গে হায়দারেরই শর্তে সন্ধি স্থাপন করে।

এই সময় নিজাম, মারাঠা এবং হায়দার ইংরেজের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হন। ওয়ারেন হেস্টিংস দেশীয় রাজশক্তির এই ঐক্য ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করেন। তিনি নিজাম, বেরারের রাজা এবং মহাদাজী সিন্ধিয়াকে হায়দার আলির পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হন। হেস্টিংস তৎকালীন ভারতস্থ ইংরেজ বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ আয়ার কুটকে হায়দারের বিরুদ্ধে পাঠান। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে প্রথম দিকে হায়দার জয়লাভ করেছিলেন ; কিন্তু পোর্টোনোভোর যুদ্ধে হায়দার আয়ার কুটের কাছে পরাজিত হন (১৭৮১ খ্রীঃ)।

হায়দার বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যান্সার রোগে হায়দারের মৃত্যু হয়।

হায়দার আলির মৃত্যুর পর তাঁর বীরপুত্র টিপু "সুলতান" উপাধি ধারণ করেন (১৭৮২ খ্রীঃ)। টিপু তাঁর পিতার ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। টিপু সুশাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে কৃষকদের উন্নতি হয় এবং মহীশূর রাজ্য সমৃদ্ধ

হয়। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে টিপু বা ইংরেজ কোনো পক্ষই সুবিধা করতে পারে না। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে টিপু সুলতান ইংরেজের সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরে সন্ধি স্থাপন করেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে উভয় পক্ষই বিজিত অঞ্চল প্রত্যর্পণ করেন।



লর্ড কর্ণওয়ালিস



লর্ড ওয়েলেসলি

হেস্টিংস-এর পর গভর্নর-জেনারেল হন লর্ড কর্ণওয়ালিশ (১৭৮৬ খ্রীঃ)। কর্ণওয়ালিস টিপুর বিরুদ্ধে নিজাম, মারাঠা এবং ত্রিবাঙ্কুর ও কুর্গের শাসকদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। টিপু ইংরেজদের আশ্রিত রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করেন। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ঃ ইংরেজ-মারাঠা নিজাম সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে টিপু একাকী অবিরতভাবে দুই বৎসর যুদ্ধ করেন। শেষে তাঁকে সন্ধি করতে হয় (১৭৯২ খ্রীঃ)। শ্রীরঙ্গপত্তন সন্ধি অনুসারে ইংরেজ ও ইংরেজের মিত্রপক্ষ টিপুর রাজ্যের অর্ধাংশ লাভ করে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ টিপুকে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দিতে হয়। ইংরেজগণ টিপুর দুই পুত্রকে জামিন স্বরূপ রেখে দেয়। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ ভারতে টিপুর প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখে দেশীয় শক্তিগুলি ঐক্যবোধ ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে এই সত্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হলেও টিপুর স্বাধীনতা স্পৃহা ছিল অদম্য। তিনি এই পরাজয়কে মেনে নিতে পারেননি।

ইউরোপে তখন চলেছে ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯ খ্রীঃ)। বিপ্লবী ফ্রান্স ভারতে ইংরেজ বিরোধী মিত্রশক্তির খোঁজ করছিল। দেশীয় শক্তিগুলির দ্বারা পরিত্যক্ত টিপু ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। ইংরেজদের ঘায়েল করবার জন্য ফ্রান্সের দেড়শত ফরাসী স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক টিপুর সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। টিপু আরব, তুরস্ক, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশেরও সাহায্য লাভের চেষ্টা করেন এবং কোম্পানীর অধীনতা-মূলক মিত্রতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলেসলি ভারতের গভর্নর-জেনারেল হন। ওয়েলসলি এবং তাঁর ভাই আর্থার ওয়েলসলি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

দেশীয় রাজাদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়াররূপে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি। বক্সার যুদ্ধের পর বঙ্গদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও, যতদিন পর্যন্ত মারাঠা ঘোড়সওয়ারগণ সজাগ ও শক্তিশালী ছিল, ততদিন পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে নাই। গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলির সময় থেকে (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রীঃ) ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তার ঘটতে থাকে এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল সর্বোচ্চ ক্ষমতা অধিকারের দিকে অগ্রসর হয়। এই সময় ভারতের দুটি বৃহৎ শক্তি মারাঠা এবং মহীশূর দুর্বল হয়ে পড়ে। ওয়েলেসলি ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ, প্রাক্তন শাসকদের রাজ্য অধিগ্রহণ এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতি 'অধীনতামূলক মৈত্রী' নীতি অনুসরণ করে-ছিলেন।

অধীনতামূলক মৈত্রী নীতির সর্বোচ্চ ক্ষমতা ঃ এই ধারণার পশ্চাতে সামন্ততন্ত্র-সুলভ প্রভু ও অধস্তন পর্যায়ের সম্পর্কের অস্তিত্ব রয়েছে। অর্থাৎ, সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে গভর্নর-জেনারেল ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হল প্রভু এবং দেশীয় রাজন্যবর্গ তাদের অধস্তন—ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মৈত্রী নীতিতে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছিল। অধীনতামূলক মৈত্রী-নীতি অনুসারে এই নীতি গ্রহণকারী রাজা তার রাজ্যে একদল ব্রিটিশ সেনা রাখবেন এবং ব্রিটিশ সৈন্যদলের ব্যয়ভার বহনের জন্য কোম্পানিকে বার্ষিক অর্থপ্রদান করবেন—কার্যতঃ যা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামন্ত কর্তৃক প্রভুকে দেয় করেরই অনুরূপ। কোনো কোনো দেশীয় শাসক বার্ষিক অর্থদানের পরিবর্তে তাঁর রাজ্যের একটি অঞ্চল কোম্পানিকে হস্তান্তর করে ইংরেজের অধীনতামূলক মৈত্রী নীতিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই নীতির অন্যান্য শর্ত ছিল—অধীনতামূলক মৈত্রীতে আবদ্ধ শাসককর্তার রাজ্যে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট থাকবেন ; ইংরাজের অনুমতি ছাড়া রাজ্যমধ্যে সরকারি কর্মে কোনো ইউরোপীয় নিয়োগ করা চলবে না এবং গভর্নর-জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত অপর কোনো ভারতীয় রাজার সঙ্গে পরামর্শ করাও চলবে না। বিনিময়ে কোম্পানি শত্রুদের হাত থেকে মৈত্রী আবদ্ধ রাজার রাজ্যরক্ষা করবে। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোম্পানি হস্তক্ষেপ করবে না—এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়। সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়েই নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন। আভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট দৈনন্দিন শাসনকর্মে হস্তক্ষেপ করতেন।

দেশীয় রাজ্যগুলির উপর প্রভাব ঃ অধীনতামূলক মৈত্রী নীতি গভর্নর-জেনারেল ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা অধিকার করতে প্রভূত সাহায্য করে। হায়দরাবাদের নিজাম সর্বপ্রথম অধীনতামূলক মৈত্রী নীতি স্বীকার করে লর্ড ওয়েলেসলির সঙ্গে চুক্তি কার্যতঃ অধীনতামূলক মৈত্রী নীতি স্বাক্ষরকারী ভারতীয় শাসক আত্মরক্ষা, বৈদেশিক স্বাক্ষর করেন (১৮০০ খ্রীঃ)। চুক্তি অনুসারে নিজাম তাঁর ফরাসীদের দিয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেনাদল ভেঙে দেন। হায়দরাবাদে ইংরেজ ফৌজ রাখবার জন্য নিজামকে বার্ষিক ২৪১,৭১০

পাউন্ড দিতে হয়। ইংরেজগণ মারাঠা আক্রমণ থেকে নিজামকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দেয়। পরবর্তীকালে নিজাম তার রাজ্যের কিছু অংশ কোম্পানিকে ছেড়ে দিয়ে ব্রিটিশ সেনাদল পালনের জন্য বার্ষিক বিপুল ব্যয়ভারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পান। মহীশূরের টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর ওয়েলেসলি টিপুর রাজ্যের অর্ধাংশ নিজাম ও কোম্পানীর মধ্যে ভাগ করে দেন। অবশিষ্ট অর্ধাংশের উপর ওয়েলেসলি মহীশূরের প্রাক্তন রাজবংশকে অধিষ্ঠিত করেন। নূতন রাজা ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মৈত্রী নীতিতে আবদ্ধ হন। চুক্তি হয় যে, প্রয়োজনবোধে গভর্নর-জেনারেল মহীশূর রাজ্য গ্রহণ করতে পারবেন। মহীশূর সম্পূর্ণভাবে কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলেসলি কর্ণাটকের নবাবকে বৃত্তি দিয়ে কর্ণাটক রাজ্য কোম্পানির শাসনভুক্ত করেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও মারাঠা অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ইংরেজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং অধীনতামূলক মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ওয়েলেসলির ভাষায় এই চুক্তি "মারাঠা সাম্রাজ্যের উপর সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ স্বার্থ প্রতিষ্ঠার" সুযোগ এনে দিয়েছিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ আলম সম্পূর্ণভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য ব্রিটিশ সৈন্য দিল্লী অধিকার করেছিল। ওয়েলেসলি বৃদ্ধ বাদশাহকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, মারাঠাদের হাত থেকে বাদশাহকে রক্ষা করবার জন্যই জেনারেল লেক দিল্লী অধিকার করেছেন। ওয়েলেসলির কথায় আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হয়ে মুঘল বাদশাহ শাহ্ আলম লেককে উপাধি দিয়েছিলেন "সুমসামউদ্দৌলা আসগর উল-মুলক্ খান-দৌরান-খান জেনারেল জেরাল্ড লেক বাহাদুর ফতে জঙ্গ, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় তরবারি—দেশবীর—যুগাধিনায়ক—যুদ্ধজয়ী জেনারেল জেরাল্ড লেক বাহাদুর। কার্যতঃ ওয়েলেসলি দিল্লী অধিকার করে নামসর্বস্ব মুঘল মহিমার কেন্দ্রবিন্দুটিতেই ব্রিটিশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে দিলেন।

ওয়েলেসলি ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা অধিকারের দিকে আগিয়ে দিলেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন পর্যন্তও ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি, সম্পূর্ণ ভারত তখনও কোম্পানীর করায়ত্ত নয়। গভর্নর-জেরারেল লর্ড হেস্টিংস (১৮১৩-১৮২৩ খ্রীঃ) মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করে কোম্পানিকে ক্ষমতার পাদপীঠে অধিষ্ঠিত করেন। মারাঠা সাম্রাজ্য পুণার পেশোয়া, বরোদার গায়কোয়াড়, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার এবং নাগপুরের ভোঁসলে সর্দারদের নিয়ে গঠিত ছিল। মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রধান পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মৈত্রী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজ মৈত্রীবন্ধন থেকে মুক্তির জন্য পেশোয়া পুণার ব্রিটিশ রেসিডেন্সি আক্রমণ করলে লর্ড হেস্টিংস পেশোয়া, ভোঁসলে এবং হোলকারের সম্মিলিত আঘাত প্রতিরোধ করেন। যুদ্ধে মারাঠা সৈন্যদল পরাজিত হয়। লর্ড হেস্টিংস পেশোয়াকে রাজ্যচ্যুত করে কানপুরের কাছে বিঠুর তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেন। পেশোয়া ইংরেজের বৃত্তিভোগী হন। হোলকার এবং ভোঁসলে অধীনতামূলক মৈত্রী নীতি গ্রহণ করেন। পেশোয়ার রাজ্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয়। হেস্টিংস পেশোয়ার রাজ্যের এক অংশে ক্ষুদ্র সাতারা রাজ্য স্থাপন করেন। অন্যান্য মারাঠা সর্দারের রাজ্যাংশেও কোম্পানির

শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড হেস্টিংস সিন্ধিয়াকে ব্রিটিশ আধিপত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেন। বরোদার গায়কোয়াড় আগেই ব্রিটিশ পক্ষভুক্ত হয়েছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে রাজপুত রাজ্যগুলির উপর সিন্ধিয়া এবং হোলকারের আধিপত্য ছিল। সিন্ধিয়া এবং হোলকার ব্রিটিশ প্রভুত্ব গ্রহণ করলে রাজপুত রাজ্যগুলোও ইংরেজ প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সিন্ধু এবং পাঞ্জাব ছাড়া সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ শক্তি সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ ইঙ্গমহীশূর যুদ্ধ : ওয়েলেসলি টিপুকে স্তব্ধ করার জন্য এবং ভারতে ফরাসী শক্তির পুনঃপ্রবেশ বন্ধ করবার জন্য মহীশূর আক্রমণ করেন (১৭৯৯ খ্রীঃ)। চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ছিল স্বল্পস্থায়ী। কিন্তু এই যুদ্ধেই টিপু এবং ইংরজেদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করেও টিপু যুদ্ধে হেরে যান। রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন রক্ষার সময় টিপু যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। (৪ মে, ১৭৯৯ খ্রীঃ) টিপুর রাজ্যাংশ ইংরেজ এবং নিজাম ভাগাভাগি করে নেয়। অবশিষ্ট ছোট অংশটিকে ওয়েলেসলি মহীশূরের প্রাক্তন হিন্দু রাজবংশের একজন নাবালক বংশধরকে দিয়ে মহীশূরের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। স্বাধীন মহীশূর ইংরেজের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।

নিজাম ওয়েলেসলি প্রবর্তিত অধীনতামূলক মৈত্রী নীতি গ্রহণ করে ইংরেজদের বশীভূত হয়। দক্ষিণ ভারতে অবশিষ্ট ভারতীয় শক্তি রইল মারাঠা।

(খ) **মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিরোধ ও পরাজয় :** পানিপথের পরাজয়ের পরেও পেশোয়া মাধবরাও-এর নেতৃত্ব মারাঠাশক্তি আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। ১৭৭১ সালে দিল্লী পর্যন্ত তাদের আধিপত্যে আসে।

মারাঠাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের ফলেই মারাঠাগণ ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া মাধব রাওয়ের মৃত্যু হয়। মাধব-রাও-এর পরে মাধব রাওয়ের ভাই নারায়ণ রাও পেশোয়া হন। মাধব রাওয়ের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও পেশোয়া পদের প্রত্যাশী ছিলেন। রঘুনাথ রাও নারায়ণ রাওয়ের বিরুদ্ধ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। পেশোয়া পদলাভের কয়েক মাস পরই নারায়ণ রাও নিহত হন। রঘুনাথ পেশোয়া হন।

রঘুনাথ রাও মাত্র অল্প কিছুকাল পেশোয়া থাকতে পেরেছিলেন। নারায়ণ রাও নিহত হবার পর তাঁর বিধবা স্ত্রী গঙ্গাবাঈ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। নানা ফড়নবিশের নেতৃত্বে পুণার মারাঠা নায়কগণ এই নবজাত শিশু দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশোয়ারূপে বরণ করেন। রঘুনাথ বিতাড়িত হন।

নানা ফড়নবিশের প্রকৃত নাম বালাজী জনার্দন। তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। সকলে তাঁকে "নানা" বলত। নানা পেশোয়া-র অধীনে ফড়নবিশের কাজ করতেন। এজন্য তিনি ফড়নবিশ নামে পরিচিত হন। নানা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রীঃ) অংশ-গ্রহণ করেছিলেন। এই যুদ্ধে মারাঠাগণ আহম্মদ শাহ আবদালী, রোহিলাখন্ড ও অযোধ্যার মিলিত শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

বিতাড়িত রঘুনাথ রাও পেশোয়া পদ লাভের জন্য বোম্বাইয়ের ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরেজরাও নিজেদের স্বার্থে রঘুনাথ রাওয়ের দাবি সমর্থন করে। পরস্পরের স্বার্থ দেখার জন্য রঘুনাথ রাও ও ইংরেজদের মধ্যে সুরাটে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় (১৭৭৫ খ্রীঃ)। রঘুনাথের এবং ইংরেজদের সৈন্যদল মারাঠা অঞ্চল আক্রমণ করে। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

ভারতের তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বোম্বাই কাউন্সিল-এর রঘুনাথ তোষণ এবং যুদ্ধনীতির বিরোধী ছিলেন। হেস্টিংস-এর নির্দেশে ইংরেজগণ পুণার মারাঠা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন (১৭৭৬ খ্রীঃ)। পুরন্দরের সন্ধি অনুসারে সুরাটের সন্ধি বাতিল হয়।


নানা ফড়নবিশ

অবশ্য বোম্বাই কাউন্সিল বা মারাঠা কর্তৃপক্ষ কেহই পুরন্দরের সন্ধি পালনে আগ্রহী ছিল না। বোম্বাই কাউন্সিল পুরন্দরের সন্ধিশর্ত অগ্রাহ্য করে রঘুনাথ রাওকে আশ্রয় দেয়। নানা ফড়নবিশও ইংরেজদের মতিগতি বুঝতে পেরে ফরাসীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টরস বোম্বাই কাউন্সিল-এর কাজই সমর্থন করে। এমন অবস্থায় ইংরেজ এবং মারাঠাদের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তেলিগাঁও-এর যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ মারাঠাদের কাছে পরাজিত হয়। বোম্বাই সরকার ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে যতখানি মারাঠা অঞ্চল অধিকার করেছিল, তার সবটাই মারাঠাদের ফিরিয়ে দিতে স্বীকৃত হয় এবং রঘুনাথকেই দান করেন। এই মর্মে ওয়াড়গাঁও সন্ধি স্বাক্ষর করে (১৭৭৯ খ্রীঃ)।

সলবই সন্ধি ঃ তেলিগাঁওয়ে পরাজয়ের ফলে স্পষ্টতই ইংরেজদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছিল। হেস্টিংস ইংরেজ পক্ষের লুপ্ত মর্যাদা উদ্ধার করবার জন্য ওয়াড়গাঁও সন্ধি-শর্ত অস্বীকার করেন। তিনি বঙ্গদেশ থেকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সেনাদল পাঠান। পুনার নিকট ইংরেজবাহিনী পরাজিত হয় (১৭৮১ খ্রীঃ)। কিন্তু মহাদাজী সিন্ধিয়া ইংরেজ আক্রমণে বিপর্যস্ত হন। সিন্ধিয়া বিভিন্ন মারাঠা শক্তির নেতৃত্বলাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করেন। সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় সলবই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় (১৭৮২ খ্রীঃ)। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফড়নবিশ এই সন্ধি মেনে নেন। সলবই সন্ধি অনুসারে ইংরেজরা দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশোয়া হিসাবে স্বীকার করে, সিন্ধিয়া যমুনার পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল ফিরে পায়, রঘুনাথ রাও বৃত্তি লাভ করেন, হায়দার আলিকে আর্কটের নবাবের অঞ্চল প্রত্যর্পণ করতে হয় এবং সালসেট দ্বীপের উপর ইংরেজদের দাবি স্বীকৃত হয়। দীর্ঘকাল ধরে এই দ্বীপটির উপর বোম্বাই কাউন্সিল-এর ইংরেজদের লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। সলবই সন্ধির ফলে ইংরাজদের সাম্রাজ্য বা সম্পদ বৃদ্ধির দিক থেকে বিশেষ কিছু লাভ হল না। কিন্তু এই সন্ধি ইংরেজ এবং মারাঠা উভয় পক্ষকে অন্ততঃ বিশ বৎসরের জন্য শান্তিতে থাকবার সুযোগ এনে দিয়েছিল।

সলবই সন্ধি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের (১৭৭৫—১৭৮২ খ্রীঃ) অবসান হয়।

মারাঠা অন্তঃবিরোধ ঃ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহাদাজী সিন্ধিয়া, অহল্যাবাঈ হোলকার, তুকোজী হোলকার, নানা ফড়নবিশ এবং পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও মারা যান। তাঁদের মৃত্যুর ফলে মারাঠাদের মধ্যে উপযুক্ত নেতৃত্বের সংকট দেখা দিল। মহাদাজী সিন্ধিয়া দিল্লীর মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে তাঁর তাঁবেদারে পরিণত করেছিলেন। মহাদাজীর নেতৃত্বে উত্তর ভারতে মারাঠা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। মলহর রাও হোলকারের পুত্রবধূ রানী অহল্যাবাঈ শাসনকার্যে অসাধারণ যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁদের মৃত্যুর পর মারাঠাদের অন্তঃকলহ প্রবল হয়ে উঠল। মারাঠা সাম্রাজ্য পাঁচজন প্রধান মারাঠা নায়কের অধীনে বিভক্ত ছিল—পুনার পেশোয়া, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, বরোদার গায়কোয়াড়, ইন্দোরের হোলকার এবং নাগপুরের ভোঁসলে। পেশোয়ার প্রতি মারাঠা নায়কদের নামমাত্র আনুগত্য ছিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফড়নবিশের মৃত্যু হয়। এই সময় যশোবন্ত রাও হোলকার পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও এবং দৌলত রাও সিন্ধিয়ার মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে পেশোয়া এবং সিন্ধিয়ার সৈন্যদল হোলকারের কাছে পরাজিত হয় (১৮০২ খ্রীঃ)। পরাজিত পেশোয়া ইংরেজের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। গভর্নর-জেনারেল ওয়েলেসলি এই রকম সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তিনি পেশোয়ার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁকে অধীনতামূলক মৈত্রী নীতিতে আবদ্ধ করেন। বেসিন চুক্তিতে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মৈত্রী চুক্তি মেনে নেন (৩১শে ডিসেম্বর, ১৮০২ খ্রীঃ)।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ঃ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে (১৮০৩-০৬ খ্রীঃ) সিন্ধিয়া এবং ভোঁসলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। গায়কোয়াড় ইংরেজদের সাহায্য করেন। হোলকার কোনো পক্ষে যোগ না দিয়ে চুপচাপ থাকেন। আর্থার ওয়েলেসলি সিন্ধিয়া এবং ভোঁসলের বহিনীকে অসঈ এবং অবগাঁও-এর যুদ্ধে পরাজিত করেন (১৮০৩ খ্রীঃ)। উত্তর ভারতে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেক সিন্ধিয়ার সৈন্যদলকে পরাজিত করে দিল্লী এবং আগ্রা অধিকার করেন। মুঘল বাদশাহ্ দ্বিতীয় শাহ্ আলম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। সিন্ধিয়া এবং ভোঁসলে ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মৈত্রী নীতি মেনে নেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বরোদার গায়কোয়াড়ও অধীনতামূলক মৈত্রী নীতিতে স্বাক্ষর করেন।

মারাঠা প্রধানদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিলেন হোলকার। হোলকার প্রচন্ড উদ্যমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ভরতপুরের রাজা হোলকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। ভরতপুরের রাজার নিকট লর্ড লেককে প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। হোলকার মারাঠা রণকৌশল প্রয়োগ করে ইংরেজ সেনাদলের গতি স্তব্ধ করে দেন। এই সব যুদ্ধের কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রচুরভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইউরোপেও এই সময় ফরাসী বীর নেপোলিয়ান ইংরেজের আতঙ্করূপে দেখা দিয়েছিলেন। ইস্ট

ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজঘাটের সন্ধি দ্বারা হোলকারের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে (১৮০৬ খ্রীঃ)।

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো ভারতের গভর্নর-জেনারেল হন। মিণ্টো ত্রিবাঙ্কুর এবং বুন্দেলখণ্ডে ছোটখাট যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। মিণ্টোর শাসনকালে পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন।

১৮১৩ খ্রীষ্টব্দে ভারতের গভর্নর-জেনারেল হন লর্ড হেস্টিংস। লর্ড হেস্টিংস লর্ড ময়রা নামেও খ্যাত। লর্ড হেস্টিংস-এর অন্যতম কীর্তি পিন্ডারি দমন (১৮১৭-১৮ খ্রীঃ)। পিন্ডারিগণ নিছক ডাকাত দল ছিল না। ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মৈত্রী নীতি গ্রহণ করার ফলে বহু দেশীয় রাজা তাঁদের সৈন্যদল ভেঙে দিয়েছিলেন। এইসব বেকার সৈন্য পিন্ডারিদের দলে যোগ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে কর্মহীন মারাঠা সৈন্যও ছিল। মধ্যভারতে পিন্ডারিগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লুণ্ঠন করত। লর্ড হেস্টিংস পিন্ডারি দমন করার নামে প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে দুটো বিশাল সেনাদল গড়লেন।

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ঃ মারাঠা বাসভূমির কাছে এত সৈন্যের সমাবেশ যে নিছক পিন্ডারি দমনের জন্য, মারাঠারা এটা বিশ্বাস করল না। তারা লর্ড হেস্টিংসের সৈন্য সমাবেশের পিছনে ব্রিটিশ চক্রান্ত অনুমান করল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও বেসিন চুক্তির অপমান ভুলতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি অধৈর্য হয়ে পুনার ব্রিটিশ রেসিডেন্সিতে আগুন লাগিয়ে দেন। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট কিরকিতে চলে যান। কিরকিতে পেশোয়ার সৈন্যদল পরাজিত হয়। (১৮১৭ খ্রীঃ)। পুন্যার কাছে যুদ্ধেও মারাঠা সৈন্যদল পরাজয় বরণ করে। পেশোয়া বন্দী হন। ইংরেজগণ পেশোয়াকে বিঠুরে আনে। পেশোয়ার বৃত্তি স্থির হয় বার্ষিক আট লক্ষ টাকা। পেশোয়া-রাজ্য ইংরেজের অধিকারভুক্ত হয়।

পেশোয়ার অভ্যুত্থানে উৎসাহিত হয়ে নাগপুরের আপ্পাসাহেব এবং যশোবন্ত রাও হোলকারের পুত্র দ্বিতীয় মলহর রাও ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন। কিন্তু ইংরেজশক্তি তাঁদের উভয়কেই পরাজিত করে। হোলকার তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ অধিকার বিসর্জন দিয়ে ইংরেজের সাথে মান্দাসোরের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন (১৮১৮ খ্রীঃ)। আপ্পাসাহেব প্রথমে পাঞ্জাব এবং পরে যোধপুরে পালিয়ে যান। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে যোধপুরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে (১৮১৭- ১৮১৯ খ্রীঃ) মারাঠা শক্তির পতন ঘটে।

মারাঠাদের পতনের কারণ ঃ ভারতে মুঘল শক্তির পতনের সময় মারাঠাদের একটি জাতীয় শক্তি হিসাবে অভ্যুত্থানের সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কয়েকটি কারণে মারাঠারা এই গৌরব অর্জনে ব্যর্থ হয়। প্রথম কারণ, মারাঠা নায়কগণ শিক্ষা-বিস্তার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার দ্বারা জাতিগঠনের চেষ্টা করেন নাই। দ্বিতীয় কারণ, মারাঠা সাম্রাজ্যের কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থনীতি ছিল না। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির কাছ থেকে চৌথ এবং সরদেশমুখী নামক কর আদায় এবং এই করের উপর নির্ভর করে একটা সাম্রাজ্যের অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে না। তৃতীয় কারণ, মারাঠাদের জায়গীরদার

প্রথা। জায়গীরদারগণ স্বভাবতঃই তাঁদের জায়গীরের স্বার্থেই পরিচালিত হতেন। চতুর্থ কারণ ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো উপযুক্ত সামরিক সংগঠন মারাঠাদের ছিল না। পঞ্চম কারণ মারাঠাদের অন্তঃবিরোধ। ষষ্ঠ কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকেই মারাঠাদের মধ্যে দূরদর্শী নেতৃত্বের অভাব।

মারাঠাদের পতনের পর দক্ষিণ এবং মধ্য ভারতে ইংরাজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

(গ) শিখশক্তির উত্থান ও পতন

পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারাঠারা পাঞ্জাব থেকে হঠে গিয়েছিলেন আবার আহমদশাহ্ আবদালীও পাঞ্জাব দখলে রাখতে পারেননি। পাঞ্জাবে তখন জেঁকে বসে শিখশক্তি। পূর্ব, দক্ষিণ এবং মধ্যভারত জয়ের পর ইংরেজদের দৃষ্টি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে পড়ল। মারাঠা শক্তির পতনের পর ভারতে অবশিষ্ট উল্লেখযোগ্য শক্তি ছিল পাঞ্জাবের শিখগণ। রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখশক্তি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

রণজিৎ সিংহ : ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাহা সিংহ শিখদের সুখেরচাকিয়া মিসল-এর নায়ক ছিলেন। এই সময় শিখগণ কয়েকটি ছোট ছোট মিসল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। বার বৎসর বয়সে রণজিতের পিতৃবিয়োগ হয়। কাবুলের শাসনকর্তা জমান শাহ্ ভারত আক্রমণ কালে রণজিতের সাহায্য পান (১৭৯৩-৯৮ খ্রীঃ)। এই সাহায্যের স্বীকৃতি স্বরূপ জমান শাহ্ রণজিৎকে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং 'রাজা' উপাধি দেন (১৭৯৮ খ্রীঃ)। তখন রণজিতের বয়স মাত্র উনিশ। রণজিৎ অবশ্য প্রথম সুযোগেই আফগান প্রভাব থেকে পাঞ্জাবকে মুক্ত করেন। ছোট ছোট মিসল একত্র করে একটা শক্তিশালী শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাঁর মনে স্থান পায়। মিসলগুলির পারস্পরিক বিবাদ ও কলহের সুযোগ গ্রহণ করে রণজিৎ কয়েকটি মিস্‌ল তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন।

ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড লেক মারাঠা নায়ক হোলকারের পশ্চাদ্ধাবন করবার সময় হোলকার রণজিতের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রণজিৎ তাঁকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হন। ইতিপূর্বে মহাদাজী সিন্ধিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখ রাজ্যগুলির বিবাদ ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে পাঞ্জাবের শতদ্রু অঞ্চলে মারাঠা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইংরেজগণ মহাদাজীকে তাড়িয়ে দিয়ে এই অঞ্চল ইংরেজ প্রভাবাধীনে আনে। সম্ভবত বহিঃশক্তির অনুরূপ অনুপ্রবেশ এড়াবার জন্যই রণজিৎ সিংহ হোলকারকে নিজ রাজ্য মধ্যে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু শক্তিশালী শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য রণজিৎ শতদ্রু অঞ্চলের ছোট ছোট শিখ রাজ্যগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং লুধিয়ানা অধিকার করেন (১৮০৬-০৭ খ্রীঃ) ভারতে তখন লর্ড কর্নওয়ালিস-এর দ্বিতীয় বারের শাসনকাল শেষ এবং লর্ড মিণ্টোর শাসনকাল আরম্ভ।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে রণজিতের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে লর্ড মিণ্টো কূটনৈতিক কারণে রণজিতের সাহায্যপ্রার্থী হন। ইউরোপ তখন নেপোলিয়নের অভ্যুদয়ের ফলে ইংরাজশক্তি আতঙ্কিত। ইংরেজরা আশঙ্কা করেছিলেন যে তুরস্ক এবং পারস্যের সহযোগিতায় ফ্রান্স ভারতের ইংরেজ ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করবে। এই সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে ভারতের উত্তর-

পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করবার জন্যই গভর্নর-জেনারেল লর্ড মিণ্টো রণজিৎ সিংহের সাহায্য চেয়েছিলেন। রণজিৎ ইংরেজদের দুর্বলতা বুঝতে পেরে তাঁর রাজ্যসীমা দ্রুত বৃদ্ধি করলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, এই বিপদ সম্ভাবনার মধ্যে ইংরেজগণ তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।

ইতিমধ্যে ইংরেজদের নেপোলিয়ন-ভীতি কিছুটা দূর হয়। তুরস্কের সঙ্গেও ইংরেজদের সম্পর্কের পরিবর্তন হয়। অতএব ইংরেজগণ রণজিতের ক্ষমতা বৃদ্ধি রোধ করবার জন্য লর্ড অক্টারলোনির নেতৃত্বে অভিযান করেন। রণজিৎ ইংরেজের সঙ্গে অমৃতসরে 'চিরস্থায়ী মৈত্রী চুক্তি' সম্পাদন করেন (১৮০৯ খ্রীঃ)। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, রণজিৎ শতদ্রুর পশ্চিম তীরের শিখরাজ্যের অধীশ্বর থাকবেন। অমৃতসরে স্বাক্ষরিত চুক্তির ফলে শতদ্রুর পূর্বতীরের শিখরাজ্যগুলি ইংরেজ প্রভাবাধীনে আসে। ব্রিটিশ ভারতের সীমানা যমুনা থেকে পাঞ্জাবের শতদ্রু নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

রাজ্যবিস্তার ঃ পূর্বদিকে রাজ্যবিস্তার বন্ধ হওয়াতে রণজিৎ পশ্চিম, উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ দেন। গুর্খাদের পরাজিত করে তিনি কাংড়া জেলা লাভ করেন। আফগানদের পরাজিত করার পর আটক জেলা রণজিতের রাজ্যভুক্ত হয়। আফগান শাসক শাহ সুজাকে আশ্রয় দিয়ে রণজিৎ জগদ্বিখ্যাত কোহিনুর হীরক লাভ করেন। আফগানরাজ শাহ্ সুজা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে লাহোরে আশ্রয় পেয়েছিলেন (১৮১৩-১৪ খ্রীঃ)। মুলতান এবং কাশ্মীর রণজিৎ কর্তৃক বিজিত হয়। রণজিতের সেনাদল পেশোয়ারও জয় করে।

এই সময় ইংরেজদের রুশ-ভীতি প্রবল হয়ে উঠেছিল। আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে রুশ আক্রমণ হলে রণজিতের শিখরাজ্য যেন রুশ আক্রমণ প্রতিরোধ করে—এই আশায় বেণ্টিঙ্ক রণজিতের সাথে দেখা করেছিলেন (১৮৩১ খ্রীঃ)। এই সাক্ষাৎকারে ইঙ্গ-শিখ মৈত্রী প্রতিফলিত হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে রণজিৎ সিংহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রণজিৎ সিংহ ভারত ইতিহাসের একটি অসাধারণ চরিত্র। আশ্চর্য রণনৈপুণ্য ও দৃঢ়তার ফলে তিনি শক্তিশালী শিখরাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সুশ্রী ছিলেন না। বাল্যকালে বসন্ত রোগে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়। রণজিৎ আপন কর্ম-সাধনায় ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বহু সংগ্রামের বিজয়ী যোদ্ধা রণজিৎ নিষ্ঠুর ছিলেন না। তাঁর রণজয়ী সৈন্যবাহিনীকে তিনি যে শুধু আধুনিক কায়দায় গড়ে তুলেছিলেন তা নয়, রণজিতের পরিচালনাধীন শিখ সৈন্যগণ ছিল আশ্চর্য রকমের ধর্মনিষ্ঠ। সমসাময়িক ফরাসী. জার্মান প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ রণজিতের গুণাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ফরাসী পর্যটক রণজিত সম্পর্কে বলেছিলেন—'আশ্চর্য ব্যক্তি, নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ছোট সংস্করণ।' রণজিতের শাসন-ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল ছিল। তাঁর শাসনকালে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়। মানচিত্রে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল লাল রঙে রঞ্জিত দেখে রণজিৎ বলেছিলেন—'সব লাল হো জায়েগা।' রণজিতের কথা সত্য হয়েছিল। এমন কি, রণজিতের মৃত্যুর পর পাঞ্জাবও ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে. ইংরেজদের এই আক্রমণাত্মক ভূমিকা বুঝতে পেরেও রণজিৎ

ভারত থেকে ইংরেজ প্রাধান্য দূর করবার জন্য যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন না।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর দুই পুত্রের মৃত্যু হয়। অতঃপর রণজিতের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহ রাজা হন (১৮৪৩ খ্রীঃ) রাজমাতা রাণী ঝিন্দন হন দলীপের অভিভাবিকা। দলীপের উজির লাল সিংহ এবং সেনাবাহিনীর প্রধান তেজসিংহ ক্ষমতা লাভের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেন। শিখনায়কগণও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সৈনিকদের হাতে ক্ষমতা এসে যায়। এই সৈনিকগণ সাহসী ও দেশপ্রেমিক হলেও তারা ছিল অক্ষম নেতৃত্বে অসংগঠিত।

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ঃ শিখনেতারা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিজেদের সৈন্য সম্পর্কেই ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁরা শিখ সৈনিকদের ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। লুধিয়ানার ইংরেজ মেজর ব্রডফুট শিখদের নানাভাবে উস্কানি দিয়েছিলেন। এই সময় গভর্নর-জেনারেল ছিলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। শিখ সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হল যে, লর্ড হার্ডিঞ্জ ফিরোজপুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। শিখ সৈন্যগণ শত্রুকে আঘাত করবার জন্য প্রস্তুত হল। এইভাবেই প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের সূত্রপাত হয় (১৮৪৫-৪৬ খ্রীঃ)। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পাঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান-শিখগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অমিতবিক্রমে শত্রুকে বাধা দেয়, কিন্তু দলীপ সিংহের উজির এবং সৈন্যাধ্যক্ষ গোপনে ইংরাজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। অন্যান্য শিখ নেতারাও কার্যতঃ বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা নেয়। এইসব কারণে শিখ সৈন্যগণ পরাজয় বরণ করে। লাহোর সন্ধি (১৮৪৬ খ্রীঃ) অনুসারে জলন্ধর দোয়াব অঞ্চলের



লর্ড ডালহৌসি



রণজিৎ সিংহ

উপর ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং শিখ সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করা হয়। ইংরেজগণ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে জম্মু ও কাশ্মীর গুলাব সিং ডোগরার কাছে বিক্রী করে। অন্য একটি চুক্তি অনুসারে লাহোরের ইংরেজ রেসিডেন্ট পাঞ্জাবের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ঃ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি গভর্নর-জেনারেল হন।

তিনি ছিলেন প্রচণ্ডভাবে সাম্রাজ্যবাদী শাসক। স্বাধীনতাপ্রিয় শিখগণ নানা স্থানে বিদ্রোহের চেষ্টা করছিলেন। এইসব বিদ্রোহের মধ্যে মুলতানের বিদ্রোহ এবং হাজারার শাসনকর্তা ছত্তর সিংয়ের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। ডালহৌসি শিখদের বিদ্রোহ দমনের জন্য দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯ খ্রীঃ) **আরম্ভ** করেন। চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ইংরেজপক্ষকে প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু পরিণামে শিখগণ পরাজয় বরণ করে। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ডালহৌসি ভারতের শেষ স্বাধীন রাজ্য পাঞ্জাব ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন।

সিন্ধু বিজয়

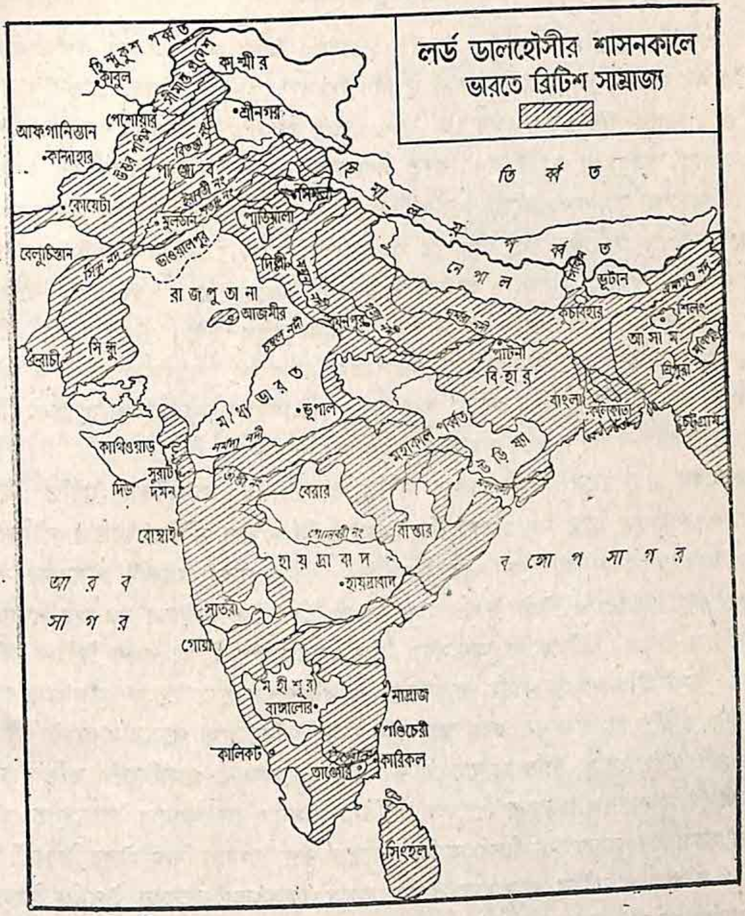
সিন্ধু বিজয় (১৮৪৩) : সিন্ধুদেশ আক্রমণের কারণ : ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ ভারতের অধিকারভুক্ত হয়। অতিরিক্ত রুশভীতি থেকে শাসকগণ সিন্ধুদেশ জয় করেন। ইংরাজদের আশঙ্কা ছিল যে, রাশিয়া পারস্য ও আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারত আক্রমণ করবে। ভৌগোলিক দূরত্ব বিচারে এই কল্পিত রুশ-আক্রমণ কতখানি সম্ভব ছিল বলা শক্ত। কারণ ব্রিটিশ ভারত থেকে কাছাকাছি রুশ ঘাঁটি খিবার দূরত্ব ছিল আট শত মাইল, বোখারার দূরত্ব ছিল এগার শত মাইল। তবে ইংলণ্ড এবং রাশিয়া এই সময় পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ককেসাস-এর রুশ সেনাপতি পাস্কিভিচ প্রকাশ্যেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা বলেছিলেন। যাহা হউক, মধ্য-এশিয়ার দিক থেকে ভারতের দিকে রুশ অভিযান প্রতিহত করবার জন্য ইংরাজগণ সিন্ধুদেশ অধিকারের পরিকল্পনা করে। সিন্ধুনদের গুরুত্ব এবং সিন্ধুদেশের বাণিজ্যিক সম্ভাবনাও ইংরাজদের এই অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তারে প্রলুব্ধ করেছিল।

সিন্ধুদেশ বিভিন্ন আমীররা শাসন করতেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে আমীরদের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ইংরাজগণ সিন্ধুদেশে বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করে। ইংরাজগণ বারবার সিন্ধুদেশের সংহতি রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে সিন্ধুর আমীরগণ ইংরেজদের সঙ্গে অধীনতামূলক মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেন ১৮৩৯ খ্রীঃ)। কিন্তু কার্যতঃ ইংরেজ সেনাপতি স্যার চার্লস নেপিয়ার ইংরেজ স্বার্থে সিন্ধুদেশ অভিযান করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সিন্ধুদেশ অধিকার করেন (১৮৪৩ খ্রীঃ)। আমীরগণ নির্বাসিত হলেন আর নেপেয়ার ইংরেজ সরকার কর্তৃক ৭ লক্ষ টাকার পুরস্কার লাভ করেন।

ডালহৌসির স্বত্ত্ববিলোপ নীতি (Doctrine of Lapse)

ডালহৌসির স্বত্ত্ববিলোপ নীতি : ডালহৌসি দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসক ছিলেন। তার লক্ষ্যই ছিল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি গভর্নর-জেনারেল রূপে ভারত শাসন করেন। ব্রিটিশ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র তাঁর শাসনকালে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠে। ডালহৌসির ভারত শাসনের একটি আদর্শগত দিকও ছিল। এই আদর্শ সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ। নিজের সম্বন্ধে ডালহৌসি বলেছিলেন, 'স্বৈরাচারী ও উদারনৈতিকের বিচিত্র সংমিশ্রণ'। ভারতে ব্রিটিশ প্রভাব বৃদ্ধির জন্য লর্ড ডালহৌসি স্বত্ত্ববিলোপ নীতি দেশীয় রাজন্যবর্গের উপাধি ও খেতাব অস্বীকার নীতি এবং নীতিহীনতার নীতি সব কিছুই অবলম্বন করেছিলেন।

প্রথম হইতেই ডালহৌসি নানা আছিলায় ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি উচ্ছেদ করে ব্রিটিশ শাসন প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। দেশীয় রাজ্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য ডালহৌসি প্রধানতঃ স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করেছিলেন।



স্বত্ববিলোপ নীতি অনুসারে কোনো আশ্রিত দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্তা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর রাজ্য ব্রিটিশ ডমিনিয়ন-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। মৃত অপুত্রক শাসনকর্তার দত্তক পুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবেন না। এই নীতি যুগ-যুগান্তরের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের বিরোধী। হিন্দু আইন অনুসারে দত্তক পুত্র স্বাভাবিক পুত্রের মতোই পিতার যাবতীয় স্বত্বের উত্তরাধিকারী। কিন্তু ডালহৌসির নীতির তাৎপর্য হল যে, বিদেশী গভর্নর-জেনারেল মেনে না নিলে দেশীয় রাজার উত্তরাধিকারও আইনসংগত হবে না। স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের ফলে মহারাষ্ট্রের সাতারা নাগপুর (১৮৫৪ খ্রীঃ), উড়িষ্যার সম্বলপুর (১৮৪৯ খ্রীঃ), রাজস্থানের বাঘাট ও উদয়পুর (১৮৫২ খ্রীঃ), মধ্যভারতে ঝাঁসি (১৮৫৩ খ্রীঃ) ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ডালহৌসির নীতির

প্রতিক্রিয়াও শীঘ্র দেখা দিয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় সাতারা এবং নাগপুর ইংরেজ শাসন-বিরোধী বিদ্রোহের ঝটিকা কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঝাঁসির রাজ্যহারা রাণী লক্ষ্মীবাঈ অন্তঃপুর ত্যাগ করে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

ডালহৌসি প্রাক্তন শাসকদের উপাধি ইত্যাদিও অস্বীকার করেন। কর্ণাটকের নবাব, সুরাটের নবাব এবং তাঞ্জোরের রাজার উপাধি বিলোপ করা হয়। বহু প্রাক্তন শাসনকর্তার বৃত্তি ও পেনসন বন্ধ হয়। এমন কি, শেষ মুঘল বাদশাহ্ বাহাদুর শাহেরও উপাধি ও বৃত্তি বন্ধের আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু লণ্ডনের কোর্ট অব ডিরেক্টরস-এর হস্তক্ষেপের ফলে এই ব্যবস্থা তখনকার মতো কার্যকরী হয় না। তবে বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারীদের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে, বাহাদুর শাহের পর তাঁরা রাজকীয় উপাধি ত্যাগ করবেন এবং মুঘল বাদশাহের বাসস্থান লালকেল্লায় বাস করবেন না। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাক্তন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের মৃত্যু হয়। নানাসাহেব তাঁর দত্তক পুত্র ছিলেন। বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর ডালহৌসি নানাসাহেবকে প্রাক্তন পেশোয়ার প্রাপ্য বৃত্তি দিতে অস্বীকার করেন। বিক্ষুব্ধ বাহাদুর শাহ্ এবং নানাসাহেব স্বাভাবিক কারণেই সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিপাহী পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

অযোধ্যা ঃ যেখানে স্বত্ববিলোপ নীতি বা উপাধি অস্বীকার নীতি ইত্যাদির অজুহাতও কার্যকর ছিল না, ডালহৌসি সেখানে নির্দ্বিধায় নীতিহীনতার নীতিই গ্রহণ করেন। অযোধ্যা রাজ্য অধিগ্রহণ এর নিদর্শন। বক্সার যুদ্ধ থেকেই অযোধ্যার নবাবগণ ইংরাজের বন্ধু। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলেসলি অযোধ্যার তদানীন্তন নবাবের সাথে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুসারে অযোধ্যা রাজ্যের কিছু অংশ ব্রিটিশ অধিকার-ভুক্ত হয়; ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গৃহশত্রুর ও বহিশত্রুর হাত থেকে অযোধ্যার অবশিষ্ট অংশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অযোধ্যার নবাব পরিবারকে পুরুষানুক্রমেই এই অঞ্চল ভোগের প্রতিশ্রুতি দেন। চুক্তিতে অযোধ্যার নবাব সুশাসন ও প্রজাহিতের দায়িত্ব নেন।

ডালহৌসি অযোধ্যা রাজ্য প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীনে আনার অজুহাত খুঁজতে থাকেন। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের বহু স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী ছিল। অতএব স্বত্ববিলোপ নীতি অযোধ্যার পক্ষে অচল। বর্তমান নবাবের উপাধি বিলোপ ও বৃত্তি বন্ধের প্রশ্নও উঠে না। এইবার ডালহৌসি প্রশ্ন তুললেন যে, অযোধ্যায় কুশাসন চলেছে, নবাব প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করছেন না এবং অযোধ্যার প্রজাদের দুঃখদুর্দশা দূর করা প্রয়োজন। এই অজুহাতে ডালহৌসি অযোধ্যা ব্রিটিশ শাসনভুক্ত করলেন (১৮৫৬ খ্রীঃ)। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে কলিকাতার মেটিয়াবুরুজে নিয়ে এসে নজরবন্দী করে রেখে বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হল।

এটাও ঠিক যে, অযোধ্যার প্রশাসন ব্যবস্থায় গলদ ছিল, প্রজাগণও সুখে ছিল না। কিন্তু এই অভিযোগ ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে সমান সত্য। আসলে ডালহৌসি ব্রিটিশ পণ্যের জন্য ভারতের বাজার বৃদ্ধি করতে চাইছিলেন। ইংলণ্ডের কারখানার তুলার চাহিদা মিটাবার জন্য তিনি নিজামের তুলা উৎপাদনকারী বেরার অঞ্চলও ব্রিটিশ শাসনভুক্ত করেন।

ডালহৌসী ও নিরংকুশ ক্ষমতা ঃ ইংরেজ শাসনে দেশীয় রাজন্যবর্গ হীনবল হয়ে পড়েছিলেন। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনেও তাঁরা প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন না। সর্বক্ষেত্রেই বিটিশ রেসিডেণ্টের উপর তাঁদের নির্ভর করতে হত। দেশীয় রাজন্যবর্গের শেষ সম্বল ছিল রাজা বা নবাব উপাধি ও রাজ্যের কিছু রাজস্ব। সাম্রাজ্যবাদী শাসক লর্ড ডালহৌসি এটুকুও সহ্য করলেন না। তিনি ওয়েলেসলির আমল থেকে চলে আসা সাতারা, কর্ণাটক ও তাঞ্জোরের রাজাদের ভাতা বন্ধ করে দেন। স্বত্ববিলোপ ও উপাধি অস্বীকার নীতি প্রয়োগ করে তিনি ১৮৪৮ সনে তার স্বত্ব বিলোপ নীতির মধ্যে দত্তক গ্রহণ অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। এর বলে সাতারা, সম্বলপুর, বাঘাট, উদয়পুর, ঝাঁসি, নাগপুর, কর্ণাটক, সুরাট, তাঞ্জোর প্রভৃতি রাজ্যের উপর ব্রিটিশ প্রভুত্ব কায়েম করেন। সম্পূর্ণ নীতি বিগর্হিত আচরণ করে অযোধ্যা ব্রিটিশ শাসনভুক্ত হয়। ডালহৌসির নীতি ও আচরণ প্রমাণ করে দিল যে, দেশীয় রাজ্যের উত্তরাধিকার, উপাধি ও আভ্যন্তরীণ শাসনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাজ্যের শাসনকর্তা, অথবা হিন্দু-মুসলমান সমাজ, এমনকি হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় শাস্ত্রেরও নাই। এই সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতার অধিকারী হলেন বিদেশী গভর্নর-জেনারেল—চলিত কথায় যাঁকে বলা হত ভারতের বড়লাট। ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন ডালহৌসির ব্যবহারকে 'অমানুষিক' বলে মন্তব্য করেছেন।

ভারতীয় রাজাদের ব্যর্থতা

ভারতের রাজারা অনেকেই দুর্বলতা এবং হীনতা দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেকেই আবার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ দেখিয়েছেন। প্রতিরোধ প্রধানতঃ হয়েছে বাঙ্গলাদেশ ; মহীশূর, মারাঠা ও শিখরাজ্যে। আধুনিক অর্থনীতিতে বলীয়ান এবং আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে এঁটে ওঠা হয়তো ভারতের রাজাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই সৎসাহস দেখালেও ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁরা দাঁড়াতেও পারেননি। তাঁরা বরং আত্মকলহ করেছেন ; আত্মস্বার্থের তাগিদে শত্রুকে ডেকে এনেছেন এবং অনেকেই অধীনতা মেনে নিয়ে নিরুপদ্রবে জীবন যাপন করেছেন। এই হল সামন্ততন্ত্রের চরিত্র। প্রকৃত জাতীয়তাবোধের অভাবে সামন্ততন্ত্রের ভাগ্যের লিখন ফলেছে। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭, এই একশ বছরের মধ্যে একটু একটু করে স্বাধীন ভারত রূপান্তরিত হয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরাধীন উপনিবেশে।

॥ ইংরেজ শাসকদের কৃতিত্ব ॥

ইংরেজরা কিন্তু যথেষ্ট চতুরতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনও ষড়যন্ত্র করে, কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে কখনও চুক্তিভঙ্গ করে, কখনও কূট-কৌশল চালিয়ে তাঁরা কাজ হাসিল করেছেন। সর্বোপরি যখনই তাঁরা শত্রুর দুর্বলতা ধরতে পেরেছেন, তখনই সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছেন। শক্তিশালী আর্থিক ব্যবস্থা এবং উন্নত সামরিক শক্তির জয় হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই।

কোম্পানীর অনেক কর্তা ব্যক্তিই কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। দক্ষিণভারতে ফরাসীদের জব্দ করে এবং বাঙ্গলাদেশে ইংরেজ অধিকার কায়েম করে রবার্ট ক্লাইভ করে

ছিলেন সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস ইংরেজ অধিকারকে প্রসারিত করেন। চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধের সাহায্যে লর্ড ওয়েলেসাল মহীশূর রাজ্যের বিলোপসাধন করেন। দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের মধ্য দিয়েও তিনি সাম্রাজ্যের সীমানা বাড়ালেন। অধীনতামূলক মিত্রতার সাহায্যে অনেক ছোটখাট রাজ্যও তিনি গ্রাস করেন। লর্ড হেষ্টিংসের সময় তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধে জয়লাভের ফলে সারা পশ্চিম ও উত্তর ভারতেই ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হয়। স্বত্বাবলোপের উপায়ে লর্ড ডালহৌসি বহু জায়গাতেই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা স্থাপন করেন। আর লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং লর্ড ডালহৌসির চেষ্টায় পাঞ্জাবও দখল করা সম্ভব হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সারা ইউরোপের শক্তিগুলি সারা পৃথিবীকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে উপনিবেশ গড়বার জন্য কাড়াকাড়ি করেছে। তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, আফগানিস্তান প্রভৃতি জায়গায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। তাই ইংরেজ শাসকরা বিভিন্ন সীমান্ত রাজ্যে বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আকুল হয়ে ওঠে।

এছাড়া সাম্রাজ্যের সীমা বাড়ানো, সামান্ত সুরক্ষিত করা, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, কৃষি সম্পদ বিশেষ করে চা-এর জমি সংগ্রহের জন্য সীমান্ত এলাকার স্বাধীন রাজ্যগুলিতে ইংরেজরা সামরিক অভিযান করেছেন। যুদ্ধ হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে। ঐসব যুদ্ধে ভারতের মানুষের কোন স্বার্থ ছিল না।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সৌহার্দ্য ছিল ঐ সব দেশের সাথে। বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেন একে অপরের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই সামান্ত এলাকায় হয়েছে সামরিক অভিযান। ভারতের উত্তর হিমালয়ের কোলে নেপাল, সিকিম, ভূটান ও তিব্বতের সাথে হয়েছে ভারতে ইংরেজ সরকারের যুদ্ধ। উত্তর পশ্চিম সামান্তে আফগানিস্তান এবং উত্তর পূর্ব সীমান্তে ব্রহ্মদেশের সাথেও হয়েছে যুদ্ধ বিগ্রহ। ভারত মহাসাগরের দ্বাররক্ষী সিংহলের ভাগ্যও হয়েছিল ভারতেরই মত।

নেপাল যুদ্ধ

ভারতের উত্তরদিকস্থ ভৌগোলিক সীমা স্থিরীকরণের প্রশ্নেই ইংরেজশক্তি নেপালের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গুর্খাগণ নেপাল উপত্যকা অধিকার করে। গুর্খারা পশ্চিম হিমালয়ের সাহসী ও রণকুশলী উপজাতি। পশ্চিমে শতদ্রু নদী হতে পূর্ব দিকে ভূটান পর্যন্ত গুর্খাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গুর্খাগণ দক্ষিণ দিকে, অর্থাৎ ভারতের দিকেও অগ্রসর হতে চেষ্টা করে।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে গোরক্ষপুর ইংরাজদের অধিকার ভুক্ত হয়। এই সময় নেপাল এবং ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে সীমানা সুনির্দিষ্ট ছিল না। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল এবং ব্রিটিশ ভারতের সামান্ত রক্ষাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সামান্ত সংঘর্ষ উপলক্ষ্য করে ইংরেজগণ নেপাল আক্রমণ করে (১৮১৪ খ্রীঃ)।

ভারত-নেপাল ছয় শত মাইল সীমান্ত জুড়ে ব্রিটিশ বাহিনী আক্রমণ করে। নেপালীদের তুলনায় ইংরাজগণ জনবল, অর্থবল এবং সামরিক শক্তিতে নিঃসন্দেহে অধিকতর শক্তিশালী ছিল। তথাপি আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে ইংরাজশক্তি গুর্খাদের কাছে বারবার পরাজিত হয়। অবশেষে ইংরাজগণ গুর্খাদের কাছ থেকে কুমায়ুন অধিকার করে (১৮১৫ খ্রীঃ)। গুর্খা সেনাপতি অমর সিং থাপা আত্মসমর্পণ করেন। অমর সিং দুর্ধর্ষ সেনাপতি ছিলেন। অমর সিংয়ের আত্মসমর্পণের পর নেপাল ইংরাজদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্য আগ্রহী হয়। ইংরাজগণ নেপালে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখতে হবে এই শর্ত উপস্থাপন করে। শর্তটি ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মৈত্রী নীতিরই নামান্তর মাত্র। নেপাল বুঝতে পারে যে, রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট থাকলে সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। অতএব নেপাল কর্তৃক ব্রিটিশ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়।

নেপাল ব্রিটিশ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে ইংরাজগণ পুনরায় নেপাল আক্রমণ করে (১৮১৬ খ্রীঃ)। ইংরাজ সৈন্য কাঠমাণ্ডুর পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে উপনীত হয়। এইবার নেপাল বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ প্রস্তাব স্বীকার করে। নেপালের সাথে স্বাক্ষরিত সন্ধিশর্ত অনুসারে স্থির হয় যে, নেপালে একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট থাকবেন। নেপাল গাড়ওয়াল ও কুমায়ুন জেলা, তরাই অঞ্চল-এর অধিকার ত্যাগ করে। সিমলা, মুসৌরি, আলমোড়া, রানীক্ষেত, নৈনিতাল ইত্যাদি ব্রিটিশ ভারতের অধিকারভুক্ত হয়।

নেপালের সঙ্গে ইংরাজদের এই চুক্তির ফলে মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যে ইংরাজদের সুবিধা হয়। ব্রিটিশ বাহিনীতে দুর্ধর্ষ গুর্খাসৈন্য নিযুক্ত হতে থাকে। সর্বোপরি ভারতের উত্তর সীমা হিমালয় পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

বাংলাদেশের উত্তরে এবং নেপালের গায়ে লেগে রয়েছে সিকিম। ইংরাজদের চাপে পড়ে সিকিমের রাজা ১৮০৩ সনে দার্জিলিং এর চার পাশে অনেকটা জমি ছেড়ে দেন। এর প্রতিদানে অবশ্য তাঁকে বাৎসরিক অর্থ সাহায্য করা হতে থাকে। কিন্তু সামান্য অজুহাতে লর্ড ডালহৌসি ১৮৪৯ সনে সিকিমে সৈন্য পাঠান। সিকিম আরও ১৭০০ বর্গমাইল জায়গা ছেড়ে দেয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমেই বিষিয়ে উঠে। পরিণামে ১৮৬০ সনে বাধে যুদ্ধ। ১৮৬১ সনের শান্তি চুক্তির ফলে সিকিম হল বাস্তবে একটি আশ্রিত রাজ্য। কিন্তু বিরোধের অবসান হল না। পরিশেষে গায়ের জোরেই ১৮৯০ সনে ইংরাজরা পেলেন সিকিমের বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ নীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার। ভারত স্বাধীন হবার পর অবশ্য সিকিমের সাথে সম্পর্কের ক্রমোন্নতি ঘটেছে। কিছুদিন আগে সিকিম স্বেচ্ছায় হয়েছে ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্য।

ভূটানের সংগ্রাম ও বিপর্যয়

সিকিমের পূর্ব পার্শ্বে ই অবস্থিত হিমালয়ের পার্বত্য রাজ্য ভূটান। ওয়ারেন হেস্টিংসের চেষ্টায় ১৭৭৪ সনে ভূটানের সাথে বাণিজ্যের পথ খোলা হয়েছিল। কিন্তু ১৮১৫ সনের পর থেকে ভূটানের প্রশ্নকে অন্যভাবে বিচার করা হয়। প্রথমতঃ সীমান্ত রক্ষার প্রশ্নেই ভূটানকে তাঁবেদার তৈরীর কথা ভাবা হয়েছে—কারণ 'ডুয়ার্স' নামে পরিচিত অঞ্চলে অনেকগুলি ছোট বড় গিরিপথ ছিল সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ ডুয়ার্সের

জমি হল চা উৎপাদনের পক্ষে মূল্যবান। সুতরাং চা বাগান তৈরীর জন্য ডুয়ার্সের জমি ইংরেজ বণিকদের চাই-ই।

নিজের স্বার্থে এই ধরণের সম্প্রসারণ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে নতুন কিছু নয়। যখনই যেখানে কাঁচামালের সন্ধান পেয়েছে তখনই সে জায়গাটি দরকার হয়েছে। যেখানে প্রচুর ক্রেতার সন্ধান মিলেছে, অমনি সে জায়গাটি দখল করে সেখানে একচেটিয়া বাণিজ্যের ব্যবস্থা হয়েছে। কখনও আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগে, কখনও সেই সব দেশের সামরিক দুর্বলতার সুযোগে রাজ্য-গ্রাসনীতি নেওয়া হয়েছে। ভুটানের বেলাতেও তাই হয়েছে।

১৮৪১ সনে লর্ড অকল্যাণ্ড আসাম ডুয়ার্স দখল করেন। ১৮৬৩ সনে এ্যাসলে ইডেন নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে দলবল সহ পাঠানো হয় ভুটানে। উদ্দেশ্য ছিল আপসে কিংবা শক্তি প্রয়োগ করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্সের উপর ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। তথাকথিত বেসামরিক অভিযান থেকেই সূত্রপাত হয় সামরিক সংঘর্ষের। ১৮৬৫ সনে ইংরেজরা পুরোদস্তুর সামরিক আক্রমণ করেন। ভুটানীরা পরাজিত হন। বাংলা ও আসামের বিস্তৃত ডুয়ার্স অঞ্চল তাঁরা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তাছাড়া ভুটানের প্রতিরক্ষা এবং বৈদেশিক সম্পর্কের উপরও ইরেজদের খবরদারী স্থাপিত হয়। বস্তুত ভূটান হল একটি অর্ধ শাসিত রাজ্য। স্বাধীনতার পরে অবশ্য ভারতের সাথে ভুটানের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

৬। প্রশাসনিক ব্যবস্থা

১৭৬৫ সন পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রকৃতি—ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্যের নিরাপত্তা থেকে অর্থ নৈতিক প্রভুত্বের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভুত্বের পথ সুগম করার লক্ষ্যে প্রথম থেকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। ১৬৮৭ ও ১৬৮৯ সনে বোম্বাই-এ কোম্পানী কর্তৃপক্ষ বিলাত থেকে যে নির্দেশ পাঠায় তাতে বলা ছিল যে, "চিরকালের জন্য ভারতবর্ষে এক বিপুল সুদৃঢ় এবং সুনিশ্চিত ইংরাজ শাসনের পক্ষে প্রয়োজন রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা এবং প্রচুর রাজস্ব সংগ্রহ" বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজের রাজনৈতিক ক্ষমতা লোলুপতার পূর্বাভাস বহুবার নানা অপকৌশলের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে ইংরেজ বাণিজ্যিক সংস্থা সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এক কথায় ১৭৬৫ সন পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজনৈতিক শক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে বলা যায় যে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার এই আদিপর্বে রয়েছে বিজয়ীর বিজিতের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন ও নির্লজ্জ অর্থ সম্পদের লুণ্ঠনে কলঙ্কিত। ইংরেজ শাসনের আদিপর্বের শাসকদের (ক্লাইভ, হেষ্টিংস) যিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন সেই ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ নিজেই বলে গেছেন যে—সে যুগ ছিল লৌহ জর্জরিত যুগ, এবং সে সময়ে ঐ সব নায়কদের ব্যবহার এমন হয়েছিল যে জীবিত অবস্থায় সম্মান এবং মৃত অবস্থায় পরিতাপের অযোগ্য।

বাংলার ধনসম্পদ ইংরেজ শাসকদের সমগ্র ভারত গ্রাস করতে প্রলুব্ধ করে তুলেছিল। এর পর হতে তারা যে কোন প্রকারে এই অগাধ ঐশ্বর্যশালী বিরাট দেশের বিভিন্ন

অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল। ইংরেজ শক্তি দ্রুত অগ্রসর হয়ে ভারতের একটার পর একটা প্রদেশ ও অঞ্চল ছলে-বলে-কৌশলে গ্রাস করতে থাকে। ইংরেজরা এরই জন্য যে প্রতারণা, ছলনা, উৎকোচদান, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির আশ্রয় নিয়েছিল তার তুলনা কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে মেলে না। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে গ্রাস করবার জন্য তাদের প্রয়োজন হয়েছিল বহু ছোটখাট সংঘর্ষ ব্যতীত প্রধানত তিনটি মারাঠা যুদ্ধ, দুইটি মহীশূর যুদ্ধ এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী শিখ যুদ্ধ, পিণ্ডারী যুদ্ধ ও আফগান যুদ্ধ প্রভৃতি। এগুলোর মাধ্যমেই দেশী শক্তিগুলিকে কাবু করে বা কখনও কোন রাজ্যকে দাবার ঘুটির মত ব্যবহার করে (হায়দ্রাবাদ) ইংরাজরা এগিয়েছে। এছাড়াও যুদ্ধ বিগ্রহ এবং সাম্রাজ্য বিস্তারকে নীতি কথার পোশাকে সাজিয়ে ইংরেজরা অধীনতামূলক মিত্রতা এবং স্বত্ব বিলোপ নীতি উদ্ভাবন করেছেন। এইভাবে এমন এক নূতন ভারতের জন্ম হল যা পূর্বের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কহীন, পূর্বের সমাজের সাথে সামঞ্জস্যহীন, এবং পূর্বের সাথে সাদৃশ্যহীন। কারণ ঔপনিবেশিক শাসনের রূপ কখনও বাঞ্ছিত হয়না। এই শাসনে শাসিতের ভাগ্যলিপি লেখা হয় দুঃখের ভাষায়।

দ্বৈতশাসন ঃ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলার প্রকৃত প্রভুত্ব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে এসে গিযেছিল। বাংলা প্রদেশের প্রতিরক্ষার ভার এবং সর্বোচ্চ রাজনৈতিক অধিকার এদের করতলগত হয়েছিল। প্রদেশের আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাক্রমণের প্রতিরোধের দমনের জন্য নবাবকে কোম্পানীর উপর একান্ত নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল। 'দেওয়ান হিসেবে এদিকে কোম্পানী সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহের ভার নিয়েছিল। অন্যদিকে ডেপুটি সুবাদার নিয়োগের অধিকার তাদের থাকায় কার্যতঃ নিজমতের অর্থাৎ আইন পরিচালনাও তাদের হস্তগত হয়েছিল। নিজমতের অধীন বিভাগগুলি থেকেই দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য সান্ত্রী, সেপাই (পুলিশ) রাখা হত এবং বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হত। সরকারী শাসনের দুই অঙ্গ যে একই ছিল এবং এটা যে একান্তভাবে কোম্পানীর দ্বারাই পরিচালিত হ'ত তা কার্যকালে বেশ ধরা পড়ত। তার কারণ এই যে, কোম্পানীর তরফে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত ডেপুটি—দেওয়ানকেই নবাবের তরফে ডেপুটি—সুবাদার নিযুক্ত করা হত। এটাই ইতিহাসে যুগ্মশাসন বা দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থা ছিল ব্রিটিশের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। এতে সকল ক্ষমতাই তারা বিনা দায়িত্বে ভোগের অধিকারী হয়েছিল। কোম্পানী সোজাসুজিভাবে সবকিছু আর্থিক আধিপত্য ভোগ করত এবং এই অর্থের জোরে সৈন্যবাহিনীও পুষত। কিন্তু তারা শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি কোন যোগ রাখত না। নবাব ও তাঁর কর্মচারীদের উপর শাসনব্যবস্থা চালাবার দায়িত্ব ছিল কিন্তু এই কাজ চালাবার জন্য যে অধিকার বা ক্ষমতা দরকার তার প্রয়োগের সুবিধা তাদের ছিল না। শাসন ব্যবস্থার গলদের জন্য নবাব ও তাঁর কর্মচারীদের দায়ী করা হত আর শাসনজনিত সুবিধাগুলি কোম্পানী ও তার কর্মচারীরা ভোগ করত। এর ফল বাংলার জনসাধারণের কাছে বিষময় হয়ে উঠেছিল। কোম্পানী অথবা নবাব উভয় পক্ষই জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকত। নবাবের পক্ষ থেকে এই ঔদাসীন্যের একটা কারণও অবশ্য ছিল, কোম্পানী ও তার থেকে তাদের রক্ষা

করার কোন সাধ্য নবাব বা তাঁর কর্মচারীদের ছিল না। নবাবের কর্মচারীদের আর একটা ধান্ধা ছিল—সরকারী ক্ষমতার জোরে যতটুকু উপরি পাওনা হতে পারে তার প্রতি আকর্ষণ।

(খ) প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ কোম্পানী প্রথম দিকে তার অধিকৃত অঞ্চলের শাসন-ভার ভারতীয় কর্মচারীদের উপরই ন্যাস্ত করে রাখত, নিজেরা শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করে এর উপর মোটামুটি দৃষ্টি রাখত। এই পুরাতন শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশের লক্ষ্য পূরণ ঠিক মত হচ্ছেনা এটা তারা শীঘ্রই বুঝতে পারলেন। অতঃপর কোম্পানী শাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হাতে নিয়েছেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস ও কর্ণওয়ালিশের আমলে বাংলার শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ঢেলে সাজানো হয়েছিল। এই নূতন শাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশ ধাঁচে গড়ে তোলা হয়েছিল। ব্রিটিশের কর্তৃত্ব নূতন নূতন এলাকায় প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন প্রশাসনিক সমস্যার উদ্ভব হত, নবার্জিত অভিজ্ঞতা ও তজ্জনিত পরিকল্পনার সাহায্যে শাসনব্যবস্থা সময়োপযোগী পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে একটি সুষ্ঠু রূপ পেয়েছিল। তবে সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই শাসন ব্যবস্থা সংগঠিত হয়েছিল, একথা মনে রাখতে হবে।

শাসনের প্রকৃত সংস্কার শুরু হয় **ওয়ারেন হেষ্টিংস**-এর আমল থেকে। ১৭৬৫ সনে কোম্পানী দেওয়ানী পেয়ে থাকলেও নিজ দায়িত্বে দেওয়ানী পরিচালনা করছিল না। রেজা খান ও সিতাব রায়ের মত দেশীয় কর্মচারী দিয়েই কাজ হচ্ছিল। তারাও লুটেপুটে খাচ্ছিল আর প্রজাদের দুর্দশা ক্রমেই বাড়ছিল। আইনের চোখে নবাব ছিলেন শাসক, অথচ তাঁর প্রকৃত ক্ষমতা ছিলনা। ক্ষমতা ছিল কোম্পানীর হাতে। দ্বৈত শাসনের কুফলেই হল ১৭৭০ সনের মন্বন্তর। এর পর কোম্পানী নিজেই দেওয়ানী প্রশাসনের দায়িত্ব নিল। হেষ্টিংস নবাবের পেনসন ৩২ লক্ষ টাকা থেকে ছাঁটাই করে ১৬ লক্ষতে নামালেন। রাজকোষ মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় আনলেন। দেওয়ানী বিভাগে রাজস্ব আদায়কারী নিয়োগ করে পাঁচ বছরের চুক্তি করলেন। রাজস্ব ব্যবস্থা দেখাশোনার জন্য কলেক্টর এবং রাজস্বের হার নির্ধারণের জন্য কয়েকটি আঞ্চলিক কমিটি তৈরী করলেন (কমিটি অফ সারকিট)। সবার উপর বসানো হল রাজস্ব বোর্ড।

বিচার ব্যবস্থার দিকেও তিনি দৃষ্টি দিলেন। জেলার ভিত্তিতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হল। দেওয়ানী মামলার আপিল বিচারের জন্য হল সদর দেওয়ানী আদালত। কাজি, মুফ্‌তি প্রভৃতি বিচার বিভাগীয় কর্মচারীদের জন্য বেতনের ব্যবস্থা করা হল। আর দস্তকের ব্যবহারও তিনি নিষিদ্ধ করলেন। সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করতে গিয়ে অনেক জুলুমও হেষ্টিংস করেছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ভারতে ইংরেজশক্তির প্রসার ও সংহতি অগ্রসর হয়েছে পর্যায়ক্রমে। **কর্ণওয়ালিশের** যুগ ছিল মূলতঃ সংহতি ও সংগঠনের যুগ। অবশ্য বিলেতে শিল্পবিপ্লব আমেরিকার অভিজ্ঞতা, আমেরিকা হস্তচ্যুত হওয়ার প্রভাব, ওয়ারেন হেষ্টিংস' এর বিরুদ্ধে

বিলাতে সমালোচনা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রভাবের ফলে কর্ণওয়ালিশের কার্যধারা কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা প্রায় পূর্বনির্ধারিতই ছিল।

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে ভারতে 'লুটের শাসন' অবসান করে কাঁচামালের দীর্ঘস্থায়ী যোগানদার উপনিবেশরূপে ভারতের প্রশাসন ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন হলো। এই কাজটিই কর্ণওয়ালিশ করেছেন। তাই সাধারণ প্রশাসন, বাণিজ্য, রাজস্ব, বিচার, আইন ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি সকল দিকেই সংস্কারের কর্মসূচী প্রয়োগ করা হয়।

বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সুরু হয়েছিল ওয়ারেন হেষ্টিংস'-এর আমল থেকে। কর্ণওয়ালিশের নীতি হলো বিচার ব্যবস্থা সরল করা, অনাচারমুক্ত করা এবং স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ করা। এই সংস্কার কার্য চলে দুই পর্যায়ে—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে আর পরে। বিচার ব্যবস্থাকে সরল এবং মিতব্যয়ী করার উদ্দেশ্যে তিনি দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার একীকরণ সমাধা করেন, কালেক্টরদেরকে রাজস্ব ও বিচার—এই উভয় দায়িত্ব অর্পণ করেন। সদর দেওয়ানী আদালত আরও ভালভাবে সংগঠন করেন, উচ্চতম রাজস্ব বিচারের দায়িত্ব দেন রাজস্ব বোর্ডকে, নিজামত আদালত কলকাতায় স্থানান্তর করেন এবং ঢাকা, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় সার্কিট কোর্ট প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা তিনটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল—সিভিল সার্ভিস, সামরিক বাহিনী ও পুলিশ। এর কারণ ছিল দুটি। প্রথম কারণটি এই যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল আইন শৃঙ্খলা বজায় রেখে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব বিধান। ভারতে আইন ও শৃঙ্খলার অভাব হলে ভারতের প্রতিটি প্রান্তে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও ব্রিটিশ পণ্যোৎপাদক শ্রেণীর মালের কাটতির ঘাটতি বা লোকসান অনিবার্য-ভাবে ঘটার সম্ভাবনা ছিল। তার উপর ইংরাজ শাসকেরা ছিল বিদেশী, ভারতবাসী তাদের প্রীতির চোখে দেখবে এটা তারা আশা করতে পারত না। ভারত শাসন কার্যে বা ভারতে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ভারতীয় জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন ছিল তাদের আশাতীত। এই কারণে জন-সমর্থনের চেয়েও বেশী শক্তিশালী ও কার্যকর উপায় তাদের অবলম্বন করতে হয়েছিল। ডিউক অফ ওয়েলিংটন তাঁর ভ্রাতা লর্ড ওয়েলেসলির অধানে কিছুকাল ভারতে কাজ করতে এসেছিলেন। পরে (স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে) তিনি লিখেছিলেন "ভারতের শাসনতান্ত্রিক গঠন, শাসনের প্রয়োগ পদ্ধতি ও প্রণালী এ সব ইউরোপে—অবলম্বিত শাসন-পদ্ধতি থেকে একেবারে ভিন্ন। ভারতে গভর্ণমেন্টের অবস্থিতি ও সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস হল—তরবারি।" ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন বোঝাতে চেয়েছেন শুধুমাত্র তরবারির জোরে ব্রিটিশ শাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একমাত্র তরবারির জোরেই ভারত শাসনকার্য পরিচালিত হয়ে থাকে।

(গ) বিচার ব্যবস্থা ঃ কতকগুলি দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধির প্রবর্তন দ্বারা ব্রিটিশ রাজ ভারতে এক নূতন ধরণের বিচার-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই ব্যবস্থার সূচনা ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে হলেও, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশ এটি সুসংগঠিত করেছিলেন। প্রতিটি জেলায় একটি করে দেওয়ানি আদালত (civil court)

প্রতিষ্ঠিত হয়, এর কর্তা থাকতেন জেলা জজ। এই জেলা জজ হতেন সিভিল সার্ভিসের লোক অর্থাৎ আই-সি-এস। কর্ণওয়ালিশ এইভাবে বিচার বিভাগীয় 'জজ' ও 'কালেক্টর'—এর পর দু'টি পৃথক করে দেন। 'আপিল বা উত্তর বিচারের জন্য চারটি প্রাদেশিক আদালত ছিল এবং তারপরের ধাপ ছিল সদর দেওয়ানী আদালত। জেলা আদালতের অধীনে ছিল রেজিষ্ট্রারের আদালত, এই রেজিষ্ট্রার পদগুলিও ছিল ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত। তার নীচে কয়েকটি আদালত থাকত, এগুলিতে, বিচারভার অবশ্য ভারতীয়দের উপর ন্যস্ত থাকত। এই পদাধিকারীদের মুন্সেফ ও আমীন বলা হত। অপরাধ—সংক্রান্ত বা ফৌজদারী মামলার জন্য কর্ণওয়ালিশ বেঙ্গল বা বাংলা প্রেসিডেন্সিকে চারভাগে ভাগ করে সেখানে একটি করে বিভাগীয় আদালত (সার্কিট কোর্ট) স্থাপন করেন। এই কোর্ট-গুলি ছিল এক এক জন সিভিল সার্ভিসযুক্ত তথা ইউরোপীয় বিচারপতির অধীন। এই আদালতগুলির অধীনে আরও অনেক ছোট খাট আদালত ছিল। এইগুলিতে বিচার ভার ছিল ভারতীয় বিচারক বা ম্যাজিষ্ট্রেটদের উপর। এরা ছোট-খাট মামলার উত্তর-বিচারের (আপীল) দায়দায়িত্ব ছিল সদর নিজমত আদালতের উপর। ফৌজদার আদালতে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট অপরাধ সংক্রান্ত আইন কিছুটা সংশোধিত করে নিয়ে তদনুসারে বিচার হত। অপরাধীর শাস্তি বিষয়ে এই নিয়মগুলি অবশ্য কিছু সহৃদয়তার সঙ্গে প্রয়োগ করা হত। মুসলিম অপরাধ—সংক্রান্ত আইনে কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদেরও বিধান আছে। অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি বিধানগুলি অবশ্য, সংশোধিতরূপে প্রয়োগ করা হত। দেওয়ানী আদালতগুলিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম বেন্টিংক্ পূর্বসৃষ্ট চারটি প্রাদেশিক 'আপিল' ও 'সার্কিট' আদালত তুলে দিয়ে প্রথমে এই বিচার ভার বিভাগীয় কমিশনারদের উপর ন্যস্ত করেন। কিছু পরে জেলার অমীমাংসিত মামলার উপর বিচারের (আপিল) ভার জেলার জজ ও জেলার কালেক্টরের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বেন্টিঙ্ক বিচার—সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতীয় পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সাব জজ, মুখ্য সদর আমীন প্রভৃতি চাকুরিতে ভারতীয়দের চাকুরির সুযোগও তিনি করে দিয়ে ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালত তুলে দিলে কলকাতায়, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ হাইকোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকার নিজস্ব প্রণালীতে দেশে নূতন ধরণের এক আইন ব্যবস্থা প্রচলন করেছিল। কিন্তু আইন রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে বিধিবদ্ধ হয়েছিল আবার দেশে প্রচলিত আইনও সময়োপযোগীরূপে পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়েছিল। এর পূর্বে বিচার ব্যবস্থা ভারতের চিরাচরিতপ্রথানুযায়ীই, বলবৎ ছিল। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র, ইসলামী শরিয়ৎ অথবা রাজকীয় নির্দেশ এইগুলির সমন্বয়ে গঠিত আইন ছিল প্রথাসিদ্ধ। সাধারণভাবে এই প্রথাসিদ্ধ আইনগুলি যথাসম্ভব বজায় রেখে ভারতের ব্রিটিশ রাজ ধীরে ধীরে একটি নূতন ধরনের আইনের কাঠামো দাঁড় করিয়েছিল। কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ সূচক নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল আবার প্রচলিত কিছু আইন যুগোপযোগী সংস্কার করে নূতনভাবে

বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক চার্টার এক্টের কল্যাণে গভর্ণর জেনারেলদের ভারতের উপর আইন প্রণয়নের অধিকার ন্যস্ত হয়েছিল। গভর্ণর জেনারেল দেশের আইন প্রণয়নের কর্তা, এর অর্থ এই দাঁড়িয়েছিল যে ভারতবাসীকে অতঃপর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা শাসিত হতে হবে তা সেটা ভালই হ'ক বা মন্দই হ'ক। এর আগে আইনের অর্থ ছিল শাস্ত্র নির্দেশ, এই শাস্ত্রের পিছনে ঐশ্বরিক সমর্থন আছে তা অবশ্য পালনীয়, এই ছিল ভারতবাসীর বিশ্বাস। এখন অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে তারা মনুষ্যরচিত আইন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার লর্ডমেক্‌লের নেতৃত্বে একটি আইন কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনকে ভারতে ব্যবহার্য আইন সমূহ সংহিতা Code) আকারে লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল। ল' কমিশনের চেষ্টার ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন (Penal Code) প্রণীত হয়। এছাড়া এই আইন কমিশন পশ্চিমী ধাঁচের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার পদ্ধতি প্রভৃতি আইনগ্রন্থ বা কোড্ তৈরী করেছিলেন। অতঃপর সমগ্র দেশের জন্য একই ধরনের আইন প্রচলনের ব্যবস্থা হয়। দেশব্যাপী আদালতগুলিতে এই বিধিবদ্ধ আইন ও বিচার প্রণালী অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। এক কথায় বলা যায় যে বিচার ব্যবস্থা সূত্রে ভারতবর্ষ একটি অখণ্ডরূপ পেয়েছিল।

আরক্ষা (Police)ঃ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তৃতীয় স্তম্ভ ছিল তার আরক্ষা বিভাগ বা Police। এটাও কিন্তু অনেক কিছুর মতই কর্ণওয়ালিশের সৃষ্টি। আগে আরক্ষার দায়িত্ব ছিল জমিদারদের হাতে। জমিদারদের হাত থেকে দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কর্ণওয়ালিশ একটা নিয়মিত আরক্ষা বাহিনী (Police Force) গড়ে তুলেছিলেন। এই সংগঠনের ভার হাতে নিয়ে তিনি ভারতে প্রচলিত 'থানা' প্রথা কিছুটা আধুনিকীকরণ-এর পর পুনঃ প্রবর্তিত করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে খাস ব্রিটেনেও এই পুলিশ-ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত ভালভাবে গড়ে ওঠেনি। কর্ণওয়ালিশ কতকগুলি 'থানা' বা আরক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করে প্রত্যেকটি থানার দায়িত্ব একজন ভারতীয়র হাতে ন্যস্ত করেন। প্রতিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে 'দারোগা' বলা হত। পরবর্তীকালে সমগ্র জেলার আরক্ষা দায়িত্ব সহ 'সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট অফ্ পুলিশ, নামে কতকগুলি পদ সৃষ্ট হয়। তবে আরক্ষা বিভাগের সব গুরুত্বপূর্ণ উচ্চবেতন যুক্ত পদগুলি থেকে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ রাখা হয়েছিল। প্রশাসন ও সামরিক বিভাগের মত উচ্চপদে ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। গ্রামের আরক্ষা কার্যের ভার আগের মতই গ্রাম্য—চৌকিদারদের উপর ন্যস্ত ছিল, এদের বেতন গ্রামবাসীদেরই দিতে হত। নব-সৃষ্ট আরক্ষা বিভাগ ধীরে ধীরে ডাকাতির ও গুরুতর অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করতে সমর্থ হয়েছিল। এই বিভাগের সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ ঠগীদের দমন। এই ঠগ বা ঠগীরা রাজপথের যাত্রী বা পথিকদের সর্বস্ব অপহরণ করত, তাদের হত্যা করে পলায়ন করত। বিশেষভাবে মধ্যভারতেই এদের আধিপত্য ছিল। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বড় রকমের কোন প্রকার ষড়যন্ত্রের সংগঠন দমনেরও ভারতীয় পুলিশ বাহিনীর বিশেষ তৎপরতা ছিল।

(ঘ) **ভূমি রাজস্বনীতি** ঃ মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশীয় রাজা, জমিদাররা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও ভারতের মাটিতে ক্রমশঃ তাদের ব্যবসায়, প্রশাসন ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃটিশ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য যে অভিযান বা যুদ্ধাদি প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় হত তার সবটাই ভারতের কৃষক সমাজ বা রায়তদেরই (খাজনা) যোগাতে হত। রাজস্ব হিসাবে শস্যের একটা অংশ বেতন ভুক্ত রাজকর্মচারী বা কমিশনের ভিত্তিতে মধ্যবর্তী প্রথার জোতদারেরা আদায় করত। জোতদারের জমির রাজস্ব জোতদারেরাই ভোগ করত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঃ শুরু থেকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্বের ব্যাপারে নীতি ছিল ভারতে তাদের যাবতীয় খরচ এখান হতেই উশুল করা এবং ব্রিটিশ সরকারকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ পাঠিয়ে সন্তুষ্ট রাখা। ১৭৬৫ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব পেয়ে প্রথমে পূর্ব প্রথা মতই রাজস্ব সংগ্রহ করত কিন্তু ১৭৭৩ সন থেকে সোজাসুজি রাজস্ব সংগ্রহ প্রজার কাছ থেকে লওয়ার নীতি গ্রহণ করেছিল। হেস্টিংসের সময় নীলামে বেশী অঙ্ক দিতে রাজী ব্যক্তিকে রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার দেওয়া হত। এ ক্ষেত্রে প্রতিবছর একই অঙ্কে রাজস্ব না থাকায়, প্রতিবছর নূতন খাজনা হার ধার্য হওয়ায় উভয় ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিত। ফলে চাষের অবনতির ফলে কৃষি উৎপাদনও আশানুরূপ হতে পারত না।

এসব সত্ত্বেও পার্লামেণ্টে বহু অভিযোগ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে উঠতে থাকে এমনকি ওয়ারেন হেস্টিংস-এরও অভিযোগ ওঠে। এই সব কারণে ১৭৮৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে বোর্ড অফ কমিশনারস্—যা বোর্ড অফ কন্ট্রোল নামে পরিচিতি লাভ করে—তেমন একটি কমিটি নিয়োগ করে। রাজা জমিদার প্রভৃতির উপর অন্যায় জুলুমের তদন্ত করতে নির্দেশ দেয়। ন্যায় ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ভবিষ্যতের নীতি ঠিক করতে বলে। ১৭৮৬ সালে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস নির্দেশ দেয়, জমিদারদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে হবে, যে সব সুযোগ ও সুবিধা তাদের দেওয়া হচ্ছে, তা' তারা অধিকার বলে আদৌ পেতে পারে না। স-পারিষদ গভর্ণরের দয়াতেই তা' তারা পাচ্ছে। জমিদার ও রায়তের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য যে কমিশন বসানো হয়েছিল জমিদারদের প্রতিহিংসার ভয়ে কোন রায়তই তার কাছে সাক্ষ্য দিতে যেতে সাহস করেনি। কমিশনের কাজ অচল হয়ে পড়ে।

১৭৯৩ সনে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাংলা ও বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এ ব্যবস্থায় জমিদার ও রাজস্ব সংগ্রাহকেরা ভূস্বামীতে পরিণত হয়। পুরুষানুক্রমে এরা এই জমিদারী ভোগের অধিকার পেয়েছিল এবং ইহা ছিল হস্তান্তর যোগ্য অধিকার। অপর দিকে রায়তরা (চাষী) জমির উপর তাদের স্বত্ব ও অন্য সব সুযোগ সুবিধা হারিয়ে ছিল, খাজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থাৎ এই ব্যবস্থায় কৃষক সমাজকে জমিদার শ্রেণীর দয়ার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল। জমিদারদের সংগৃহীত রাজস্বের এগারো ভাগের দশভাগ গভর্ণমেণ্টকে দিতে হত বা আদায় করতে পারলে তা জমিদার ভোগ করতে

পারত। দুর্ভিক্ষ বা শস্যহানী ঘটলেও নির্দিষ্ট দিনে খাজনা না দিলে জমিদারের অধিকার কেড়ে নিয়ে তা নতুন জমিদারকে বিলি করাই ছিল কোম্পানীর নিয়ম, জমিদারের সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ না করেই খেয়ালখুশীমত যতদূর সম্ভব বেশী পরিমাণে উঁচু হারে কোম্পানী রাজস্ব ধার্য করত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পন করেন জন শোর (John Shor) তাঁর হিসাবে মোট রাজস্বের 45% পাবে গভর্ণমেন্ট, মধ্যস্বত্ব ভোগী পাবে 15% এবং চাষীর ভাগে পড়বে 40%।

ভারতের ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণেই ব্রিটিশ সরকার এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে ছিল। ইংল্যাণ্ডের কৃষি ব্যবস্থায় জমিদার বা ল্যাণ্ড-লর্ডই মুখ্য পাত্র। ব্রিটিশগণ তাই উভয়কে একই শ্রেণী ধরে নিলেও পরে তফাৎ ধরতে পেরেছিলেন। বাংলার ল্যাণ্ড-লর্ড ইংল্যাণ্ডের মত বৃটিশের কাছে ল্যাণ্ড-লর্ড নয় অধীন গোলাম এবং প্রজাদের জমিদার। ব্রিটিশ ল্যাণ্ড-লর্ড তার আয়ের সামান্য অংশ রাজকোষে জমা দিত। ব্রিটিশ ল্যাণ্ড লর্ডের অবস্থা আর কোম্পানী সৃষ্ট জমিদারদের অবস্থার মধ্যে আসলে আকাশ পাতাল পার্থক্য ছিল।

অনেকের মতে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধার কথা চিন্তা করে জমিদারদের জমির মালিকরূপে স্বীকার করে নিল। প্রথমটি ছিল কূট নীতি, কোম্পানী চেয়েছিল দেশ শাসনে তাদের আজ্ঞাবহ ও বিশ্বস্ত একটি শ্রেণী। তারা এদেশে মানুষ নয়, তারা বিদেশী, ভারত শাসনকে দৃঢ় ও সুচিরস্থায়ী করতে হলে কিছু সংখ্যক দেশীয় মানুষের সমর্থন তাদের বিশেষ প্রয়োজন এবং তার যোগ সূত্রের জন্যই জমিদার শ্রেণী। ব্রিটিশের কৃপায় এই ধনশালী ও বিশেষ সুবিধা ভোগী জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, কাজেই নিজেদের স্বার্থে ই এই জমিদার শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনের দৃঢ় সমর্থক হতে বাধ্য হয়েছিল এবং তাদের প্রত্যাশা মোটেই ব্যর্থ হয়নি। স্বাধীনতা আন্দোলন রোধে গোষ্ঠীগত ভাবে জমিদারগণ ব্রিটিশকে পূর্ণ সহযোগিতা করে। দ্বিতীয় কারণটি অর্থ নৈতিক। ভূমি রাজস্বের আয়ের উপর কোম্পানী নির্ভরশীল ছিল কিন্তু ঐ আয় নির্দিষ্ট না থাকায় অসুবিধা দূর করে ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। জমিদারেরা ইতিমধ্যেই বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল। তাদের এই সম্পত্তি সরকারী দৃষ্টিতে জামিনের কাজ করত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সুকৌশলে মাথাপিছু ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বেশ উঁচু হারে ধার্য করে রেখেছিল। একদিকে সর্ব্বোচ্চহারে রাজস্ব বৃদ্ধি আর একদিকে ছিল জমিদারদের মাধ্যমে এটা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, কোম্পানীর পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের এই ছিল সুবিধা। লক্ষ লক্ষ কৃষক অপেক্ষা মুষ্টিমেয় জমিদারের নিকট খাজনা আদায় ছিল অধিকতর সুবিধা (ব্যয় কম হবে)। তৃতীয়তঃ এই ব্যবস্থার ফলে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা, জমিদার শ্রেণীর অতিরিক্ত আয়বৃদ্ধির ফলে এলাকার কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি বা সামগ্রিকভাবে জাতীয় শস্য উৎপাদনবৃদ্ধি প্রত্যাশিত ছিল। পরবর্তীকালে এই প্রথা ওড়িশা, উত্তর মাদ্রাজ ও বারানসী জেলায়ও প্রবর্তিত হয়।

মধ্য ভারতের কোন কোন স্থানে এবং আউধ্য বা অযোধ্যায় কোম্পানী যে জমিদারী প্রবর্তন করেছিল তাতে জমিদারদের জমির উপর মালিকানার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তবে বাংলা মুলুকের মত জমিদারদের রাজস্বের হারবৃদ্ধির অধিকার কোম্পানী নিজের

হাতেই রেখেছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে কোম্পানী অপর একটি জমিদারও সৃষ্টি করেছিল, বিদেশী ইংরাজ শাসকদের বিশ্বস্ত সেবার পুরস্কার স্বরূপ কিছু কিছু 'রাজভক্ত' ব্যক্তিকে বেশ কিছু জমির মালিকানা দিয়ে তাদেরও জমিদার শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়ার ক্ষতিও কোম্পানী অবলম্বন করেছিল।

বাংলাদেশে জমিদারদের দেয় মোট রাজস্বের পরিমাণ স্থির হ'ল চার কোটি দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু এই বন্দোবস্তের প্রথম বৎসরেই জমিদারগোষ্ঠী কৃষকদের নিকট হতে প্রায় তিন গুণ খাজনা ও কর আদায় করে। জমিদার গোষ্ঠীর আদায় ক্রমশঃ বেড়েই গিয়েছে, কিন্তু শাসকগণের রাজস্ব অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে। এইভাবে ইংরাজ শাসকগণ তাদের লুণ্ঠনের একটা বিরাট অংশ ভাগে এদেশে 'জমিদার' নামক একদল স্থায়ী শোষককে তাদের রক্তাক্ত শাসন ও শোষণের চিরস্থায়ী সমর্থক গোষ্ঠীরূপে সৃষ্টি করে।

জমির উপর চিরস্থায়ী স্বত্ব লাভ করে জমিদারগণের কৃষক শোষণ আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। খাজনা ও বিভিন্ন প্রকারের করের দায়ে জমিদারগণ কৃষকের নিকট হতে জমি কেড়ে নিতে থাকে। এইভাবে এক বিরাট সংখ্যক কৃষক ভূমিহীন হয়ে পড়ে এবং তাহাদের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলে।

জমিদারদের ভূস্বামী করে দিয়ে এবং কৃষকদের তাদের অধীনস্থ প্রজা করে দিয়ে ইংরাজই প্রথম পরিপূর্ণভাবে ভূমি ব্যবস্থার সামন্ততন্ত্রের পত্তন করে। প্রমথ চৌধুরী তাঁর রায়তের কথায় দুঃখ করে বলেছেন "যে সময়ে ফরাসী কৃষক সামন্ততন্ত্রের অবসান করে জমির মালিক হলো—সেই সময়ে বাংলার কৃষক তাদের দীর্ঘদিনের অধিকার হারাল।" এই প্রসঙ্গে মার্কস তাঁর ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডে মন্তব্য করেছেন ভারতের ইংরাজ শাসনের ইতিহাসেই কেবলমাত্র দেখা যায়, সে দেশের অর্থ ব্যবস্থায় অনেকগুলি ব্যর্থ এবং নিতান্ত অবাস্তবও কুখ্যাত পরীক্ষা চালানো হয়েছে। বাংলাদেশে তারা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি করেছে বিলাতী ধরনের বৃহদায়তন জমিদারী অপকৃষ্ট নকল।

৭। শিল্প ও বাণিজ্য

পলাশী যুদ্ধের পর থেকে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত এই একশ' বছর ইংরেজ কোম্পানী শুধু ভারতের রাজনীতিতেই প্রভাব বিস্তার করেছিল, এমন নয়, ভারতবাসীর অর্থ নৈতিক জীবনেও কোম্পানীর শাসনের গভীর প্রভাব পড়েছিল। ইংরেজ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতি ভারতবাসীর আবহমান কাল থেকে চলে আসা অর্থ নৈতিক জীবনের ভিত্তিতে ফাটল ধরিয়ে শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

ভারতবর্ষের কুটির শিল্প ও হাতের কাজের প্রশংসা যুগ যুগ ধরেই শোনা গেছে। ভারতের প্রধান শিল্পগুলি ছিল তুলোজাত বস্ত্র, পশম, সিল্ক ইত্যাদি। কেন্দ্রগুলি ছিল বাংলা, লক্ষ্ণৌ, আমেদাবাদ, নাগপুর প্রভৃতি। সূক্ষ্ম শাল ও কম্বল তৈরী হত কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে। মুঘল আমলে প্রায় সারাদেশ জুড়ে কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনের কাজ চলত। এটাই তৎকালীন ভারতের সবচেয়ে বৃহৎ শিল্প। গুজরাট, খান্দেশ, জৌনপুর, কাশী, পাটনা থেকে উড়িষ্যা ও বাংলা পর্যন্ত বস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি বিস্তৃত ছিল। কার্পাস ও রেশমের ন্যায় পশম বোনার শিল্পও কিছু ছিল। মোটা কম্বল রপ্তানিও কিছু হত। কাশ্মিরী শাল ধনীদের চাহিদা মেটাত।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ইংরেজ বণিকরাজ (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি) ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ গ্রাস করেছিল, তখন গ্রেট বৃটেনের এই ব্যবসায়ীগণের প্রধান ব্যবসা ছিল ভারতবর্ষ হতে নামমাত্র মূল্যে বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করে বৃটেন ও য়ুরোপের বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় করা এবং এইভাবে বিপুল পরিমাণ মুনাফা সঞ্চয় করা। তৎকালে ইংলণ্ড হতে পণ্যসম্ভার নিয়ে এসে ভারতের বাজারে বিক্রি করার কথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। বঙ্গদেশ, বিহার ও মাদ্রাজের চরকা ও হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে এইরূপ উন্নত বস্ত্রশিল্প তখনও ইংলণ্ডে বা য়ুরোপের কোন দেশে গড়ে ওঠেনি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতা হাতে পেয়ে তাঁতীদের ভয় দেখিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত নির্দিষ্ট দরে তাদের বস্ত্র বিক্রয় করতে বাধ্য করত। উচিত মূল্য না পাওয়ার জন্য তাঁতীরা লোকসান দিতে বাধ্য হত। কোম্পানীর কর্মচারিগণ কাঁচাতুলা বিক্রয়ের ব্যবসা একচেটিয়াভাবে নিজেদের হাতে রেখেছিল। ফলে বাঙালী তাঁতীদের অত্যধিক দামে তুলো কিনতে হোত। বেশীদামে কেনা তুলোজাত দ্রব্য কম দামে বিক্রি করতে হোত। ফলে কেনা ও বেচা দুই তরফেই লোকসান হত। বাংলার রাজকোষে রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ২৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়াল। ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত দেশীয় বণিকেরা ইংরাজদের এই ঔদ্ধত্য দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। নবাবের কর সংগ্রাহকদের সঙ্গে ইংরাজ বণিকদের সংঘর্ষ অনেক ক্ষেত্রে শান্তিভঙ্গের কারণ হয়ে উঠল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব হন মীরকাশেম। তিনি ইংরাজ কর্মচারীদের দ্বারা ক্ষমতা অপব্যবহারের এই দৃষ্টান্তগুলি বারবার কলকাতায় কোম্পানীর গভর্নরের গোচরে আনেন কিন্তু দোষী কর্মচারীদের শাস্তি দেবার প্রতিশ্রুতি বারবার দেওয়া সত্ত্বেও এর কোন সুরাহা হয় নি। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী ইংরাজ কর্মচারীদের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু কিছু নিয়মাবলী প্রবর্তন করেন। কোম্পানী এই শর্তে রাজী হয় যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নিযুক্ত কর্মচারীরা বাণিজ্য সামগ্রীর মূল্যের উপর যথারীতি ৬ শতাংশ কর দিবে। কোম্পানীর তৎকালীন গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট এইভাবে কোম্পানী ও নবাবের বিরোধিতা দূর করার কাজে উদ্যোগী হন।

বক্সারের পর বাংলার বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ বণিক ও তাদের দেশীয় প্রতিনিধিদের করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। এখন থেকে তারা সমস্ত রকম বাধা নিষেধ মুক্ত হয়ে দেশীয় বণিক ও কারিগরদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে বিরাট মুনাফা আত্মসাৎ করতে শুরু করে। বাংলার দেওয়ানী ইংরেজ কোম্পানীর কাছে বিরাট অর্থ নৈতিক আশীর্বাদ স্বরূপ হয়। এখন থেকে বাংলার শিল্পজাত রপ্তানী দ্রব্যের দাম দেবার জন্য সোনা আমদানী ক্রমশই অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। কোম্পানী রাজস্ব-উদ্বৃত্ত প্রদেশের রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য ক্রয়ের পক্ষে সাধারণতঃ পর্য্যাপ্ত ছিল। বস্তুতঃ চীন ও অন্যান্য দেশে বাণিজ্যিক পণ্য ক্রয়ের জন্য কোম্পানী বাংলা থেকে সোনা রপ্তানী সুরু করে।

১৭৬৭ খৃঃ কোম্পানীর বাণিজ্যিক বিনিয়োগের অঙ্ক প্রায় ৬০ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। ১০ বৎসর পরে উহা এক কোটী টাকায় উন্নীত হয়। কোম্পানীর রপ্তানী বাণিজ্যের প্রায় ৯-১০ অংশ ছিল তুলাজাত বস্ত্র ও কাঁচা রেশম। ইত্যবসরে অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে কোম্পানী কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের নূতন নূতন সুযোগ হওয়ায় ব্যক্তিগত বাণিজ্যও পাশাপাশি চলতে থাকে। এসব বণিকদের বলা হত ফ্রি মার্চেণ্ট। এরা অনেক সময় ইংরাজ

ভিন্ন ইওরোপীয় বণিকদের জাহাজ ব্যবহার করত। তাদের কেনাবেচা প্রধানত নীল ও আফিম এই দুটি দ্রব্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

১৭৮০ খৃঃ পর বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ওলন্দাজ ও ফরাসী প্রতিযোগিতা ক্ষীণতর হওয়ায় কোম্পানী এদেশে ব্যবসায়িক নিয়মাবলীতে আরও কড়াকড়ি সুরু করে। নির্দিষ্ট পরিমাণে দ্রব্য সরবরাহের জন্য তাঁতী ও অন্যান্য কারিগরদের দাদন দেওয়া ছিল সাধারণ প্রথা। সময়মত মাল সরবরাহ করতে না পারলে তাদের মজুত মাল বাজেয়াপ্ত হোত। বাংলার তাঁতীরা ক্রমশঃ কোম্পানীর তুলাজাত দ্রব্য ক্রয়ের উপর শোচনীয়ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বছরগুলিতে তুলাজাত দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ ছিল বার্ষিক প্রায় ৬৮ লক্ষ টাকা।

ইউরোপে রপ্তানী ক্রীত তুলাজাত দ্রব্য বাজারস্থ করতে কোম্পানীর বিশেষ অসুবিধা হোত না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শিল্পবিপ্লবের ফলে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের মিলগুলি সুপ্রসিদ্ধ ঢাকার মসলিনের মত সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র ভারতীয় দাম অপেক্ষা প্রায় শতকরা ২০ ভাগ সস্তায় তৈরী করতে সমর্থ হয়। ভারতের বাজারে কোম্পানীর মসলিন ক্রয় ২৫ বছরের মধ্যে প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। ইংলণ্ডের সূতাকল শিল্পের প্রসারকে উৎসাহ দেবার জন্য ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের উপর চড়া হারে শুল্ক ধার্য করা হয়। ১৮১০ খ্রীঃ ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিবহণ কর বৃদ্ধির ফলে দেশীয় শিল্প আরও বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরদিকে বৃটেনের শিল্পজাত দ্রব্যের ভারতে বিক্রয়ের পথ সুগম হয়ে ওঠে। ১৮১৩ খ্রীঃ হতে ১৮৩৩ খ্রীঃ মধ্যে ভারতীয় সূতীবস্ত্রের বিক্রয়ে সঙ্কোচনের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২ কোটি টাকা।

গ্রেটবৃটেনের শিল্পস্বার্থের দিকে অধিকতর নজর রেখে ভারতীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে কোম্পানীর ছিল অনীহা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বস্ত্র রপ্তানী কমে গেল। রপ্তানী সামগ্রী হিসাবে নীল বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। ইউরোপের বাজারে নীল চাষ হ'তে প্রচুর মুনাফা অর্জন করার জন্য বাংলা ও বিহারের নীলকরেরা নীল চাষীদিগকে অন্যান্য শস্যের পরিবর্তে নীল চাষকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য করে। এছাড়া কোম্পানী চিনি রপ্তানী এবং চীনে আমদানী-রপ্তানীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮০০ খ্রীঃ হতে ১৮২০ খ্রীঃ ভিতর কলকাতা বন্দর দিয়ে নীল রপ্তানীর পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরবর্তী দশকে নীলের দাম পড়ে গেলে নীল চাষীদের উপর বিরাট আর্থিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যে কেবলমাত্র এদেশের শিল্পী ও কারিগররা নানাভাবে শোষিত হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ল। আর নতুন শিল্প নীতির প্রয়োজনে —এদেশ থেকে অর্থ সংগৃহীত হয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে জমা হতে থাকে। ভারতবর্ষ হয়ে দাঁড়ালো একটি ঋণগ্রস্ত দেশ এবং উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের কোন সুফল ভোগ করার অধিকার ভারতের ভাগ্যে রইল না। দাদাভাই নওরোজী স্বয়ং মনে করতেন যে ১৭৮৮-৮৯ থেকে ১৮২৮-২৯ সন পর্যন্ত চল্লিশ বছর কাল ধরে ভারত হতে যে পরিমাণ সম্পদ নিঃসৃত হয়েছিল তার পরিমাণ ১৫০ কোটি পাউণ্ডের কম হবে না বিশাল সম্পদের এই নিঃসরণ ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের পক্ষে প্রাণঘাতী স্বরূপ ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে ইংল্যাণ্ড ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহে ভারত থেকে যে 'সম্পদের নির্গমন' হতে থাকে দাদাভাই নওরোজী তার মাত্রা শুধু অঙ্কে ব্যক্ত

করেইক্ষান্ত হননি ; তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভারতীয় জনতার অসীম দারিদ্র এই 'সম্পদ নির্গমনের'-ই প্রত্যক্ষ ফল।[১]

দাদাভাই নওরোজীর সম্পদ নিঃসরণের পরিমাপ মোটামুটিভাবে উইলিয়ম ডিগবীর পরিমাপ দ্বারা সমর্থিত। ডিগবীর মতে ১৭৫৭ থেকে ১৮ ২ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারত হতে নিঃসরিত সম্পদের পরিমাণ ৫০ কোটি পাউণ্ড হতে ১০০ কোটি পাউণ্ডের কোন অঙ্কের সম পরিমাণ ছিল।[২]

এই 'সম্পদ নির্গমন' শুধুমাত্র ইংল্যাণ্ড বা ইউরোপীয় দেশসমূহেই সীমিত ছিলনা। ১৭৭৭ হতে ১৭৮৭ সাল—এই সময়ে বৃহৎ পরিমাণ সোনা চীনে কোম্পানীর 'বিনিয়োগের' মূলধন হিসেবে ভারত হতে নির্গত হয়েছিল। এছাড়া রৌপ্য রপ্তানীর পরিমাণও ছিল লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড। এই নির্গমনের ধারা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত মাঝে মাঝেই চলতে থাকে।

ভারত থেকে সম্পদ নির্গমনের অন্যতম প্রধান পথ ছিল ভারত সরকারের নির্ধারিত খাত (charged head)। ঔপনিবেশিক ভারতে উচ্চ বেতনযুক্ত রাজপদগুলো ছিল ইংরেজদের জন্য সংরক্ষিত। কোন ভারতীয়ের ঐসব পদে অধিষ্ঠিত হবার অধিকার ছিলনা। ফলে এইসব উচ্চ পদাধিকারী ইংরেজ রাজপুরুষদের উচ্চ বেতন ও আনুসঙ্গিক আয় হিসেবে বছর বছর বৃহৎ পরিমাণ সম্পদ ইংল্যাণ্ডে প্রেরিত হত। সম্পদ নির্গমনের এই ধারা উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিল্পোন্নয়নের নবযুগের দিকে ইংল্যাণ্ড যে যাত্রা শুরু করে, তা' ভারত হতে কৃষিজ রপ্তানী মারফৎই সে লক্ষ্যে পৌছুতে সহায়তা করে। বস্তুতঃ ভারতীয় সম্পদের হস্তান্তরের আকারে ভারতীয় অর্থনীতির 'রক্ত ক্ষরণের' মাধ্যমেই ইংল্যাণ্ডের দ্রুততর শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয়।

ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লবের ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়ারূপে ভারতে যে পশ্চাৎপদ কৃষি অর্থনীতি সৃষ্টি হল তা-থেকেই শিল্পহীন ভারতকে চড়াদামে স্থায়ী বাজারে (market) পরিণত করে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তা বেহিসাবী লুটের বদলে পরিকল্পিত শোষণের ক্ষেত্ররূপেই ভারতকে দেখা হল। অর্থাৎ সারা ভারতই পরিণত হল ইংরেজ পুঁজির অবারিত শোষণক্ষেত্রে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতকে ব্রিটেনের কৃষি ও কাঁচামাল উৎপাদনের দেশ হিসাবে গড়ে তোলার কাজটি প্রধানতঃ শেষ হয়েছিল। 'বিশ্বের কর্মশালা' হিসাবে ব্রিটেনের ভূমিকার ক্রমাবনতির ফলে এবং আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ওশিয়ানিয়ায় (যে-চৌহদ্দিতে প্রধান ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে ব্রিটেনের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল) জার্মান ও ফরাসীদের প্রাধান্য ঘনীভূত হওয়ায় ব্রিটেনের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারতের গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। উনিশ শতকের ষাটের দশকে তুলার বাজারে চড়া-ভাব দেখা দিলে প্রক্রিয়াটি ত্বরিত হয়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিরা ভারত থেকে কাঁচামাল, বিশেষত তুলা

১। 'Poverty and Un-British Rule in India' (1871)

২। 'Prosperous British India'

রপ্তানি প্রচুর বৃদ্ধি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের (১৮৬২-১৮৬৫) ফলে ইউরোপীয় বাজারে মার্কিন তুলার রপ্তানি কমে গেলে সেখানে ভারতীয় তুলার চাহিদা যথেষ্ট বেড়েছিল। ১৮৬০-১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে ভারত থেকে ব্রিটেনের তুলা আমদানির পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পায় এবং ভারত তখন থেকে ব্রিটেনের প্রধান তুলা সরবরাহকারী দেশ হয়ে ওঠে।

রপ্তানির চাহিদা বৃদ্ধির ফলেই ভারতে তুলা উৎপাদনে সমারোহ দেখা দেয়। গত শতকের ষাটের দশকে মধ্য ও পশ্চিম ভারত (বোম্বাই, সিন্ধু, রাজপুতানা, মধ্যভারতের বহু এলাকা, বেরার, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দরাবাদ) রপ্তানিযোগ্য তুলা উৎপাদনের বিশিষ্ট অঞ্চলে পরিণত হয়।

মার্কিন দেশে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটলে তুলার চড়া-বাজার স্বাভাবিক হয়ে আসে। এমতাবস্থায় ভারতের তুলার দামও কমে যায়, কিন্তু দেশে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি তখনো অব্যাহত থাকে। উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে, বিশেষতঃ জলসেচকৃত এলাকাগুলিতে তুলার নতুন নতুন আবাদ গড়ে ওঠে। ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি আসলে ব্রিটিশ প্রসেসিং ও ভারতের কৃষির মধ্যে, ব্রিটিশ শহরগুলি ও ভারতের গ্রামগুলির মধ্যে বর্ধমান শ্রমবিভাগকেই প্রকটিত করেছিল।

উনিশ শতকের ষাটের দশকে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা ভারত থেকে অধিকতর পরিমাণে কৃষিজাত সামগ্রী আমদানি শুরু করে। এতে ছিল প্রধানত তুলা, পশম, পাট, নারকেলের আঁশ, চাল, গম, তৈলবীজ, মসলা, নীল ও আফিম। ভারতীয় রপ্তানির প্রধান অংশই (যেমন তুলার ৮০ শতাংশ) যেত ব্রিটেনে। ভারত তখন ব্রিটেনের প্রধান খাদ্য সরবরাহকারী দেশ হয়ে উঠেছিল। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই শতকের শেষ নাগাদ ব্রিটিশরা ভারত থেকে বার্ষিক তিনগুণ পরিমাণ মূল্যের পণ্য আমদানি করত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থে গর্ব করার মত যে উচ্চস্থান প্রায় দু'হাজার বছর আগে থেকে ভারতের ছিল সে ভারত ক্রমশঃ কাঁচামাল উৎপাদনের ও পাশ্চাত্য দেশ থেকে সস্তা শিল্পদ্রব্যের মজুতকারী দেশে পরিণত হয়। ভারতের কোটি কোটি অধিবাসীর ভাগ্য সম্বন্ধে উদীয়মান ঔপনিবেশিক শক্তি ইংরেজদের প্রতিকারের দিকে কোন বাস্তব পদক্ষেপ ছিল না। মাদ্রাজের রাজস্ব বোর্ডের সভাপতি সিভার্স মন্তব্য করেন—"আমাদের শাসনব্যবস্থা স্পঞ্জের মত। গঙ্গা তীরবর্তী কোন দেশে এই স্পঞ্জধর্মী শাসন, যা কিছু সম্পদ তা সব শুষে নেয়। এই স্পঞ্জ থেকে সব কিছু সারবস্তু টেমস্ তীরবর্তী দেশে নিঙ্‌ড়ে নেওয়া হয়।"

"বাণিজ্যের সমস্ত চরিত্রই বদলে গিয়েছে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল রপ্তানিকারী দেশ, আর এখন ভারতবর্ষ আমদানিকারী দেশে পরিণত হয়েছে। এই পরিবর্তন এত দ্রুত দেখা দিয়াছে যে, এমনকি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দেই টাকার বিনিময়মূল্য দুই শিলিং ছয় পেন্স হতে হ্রাস পেয়ে দুই শিলিংয়ে পরিণত হয়েছে। যে ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল হতে 'সমগ্র বিশ্বের বস্ত্রের কারখানা' বলে খ্যাতি লাভ করেছিল, সেই ভারতবর্ষ এখন ইংলণ্ডের উৎপন্ন সূতা ও তুলাজাত দ্রব্যের দ্বারা প্লাবিত হল। এর অনিবার্য পরিণতি হল বিখ্যাত ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংস।"

৮। (ক) পুরানো দেশজ শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা:

যে কোন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা। যুগ পাল্টায়, সমাজ ব্যবস্থাও পাল্টায়। সমাজ পরিবর্তন হলে শিক্ষার আদর্শ ও কাঠামোর পরিবর্তন হয়। ভারতে প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার তাই রূপান্তর হয়েছে মধ্যযুগে। আবার মধ্যযুগের শিক্ষা-ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটেছে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায়।

ভারতে প্রাচীন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থা ও বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-রূপে গুরুকুল, তপোবন আশ্রম, বৌদ্ধবিহার প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এই শিক্ষাব্যবস্থার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রভাব পড়েছে মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থায়। এরই সাথে পাশাপাশি চলেছে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা।

মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থায় নিম্ন বিদ্যালয়গুলির কোন নিজস্ব ঘর অনেক ক্ষেত্রেই ছিলনা। চণ্ডীমণ্ডপে, বারান্দায়, এমনকি গাছতলাতেও স্কুল বসত। জমির আয় থেকে পাঠশালা ও মক্তবের খরচ চলত। জীবিকার জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা এবং লেখাপড়া ও গণিত প্রভৃতি শেখানো হত। বিদ্যালয়গুলির নির্দিষ্ট শিক্ষাবর্ষ বা নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিলনা। ৫/৬ বছরেই শিক্ষা শেষ হত। শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষা ও পারিশ্রমিক ছিল না। উচ্চ শিক্ষার সাথে এর কোন ধারাবাহিকতার সম্পর্ক ছিলনা। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে মাদ্রাসা এবং টোলগুলিতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দান করা হত। নিম্ন বা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধারাপাত এবং ব্যবসা ও কৃষি সম্বন্ধীয় হিসাব রক্ষণের শিক্ষা দেওয়া হত। মধ্যযুগে কয়েকটি বৌদ্ধবিহারে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হত। এইগুলির মধ্যে নালন্দা সব চাইতে বিখ্যাত। বিক্রমশীলা এবং ওদন্তপুরীও ছিল উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীর, দক্ষিণ ভারতের মাদুরাই ও শৃঙ্গেরীতে বেশ কয়েকটি মঠবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ভারতে আগেকার এই শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ইংরেজ শাসকরা পরিবর্তন আনার জন্য প্রয়াসী হন। রাজনৈতিক বিজয়কে সুদৃঢ় করবার জন্য সাংস্কৃতিক বিজয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইংরেজ শাসকগণ বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। ফলে শাসন সংস্কারের সাথে সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও তাঁরা হস্তক্ষেপ করেন। অবশ্য শাসনের সুবিধা ও ভারতীয়দের মনোভাবের দিকে তারা সব সময়ই নজর রেখে চলেছেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১ সনে) স্থাপন করেন এবং জোনাথান ডানকান কর্তৃক স্থাপিত হয় বারাণসী সংস্কৃত কলেজে (১৭৯১)। ইতিপূর্বে ১৭৮৪ সনে হেস্টিংসের উৎসাহে স্যার উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার ব্যাপারে এই সমিতি অত্যন্ত মূল্যবান কাজ করেছে এবং এখনও করছে।

দেশ শাসনের স্বার্থে অধিবাসীদের প্রধান প্রধান ভাষার সাথে পরিচিতি বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্যে ওয়েলেসলীর সময়ে ১৮০০ সনে স্থাপিত হয় কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জন্য দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্ররূপে এই কলেজ গড়ে উঠেছিল। লর্ড মিণ্টোর

আমলে (১৮০৭—১৩) ভারতের শিক্ষা বিষয়ে নানা চিন্তা ভাবনা হতে থাকে। কোম্পানীর দিক থেকে একটানা টালাবাহানার পর এ দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য দায়িত্ব স্বীকার করে শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার জন্য রাজকোষ থেকে অর্থ বরাদ্দের আইন পাশ হয় বিলাতের পার্লামেণ্টে ১৮১৩ সনে। এই আইনের (সনদ আইন) ৪৩ নম্বর ধারায় শিক্ষা বিষয়ক শর্তে বলা হল যে ব্রিটিশ ভারতের উন্নতিবিধান, পণ্ডিতদের উৎসাহদান এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য ইংরেজ কোম্পানী প্রতি বছর একলক্ষ টাকা ব্যয় করবে। এরপর এদেশে কোম্পানীর শিক্ষানীতির বাস্তব রূপায়নের জন্য ১৮২৩ সনে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (সংক্ষেপে জি. সি. পি. আই) নামে দশজন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। এই বছরেই ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে লর্ড আমহার্স্টকে প্রগতিশীল উন্নত ধরণের প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের জন্য অর্থ ব্যয় করতে অনুরোধ জানিয়ে এক পত্র দেন। ১৮২৪ সনে এই কমিটি দিল্লী, আগ্রা ও কলিকাতায়' "ওরিয়েণ্টাল কলেজ" প্রতিষ্ঠা করে। যুগের দাবী বদলে গিয়ে প্রাচ্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরাজী শেখানোর দিকে কমিটির সদস্যদের একাংশের মধ্যে বিশেষ ঝোঁক দেখা দেয়। ১৮৩১ সালে এই কমিটি প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী—এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্ক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মেকল-কে প্রাচ্যশিক্ষা কিংবা পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব নির্ণয় করে, এদেশে কোন্ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত জানতে বললেন। মেকলে ১৮৩৫ সনে তাঁর বিখ্যাত প্রতিবেদন '(মিনিট)' পেশ করে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের নীতি সমর্থন করে মত প্রকাশ করেন। মেকলের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে লর্ড বেণ্টিঙ্ক সরকারী শিক্ষা নীতি ঘোষণা করলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইংরাজীর অনুকূলে। শিক্ষা বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্তের পর সরকারী উদ্দেশ্যে স্কুল স্থাপিত হলে তা'তে ইংরেজী ভাষাই শিক্ষার মাধ্যমরূপে গৃহীত হয়। এরপর লর্ড হার্ডিঞ্জের (১৮৪৪) ঘোষণাপত্রে সরকারী চাকুরীতে শিক্ষাগত যোগ্যতারূপে ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব নির্দেশিত হলে পাশ্চাত্য শিক্ষা আরও দ্রুততালে অগ্রসর হতে থাকে। এরপর বিভিন্ন ধরণের প্রচলিত শিক্ষানীতির মধ্যে একটি সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে রচিত হল একটি শিক্ষা দলিল। 'ভারতে শিক্ষা' এই নির্দেশনামাটি 'উডের দলিল' নামে (১৮৫৪) প্রসিদ্ধ (ইংরেজ কোম্পানীর নিয়ন্ত্রক সভার সভাপতি স্যার চার্লস উড-এর নামানুসারে)। শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষায় ধর্মের স্থান, শিক্ষা ব্যবস্থাপনার যন্ত্র, সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি—সবদিক থেকেই উডের শিক্ষা দলিল ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে।

ভারতে একটি পুরাদস্তর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশের মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব পেল পাশ্চাত্য জ্ঞানের চর্চা আর তার প্রধান অবলম্বনরূপে ইংরেজী ভাষা মাধ্যম। সেই অনুসারে ডালহৌসীর আমলে স্থাপিত হল সরকারের শিক্ষা বিভাগ (ডি. পি. আই)। কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ বিশ্ববিদ্যালয় হল' লর্ড ক্যানিং এর আমলে (১৮৫৭)।

এর পর থেকে আমাদের দেশে তাবৎ স্কুল কলেজে পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ, পরীক্ষা ইত্যাদি গ্রহণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর ন্যস্ত হল।

ইংরেজ সরকার সাংস্কৃতিক, বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার করলেন তাদেরই স্বার্থে। জাতির নিজস্ব চিন্তায় যখন সংস্কারের আদর্শ এল এবং সংস্কারের জন্য আন্দোলন হল, তখন জাতির জীবনে তার স্থায়ী প্রভাব পড়ল অনেক বেশী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই ব্যবসা বাণিজ্য, আইন আদালত প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইংরেজদের সাথে ভারতীয়দের নানাভাবে যোগাযোগ ঘটে। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ফলে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হয় আরও ঘনিষ্ঠ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজ এবং ভারতীয় শিক্ষক-পণ্ডিতরা পরস্পরের কাছে আসেন। বস্তুতঃ ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পরস্পরের কাছে এল। ওদিকে খ্রীষ্টান মিশনারীরা একদিকে যেমন ধর্মপ্রচার করলেন, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষা প্রসার করলেন। শ্রীরামপুরের কেরী, ওয়ার্ড; মার্সম্যানের অবদান কখনও ভুলবার নয়। আমরা অশেষ ঋণী আলেকজাণ্ডার ডাফ-এর কাছেও। ধর্মীয় ব্যাপারে মিশনারীরা হয়তো কখনো বাড়াবাড়ি করেছেন কিন্তু আমাদের চিন্তা আর যুক্তিতে তাঁরা যে নাড়া দিয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তবে একথা ঠিক যে শিক্ষা প্রচার বা বিস্তারে ভারত সরকারের তেমন আন্তরিক প্রয়াস ছিল না। বস্তুতঃ আধুনিক শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার নেতা ছিলেন কতিপয় প্রগতিশীল ভারতীয় পণ্ডিত ব্যক্তি, বিদেশী খৃষ্ট ধর্মপ্রচারকগণ এবং মানবিকতাবোধ সম্পন্ন ইংরেজ রাজকর্মচারী ও বেসরকারী কিছু ইংরেজ ভদ্রলোক। তাই আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে এদের প্রয়াস যেমন ছিল মুখ্য, উদ্দেশ্যও ছিল মহৎ। অপর দিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য ছিল শাসনব্যবস্থায় কর্মচারী সংগ্রহ তথা কেরাণী তৈরীর প্রয়োজন মেটানো। এছাড়া ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজপ্রীতি থেকে ইংরেজ শাসনের জয়গানে মুখর হয়ে 'আজ্ঞে হুজুর' মানসিকতা নিয়ে এক শ্রেণীর উদ্ভব হবে যেমনটি চেয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজশক্তির প্রতিনিধি মেকলে। তিনি বলেছিলেন —"শুধু গায়ের চামড়ায় এবং জন্মসূত্রে ভারতীয় এই শ্রেণীর মানুষগুলিকে রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে পুরোপুরি ইংরেজরূপে গড়ে তুলতে হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে ইংরেজদের একটা গূঢ় অভিসন্ধি ছিল। এটা ছিল সাংস্কৃতিক বিজয়ের মাধ্যমে ভারতে তাঁদের রাজনৈতিক প্রভুত্বের চির স্থায়িত্ব বিধান।

ফলে ভারতের পুরাতন শিক্ষাধারার স্রোত ক্ষীণ হয়ে একেবারে শুকিয়ে যেতে বসল। কারণ সরকারী চাকুরী ও সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা ইংরেজী শিক্ষার উপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়েছিল। ভারতে আধুনিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল এ শিক্ষা গণ-শিক্ষাকে কোনরূপ গুরুত্ব দেয়নি।

১৮২১ থেকে ১৯২১ খৃঃ পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের সংখ্যার বিশেষ একটা তারতম্য ঘটেনি। এছাড়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারও চলেছে শম্বুকগতিতে সরকারী উদাসীনতার জন্য। প্রযুক্তিমূলক শিক্ষাও হয়েছে উপেক্ষিত। ১৮৫৭ সন

পর্যন্ত চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাদানের নিমিত্ত মাত্র ৩টি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্তবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা দানের নিমিত্ত একটি মাত্র মহাবিদ্যালয় ছিল রুড়কিতে। তাও আবার প্রবেশাধিকার ছিল মাত্র ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রদের।

তবে আমাদের একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সরকারী শিক্ষানীতির নানাবিধ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আধুনিক শিক্ষার এই সীমিত প্রসার ভারতের মধ্যে নব নব চিন্তার স্রোতধারা প্রবাহিত করে দিয়েছিল। এই ভাবধারাই বাংলার নবজাগরণের মধ্য দিয়ে ভারতের আধুনিকীকরণের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

৮ (খ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন

(১) ভূমিকা ঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীকে জীবনের এক নব জাগরণের যুগ বলে অভিহিত করা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার ও ভাবধারার সঙ্গে প্রচলিত জীবনধারার সংঘাত ও প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ এক নবতর চেতনা ও স্পন্দনের প্রতিফলন দেখা যায় জাতির চিন্তা, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে। সৃষ্টি হয় এক নূতন ও সৃজনাত্মক আন্দোলন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজনৈতিক জীবনের অনিশ্চয়তা ও শূন্যতা সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের কুসংস্কার ও অনাচার অর্থ নৈতিক জীবনের অনিশ্চয়তা এবং সাংস্কৃতিক জীবনের শূন্যতা সমাজদেহকে জীর্ণ করে দিয়েছিল। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই নূতন চিন্তা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও আদর্শ নিয়ে ইউরোপীয় জাতিগুলি ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হয়। পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রভাবিত সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং শিল্প, বাণিজ্য-অর্থনীতির সংস্পর্শে এসে এদেশের প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের মধ্যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। ফলে ধর্ম ও সমাজ জীবনে সুরু হয় সংস্কার আন্দোলন। এই আন্দোলন থেকেই ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয় এবং ক্রমশঃ তা জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

(২) পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও নবজাগরণ ঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসনের কিছু অবদান আছে। তাঁদের শাসন কার্যের সুবিধার জন্য তাঁরা এদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা করেছেন। প্রাচ্য শিক্ষায় উৎসাহও দিয়েছেন। রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, দাস প্রথার বিলোপ প্রভৃতি ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে এদেশে প্রচলিত ধ্যানধারণার উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন। খ্রীষ্টান মিশনারীরাও যেমন কেরী, মার্সম্যান, ওয়ার্ড, ডাফ, উইলসন প্রমুখদের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা, ভাবধারার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত জাতির জীবনসত্তা না জেগে ওঠে, ততক্ষণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত সরকারী সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার কোন মূল্য নেই। এই প্রার্থিত সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের আন্দোলনে গৌরবময় অধ্যায় শুরু করলেন রামমোহন রায়, কেশব সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীরা। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা মধ্যযুগের শেষ ভাগের শেষে এসে গতিশীলতা হারিয়ে ফেলেছিল ; বর্ণাশ্রম, কুসংস্কার, রাষ্ট্রনৈতিক স্বৈরাচার, গ্রামীণ

সমাজ ও অর্থনীতি, কৃষিনির্ভর স্থানুর অর্থনীতি প্রভৃতি ভারতের ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতিকে প্রায় জীর্ণ করে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতাই জীবনের সমস্ত স্তরে গতিশীলতা আনে। মধ্যবিত্ত সমাজ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সংস্পর্শে এসে প্রথম এগিয়ে এলেন নূতন চিন্তা ও ধ্যানধারণা নিয়ে। কুসংস্কার থেকে মুক্ত সামাজিক সংস্কারকে নূতন পথে নিয়ে যাওয়া, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্বাধীন চিন্তা প্রভৃতি ছিল তাঁদের নেতৃত্বে সংস্কার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশেই ব্রিটিশ আধিপত্য প্রথম বিস্তৃত হয়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার এখানেই প্রথম ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়। বাঙ্গালীরা হলেন এই নূতন শিক্ষা ও ধ্যানধারণার প্রথম বাহক। তারপর এই চেতনা ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হল সারা ভারতবর্ষে। বাংলাদেশে একেই রেঁনেসা বা নবজাগরণরূপে আখ্যা দেওয়া হয়।

(৩) **ধর্ম সংস্কার আন্দোলন**ঃ ধর্মবোধ ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। প্রাচীন যুগে যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্মের ক্রম-রূপান্তর ঘটেছে এবং বৌদ্ধধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের পথে জনজীবনের ধারা এগিয়ে গেছে, তেমনি মধ্যযুগে ও ইসলামের সংঘাতে ভক্তিবাদ ও সমন্বয়বাদের মধ্য দিয়ে এক নূতন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্মের সংঘাতে ভারতে এক নূতনতর ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়।



ডিরোজিও



রামমোহন

এই সংস্কার আন্দোলনের পথ দেখান ভারতপথিক রামমোহন রায়। নানা শাস্ত্র ও নানা ভাষায় পণ্ডিত রামমোহন হিন্দু ধর্মকে পৌত্তলিকতা ও আচার সর্বস্ব সংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার ব্রত গ্রহণ করেন। বেদ-উপনিষদের উদার সত্যাদর্শ এবং ব্রহ্মবাদের প্রকৃত ধর্মাদর্শকে সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরেন। উপনিষদের ভিত্তিতে তিনি একেশ্বর-বাদ প্রচার করলেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা এর বিরোধিতা করলেন। ধর্ম ও যুক্তিবাদ, সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ভাবধারা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধর্ম সংস্কৃতির সংমিশ্রণ তাঁর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি প্রথমে ধর্মালোচনার জন্য 'আত্মীয় সভা' এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মোপসনার জন্য ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের

উদ্যোগে এই ব্রাহ্মসভাই "ব্রাহ্মসমাজে' রূপান্তরিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব সেনের প্রচেষ্টায় এই আন্দোলন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণের প্রবণতা হ্রাস পায়। কেশব সেনের নেতৃত্বে 'ব্রাহ্মসমাজের' আদর্শ বাংলার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মূল ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে এসে 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ গড়ে'তোলেন। পরবর্তীকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে পৃথক আর একটি সংগঠন তৈরী হয়। নারী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ



কেশব চন্দ্র সেন



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথার বিলোপ, অস্পৃশ্যতা দূর ও জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধনে ব্রাহ্মসমাজ অগ্রণী হয়েছিল। বাংলার সীমানার বাইরে মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে গঠিত হয় 'প্রার্থনা সমাজ'। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের কাজে এই সমাজ আত্মনিয়োগ করেছিল। মাধব গোবিন্দ রাণাডে ছিলেন প্রার্থনা সমাজের নেতা। হিন্দুধর্মের কুসংস্কার দূর করে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার জন্য স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের মত সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে আর্য সমাজও অগ্রণী ছিল। একেশ্বরবাদী ও পৌত্তলিকতার বিরোধী দয়ানন্দ শুদ্ধি আন্দোলন (অন্য ধর্মাবলম্বীদের হিন্দুধর্ম ও সমাজে গ্রহণ) দ্বারা হিন্দুধর্মের উদারতার শক্তিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের যে রূপটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় তা হ'ল 'রামকৃষ্ণ মিশন'। হিন্দু ধর্মের উদারতা ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর মন্ত্রশিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে হিন্দুধর্মের এক অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটে, যার প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব ও স্বাতন্ত্র্য হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। সংকীর্ণতামুক্ত হিন্দুধর্মের মহিমান্বিত সত্য রূপটি বিবেকানন্দ ভারত ও বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমাজ সেবার আদর্শও তুলে ধরা হয়। হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান

আন্দোলনের সাথে যুক্ত থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। এই সোসাইটির নেত্রী শ্রীমতী এ্যানি বেসান্তের ভাষায় বলা যায় যে ভারতের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ও ভাবধারার পুনরুজ্জীবন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সম্ভব।


শ্রীরামকৃষ্ণ


বিবেকানন্দ

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহে গঠিত সেণ্ট্রাল হিন্দু স্কুল ও বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এই সোসাইটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। উত্তর ভারতে আলিগড়কে কেন্দ্র করে সৈয়দ আহম্মদ খান মুসলিম সমাজের ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও গোড়ামি দূর করতে চেয়েছিলেন।


দয়ানন্দ সরস্বতী


অ্যানি বেসান্ত

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন করে এবং কোরাণের নূতন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করে মুসলিম সম্প্রদায়কে নূতন প্রগতিমূলক পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। মহামেডান এ্যাংলো-

ওরিয়্যাণ্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর সংস্কারমূলক কর্মধারা সংগঠিত হয়। উনবিংশ শতকে এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা শুধুমাত্র ধর্ম-সংস্কারমূলকই নয়। বস্তুতঃ এইসব সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারত এক নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে কয়েকজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও অন্যান্য কর্মপ্রচেষ্টার উল্লেখ না করলে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হবে না।

(৪) **সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা** ঃ মানবতাবাদী বা হিউম্যানিষ্ট রামমোহন ভারতীয় সমাজ জীবনের বিভিন্ন সংস্কারমূলক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। বেণ্টিঙ্কের আমলে সতীদাহ নিবারণী আইন পাস, স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আন্দোলন, বিবাহ, নারীশিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেন। ইংরেজীশিক্ষা প্রবর্তন করে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় উদারনৈতিক ভাবধারার প্রবর্তন করে ভারতীয় জনমানসকে সংকীর্ণতামুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি একদিকে হিন্দু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় পরোক্ষে হলেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, অন্যদিকে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি একদিকে এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, অন্যদিকে বেদান্ত কলেজও চালিয়েছেন। ইংরেজী ভাষাকে তিনি যেমন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, আবার আধুনিক বাংলা গদ্যের স্রষ্টা বলেও তিনি পরিচিত। তিনি বাংলা অভিধান সংকলন করেছেন এবং বাংলা ও ফারসীতে সংবাদপত্রও তিনি চালিয়েছেন। সমাজ চেতনারও পথিকৃৎ হলেন রামমোহন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন সমন্বয়ের প্রতীক। ১৮১৮ খ্রীঃ প্রেস আইনের বিরুদ্ধে, ১৮২৭ সনে জুরী আইনে ভারতীয়দের ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিচার-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রীম কোর্টে বা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ১৮০৯ খৃঃ ভাগলপুরে কালেক্টরের দুর্ব্যবহারের নিরসন জানিয়ে লর্ড মিণ্টোকে দেওয়া তাঁর চিঠি স্বাজাত্যবোধেরই প্রমাণ। ১৮৩০ সনে তিনি ফরাসী বিপ্লব ও স্পেনের বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছেন।

রামমোহনের সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখরা যেমন সহযোগী হয়েছেন, তেমনি শিক্ষাবিস্তারে ডেভিড্ হেয়ার তাঁর সহযোগী ছিলেন। এরপর রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হিন্দু কলেজের 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী আন্দোলনে এগিয়ে এলেন। হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন এঁদের নেতা। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ সিকদার, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখরাও এই দলে ছিলেন। প্রথম দিকে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ভাষাকে স্বাগত জানালেও এঁরা পরবর্তী স্তরে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার করেন। দেশীয় ভাষা, বিজ্ঞান ও ইতিহাসচর্চা ইংরাজের বৈষম্যমূলক আইন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অঙ্গুলি নির্দেশ করা ছাড়াও স্বদেশপ্রেম বিস্তারেও ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

কিন্তু রক্ষণশীল নেতা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয়

বিদ্যালঙ্কার, রামকমল সেন প্রমুখরা সমাজ সংস্কার চাইলেন ভারতীয় ঐতিহ্য এবং রক্ষণশীল প্রকোষ্ঠের মধ্যে থেকেই, রামমোহন প্রদর্শিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের পথে নয়। তাঁরা রুখে দাঁড়ালেন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী উগ্রাদর্শ পরিচালিত ডিরোজিও পন্থীদের বিরুদ্ধে। তা সত্ত্বেও ইয়ং বেঙ্গলের সাংস্কৃতিক আলোড়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

সংস্কার আন্দোলনের বিচিত্র কর্মধারা উনবিংশ শতকের নানা পর্যায়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এই শতাব্দীর শেষ ভাগে সংস্কার আন্দোলন মোটামুটি মধ্যপন্থা অনুসরণ করে দেবেন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে। কিন্তু রামমোহনের মতই এঁরা প্রাচ্য সংস্কৃতির সাথে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিজ্ঞানসম্মত মিশ্রণই চাইলেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ 'তত্ত্ব-বোধিনী সভা' এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা গড়ে তুললেন। বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সংস্কার আন্দোলনে এই পত্রিকার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের ভূমিকাও উল্লেখ্য। মূলতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় "Civil Marriage Act" বিধিবদ্ধ হয়ে সর্বপ্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার আইন-সম্মত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের 'ভগীরথ' ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁর বহুমুখী সংস্কার আন্দোলন দ্বারা সমস্ত দেশে যে প্রগতিমূলক সংস্কার চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল তা'তে জাতির জীবনে সঞ্চালিত হয়েছে এক নবযুগের চিন্তা-চেতনা। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন এতখানি তীব্র হয়েছিল যে একে একে এগুলির অবসান ঘটতে থাকে। শিক্ষা আন্দোলনেও তিনি নূতন যুগের পথপ্রদর্শক। সংস্কৃত পড়ানোর আধুনিক পদ্ধতি তিনি প্রচলন করেন। আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা তিনি। এই প্রসঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্মলগ্নের কথা উল্লেখ করা দরকার। বস্তুতঃ কেরী-রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্রতিভা স্পর্শে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ রচিত হয়। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের দ্বার অব্রাহ্মণদের কাছে উন্মুক্ত করেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ক্লাসও সেখানে শুরু হয়। মেয়েদের পৃথক স্কুল তিনি গড়ে তোলেন। বেথুন স্কুলের সম্পাদক হিসাবে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রবর্তনে তাঁর ভূমিকা উল্লেখ্য। মেট্রোপলিটন স্কুল ও কলেজে তিনি ভারতীয় শিক্ষক নিয়েই শিক্ষাদান করেন। শিশু শিক্ষার জন্য প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তকও প্রণয়ন করেছিলেন।

(৫) সাহিত্য ও সমাজ সংস্কার—সমাজ সংস্কার আন্দোলনে বিভিন্ন মনীষীর অবদান যেমন আছে, তেমনি সাহিত্য ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে নবযুগের মনীষীরা সমাজ সংস্কৃতি তথা রাজনৈতিক আন্দোলনকেও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে রামমোহনই আন্দোলন করেছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ মেটকাফ, সংবাদপত্রের উপর থেকে বিধি নিষেধের কঠোরতা তুলে নেন। রামমোহনের 'সংবাদ কৌমুদী', ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদ চন্দ্রিকা', ইয়ংবেঙ্গলের সম্পাদনায় ইংরেজী মুখপত্র 'এনকোয়ার' এবং বাংলা মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ', প্রসন্ন ঠাকুরের 'দি রিফর্মার', দেবেন্দ্র নারায়ণের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা, ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন, কেশবচন্দ্রের

'ইণ্ডিয়ান মীরর', শিশির ঘোষের 'অমৃত বাজার', স্বরেন ব্যানার্জ্জীর 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি উত্তরোত্তর সোচ্চার কণ্ঠে একদিকে যেমন সমাজসংস্কারের উপর জোর দেয় তেমনি জাতীয় মতামত প্রচার করে। লিটন দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েও সফল হননি।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির চিন্তা প্রতিফলিত হয় মাইকেল, অক্ষয়কুমায় দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারিচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, নবীন সেন,



বঙ্কিমচন্দ্র



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, নাট্যচর্চার অগ্রগতিও এই সময়ে দেখা যায়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গঠিত বিভিন্ন সভা সমিতির মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হত। এগুলির মধ্যে অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েসন, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা বেথুন সোসাইটি, সুহৃদ সমিতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গঠিত সমিতিগুলি প্রধানতঃ রাজনৈতিক হলেও সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এদের অবদান আছে। রাজনারায়ণ বসুর উদ্যোগে স্থাপিত 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনা সভা', দেশপ্রেমিক সমিতি, হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলা প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

যাই হোক উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলন তাই ধর্ম ও সমাজের চৌকাঠ পেরিয়ে ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনার উন্মেষের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই আন্দোলন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজকে ঘিরে হয়েছিল বলে এর সামগ্রিক রূপ যেমন খুব প্রকট ছিলনা সমাজ জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের গতিও তেমন বেগবতী হয়নি।

বাংলা প্রদেশে পাশ্চাত্য ভাবধারা পশ্চিম ভারতের বহু পূর্বেই প্রবাহিত হতে সুরু করেছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ নাগাদ পশ্চিম অঞ্চল প্রকৃত অর্থে ব্রিটিশ শাসনের আওতায় এসেছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে 'প্রার্থনা সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রবর্তকরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন এবং জাতিভেদ প্রথার বিলোপ এঁদের লক্ষ্য ছিল। এই প্রার্থনা সমাজের অধিবেশনকালে এর সদস্যগণ তথাকথিত নীচজাতির হাতের রান্না খাবার খেতেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন শিক্ষিত যুবকের চেষ্টায় ছাত্রদের জন্য একটি

সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল (Students' Library and Scientific Society)। এর দুটি শাখা ছিল, একটি গুজরাটি ভাষীদের অপরটি মারাঠি ভাষীদের জন্য। এর দেশীয় নাম ছিল 'জ্ঞান প্রকাশ মণ্ডলী'। উপরোক্ত সমিতি বিজ্ঞান বিষয়ে এবং সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে সর্বসাধারণের উপযোগী বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করত। এই সমিতির আর একটি উদ্দেশ্য ছিল নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মহামতি ফুলে মহারাষ্ট্রের পুনেতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই পরপর আরও কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনে যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ভাউজাদী এশংকর শেঠের নাম উল্লেখযোগ্য। ফুলে মহারাষ্ট্রে বিধবা পুনর্বিবাহের ব্যাপারেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালে বিষ্ণুশাস্ত্রী পণ্ডিত মহারাষ্ট্রে বিধবা পুনর্বিবাহ প্রথা প্রচলিত করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে আর একটি বিশিষ্ট সংস্কারকের নাম কারসনদাস (কৃষ্ণদাস) মূলজী। ইনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বিধবা বিবাহকে সমাজ-সম্মত করার উদ্দেশ্যে গুজরাটিতে 'সত্যপ্রকাশ' নামে একটি সাময়িকপত্র প্রবর্তন করেন।

মহারাষ্ট্রে প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে গোপালহরি দেশমুখ ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ। লোক হিতৈষণার জন্য ইনি দেশবাসী কর্তৃক লোক 'হিতবাদী' নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। যুক্তিবাদী চিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুগ-সম্মত মানবতাবাদের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের পুনর্বিন্যাস তাঁর ঈপ্সিত ছিল। ফুলে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর 'মালি' বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই কারণে মহারাষ্ট্রে অব্রাহ্মণ ও অচ্ছুৎ শ্রেণীর সামাজিক দুর্গতির বেদনা তিনি বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। উচ্চবর্ণের মানুষদের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের নিম্নবর্ণের মানুষদের উপর প্রভুত্ব স্পৃহা ও দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন।

বোম্বাই প্রদেশের আর একজন নেতৃস্থানীয় সমাজ সংস্কারক ছিলেন দাদাভাই নৌরজী। জরথুস্ট্র, (zoroastrian) ধর্মসংস্কারের জন্য যে সমিতি গঠিত হয়, ইনি ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। জরথুস্ট্র ধর্মাবলম্বীদের (পার্শীদের) মধ্যে নারীজাতির অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিবাহ ও উত্তরাধিকার বিষয়ে একই ধরনের আইন প্রচলনের উদ্দেশ্য নিয়ে যে পার্শী আইন প্রণয়ন সমিতি স্থাপিত হয় দাদাভাই নৌরোজী তারও একজন উদ্যোক্তা ছিলেন।

ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও সংগ্রাম

(ক) কৃষক বিদ্রোহ—ফরাজী ও ওয়াহাবী (১৮৫৫-৫৬) আন্দোলন

'ফরাজী' কথাটির অর্থ 'ফরাজ' অর্থাৎ আল্লার আদেশ অনুসরণকারী। ফরিদপুরের শরিয়তুল্লা ও তাঁর পুত্র মহম্মদ মহসীন বা দুদু মিঞা ছিলেন ফরাজী নামে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতা। ফরাজীগণ ছিলেন ফরিদপুরের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। শরিয়াতুল্লা মুসলমান ধর্মের মূলগত সংস্কার সাধন করে জনসাধারণের মধ্যে ফরাজী মতবাদ প্রচার করেন। এই ধর্মীয় মতবাদে ধর্মাচরণের সরলতা অল্প সময়ের মধ্যেই দরিদ্র মুসলমান

জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে। ওয়াহবীদের ধর্মমতের সাথে এদের ধর্মমতের বেশ সাদৃশ্য থাকলেও—পার্থক্যও ছিল যথেষ্ট। ফরাজীরা 'ওয়াহাবী, নামটিরও বিরোধিতা করত। তা সত্বেও উভয় আন্দোলনই মুসলমান ধর্মের মৌলিক সংস্কারের মাধ্যমে কুসংস্কার দূর করে জনসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

মুসলমান শাসন অবসান করে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ঘটনা মুসলমানদের মনে ইংরেজ শাসনের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ওয়াহাবী (১৮৫৫-৫৬ সন) ও ফরাজী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের বিক্ষোভ প্রকাশ পায়। দুই ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া থেকে আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

ওয়াহাবী আন্দোলন প্রথমে ধর্মসংস্কার আন্দোলন রূপে আরম্ভ হলেও জমিদার গোষ্ঠী ও নীলকুঠীর শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রামই এর প্রধান বিষয়বস্তু হল। আরবের আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-৮৭ খ্রীঃ) মুসলিম ধর্মে সংস্কার সাধনের কথা বলেন। আবদুল ওয়াহাবের নামানুসারে তাঁর অনুগামীগণ ওয়াহাবী নামে পরিচিত হন। কিন্তু ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রায়বেরেলীর সৈয়দ আহম্মদ (১৭৮৬-১৮৩১ খ্রীঃ)। তাঁর নির্দেশিত মুসলিম ধর্ম হতে দুর্নীতি দূর করে আরবের পয়গম্বর কর্তৃক প্রচারিত ইসলাম ধর্মের সারল্যে প্রত্যাবর্তনই ছিল ওয়াহাবীদের লক্ষ্য। সৈয়দ আহ্মদ ভারত হতে বৃটিশ শাসন উৎখাত করে পুনরায় মুসলিম শাসন প্রবর্তনের কথা বললেন। সৈয়দ আহ্মদের নেতৃত্বে ওয়াহাবী আন্দোলন একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়।

কালানুক্রমিক বিচারে ফরাজী আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলনের পূর্বে সংগঠিত হয়। অথচ ফরাজী আন্দোলনেও ওয়াহাবী আন্দোলনের মূলকথা বলা হয়েছিল। ফরাজী আন্দোলনের (১৮৩৭-'৪৮ সনের) প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরিয়তুল্লা। তিনি ১৮০৪ খ্রীঃ হতে মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। শরিয়তুল্লা বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জিলার অধিবাসী ছিলেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ইসলাম ধর্ম হতে দুর্নীতি ও কুসংস্কার দূর করে তিনি ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধন করতে চাইলেন। তিনি খোলাখুলি ঘোষণা করলেন—ব্রিটিশ শাসনাধীন অঞ্চল হল দার-উল-হারব, অর্থাৎ শত্রুর দেশ। এই দার-উল-হারবে মুসলিম ধর্মানুষ্ঠান পালন বা শুক্রবার নামাজের কোন প্রয়োজন নেই। সহজ সরল জীবন-যাপনের জন্য শরিয়তুল্লা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে শরিয়তুল্লা প্রবর্তিত ফরাজী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ফরিদপুর জেলা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের কৃষক ও বৃত্তিচ্যুত কারিগরগণ সংঘবদ্ধ হয়। দরিদ্র, লাঞ্ছিত, দুর্বল কৃষকদের ইংরেজ-বিরোধী গণ-আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে ফরাজী আন্দোলন কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী ভাব সঞ্চার করে দিয়েছিল।

শরিয়তুল্লার পুত্র মহম্মদ মহসীন (১৮১৯-৬০ খ্রীঃ) ছিলেন ফরাজী আন্দোলনের প্রাণ। তিনি দুদু মিঞা নামেও পরিচিত ছিলেন। দুদু মিঞার সাংগঠনিক প্রতিভা ছিল অপরিসীম। তিনি পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ফরাজী আন্দোলনের বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই সময় সাধারণভাবে ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ইংরেজ শাসন

উৎখাত করে মুসলিম শাসনের পুনঃ প্রবর্তন হল ফরাজীদের লক্ষ্য। দুদু মিঞা জমিদারের অত্যাচার হতে অসহায় কৃষকদের রক্ষা করতেন। দুদু মিঞার ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পায় যে তাঁকে না জানিয়ে কেহ বিবাদ বিসম্বাদ মিটাবার জন্য ইংরেজ আদালতে গেলে দুদু মিঞা তাঁকে শাস্তি দিতেন। হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সকলের সম্পর্কেই দুদু মিঞার এই ব্যবস্থা ছিল। অবশ্যই দুদু মিঞার ক্ষমতার উৎস ছিল তাঁর জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক প্রতিভা। জমিদার ও নীলকরগণ দুদু মিঞার কার্যে শঙ্কিত হয়ে সরকারের শরণাপন্ন হয়। সরকার দুদু মিঞাকে গ্রেফতার করে। কিন্তু কেহই তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় না। প্রমাণাভাবে আদালত দুদু মিঞাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সরকার পুনরায় দুদু মিঞাকে গ্রেফতার করে এবং আলিপুর জেলে বন্দী করে রাখে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুরপুরে দুদু মিঞার মৃত্যু হয়। বাহাদুরপুরই ছিল দুদু মিঞার ফরাজী আন্দোলনের কেন্দ্র। ফরাজী আন্দোলন ক্রমে ক্রমে ওয়াহাবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

মোটামুটিভাবে ১৮৩০ খ্রীঃ হতে ১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত ওয়াহাবী আন্দোলন বিস্তৃত ছিল। ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহ্মদ মুসলিম সাধক দিল্লীর ওয়ালিউল্লার পুত্র আবদুল আজিজের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ওয়ালিউল্লার ধর্মমত ইসলামের সুফীদর্শন দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। সৈয়দ আহ্মদ ওয়ালিউল্লার বহু মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। সৈয়দ আহ্মদ সর্বপ্রথম রোহিলাখণ্ডে তাঁর মতামত প্রচার করেন। পাটনা ও কলিকাতায় তিনি বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন। আবদুল আজিজ ইংরেজ শাসন বিরোধী ছিলেন। আবদুল আজিজের প্রভাব সৈয়দ আহ্মদের উপর পড়েছিল। ফরাজীদের মত সৈয়দ আহ্মদ ঘোষণা করলেন—ভারতভূমি দার-উল্-হার্ব—শত্রুদেশ। প্রত্যেক ওয়াহাবীর পবিত্র কর্তব্য শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করা—অথবা দার-উল্-হার্ব পরিত্যাগ করে অন্য মুসলিম দেশে বাস করা। ওয়াহাবী আন্দোলন প্রথমদিকে শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল কিন্তু পরে ওয়াহাবী আন্দোলনে শিখ-বিরোধী মনোভাব ও প্রচার পরিত্যক্ত হয়। ভারতকে ইংরেজ শাসন হতে মুক্ত করার জন্য সৈয়দ আহ্মদ দেশীয় রাজাদের সাহায্যলাভের চেষ্টা করেছিলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনার জন্য তিনি ওয়াহাবীদের অস্ত্রব্যবহার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সৈয়দ আহমদ স্বয়ং সামরিক কুচকাওয়াজে যোগ দিতেন; ভারত জয়ের জন্য তিনি ওয়াহাবীদের মধ্যে বহু প্রচার পত্র বিলি করেন। ভারতকে ইংরেজ শাসন হতে মুক্ত করার জন্য সৈয়দ আহ্মদ দেশীয় রাজাদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করেছিলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনার তিনি ওয়াহাবীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তিনি ওয়াহাবীদের মধ্যে তার মতাদর্শ সম্বলিত প্রচার পত্র বিলি করেন। ওয়াহাবী আন্দোলন প্রচারের জন্য সৈয়দ আহ্মদ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তান পর্যন্ত গিয়েছিলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদে সীমান্তের উপজাতীয়দের সংঘবদ্ধ করাই এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য।

সুনিপুণ সংগঠন, গুপ্ত প্রচার, নিজেদের মধ্যে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি দ্বারা

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে ওয়াহাবী আন্দোলন দৃঢ়বদ্ধ হয়।

বঙ্গদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা হিসেবে তিতুমীর ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিতুমীর মক্কায় সৈয়দ আহমদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। চব্বিশ পরগণা, যশোহর, ও নদীয়া জেলায় কৃষক এবং তাঁতীদের মধ্যে তিতুমীরের বহু অনুগামী ও সমর্থক ছিল। তিতুমীর প্রজাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিতুমীর ঘোষণা করলেন যে ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে এবং পুনরায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিতুমীরের বিদ্রোহ দমন করবার জন্য আলেকজাণ্ডারের অধীনে ক্যালকাটা মিলিশিয়ার (Calcutta Militia) সৈন্যগণ প্রেরিত হয়। তিতুমীরের সেনাপতি গোলাম মাসুম এই বাহিনী বিধ্বস্ত করেন (১৮৩১ খ্রী:)। তিতুমীর ও তাঁর অনুগামীগণ বারাসতের নিকট নারকেলবাড়িয়া নামক স্থানে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে কোম্পানীর সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। কোম্পানী এবার তিতুর বিরুদ্ধে গোলন্দাজ সহ সুসজ্জিত ইউরোপীয় সৈনিক পাঠায়। তিতুর সৈনিকগণ যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেয়। তিতু যুদ্ধে নিহত হন। ৩৫০ জন বিদ্রোহী সহ গোলাম মাসুমকে ইংরেজরা বন্দী করে। পরে গোলাম মাসুমের ফাঁসি হয়।

ওয়াহাবীগণ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের বিদ্রোহীদের অপেক্ষা অধিকতর সংগঠন নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে তাঁরা পাটনা হতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি অঞ্চল পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতেন। সিপাহী বিদ্রোহে ওয়াহাবীগণ বিশেষ কিছু ভূমিকা পালন করেন নি। ইহার প্রধান কারণ, এই সময় ওয়াহাবী নেতাদের অধিকাংশই কারারুদ্ধ ছিলেন। তবে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সৈনিক ছাউনিতে কার্তুজে চর্বি ব্যবহার দ্বারা ইংরেজ কর্তৃক সিপাহীদের জাতি-নাশের চেষ্টা—এই প্রচার ওয়াহাবীদের কীর্তি বলে অনুমান করা হয়। ওয়াহাবী আন্দোলন ও ভারতের নানা স্থানে ওয়াহাবীদের আক্রমণে ইংরেজগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

পরাধীন ভারতে তিতুমীর প্রমুখ ওয়াহাবী বিদ্রোহের নায়কগণ সর্বপ্রথম সচেতন প্রয়াসে ইংরেজ শক্তির উচ্ছেদ করে ভারতকে স্বাধীন করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। ভারতব্যাপী ওয়াহাবী বিদ্রোহ এবং তিতুমীরের নেতৃত্বে বারাসত বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

(খ) উপজাতি আন্দোলন ঃ কোল বিদ্রোহ

ইংরেজ শাসনে ভারতের ইতিহাস কৃষক আন্দোলন ও আদিবাসী আন্দোলনের গৌরবে উজ্জ্বল। ইংরেজ শাসক ও জমিদার—মহাজনের বিশাল গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত শাসনের নির্মম রথচক্রের তলায় তাদের পিষে মারবার চক্রান্ত হয়। আদিবাসীদের তখন দুটি মাত্র পথই ছিল—অনিবার্য ধ্বংস অথবা বিদ্রোহের দ্বারা তার প্রতিরোধ। ভারতের আদিবাসীগণ দ্বিতীয় পথটিকেই বেছে নেন।

ছোটনাগপুর অঞ্চলে কোল, মুণ্ডা, হো উপজাতিদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল ইংরেজদের

সিংভূম দখলের ফলে। জমি ও জঙ্গল থেকে উৎখাত হয়ে ১৮৩১-৩২ সালে সিংভূমের কোল অধিবাসীরা কোম্পানির শাসন ও নতুন অধিকারপ্রাপ্ত দেওয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সিংভূমের আদিবাসী রাজা প্রভাত প্রজাদের সাহায্যে তাঁর সীমানায় কোম্পানির অনুপ্রবেশ বেশ কিছুদিন আটকে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮২০ সালে প্রভাত কোম্পানির কাছে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন।

ইংরেজ কোম্পানি কোলদের স্বাধীনতা হরণ করে খাজনা আদায়ের নামে শোষণের মাধ্যমে তাঁদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালায়। খাজনা আদায়ের জন্য বাইরে থেকে যে লোক নিযুক্ত হয় তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে মুসলমান ও শিখদের দ্বারা তারা লাঞ্ছিত হত। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী থানায় দারোগাদের কাছ থেকে সে সব অত্যাচারের কোনরূপ প্রতিকার না পেয়ে তারা নিজেদের বাসস্থান ত্যাগ করে চাতরা নামক স্থানে আশ্রয়ের জন্য উপস্থিত হয়। সেখানকার অধিবাসীরাও তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে সেখান থেকে তাঁদের উচ্ছেদ করে। ১৮১৯ সালে সিংভূমের পলিটিক্যাল এজেন্ট মেজর রাফসেজ সেখানে শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সে সময়ে কোলদের উপর নানা অত্যাচারের নায়ক ছিলেন তামারের জমিদারের ইজারাদার রঘুনাথ সিং। কোলদের সঙ্গে নানা গণ্ডগোল এড়াবার জন্য তামারের জমিদার 'রঘুনাথ সিংকে শাস্তি দেবার জন্য ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করলেন। চাতরা আদালতে রঘুনাথের বিচার হয় এবং বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তা হওয়া সত্ত্বেও তামার, কোল বিদ্রোহের ঝটিকা-কেন্দ্র হয়ে রইল।

এরপর কয়েক বছর কোলদের অসন্তোষ প্রশমিত হয়ে থাকলেও পুনরায় অত্যধিক মাত্রায় ভূমি রাজস্ব ধার্য ও অত্যাচারের ফলে ১৮২৯ সালের শেষ দিকে বিহারের সম্বলপুরে কোলদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ফেটে পড়ে এবং দেখতে দেখতে রাঁচী, হাজারীবাগ, পালামৌ ও মানভূমের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে (১৮৩১ সালে)। ঐ বছরের জানুয়ারী মাসে প্রায় দু'হাজার বিদ্রোহী কোল, তীর ধনুক নিয়ে তাঁদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ ও নিরসনের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে। চাতরা আদালতের নাজির ঘোষণাপত্রে জানালেন, যে সকল আদিবাসী হত্যাকাণ্ড ও দস্যুবৃত্তি করেছে তাঁরা এসে ধরা দিলে তাঁদের অপরাধ ক্ষমা করা হবে। কিন্তু বিদ্রোহী কোলগণ তা' অগ্রাহ্য করে কিছু জমিদার ও ব্যবসায়ীকে হত্যা করে। ইংরেজ ক্যাপ্টেন উইলকিন্‌সনের অধিনায়কত্বে কোলদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। অনেকে হতাহত হওয়ার পর বিদ্রোহীরা গ্রাম ত্যাগ করে পর্বতে আশ্রয় নেয় এবং ১৮৩২ সালে তাঁদের নেতাগণ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

হাণ্টারের 'Statistical Accounts of Bengal' গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, ইজারাদার-দের জবরদস্তি খাজনা আদায় ও কোল উপজাতি রমণীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে কোল বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। শেষ পর্যন্ত কোলদের বিদ্রোহী অভ্যুত্থান দমন করতে ইংরেজদের সেদিন ২০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য ও গোলান্দাজ বাহিনী লেগেছিল। আর স্যার জন শোরের হিসেবে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে হয়েছিল প্রায় ৫০০০ বর্গমাইল ব্যাপী বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়া অঞ্চল। এইভাবে বীরত্বপূর্ণ কোল উপজাতি বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ—(১৮৫৫-৫৭)

১৮৫৫-৫৭ সনের সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। সাঁওতাল উপজাতির এই বিদ্রোহ সাঁওতাল পরগণার পার্শ্ববর্তী কতিপয় জেলার কর্মকার, তেলি, ডোম ও মোমিন সম্প্রদায়ের দরিদ্র মুসলমানদের সহযোগিতায় সাঁওতাল অঞ্চলকে শোষণমুক্ত করবার জন্য সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহ যে সাঁওতাল অঞ্চলের স্বাধীনতা লাভেরই সংগ্রাম তা ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং শাসকগণও স্বীকার করেছেন। সাঁওতালদের প্রধান লক্ষ্য ছিল "তাহাদের নিজ দলপতির অধীনে স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য চাই।"

অতীতে সাঁওতালগণ প্রধানতঃ বিহার প্রদেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বিহারে তাদের স্বাধীন ও সরল জীবনধারার উপর ইংরেজ শাসনের এবং শোষণের ধারা তাদের উপর দারুণ-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আবহমান কাল থেকে তারা যে রীতি-নীতি, সমাজ ও গোষ্ঠীজীবন-এর সাথে পরিচিত ছিল তার উপর ইংরাজ অনুসৃত নূতন শাসন যন্ত্রের নিষ্পেষণ শুরু হওয়ায় তারা প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে।

ভাগলপুরের সাঁওতাল প্রধান অঞ্চলের নাম 'দামিন-ই-কো'। এই অঞ্চলে সর্বাধিক সংখ্যক সাঁওতাল বসতি স্থাপন করেছিলেন। সাঁওতালগণ এই অঞ্চলে এসে বন জঙ্গল কেটে চাষবাস আরম্ভ করার সাথে সাথে অনেকেই একে একে এখানে আসত লাগল। ইংরেজ বণিকরাজের মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির অনিবার্য ফল হিসাবে সমগ্র ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই একটি প্রকাণ্ড মহাজন শ্রেণী আবির্ভূত হয়েছিল। দরিদ্র সাঁওতালদের শোষণ করার জন্য বাঙালী, পাঞ্জাবী ও ভাটিয়া মহাজনও দলেদলে সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন স্থানে আসতে লাগল। সর্বোপরি জমিদার গোষ্ঠী ইংরাজ শাসনের ছত্রছায়ায় থেকে বিভিন্ন ভাবে সাঁওতাল শোষণকার্য অবাধে চালাতে থাকে।

মহাজন ও ব্যবসায়িগণের শোষণ ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে এবং বিভিন্ন প্রতারণা-মূলক উপায়ে সাঁওতালগণের নিকট হতে অর্থ ও শস্য হস্তগত করে অল্প সময়ের মধ্যে অবিশ্বাস্যরূপ ধনসম্পদ সঞ্চয় করে। বারহাইত ও হিরণপুর এই দুইটি স্থান ছিল মহাজনগণের প্রধান কেন্দ্র। এই দুই স্থানে সাঁওতালদের দেওয়া সুদে অতি অল্প সময়ে একটি ধনী মহাজন শ্রেণীর সৃষ্টি হল।

সংক্ষেপে বলা চলে, এই সকল ব্যবসায়ী অন্য জায়গা থেকে এসে পাহাড়ী অঞ্চলে বাসা বাঁধবার পর হতে সাঁওতালদের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে।

এই উপজাতিদের সহিত ব্যবসা চালাতে গিয়ে মহাজনগণের লোভ ও লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি; ঋণের জন্য ব্যক্তিগত ও বংশগত দাসত্বের বর্বর প্রথাজনিত ক্রমবর্ধমান দুর্দশা ও দুর্নীতি; পুলিসের সীমাহীন দুর্নীতি ও উৎপীড়ন এবং পুলিশ কর্তৃক মহাজনগণের দুষ্কার্যে সহায়তা এবং আদালতে সুবিচার লাভ সাঁওতালদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

ব্যবসায়ীরা দলে দলে সাঁওতাল অঞ্চলে প্রবেশ করে ঋণের দায়ে সমস্ত শস্য টেনে বের করে নিয়ে যেত। পুলিশ কর্মচারীগণ এই দুষ্কর্মে জমিদার ও মহাজনদের সহায় ছিল, এবং পুলিশ কর্মচারীগণই এই অঞ্চলের প্রকৃত শাসক ছিল। সাঁওতালগণ মুদ্রা দ্বারা লেনদেন ব্যবস্থায় মোটেই অভ্যস্ত ছিল না এবং তার উপর ছিল অনগ্রসরতার সর্ব

প্রকার অসুবিধা। এই অসহায় অবস্থার মধ্যেও তাদের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা সাঁওতালদের ভূমিদাসে ও ভূমিহীনে পরিণত করে।

সাঁওতালদের অধিকাংশই ছিল কৃষি-শ্রমিক কিংবা দরিদ্র চাষী। সম্পত্তির মধ্যে তাদের কারও কারও ছিল দু একটি গৃহপালিত পশু। সুতরাং এই সাঁওতালদিগকে মহাজন বা জমিদারদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হত। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল একবার যদি কেউ ঋণ গ্রহণ করত সেই ঋণ সে জীবনেও শোধ করতে পারত না। ঋণগ্রস্তকে জমিদার ও মহাজনদের ক্রীতদাসে পরিণত হতে হত। বছরের পর বছর এই-ভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ঋণ শোধ করার চেষ্টা করত। যদি কখনও এই অত্যাচার হতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বনে-জঙ্গলে পলায়নের চেষ্টা করত, তৎক্ষণাৎ কোনরূপ সতর্ক না করেই পেয়াদা ও পাইক এসে দরিদ্র সাঁওতালের সমস্ত সম্পত্তি এমনকি স্ত্রী-লোকদের চিহ্নস্বরূপ লৌহনির্মিত অলংকারগুলি হাত থেকে জোর করে কেড়ে নিত।

ইংরাজ শাসনে এইরূপ অত্যাচারের বিচার বা প্রতিকার চাওয়া বৃথা হত। কারণ সেই শাসন ব্যবস্থায় জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, দারোগা-পুলিশ আমলা-কর্মচারী, এক কথায় গোটা সমাজ ব্যবস্থাটিই ছিল লুণ্ঠন উৎপীড়নে তৎপর, সেই শাসন ব্যবস্থায় কে কাকে বাধা দেবে। সুতরাং এই অত্যাচার অবসানের কোন উপায়ই ছিল না।

রেলপথে যে সকল ইংরাজ কর্মচারী কাজ করত তারা বিনামূল্যে সাঁওতাল অধিবাসীদের কাছ থেকে বলপূর্বক তাদের গৃহপালিত পশু খাদ্য হিসাবে আদায় করত। এইভাবে দেখা যায় যে সমাজের সকল স্তরের লোক সাঁওতালের উপর নিদারুণ অত্যাচার চালাত। শতকরা পঞ্চাশ টাকা হতে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত সুদ আদায়, বলপূর্বক জমি দখল, শারীরিক অত্যাচার সমস্তই চালাত।

ত্রিশক্তির মিলিত শোষণ-যন্ত্রের ফলে হতভাগ্য সাঁওতালদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত শুষে নিয়েছিল। জমিদার ও মহাজনগণ ঋণের নাগপাশে আবদ্ধ করে সাঁওতালদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। আর ইংরাজ শাসন পর্বত-প্রমাণ খাজনার চাপে তাদের পিষ্ট করেছিল। হতভাগ্য সাঁওতালগণ নিজ বাসভূমিতে কয়েক সহস্র বৎসর স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে অবশেষে ইংরাজ শোষণ-শাসনের জালে আবদ্ধ হয়ে অসহ্য মৃত্যু-যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলত 'ঈশ্বর মহান! কিন্তু তিনি থাকেন বহুদূরে! আমাদের রক্ষা করবার কেউ নাই।"

শোষণ পীড়নের চাপে মরিয়া হয়ে অবশেষে সাঁওতালগণ আত্মরক্ষার পথ খুঁজে বার করল। দরিদ্র সাঁওতাল চাষী ও কৃষি-শ্রমিক জমি ও ফসলের জন্য অমানুষিক উৎপীড়নের অবসানের জন্য নিজের পরিশ্রমে প্রস্তুত করা বাসভূমিতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহের পতাকা তুলল।

সাঁওতালী ভাষায় বিদ্রোহকে বলা হয় 'হুল'। সুতরাং সাঁওতাল বিদ্রোহ 'সাঁওতাল হুল' নামেও পরিচিত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে দাবাগ্নির মত চতুর্দিকে বিস্তৃত হলেও ১৮৫৪ সনে এর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠতে আরম্ভ করে ছিল।

সাঁওতাল উপজাতির এই ব্যাপক বিদ্রোহে সাঁওতালগণই একা ছিল না, বাংলাদেশের, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি এবং বিহারের ভাগলপুর ও ছোট-নাগপুর অঞ্চলের দরিদ্র শ্রমজীবী জনসাধারণও সাঁওতালগণকে সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল। কারণ যে শত্রুর বিরুদ্ধে সাঁওতালদের সংগ্রাম সেই শত্রু তাদেরও শত্রু।

মহাজনদের শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে এবং তাদের হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তারা ডাকাতের দল গঠন করে। 'ডিকু' অর্থাৎ বাঙালী মহাজন ও পশ্চিম ভারতীয় মহাজনদের গৃহে ডাকাতি করে প্রতিহিংসা গ্রহণ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। সাঁওতালদের গতিবিধি লক্ষ্য করে মহাজনগণ এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য স্থানীয় থানার দারোগা মহেশলাল দত্তের নিকট আবেদন জানায়। দারোগা সাহেব পাকুর জমিদারির অন্তর্গত সাঁওতাল মহলের নায়েব-মহাজনদের সঙ্গে যুক্তি করে বীরসিং মাঝিকে কাছারি বাড়িতে আটক করে তার অনুচরগণের সামনে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। এই ঘটনার পর হতে সাঁওতাল মহলের সাঁওতালগণ ক্ষিপ্ত হয়ে কতিপয় মহাজনের গৃহ লুণ্ঠন করে।

এই ঘটনার পর মহাজনগণ সামান্য সূত্র পাওয়া মাত্র সাঁওতাল নেতাদের চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করে। গোক্কো নামক সাঁওতালকে দারোগা বিনা দোষে গ্রেপ্তার করলে তিনি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন "আমরা দেখতে চাই, এই শয়তান দারোগাটা সাঁওতাল পরগণায় সমস্ত শান্তিকামী সাঁওতালকে বাঁধবার মত দড়ি কোথায় পায়।

১৮৫৪ সনের শেষভাগে গোক্কো, বীরসিং প্রভৃতি সাঁওতাল সর্দারের উপর উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে বীরভূম, বাঁকুড়া, ছোট-নাগপুর ও হাজারিবাগ হতে প্রায় সাত হাজার সাঁওতাল 'দামিন' অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়। তাদের বক্তব্য ছিল "শোষণ-উৎপীড়নের কোন বিচার নাই অথচ তাহাদের গৃহে ডাকাতির অভিযোগে সাঁওতালদের শাস্তি হবে কেন?" এই পরিকল্পিত অবিচার তাদের নিকট অসহ্য ছিল।

শোষণ অত্যাচার অবিচার হতেই বিদ্রোহের সৃষ্টি হয় এবং সেই বিদ্রোহের ভিতর হতেই জন্ম নেয় এর নেতৃত্ব। সাঁওতাল পরগণার ধূমায়িত বিদ্রোহের মধ্য হতেই বেরিয়ে এলেন ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব।

১৮৫৫ সনের ৩০শে জুন কলিকাতার দিকে এক বিপুল অভিযান যাত্রা করল। এই অভিযানে কেবলমাত্র নেতৃবৃন্দের দেহরক্ষী বাহিনীর সংখ্যাই ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার। বিদ্রোহী বাহিনী অভিযানকালে পাঁচক্ষেতিয়ার বাজারে উপস্থিত হলে সেখানকার কুখ্যাত মহাজনদের বিদ্রোহীগণ হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

বিদ্রোহের প্রারম্ভেই সাঁওতালগণ কুখ্যাত উৎপীড়কদের একে একে হত্যা করে বহুকালের পুঞ্জীভূত অপরাধের শাস্তিবিধান করে। প্রথমেই স্থানীয় থানার দারোগা মহেশলাল দত্ত সিধুর হাতে প্রাণ বিসর্জন করে পূর্বকৃত অসংখ্য অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহের সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত সমস্ত শাসক গোষ্ঠীকে স্তম্ভিত

করে দেয়। ভাগলপুরের কমিশনার প্রথমে ব্যাপক বিদ্রোহের সংবাদ বিশ্বাস করতে পারেন নাই। চারিদিক থেকে একই প্রকারের সংবাদ পেয়ে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। সাঁওতালদের বিদ্রোহের ফলে ভাগলপুর সদর, কলগঙ্গ ও রাজমহল বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে বিদ্রোহ দমনের জন্য বিপুল আয়োজন করতে থাকে। ভাগলপুরের কমিশনার এক পত্রে বড়লাট লর্ড ডালহৌসিকে অবিলম্বে 'মার্শাল-ল' জারি করে সমগ্র সাঁওতাল অঞ্চলটিকে সামরিক শাসনের অন্তর্গত করবার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য বিভিন্ন পুরস্কার ও টাকা ঘোষণা করা হয় এবং এই ঘোষণায় অস্ত্রধারী বিদ্রোহীদের দেখামাত্র হত্যা করবারও নির্দেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এইরূপ কঠোরতা সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের আক্রমণ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। সমগ্র ভারতের ইংরেজ শাসক ও সামন্ততান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে তাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল সংহত করে বিদ্রোহ দমনের আয়োজন করতে থাকে।

বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের বিস্তার

১। গোদ্দা—ভাগলপুর জেলার গোদ্দা অঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের আক্রমণ চলে সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক গোক্কোর অধিনায়কত্বে। গোক্কো ছিলেন দামিন-ইকো অঞ্চলের এক বর্ধিষ্ণু চাষী। স্বভাবত শান্তিপ্রিয় হলেও মহাজন গোষ্ঠী ও মহেশলাল দত্তের উৎপীড়ন তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। সাঁওতাল বিদ্রোহ আরম্ভ হলে গোক্কো বিদ্রোহে যোগদান করে সিধু ও কানুর সঙ্গে বিদ্রোহের পরিচালন ভার গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরা কয়েকটি স্থানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মহাজনদের হত্যা করে এবং সম্মিলিত বাহিনী এই অঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ উৎপীড়নের প্রধান কেন্দ্র পাকুড় রাজবাড়ীর দিকে যায়।

২। পাকুড় (বিহার)—বিদ্রোহী সাঁওতালদের এক বিরাট বাহিনী পাকুড় সীমান্তে পৌঁছালে বহুসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এই বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেয়। বিদ্রোহীরা পাকুড় ত্যাগ করবার পর এই স্থানের সর্বাপেক্ষা ধনী মহাজন দীনদয়াল রায় অনুচরবর্গসহ পাকুড়ে ফিরে আসেন। দীনদয়াল ও তাহার ভাই পাকুড়ে ফিরে এলে সাঁওতাল নেতাগণ তা লক্ষ্য রাখেন এবং তাদের আক্রমণ করবার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে। একদিন সেই সুযোগ এসে গেল। বিদ্রোহীগণ দীনদয়ালের মস্তক ছেদন করে অমানুষিক শোষণ উৎপীড়নের চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

৩। মহেশপুর—বিদ্রোহী বাহিনী পাকুড় ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদ জেলার দিকে অগ্রসর হয়। ১৫ই জুলাই তারিখে একটি প্রকাণ্ড ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সহিত সিধু, কানু ও ভৈরবের নেতৃত্বাধীন প্রায় চার সহস্র বিদ্রোহী সাঁওতালের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তিনজন সাঁওতাল নায়কই আহত এবং দুই শতাধিক সাঁওলাল নিহত হয়। অপরদিকে ত্রিভুবন সাঁওতাল ও মানবিদ মাঝির নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ হাজার সাঁওতাল

দুমকার নিকটবর্তী নীল কুঠিগুলির উপর আক্রমণ করে এই শয়তানের ঘাটিগুলিকে ধূলিসাৎ করে দেয়। বিভিন্ন স্থানে বহু ইংরেজ কুঠিয়াল বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহের তাৎপর্য

বাৎসরাধিক কাল অপ্রতিহত গতিতে চলবার পর সাঁওতাল বিদ্রোহের অবসান ঘটে। চল্লিশ বৎসর ব্যাপী ওয়াহাবী বিদ্রোহ ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পরেই গুরুত্বের দিক থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহের স্থান। এই বিদ্রোহ সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং ইহা ছিল ভারতের যুগান্তকারী মহাবিদ্রোহের অগ্রদূত স্বরূপ।

জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকরা বহুবার বিদ্রোহের সামিল হলেও ইংরেজ ও জমিদার গোষ্ঠীর সঙ্গে কৃষকের অন্যতম প্রধান শত্রু মহাজন গোষ্ঠীর উপরও প্রচণ্ড আঘাত সাঁওতাল বিদ্রোহেই আমরা প্রথম দেখতে পাই।

ইংরেজশক্তি বিপুল সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে—এই আঞ্চলিক বিদ্রোহকে দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও ত্রিশ হতে পঞ্চাশ হাজার সাঁওতাল তীর-ধনুক-টাঙ্গি তরবারি সম্বল করে নিপীড়িত মানুষের সমর্থনের উপর নির্ভর করে কামান সজ্জিত পনের হাজার ইংরেজ সৈন্যের মোকাবিলা করে। নটরাজন এক হিসেবে দেখিয়েছেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহীর মধ্যে অন্ততঃ পনেরো থেকে পঁচিশ হাজার সাঁওতালকে হত্যা করা হয়। সুশিক্ষিত সৈন্যের সাথে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে এই বিদ্রোহ ভারতের কৃষকশক্তিকে জাগ্রত করেছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে। সমগ্র ভারতের জনগণের সম্মুখে এই বিদ্রোহ যে পথ নির্দেশ করেছে, সেই পথ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুপ্রশস্ত রাজপথে পরিণত হয়েছে।

১০। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ

১৮৫৭ সনের মহাবিদ্রোহ ও কারণসমূহ ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে শুরু করে ইংরেজদের রাজ্য গ্রাস ও শাসনের রথচক্র ভারতের বুকে সংগঠিত রূপ নিয়েছিল। ইহা সত্বেও জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে এই শাসনের যোগ ছিল খুব সীমিত। তাদের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দ্বারা মুষ্টিমেয় সামন্তপ্রভু, অভিজাত শ্রেণী ও অল্প সংখ্যক মধ্যবিত্তরা খানিকটা সুখী থাকলেও জনসাধারণের মনে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব তখন প্রবল হয়ে উঠেছে, এর কারণও ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর এক শতাব্দী ধরে ঔপনিবেশিক শোষণ চলেছে বেপরোয়াভাবে। ভারতের ঐশ্বর্য প্রেরিত হয়েছে ইংলণ্ডে। ভারতের কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে বিলেতের তৈরী পণ্যের বাজার হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে ভারতবর্ষকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকরা জমিদার শ্রেণীর শোষণের শিকার হয়েছে। নানা ধরনের শুল্ক ধার্য করে ভারতীয় জনসাধারণকে শোষণ করা হয়েছে। এই সব কারণেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধূমায়িত হয়েছে অসন্তোষ। এই অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে স্থানীয়ভাবে—ফরাজী আন্দোলনে, ওয়াহাবী বিদ্রোহে, সাঁওতাল বিদ্রোহে। ১৮০৬ সনে ভেলোরের বিদ্রোহ, ১৮২৪ সনে বারাকপুরের স্থানীয় বিদ্রোহ, এবং এইভাবে আরও পর পর অনেকগুলি বিদ্রোহ হয়েছে, কিন্তু

সংগঠিত রূপ নিতে পারেনি, তাই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ হঠাৎ একদিনের কোন বিস্ফোরণ নয় দীর্ঘকালের ধূমায়িত ক্ষোভেরই এই পরিণতি। সিপাহী বিদ্রোহের কারণসমূহকে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক ভাগে ভাগ করা যায়।



কারণ সমূহঃ রাজনৈতিক কারণের মধ্যে রয়েছে ডালহৌসি প্রবর্তিত স্বত্ব বিলোপনীতি। এই নীতি দ্বারা সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্য অধিকার এবং নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া। এছাড়া তাঞ্জোর ও কর্ণাটকের রাজ পরিবারের ভাতা বন্ধ করা, কুশাসনের অভিযোগে অযোধ্যা অধিকার করা এবং বর্বরোচিতভাবে নাগপুর ও অযোধ্যার প্রাসাদ লুণ্ঠন প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ ও ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। বহু জমিদার ও তালুকদার তাঁদের সম্পত্তিচ্যুত হন। নূতন রাজস্বনীতির ফলেই একমাত্র দাক্ষিণাত্যে ২০,০০০ হাজার জমিদার তাঁদের জমিদারী হারান। এইসব নবাব এবং জমিদারদের

অনুগত ও তাঁদের অধীনে কর্মরত ব্যক্তিরা বেকার হয়ে যায়। এছাড়া ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা এইসব রাজ্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিছু কিছু উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীর উদ্ধত শাসন ব্রিটিশ বিরোধী অসন্তোষকে বাড়িয়ে দেয়।

সামাজিক ঃ ভারতীয়দের প্রতি অবজ্ঞা ও অবমাননা সূচক ব্যবহার, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন, সতীদাহ নিবারণ, রেলপথ ও টেলিগ্রাফের প্রবর্তন, মিশনারীদের ব্যাপক ধর্মান্তরিতকরণ প্রচেষ্টার ফলে ভারতবাসীর কাছে দূরভিসন্ধিমূলক বলে মনে হয়েছিল। ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারীদের ব্যাভিচারিতা ও নীতিহীনতা তাদের প্রতি ভারতবাসীর ঘৃণার মনোভাব সঞ্চার করেছিল। ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।



তাঁতিয়া তোপী



নানা সাহেব

অর্থনৈতিক কারণ হিসাবে ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে দায়ী করা যায়। এদেশের সোনা, রূপা প্রভৃতি ঐশ্বর্য ইংলণ্ডের রাজকোষে জমা হতে থাকে। বিলাতি পণ্যদ্রব্যের আমদানীতে এদেশের কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। বিভিন্ন করের বোঝা দিন দিন বেড়েই চলেছিল। এতে সাধারণ মানুষ, কৃষক, হস্তশিল্পীদের আর্থিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে দেশীয় প্রাচ্য পণ্ডিতদের দুর্দশার সীমা ছিল না। দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার ফলে বহু সচ্ছল ও অভিজাত পরিবারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল।

সামরিক ঃ বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ হল ভারতীয় সিপাহীদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। কোম্পানীর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসার নীতিকে সিপাহীরা সন্দেহের চোখে দেখত। ইউরোপীয়দের তুলনায় ভারতীয় সৈনিকদের বেতনের স্বল্পতা এই বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিল। সামরিক বাহিনীর জন্য নির্দিষ্ট ৯'৮ মিলিয়ন পাউণ্ডের মধ্যে ৪'৫ মিলিয়ন পাউণ্ড ইংরেজ সামরিক অফিসারদের জন্য ব্যয় করা হত। ইংরেজ সামরিক অফিসারদের অশালীন ও বর্বরোচিত ব্যবহার এই অসন্তোষকে বাড়িয়ে তোলে। ভারতীয় সামরিক অফিসার বা সিপাহীদের পদোন্নতির সুযোগ খুব সীমিত

ছিল। লর্ড ক্যানিংয়ের 'General Service Enlistment Act'. প্রবর্তনের ফলে অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি পায়। এই আইনের ফলে সিপাহীদের পৃথিবীর যে কোন স্থানে যেতে বাধ্য করা যেত। হিন্দু সিপাহীরা সমুদ্র যাত্রার ফলে জাতিচ্যুত হবে এই ভয়ে ভীত হয়ে উঠে। এই আইন সিপাহীদের কাছে তাদের ধর্মমতের পরিপন্থীরূপে বিবেচিত হয়েছিল। কারণ তখনকার দিনের হিন্দুদের মধ্যে এমনই একটা বিশ্বাস ছিল যে সাগর পার হওয়া একটা নিষিদ্ধ বিষয়। সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল এনফিল্ড রাইফেল-এর প্রবর্তন। গরু ও শূকরের চর্বি মাখানো কার্তুজ দাঁতে কেটে বন্দুকে তা পুরতে হত। এরই ফলে বহুদিনের ধূমায়িত অসন্তোষ প্রবল বিদ্রোহে ফেটে পড়েছিল।


দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্


লক্ষ্মীবাঈ

বিদ্রোহের নেতৃত্ব ও প্রসার : বিদ্রোহের প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপী প্রভৃতি। এরা নিঃসন্দেহে সামন্ত নৃপতিদের প্রতিনিধি। কিন্তু রাজপুত ও অন্যান্য নৃপতিদের অধিকাংশই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ছিলেন। এছাড়া বিহারের কুয়র সিং-এর মত সাধারণ জমিদার অথবা আহমদউল্লাহ-এর ন্যায় মধ্যবিত্ত মৌলভীর নেতৃত্বে অযোধ্যা ও উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে জমিদারদের সাথে কৃষকরাও বিদ্রোহে অংশ নিয়ে ছিল। বিদ্রোহ যখন তুঙ্গে তখন প্রায় ১ লক্ষ বর্গ মাইল জায়গায় প্রায় ৪ কোটি জনতা এই বিদ্রোহের সামিল হয়েছিল। এই বিদ্রোহে প্রথমে বাংলাদেশের ব্যারাকপুরে সিপাহীরা বিক্ষোভ জানিয়েছিল। তারপর মীরাট, ঝাঁসী, ফিরোজপুর, লক্ষ্মৌ, বেরিলি, মোরাদাবাদ, এলাহাবাদ, কানপুর, দিল্লী, মথুরা, ফৈজাবাদ প্রভৃতি স্থানের সিপাহীরা বিদ্রোহ করলেন। তাই শুধু মাত্র সামন্ত বিদ্রোহ না বলে ইহাকে মহাবিদ্রোহ রূপে আখ্যায়িত করলে তা ভুল করা হবে না।

প্রকৃতি : ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। সমসাময়িক ইংরেজ ঐতিহাসিকরা অনেকেই এই বিদ্রোহ সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন করেন নি। সাভারকর একে পুরোপুরি জাতীয়

বিদ্রোহ রূপেই আখ্যায়িত করেছেন। কার্লমার্কস তার রচনায় একে হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত জাতীয় বিদ্রোহ বলেছেন। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যেও সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। মতবিরোধ মূলতঃ কেন্দ্রীভূত দুটি প্রশ্নে, প্রথমতঃ এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র সিপাহী বিদ্রোহ কিনা; দ্বিতীয়তঃ এই বিদ্রোহকে জাতীয় অভ্যুত্থান বলা সঙ্গত হবে কিনা।

১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের চরিত্র নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন ঐতিহাসিক ডঃ এস এন সেন ও ডঃ রমেশ মজুমদার যথাক্রমে Eighteen Fifty Seven' এবং The Sepoy Mutiny & The revolt of 1857' গ্রন্থ দুটিতে। উভয়ের অভিমতের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। সামরিক বাহিনীর মধ্যে সিপাহী যুদ্ধ যে সীমাবদ্ধ থাকেনি এবং বিভিন্ন স্থানে এই বিদ্রোহ জনগণের সমর্থন পেয়েছিল একথা দুজনেই স্বীকার করেছেন, কিন্তু এই বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ নয় বলেই মোটামুটি অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু ডঃ সেন বলেছেন যে জনসাধারণের স্তর থেকেই বিদ্রোহীরা এসেছিলেন এবং এই বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদের মধ্যে সীমিত ছিল না, সকলশ্রেণী এই বিদ্রোহ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন যে ধর্মের জন্য যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল, তার পরিণতি স্বাধীনতার যুদ্ধে শেষ হয়েছিল। কারণ এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে বিদ্রোহীরা বিদেশী সরকার থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল এবং দিল্লীর বাদশাহীর পুরানো ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। এছাড়া এই বিদ্রোহে যে হিন্দু-মুসলমানে সৌভ্রাত্র ছিল এবং বিদ্রোহের সর্বস্তরে উভয় সম্প্রদায় যে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেছিল তা ডাঃ সেন উল্লেখ করেছেন।

পক্ষান্তরে ডঃ রমেশ মজুমদার বলেছেন যে জাতীয় বিদ্রোহের অংশ হিসাবে এই বিদ্রোহ দেখা দেয়নি। প্রথম থেকেই এই অভ্যুত্থান সিপাহীদেরই বিদ্রোহ, পরে সামন্ত ও তালুকদার শ্রেণী এই বিদ্রোহে যোগ দেয়।

এই বিদ্রোহ 'জাতীয় বিদ্রোহ' কিনা এ সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ থাকলেও একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে এই বিদ্রোহের একটি সামগ্রিক রূপ ছিল এবং গোটা দেশ ও জাতির জীবনের উপর এর সামগ্রিক প্রভাব পড়েছিল। আর একথাও ঠিক যে 'জাতীয় চেতনার' আধুনিক রূপের বিকাশ তখনও গড়ে উঠেনি, তবুও একটা ইংরেজ বিরোধী মনোভাব তখন ব্যাপক আকারে গড়ে উঠেছিল। এই কারণেই অধ্যাপক সুশোভন সরকার বলেছেন যে মারাঠা ও শিখদের মধ্যে যদি ঐতিহাসিকরা জাতীয়তাবোধ দেখতে পান, তবে সিপাহী বিদ্রোহে এই বোধ তাঁরা খুঁজে পাবেন না কেন? যাই হোক একথা প্রায় সবাই স্বীকার করেন যে এক ব্যাপক অঞ্চলে এই বিদ্রোহ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খাও এর সাথে জড়িয়ে ছিল। হিন্দু মুসলমান উভয়েই এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, ধনী-দরিদ্র সর্বস্তর থেকে মানুষ বিদ্রোহীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই বিদ্রোহের সময় কৃষক-অসন্তোষ দেখা গিয়েছে। মধ্যবিত্তরা এই বিদ্রোহের ফলে খুশী হয়েছিল, যদিও প্রত্যক্ষভাবে তারা বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে যেখানে বিদ্রোহের বেশী ছাপ পড়েনি, সেখানে ব্রিটিশের পরাজয়ে চাঞ্চল্য দেখা গেছে। এই সব কারণে এই বিদ্রোহকে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান বলে চিহ্নিত করলে বোধহয় ভুল হবে না।

আরও মনে রাখতে হবে যে এই বিদ্রোহ যদি মুষ্টিমেয় সিপাহীদের উদ্দেশ্যহীন ও অসংগঠিত অভ্যুত্থান হত, তবে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূল এতে নড়ে উঠত না এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে রাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করতেন না। তবে সব কিছু সত্বেও প্রকৃত জাতীয় বিদ্রোহের চরিত্র এতে চিত্রিত ছিল না। কারণ জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় চেতনা এই বিদ্রোহের আগে সৃষ্টি হয় নি। তা না হলেও একে নিছক সিপাহী বিদ্রোহও বলা যায় না। একথাও স্মরণযোগ্য যে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও জাতীয় বিদ্রোহের সম্ভাবনা এর মধ্যে ছিল। এই বিদ্রোহের পর থেকেই ভারতের জাতীয় মানসপটে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সঞ্চারিত হয় এবং উত্তরকালের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণসমূহ ঃ বিদ্রোহের আকস্মিকতায় এবং প্রচণ্ডতায় ইংরেজ শক্তি প্রথমটা হতচকিত হলেও এই বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। (১) উপযুক্ত ও সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অভাব, (২) সংগঠনের অভাব, (৩) সমর উপকণের অভাব, (৪ সংহতির অভাব, (৫) বিভিন্ন নেতৃবর্গের মধ্যে আদর্শ ও লক্ষ্যের পার্থক্য, (৬) আঞ্চলিকভাবে বিদ্রোহের সীমাবদ্ধতা, (৭) বিদ্রোহীদের সামরিক কৌশলগত ত্রুটি, (৮ ব্রিটিশদের কুটকৌশলে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য এবং শিখ, গোর্খা ও রাজপুতদের ইংরেজ পক্ষ সমর্থন, (৯) ইংরেজের উন্নত রণকৌশল ও সামরিক শক্তি, (১০) ব্রিটিশ করায়ত্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ১১) ব্রিটিশ নৌবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, (১২) সামন্ত শ্রেণীর অধিকাংশের ব্রিটিশপক্ষ সমর্থন, (১৩) প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সিপাহীদের অজ্ঞতা, (১৪) ইংরেজ নৃশংতায় সিপাহীদের মনোবল নষ্ট এবং (১৫) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদাসীনতা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণের জন্য এই বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ফলাফল ঃ এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর ফলে ভারতের শাসনব্যবস্থা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেকগুলি পরিবর্তন ঘটল (১) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয় শাসনের অবসান এবং ভারতীয় সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের হাতে ন্যস্ত হল। (২ স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যক্ত হল এবং দেশীয় রাজারা ব্রিটিশ শাসন বহির্ভূত হয়ে গেলেন। (৩) ভারতবর্ষ শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একজন সেক্রেটারী ভারপ্রাপ্ত হলেন এবং এইজন্য একটি কাউন্সিল গঠিত হল। (৪) শাসনব্যবস্থায় অধিকসংখ্যক ভারতীয় নিয়োগের নীতি গৃহীত হল। (৫) সমাজ সংস্কারে হস্তক্ষেপের নীতি পরিত্যক্ত হল। (৬) ভবিষ্যৎ বিদ্রোহ নিরোধের জন্য গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার লোপ করা হল; সামরিক উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ বাতিল করা হল, সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের আনুপাতিক সংখ্যা হ্রাস এবং ব্রিটিশ সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হল। (৭) এই বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের পরিব্যাপ্তি হয়েছে ও মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে বিরাট অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

কোম্পানীর শাসনের অবসান ঃ ব্রিটিশ সরকার ভারতে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে সরাসরি ইংরেজ সরকারের হাতে ভারতকর্ষের শাসনভার তুলে দিতে সিদ্ধান্ত নেন। পার্লামেন্টের সদস্যগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে ভারতের ন্যায়

একটি বৃহৎ দেশের শাসনের দায়িত্ব একটি বণিক কোম্পানীর হাতে থাকা অনুচিত। কারণ বণিক কোম্পানী কেবল নিজ মুনাফার কথাই ভাববে, প্রজার স্বার্থের কথা ভাববে না। ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের জন্য অনেকে কোম্পানীর কুশাসনকেই দায়ী করেন।

কোম্পানীর রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে সরাসরি ইংলণ্ড সরকারের হাতে শাসন হস্তান্তর করবার জন্য ১৮৫৮ খ্রীঃ পার্লামেণ্ট ভারত শাসন আইন পাশ করে। এই আইনের ফলে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী ভারত শাসনের দায়িত্ব পান। তাঁর পদের নাম হয় ভার সচিত (Secretary of State)। তিনি এই পরামর্শ সভার সাহায্যে ভারত শাসন বিষয়ক নীতি নির্ধারণ করবার অধিকার পান। তাঁর অধীনে ভারতে গভর্ণর জেনারেল শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব পান। গভর্ণর জেনারেলের উপাধি হয় ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি। ভারত সচিব তাঁর কাজের জন্য মন্ত্রিসভা ও পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন। ভারত শাসন আইন পাশ হবার পর কোম্পানীর হাত থেকে ভারতের শাসনক্ষমতা ইংলণ্ডের রাণীর হাতে যায়। তাঁর তরফে ভারত সচিব শাসন পরিচালনা করেন।

ভারতীয়গণকে আশ্বস্ত করবার জন্য ১লা নভেম্বর, ১৮৫৮ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঘোষণাপত্র (Queen's Proclamation) প্রকাশ করা হয়। এই ঘোষণাপত্রে মহারাণী ভারতীয় রাজন্যবর্গকে আশ্বাস দেন যে অতঃপর সরকার আর দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজ্য অধিকার করবেন না। তাঁদের সাথে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হবে! ইংলণ্ডের অন্যান্য প্রজাগণের ন্যায় ভারতীয়গণের প্রতি সমান কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ব দেখানো হবে। ভারতবাসীগণের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া হবে না। আইনের চক্ষে সমান অধিকার দেখানো হবে। সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য ধর্ম বা ব্যক্তিগত বাধাকে স্থান দেওয়া হবে না। এইভাবে বেসরকারী কোম্পানীর স্থলে সরকারী ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা ঃ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। কোম্পানীর শাসনের স্থলে সরাসরি ইংরেজ সরকারের শাসন প্রবর্তিত হয়। মহারাণীর ঘোষণার দ্বারা ভারতীয় রাজন্যবর্গের রাজ্য রাখবার আশ্বাস দিয়ে ভারতীয় রাজাদের আনুগত্য লাভ করে। এরপর থেকে ভারতীয় রাজাগণ ভারতীয় জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজ কর্মচারী কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমন এবং প্রতিশোধ নীতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভারতীয়গণের প্রতি বিরাগ সঞ্চার করে। এর ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে গভীর ফাটল দেখা দেয়। ইংরেজ কর্মচারীগণ তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও জাতিগত-শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয়গণের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাতে থাকে। শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীগণের এই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব ইংরেজ শাসনের জনপ্রিয়তা নষ্ট করে দেয়। তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীগণ শ্বেতাঙ্গ শাসকগণের ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হয় এবং সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে ভারতীয়গণের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার দেখে ইংরেজ শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা নানাবিধ অধিকার ও স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য আন্দোলনমুখী চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। এইভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তি রচিত হতে থাকে।

আদর্শ প্রশ্নাবলী (Model Questions)

প্রথম অধ্যায়

১। বিষয়মুখী ও মৌখিক প্রশ্নাবলী :—

(ক) ইতিহাস কাকে বলে ? (খ) কালানুক্রমিকতা ও ভূগোলকে ইতিহাসের কি বলা হয়ে থাকে ? (গ) কোন্ কবির কবিতায় ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ সম্বন্ধে যথার্থ বর্ণনা আছে ? (ঘ) ভারতের আয়তন কত ? (ঙ) ভৌগোলিক অবস্থান, বৈচিত্র্য ও আয়তনের বিশালতার বিচারে, ভারতকে কি বলা হয়ে থাকে ? (চ) ভারতের উত্তর সীমান্তে কোন্ পর্বতমালা পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে আছে ? (ছ) কোন্ পর্বতমালা ভারতবর্ষকে উত্তর-দক্ষিণে দু'ভাগ করেছে ? (জ) ভারত নামে দেশ বা বর্ষকে কি বলা হয় ? (ঝ) 'ভারতবর্ষ জাতিতত্ত্বের যাদুঘর'—একথা কে বলেছেন ? (ঞ) ভারতে প্রচলিত প্রধান ভাষা কয়টি ? (ট) কোন্ ভাষা উত্তর ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষার মূল উৎস ? (ঠ) কোল, ভীল, মুণ্ডা, ভারতের কোন্ জনগোষ্ঠীর বংশধর ? (ড) বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় কোন্ জনগোষ্ঠীর লোক বেশী দেখা যায় ? (ঢ) ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী কা'রা ? (ণ) হিমালয়ের পঞ্চনদ ও গঙ্গা—যমুনা—ব্রহ্মপুত্র উত্তর ভারতকে কি করেছে ? (ত) সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রে অসম বিকাশ কেন হয়েছে ? (থ) সমুদ্রবেষ্টিত দক্ষিণ ভারত কোন্ বিষয়কে উৎসাহিত করেছে ? (দ) 'ভারত-সন্ততি' কাদের বলা হয়েছে ? (ধ) কোন্ সময়টি ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন যুগরূপে চিহ্নিত ? (ন) কোন্ শিল্পরীতির সমন্বয়ে গান্ধার শিল্প গড়ে উঠেছিল ? (প) খালিমপুরের তাম্রলিপি থেকে কোন্ রাজাদের সম্বন্ধে জানা যায় ? (ফ) দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত রোমক মুদ্রা থেকে কি অনুমিত হয় ? (ব) তামিল সাহিত্যিক উপাদান কি নামে পরিচিত ? (ভ) 'হর্ষচরিত' কাহার রচনা ? (ম) কহ্লন কাহার জীবনচরিত রচনা করেছেন ? (য) তামিল ঐতিহাসিক রচনার নাম কি ? (র) 'ইণ্ডিকা' কাহার রচনা ? (ল) কোন্ তিব্বতী পণ্ডিত ভারত সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিবরণ লিখে গেছেন ? (ব) প্রাচীন যুগের শেষ দিকে কোন্ আরবীয় পণ্ডিত ভারত সম্বন্ধে বিবরণ লিখে গেছেন ? (শ) 'দি পেরিপ্লাস্ অব দি এরিথ্রিয়ান সী' বলতে কি বুঝ ?

২। ঐতিহাসিক স্থান নির্দেশ কর :—

(ক) পঞ্চনদ ; (খ) সিন্ধুগঙ্গাবিধৌত সমতলভূমি ; (গ) বিন্ধ্য পর্বতমালা ; (ঘ) হিমালয় ; (ঙ) গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী ; (চ) সুদূর দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :—

(ক) ভারতের দক্ষিণ ভাগ কিভাবে একটি উপদ্বীপে পরিণত হয়েছে ? (খ) প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভারতীয় উপমহাদেশকে কি কি ভাগে ভাগ করা হয় ? (গ) আর্য বা ভারতীয় আর্য কোন্ গোষ্ঠীর লোক এবং কোথায় কোথায় এদের সংখ্যা বেশী দেখা যায় ? (ঘ) প্রাচীন ভারতে কোন্ কোন্ বৈদেশিক জাতি কোন্ পথে বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রবেশ

করেন ? (ঙ) কিভাবে প্রাচীনকাল থেকে ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যের চেতনা দানা বাঁধে ? (চ) ইতিহাসের উপাদান বলতে কি বুঝ ? (ছ) প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষদের কথা আমরা কিভাবে জানতে পারি ? (জ) ঐতিহাসিক যুগের শুরু কবে থেকে এবং ঐ যুগের উপাদান কয় ভাগে বিভক্ত ও কি কি ? (ঞ) প্রাচীন ঐতিহাসিক রচনাগুলোর মধ্যে অন্ততঃ ৭টির নাম উল্লেখ কর। (ত) প্লিনির ন্যাচারালিস হিষ্টোরিয়া কেন বিখ্যাত।

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক রচনাধর্মী প্রশ্নমালা ঃ—

(ক) ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ কর। (খ) ভারতের ইতিহাসে বিন্ধ্য পর্বতমালার প্রভাব আলোচনা কর। (গ) ভারতের ইতিহাসে হিমালয়ের প্রভাব বর্ণনা কর। (ঘ) তিনদিকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত ভারতের ইতিহাস কিভাবে প্রভাবিত হয়েছে ? (ঙ) ভারতীয় সংস্কৃতিকে মিশ্র সংস্কৃতি বলা হয় কেন ? (চ) ভারতবাসীর চরিত্রের উপর ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা কর। (ছ) ভারতের জাতিগত ও ভাষাগত বৈচিত্র্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (জ) ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যবোধের পরিচয় ইতিহাসে কিভাবে দেখা যায় ? (ঝ) 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এই ভাবধারা ভারত-ইতিহাসে কিভাবে ফুটে উঠেছে তা' আলোচনা কর। (ঞ) বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী কিভাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান রূপে কাজ করেছে ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বিষয়মুখী ও মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ—

(ক) কবে থেকে ভারতবর্ষে মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয় ? (খ) পুরাতন প্রস্তর সংস্কৃতির চিহ্ন ভারতের কোথায় কোথায় পাওয়া গিয়েছিল ? (গ) কোন্ যুগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হয় ? (ঘ) মধ্য প্রস্তর যুগ কি ? (ঙ) ভারতের কোথায় সেযুগের মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ারের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে ? (ঙ) কোন্ যুগে কৃষির আবিষ্কার হয় ? (চ) হরপ্পা সভ্যতা কোন্ সংস্কৃতির যুগের সভ্যতা ? (ছ) নব প্রস্তর সংস্কৃতির পরবর্তী পর্যায়কে কোন্ সংস্কৃতি বলা হয় ? (জ) হরপ্পা সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল ? (ঝ) মিশরীয় সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল ? (ঞ) মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল ? প্রাচীন ভারতবর্ষে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র কোন্‌টি ? (ট) গর্ডন চাইল্ড কে ছিলেন ? (ঠ) মহেঞ্জোদড়ো স্থানটি কোথায় কোথায় অবস্থিত ছিল ? (ড) হরপ্পা স্থানটি কোথায় অবস্থিত ? (ঢ) মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ কাহারা আবিষ্কার করেন ? মহেঞ্জোদড়ো কথাটির অর্থ কি ? (ন) হরপ্পায় প্রাপ্ত সীলগুলির অনুরূপ সীল ভারতের বাইরে কোন্ দেশে পাওয়া গেছে ? (ত) সিন্ধু-সভ্যতার অঞ্চলের অধিবাসীরা কোন্ ধাতুর ব্যবহার জানতেন না ?

২। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :—

(ক) প্রাচীন প্রস্তর যুগ কাকে বলে ? (খ) ভারতবর্ষে মধ্য-প্রস্তর যুগ কবে থেকে শুরু হয় এবং প্রায় কত খৃঃ পূঃ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল ? (গ) প্রাচীন ও নবপ্রস্তর যুগের প্রধান পার্থক্য কি ? (ঘ) কৃষি আবিষ্কারের ফলে আদিম মানুষের জীবনে প্রধান কি পরিবর্তন ঘটে ? (ঙ) সভ্যতার আদিলীলাভূমি রূপে কোন্ কোন্ অঞ্চলগুলি গড়ে ওঠে ? (চ) মানুষ কখন নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল ? (ছ) হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো ভিন্ন কোন্ কোন্ সভ্যতার কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে ? (জ) হরপ্পা সভ্যতার কাল নির্ণয়ে ইরাকে প্রাপ্ত সীলগুলি কিভাবে সাহায্য করেছে ? (ঝ) কিভাবে হরপ্পা সভ্যতাকে প্রাক্-আর্যসভ্যতা বলা যায় ? (ঞ) সিন্ধুসভ্যতার বদলে বর্তমানে হরপ্পা সভ্যতা নামকরণের যুক্তি কি ? (ট) হরপ্পা সভ্যতার ব্যপ্তি আলোচনা কর।

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী :—

(ক) মানবসভ্যতার যাত্রা কখন থেকে এবং কিভাবে শুরু হয়েছিল ? (খ) হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োতে যে সুগঠিত নাগরিক জীবন ছিল সে কথা কি করে বুঝা যায় ? (গ) হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসীদের সামাজিক জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল ? (ঘ) ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে বিবরণ দাও। (ঙ) হরপ্পা সভ্যতার জন্য আমরা গৌরবান্বিত কেন ? সিন্ধু-হরপ্পা সভ্যতার বিলোপের কি কি কারণ অনুমান করা হয় ?

তৃতীয় অধ্যায়

১। বিষয়মুখী ও মৌখিক প্রশ্নাবলী :—

(ক) আর্যদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি ? (খ) কোন্ সময়ে ভারতে আর্যসভ্যতা বিকাশ লাভ করে ? (গ) কাপাডোসিয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত শীলালিপির নাম কি ? (ঘ) সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের নাম কি ? (ঙ) ঋগ্বেদের সাথে অন্য কোন্ গ্রন্থের অনেক মিল আছে ? বেদ কয়টি ? (চ) বৈদিক সাহিত্য কত ভাগে বিভক্ত ও কি কি ? (ছ) বেদের যে ভাগে মন্ত্র আছে তাকে কি বলে ? (জ) বেদান্ত কথার অর্থ কি ? (ঝ) বৈদিক যুগের দু'খানি দর্শন কি কি ? বেদের শেষ ভাগের নাম কি ? (ঞ) মহাকাব্য কয়টি ও কি কি ? (ট) সোমরস কি থেকে প্রস্তুত হত ? (ঠ) প্রাচীন গ্রীসের মহাকাব্য দুটির নাম কি ? (ড) মহাভারতের প্রধান বিষয় কি ? (ঢ) বৈদিক যুগে রাজাকে পরামর্শ দানের জন্য কি কি সংস্থা ছিল ?

২। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী :—

(ক) আর্যগণ ভারতে প্রথম কোন্ কোন্ স্থানে বসবাস করে ? (খ) শ্রুতি বলতে কি বুঝ ? (গ) ঋগ্বেদের একটি প্রচলিত প্রার্থনার উল্লেখ কর। (ঘ) ইংরেজ পণ্ডিত হুইটন ঋগ্বেদ সম্বন্ধে কি বলেছেন ? (ঙ) চতুর্বেদের মূল বিষয়বস্তু কি ? (চ) বৈদিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগের মূল বিষয় কি ? বর্ণাশ্রম কি ? (ছ) চতুরাশ্রম বলতে কি বুঝ ? বেদ ও

বেদান্তের সম্পর্ক কি? উপনিষদের প্রধান মর্ম কি? (জ) সূত্র সাহিত্য কাকে বলে? দশরাজার যুদ্ধ কি? (ঝ) কি বিষয়কে কেন্দ্র করে দাক্ষিণাত্যে আর্যপ্রভাবের ইঙ্গিত বহন করে? (ঞ) বৈদিক যুগে সমাজে নারীর স্থান কি ছিল?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :—

(ক) আর্যদের বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মতটি লিপিবদ্ধ কর।

(খ) আর্যদের রাষ্ট্রকাঠামোর রূপটি বর্ণনা কর।

(গ) বৈদিক যুগে আর্যদের অর্থনৈতিক জীবন আলোচনা কর।

(ঘ) আর্যদের ধর্মীয় জীবন কিরূপ ছিল?

(ঙ) বৈদিক যুগের শেষের দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উন্নতির বিবরণ দাও।

(চ) উপমহাদেশে বৈদিক সভ্যতার প্রসার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(ছ) আর্যদের আমলেই ভারতে যে লৌহ যুগের সূচনা হয় তার একটি প্রমাণ উল্লেখ করে কিভাবে কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির উদ্ভব ঘটে তাঁর বিবরণ দাও।

চতুর্থ অধ্যায়

১। নিম্নমুখী ও মৌখিক প্রশ্নাবলী :—

(ক) জৈনধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন? (খ) মহাবীর কত খ্রীঃ পূঃ জন্মগ্রহণ করেন? (গ) কি থেকে জৈননামের উৎপত্তি হয়? (ঘ) জৈনরা কয় ভাগে বিভক্ত ও কি কি? (ঙ) বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন? (চ) তিনি কত খ্রীঃ পূঃ জন্মগ্রহণ করেন? (ছ) গৌতম বুদ্ধের মায়ের ও মাতৃস্বসার নাম কি? (জ) গৌতম বুদ্ধের পুত্রের নাম কি? (ঝ) কোথায় তিনি প্রথম ধর্মপ্রচার করেন? (ঞ) তিনি কতবছর বয়সে দেহত্যাগ করেন? (ট) মহাবীর কোথায় দেহরক্ষা করেন?

২। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :—

(ক) বৈদিক যুগের শেষভাগে সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে কেন অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে?

(খ) মহাবীর কিভাবে জিন নামে পরিচিত হন?

(গ) কিভাবে গৌতম 'বুদ্ধ' নামে পরিচিত হন?

(ঘ) অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি?

(ঙ) বৌদ্ধ সংগীতি কি এবং কোথায় কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

(চ) ত্রিপিটক কি এবং তিনটি ভাগের মূল বিষয় কি?

(ছ) মিলিন্দ পঞ্হো থেকে আমরা কি জানতে পারি?

(জ) কেন বুদ্ধদেবকে 'এশিয়ার আলো' বলা হয়?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :—

(ক) প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের কারণগুলি কি কি?

(খ) মহাবীরের জীবনী আলোচনা কর।

(গ) জৈন ধর্মের মূলনীতিগুলি আলোচনা করে হিন্দুধর্মের সাথে মিল-অমিল দেখাও।

(ঘ) গৌতম বুদ্ধের জীবনী আলোচনা কর।

(ঙ) ভারতে ও ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির বিবরণ দাও।

(চ) বৌদ্ধধর্মের সাথে জৈনধর্মের পার্থক্য আলোচনা কর।

(ছ) ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রায় বিলুপ্তির কারণগুলি উল্লেখ কর।

(জ) বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব নির্ণয় কর।

(ঝ) ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

১। বিষয়মুখী ও মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ—

(ক) মহাজনপদ কথাটির অর্থ কি?

(খ) মগধের কোন্ রাজা বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন?

(গ) শিশুনাগ কে ছিলেন?

(ঘ) নন্দরাজার সেনাপতির নাম কি?

(ঙ) কত খ্রীঃ পূঃ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়?

(চ) সেলুকাস কে ছিলেন?

(ছ) 'ইণ্ডিকা, গ্রন্থটি কার লেখা?

(জ) অশোকের পিতার নাম কি?

(ঝ) অশোকের কোন্ লিপিতে কলিঙ্গ যুদ্ধের কথা জানা যায়?

(ঞ) প্রাচীন ভারতে কোন্ সম্রাটকে প্রকৃতপক্ষে রাজর্ষি বলা যায়?

(ট) সাইরাস কোথাকার সম্রাট ছিলেন?

(ঠ) আলেকজাণ্ডার কোন্ দেশের রাজা ছিলেন?

(ড) পাঞ্জাবে কার সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল?

(ঢ) ব্যাকট্রিয়া কোথায়?

(ণ) ব্যাকট্রিয় গ্রীক, শক ও পহ্লব রাজাদের অন্ততঃ ১জন করে নাম উল্লেখ কর।

(ত) সাঁচী স্তূপ কোথায়?

(থ) কুষাণগণ কোন্ জাতি হতে উদ্ভূত?

(দ) কুষাণযুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে?

(ধ) অশ্বঘোষ কে ছিলেন?

(ন) নাগার্জুন কে ছিলেন? ক্ষত্রপ কাকে বলে? মিলিন্দ কে ছিলেন? কণিষ্কের ধর্মমত কি ছিল?

(প) সাতবাহন সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ছিলেন ?
(ফ) 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' কে রচনা করেন ?
(ব) গুপ্তবংশের কোন্ সম্রাটকে নেপোলিয়নের সাথে তুলনা করা হয় ?
(ভ) কোন্ সম্রাট শকারি নামে পরিচিত ?
(ম) গুপ্তবংশের কোন্ সম্রাট বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন ?
(য) বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের নাম বল।
(র) ফাহিয়েন কোন সময়ে ভারতে আসেন ?
(ল) গুপ্তযুগের কয়েকজন কবি ও নাট্যকারের নাম বল ?
(ব) বিশাখদত্ত কোন্ গ্রন্থ রচনা করেন ?
(শ) 'মৃচ্ছকটিকম্' গ্রন্থ কে প্রণয়ন করেন ?
(ষ) 'কিরাতার্জুনিয়ম্'-এর লেখক কে ছিলেন ?
(স) পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের রচয়িতা কে ?
(হ) গুপ্তযুগের কয়েকজন বিজ্ঞানীর নাম কর।
(ক্ষ) অজন্তা গুহার শিল্পকর্মের একটি উদাহরণ দাও।

২। **অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :—**

(ক) ষোড়শ মহাজনপদের নামগুলি কি কি ?
(খ) মৌর্যসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত কিভাবে নন্দবংশ ধ্বংস করেন ?
(গ) মগধে কোন্ কোন্ রাজবংশ রাজত্ব করেন ?
(ঘ) চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকাসের সঙ্গে যুদ্ধের পর উভয়ের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল ?
(ঙ) গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে আমরা কি জানতে পারি ?
(চ) রাজুক ও ধর্মমহামাত্রদের করণীয় কাজ কি ছিল ?
(ছ) এইচ. জি. ওয়েলস্ অশোক সম্বন্ধে কি বলেছেন ?
(জ) আলেকজাণ্ডার কর্তৃক স্থাপিত কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশের নাম কর।
(ঝ) পহ্লবরাজ গণ্ডোফার্ণিসের কৃতিত্ব সংক্ষেপে বল।
(ঞ) শকাব্দের প্রবর্তক কে এবং কখন থেকে ?
(ট) চরক কে ছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে কি জানা যায় ?
(ঠ) বসুমিত্র কেন প্রসিদ্ধ ছিলেন ?
(ড) সাতবাহন শাসনব্যবস্থায় কোন্ কোন্ বিষয় অশোকের শাসনব্যবস্থা থেকে গৃহীত ?

(ঢ) সমুদ্রগুপ্ত যে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তা' কিভাবে জানতে পারি ? দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই যে কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য তা' কিভাবে অনুমিত হয় ? (ণ) ফাহিয়েনের বিবরণে প্রাচীন ভারতে নারী জাতির অবস্থা কিরূপ ছিল ?

৩। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী :—**

(ক) ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম মগধের উত্থানে বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর কৃতিত্ব আলোচনা কর।

(খ) চাণক্যের সহযোগিতায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উত্থান বর্ণনা কর।

(গ) মৌর্যশাসনব্যবস্থায় রাজধানী পাটলিপুত্রের শাসন পরিচালনার বিবরণ দাও।

(ঘ) মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব নিরূপণ কর। মেগাস্থিনিস প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও জাতিভেদ সম্বন্ধে যা' বলেছেন তা' লেখ।

(ঙ) অশোকের 'ধর্মবিজয়' নীতি গ্রহণ করবার কারণ কি?

(চ) দেশেও বিদেশে বৌদ্ধধর্মপ্রচারে অশোক কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন?

(ছ) ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাটরূপে অশোকের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

(জ) অলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পরোক্ষ ফলাফল বিবৃত কর।

(ঝ) কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের আমলে সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চার উন্নতির বিবরণ দাও।

(ঞ) গান্ধার শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

(ট) সাতবাহন শাসনের গুরুত্ব নিরূপণ কর।

(ঠ) উত্তর ও দক্ষিণ ভারত বিজয়ে সমুদ্রগুপ্ত যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা আলোচনা কর। (ড) শাসকরূপে সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব বিচার কর।

(ঢ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পও সাহিত্যের উন্নতির বিবরণ দাও।

(ণ) চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েনের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর।

গুপ্ত সংস্কৃতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে তুমি কি গুপ্তযুগকে-'স্বর্ণ যুগ' বলে মনে কর? গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। **বিষয়মুখী ও মৌখিক প্রশ্নাবলী :—**

(ক) ভারতে হূণ আক্রমণ কখন হয়?

(খ) দুজন হূণ-নেতার নাম কি? (গ) হূণগণকে চূড়ান্তভাবে কে পরাজিত করেন?

(ঘ) বাঙ্গালী রাজাদের মধ্যে কে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন?

(ঙ) হর্ষবর্ধন কে ছিলেন?

(চ) ভারতের কোন্ দিকে হর্ষের সাম্রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল?

(ছ) ভারতের দক্ষিণ দিকে তাঁর রাজ্যসীমা কোন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

(জ) হর্ষের সাম্রাজ্যের রাজধানী কোথায় ছিল?

(ঝ) হিউয়েন-সাঙ্ কে ছিলেন। (ঞ) বাণভট্ট কে ছিলেন?

(ট) ত্রিকোণ দ্বন্দ্ব বলতে কি বুঝ?

(ঠ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির নাম কি?

(ড) পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

(ঢ) দানসাগর ও অদ্ভুত সাগর কার রচনা?

(ণ) 'পরম বৈষ্ণব' উপাধি কে লাভ করেন?

(ত) বাদামীর চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে?

(থ) রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ?

(দ) বিক্রমাঙ্কদেব চরিত কাহার রচনা ?

(ধ) ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য কোন্ রাজবংশের সম্রাট ছিলেন ?

(ন) কাঞ্চীর পল্লববংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ?

(প) চোল রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ?

(ফ) ভারতসংলগ্ন কোন্ সাগর চোল হ্রদে পরিণত হয় ?

২। **শূন্যস্থান পুরণ কর :—**

ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে প্রধান রাজ্যটির নাম —। মগধের উত্থান শুরু হয় —' এর সময় হতে। শেষ নন্দরাজা ছিলেন —। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন —। সমুদ্রগুপ্ত রাজত্ব করেন — থেকে —পর্যন্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ছিল—থেকে —। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন ভারতে আসেন — এর রাজত্বকালে। হিউয়েন-সাঙ্ এসেছিলেন — এর রাজত্বকালে। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল সম্বন্ধে জানা যায় — লিপি থেকে। রাজা শশাঙ্ক সম্বন্ধে জানা যায় — গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি থেকে।

৩। **অতিসংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :—**

(ক) ভারতে প্রথম হূণ আক্রমণ কোন্ সময়ে হয় এবং এই আক্রমণ কিভাবে প্রতিহত হয় ?

(খ) গৌড়রাজ শশাঙ্কের সাথে মৌখরী বংশের রাজার কিরূপ সম্পর্ক ছিল ? পুষ্যভূতি বংশের সম্রাটের সাথে যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল ?

(গ) শশাঙ্কের কৃতিত্ব কিভাবে ইতিহাসে বিবৃত হয়েছে বলে তুমি মনে কর ?

(ঘ) হর্ষবর্ধনের রাজ্যসীমা উল্লেখ কর।

(ঙ) হর্ষের দানশীলতা সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ্ কি বলেছেন ?

(চ) হিউয়েন সাঙ্ হর্ষের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি বলেছেন ?

(ছ) জ্ঞাণীগুণীর পৃষ্ঠপোষকরূপে হর্ষের কার্যাবলী আলোচনা কর।

(জ) কনৌজের আধিপত্য নিয়ে ত্রিকোণ দ্বন্দ্বের কি ভাবে পরিসমাপ্তি হয় ?

(ঝ) পালবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি সম্বন্ধে তাঁর কৃতিত্ব আলোচনা কর।

(ঞ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ছিল ?

(ট) শীলভদ্র কে ছিলেন ?

(ঠ) অতীশ দীপঙ্কর কে ছিলেন ? (থ) সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

(ড) লক্ষণসেনের আমলে কোন্ মুসলিম সেনাপতি নদীয়া আক্রমণ করেন ?

(ঢ) রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কৃতিত্ব নিরূপন কর।

(ণ) কল্যাণের চালুক্যবংশীয় সম্রাট ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের বিজয় অভিযান কোন্ কোন্ রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয় ?

(ত) কাঞ্চীর পল্লব-বংশীয় রাজাদের কৃতিত্ব নিরূপণ কর।

(থ) চোল-নৌশক্তির বিবরণ দাও।

(দ) চোলদের আমলে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের বিবরণ দাও।

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক রচনাধর্মী প্রশ্নমালা ঃ—

ক) হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে আগত চৈনিক পরিব্রাজক কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণে সেকালের কথা কি জানা যায় ?

(খ) হর্ষবর্ধনের সাথে শশাঙ্ক ও দ্বিতীয় পুলকেশীর যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ?

(গ) পালরাজা ধর্মপাল ও দেবপালের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

(ঘ) বাদামীর চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর কৃতিত্ব নিরূপণ কর।

(ঙ) চোলসম্রাট প্রথম রাজেন্দ্রচোলের কৃতিত্ব আলোচনা করে চোল শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব নিরূপণ কর।

৫। করণীয় কাজ ঃ—

(ক ঐতিহাসিক স্থানানির্দেশক ভারতের মানচিত্র এঁকে ষোড়শ মহাজনপদের অবস্থান দেখাও। প্রাচীন ভারতীয় সাম্রাজ্যগুলির আনুমানিক সীমানা মানচিত্রে দেখাবে। আর একটি মানচিত্রে অশোকের প্রধান প্রধান শিলালিপি ও স্তম্ভলিপির স্থান দেখাবে, একটি মুদ্রা এঁকে তাতে সমুদ্রগুপ্তের ছবি আঁকবে।

(খ) মৌর্য, গুপ্ত ও পাল সাম্রাজ্যের একটি করে সময়রেখা অঁাকবে।

(গ) প্রচীন ভারতের বিখ্যাত সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী, শিল্পীদের রচনা, আবিষ্কার ও শিল্পকীর্তির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা (টেবুলার ফর্মে) তৈরী করবে।

সপ্তম অধ্যায়

১। এক কথায় উত্তর দাও ঃ—

(ক) সপ্তম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সামাজিক ক্ষেত্রে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কি হয় ?

(খ) পরাশর কোন শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন ?

(গ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সপ্তম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর সময়টি কেমন ছিল ?

(ঘ) 'নাথ' সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কে ?

(ঙ) শঙ্করাচার্য কোন্ দর্শনের প্রবক্তা ?

(চ) 'চর্যাপদ' কি ?

(জ) দু' জন চর্যাপদ রচয়িতার নাম বল।

(ঝ) 'অভিধান রত্নমালা' কার রচিত ?

(ঞ) পালযুগের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদের নাম কি ?

(ট) বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় কে স্থাপন করেন ?

(ঠ) ওদন্তপুরী বিহার কে নির্মাণ করেন ?

(ড) পালযুগের বিখ্যাত দু জন শিল্পীর নাম কর।
(ঢ) সেনযুগের বিখ্যাত শিল্পীর নাম কি? কৌলিন্য প্রথার কে প্রবর্তন করেন?
(ণ) 'লিঙ্গায়েত' সম্প্রদায় কে গঠন করেন?
(ত) রাষ্ট্রকূটদের আমলে কোন্ কোন্ আরবীয় পর্যটক ভারত ভ্রমণ করেন?
(থ) ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির কে নির্মাণ করেন?
(দ) খাজুরাহোর মন্দিরগুলি কোন্ রাজাদের কীর্তি?
(ধ) পল্লবশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কি?
(ন) নল-দময়ন্তীর প্রেমকাহিনীর তামিল সংস্করণের নাম কি?
(প) উড়িষ্যার মন্দির শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মারক কোন্‌টি?
(ফ) দীলওয়ারা মন্দির ভারতের কোথায় অবস্থিত?
(ব) ইন্দোনেশিয়ার বিমান ভারতের কোন্ নামে অঙ্কিত?
(ভ) কোন মোঙ্গল নায়ক বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন?
(ম) তিব্বতে কে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন?
(য) অতীশ দীপঙ্কর কত খ্রীঃ দেহরক্ষা করেন?
(র) কম্বোজের বর্তমান নাম কি?
(ল) কোন্ অঞ্চল সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল?
(ব) কম্বোজ রাজবংশের অবিস্মরণীয় কীর্তি কি?
(শ) জাভার শৈলেন্দ্রবংশের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি?

২। **অতিসংক্ষিপ্ত বিষয়মুখী প্রশ্নমালা :—**

(ক) ভারতে সপ্তম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিকাশের ফল কি হয়েছিল?

(খ) সে যুগে জনসাধারণের অবসর বিনোদনের মাধ্যম কি ছিল?
(গ) পূর্ব ভারতের কোন্ বন্দর দিয়ে কোন্ কোন্ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো?
(ঘ) ভক্তিবাদের মূলকথা কি?
(ঙ) শঙ্করাচার্যের দর্শনের মর্মকথা কি?
(চ) সন্ধ্যাকরনন্দী-রচিত রামচরিত থেকে আমরা কি জানতে পারি?
(ছ) চালুক্য আমলে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের উল্লেখ কর।
(জ) রাষ্ট্রকূটযুগের কবি ও সাহিত্যিকদের কীর্তি আলোচনা কর।
(ঝ) চন্দেল্লযুগের শিল্পকীর্তির বর্ণনা দাও।
(ঞ) পল্লবযুগের শিল্পকীর্তির বর্ণনা দাও।
(ট) দ্রাবিড় মন্দির শিল্প কি?
(ঠ) উড়িষ্যার গঙ্গ রাজাদের শিল্পকীর্তির বর্ণনা দাও।

(ড) মধ্য এশিয়ার তাকলামাকান অঞ্চলে প্রাপ্ত ভারতীয় প্রত্ন-উপাদান দেখে অরেলষ্টিন কি বলেছেন?

(ঢ) বৃহত্তর ভারত বলতে কি বুঝায় ?

(ণ) কাকে 'পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য' বলা হয় ?

৩। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক রচনাধর্মী প্রশ্নমালা :—**

(ক) ভারতে সপ্তম হতে দ্বাদশ শতাব্দী সময়ের মধ্যে যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয় তাঁর বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

(খ) সে সময়ে অর্থনৈতিক অবস্থার একটি বিবরণ দাও।

(গ) ৭ম হতে ১২শ' শতকের মধ্যে ভারতে কিরূপ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ?

(ঘ) পাল যুগে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(ঙ) সেনযুগে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(চ) পাল ও সেনযুগে চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উন্নতির বিবরণ দাও।

(ছ) বহির্বিশ্বের সাথে স্থলপথে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(জ) বহির্বিশ্বের সাথে জলপথে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিবরণ দাও।

৪। (ক) বড় করে একখানা ভারতের মানচিত্র এঁকে বৃহত্তর ভারতের স্থানগুলো এবং ভারতের সাথে তাঁদের যোগাযোগ পথ দেখাবে।

(খ) 'দ্বীপময় ভারত'—এর একখানা মানচিত্র এঁকে ভারতের সাথে জলপথে তাঁদের যোগাযোগের পথ চিহ্নিত কর।

ভারতের একটি রেখা-মানচিত্রে ঐতিহাসিক স্থানগুলির অবস্থান নির্দেশ কর এবং বন্ধনীর মধ্যে উপযুক্ত ক্রমিকসংখ্যা বসাও :—

(ক) হরপ্পা ( ) (খ) মহেঞ্জোদড়ো ( ) (গ) পুরুষপুর ( ) (ঘ) গৌড় ( ) (ঙ) মগধ ( ) (চ) প্রয়াগ ( ) (ছ) পাটলিপুত্র ( ) (জ) উজ্জয়িনী ( ) (ঝ) কাশী ( ) (ঞ) কলিঙ্গ ( ) (ট) কাঞ্চী ( ) (ঠ) তাম্রলিপ্ত ( ) (ড) বৈশালী ( ) (ঢ) তক্ষশিলা ( ) (ণ) বুদ্ধগয়া ( ) (ত) সাঁচী ( ) (থ) নালন্দা ( ) (দ) বাতাপী ( ) (ধ) অজন্তা ( ) (ন) ইলোরা ( ) (প) কনৌজ ( ) (ফ) তক্ষশীলা ( ) (ব) কল্যাণ ( ) (ভ) মাদুরা ( )

৪। **শূন্যস্থান পূরণ কর :—**

(ক) মেগাস্থিনিসের মতে ভারতে শ্রেণীগুলি ছিল যথাক্রমে —। (খ) ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাঙ্, ভারতে এসেছিলেন যথাক্রমে — এবং — এর রাজত্বকালে। (গ) কাদম্বরীর লেখক ছিলেন — —। (ঙ) প্রাচীন ভারতে বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন —। (চ) জৈনধর্মের অনুগামীরা — — নামে বিভক্ত। (ছ) বৌদ্ধধর্মে প্রধান দুটি ভাগ ছিল — এবং —। (জ) হর্ষবর্দ্ধনের লেখা বই হল — —।

অষ্টম অধ্যায়

১। মুখে মুখে উত্তর দাও :—

(ক) ইতিহাসে যুগ বিভাগ কি ধর্ম দিয়ে না যুগ-বৈশিষ্ট্য দিয়ে হওয়া উচিত? (খ) ভারতে কোন্ সময়টিকে স্থলতানী যুগ বলা হয়? (গ) হজরত মহম্মদ কখন পরলোক গমন করেন? (ঘ) মুসলমানদের ধর্মগুরুর উপাধি কি ছিল? (ঙ) কত খ্রীঃ সিন্ধুতে আরব অভিযান হয়? (চ) তখন সিন্ধুর রাজা কে ছিলেন? (ছ) মামুদ কোথাকার স্থলতান ছিলেন? (জ) তিনি কতবার ভারত আক্রমণ করেন? (ঝ) তাঁর সভায় কয়েকজন পণ্ডিতের নাম বল। (ঞ) ঘোর রাজ্যটি কোথায় ছিল? (ট) পৃথ্বীরাজ কোথাকার রাজা ছিলেন? (ঠ) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ কখন হয়েছিল? (ড) মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতির নাম কি ছিল? (ঢ) কত খ্রীঃ বক্তিয়ার খলজী নদীয়া আক্রমণ করেন? (ণ) 'চহলগানী' কি? (ত) নব মুসলমান কাহারা? (থ) মালিক কাফুর কে ছিলেন? (দ) কোন্ স্থলতান সর্বপ্রথম বাজারে জিনিষপত্রের দাম বেঁধে দেন? (ধ) কোন্ স্থলতান দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন? (ন) কোন্ স্থলতান তামার নোটের প্রচলন করেন? (প) তৈমুরলঙ্গ কত সালে ভারত আক্রমণ করেন? (ফ) পানিপথের যুদ্ধে কে কে অংশ নেন এবং কত খ্রীঃ উহা সংঘটিত হয়? (ব) একডালা দুর্গ কোথায় অবস্থিত ছিল? (ভ) 'চৈতন্য চরিতামৃত' কে রচনা করেন? (ম) বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? (য) বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কাহারা? (র) তালি-কোটার যুদ্ধ কবে হয়েছিল। (ল) 'জিম্মি' কাদের বলা হত? (ব) ভক্তিবাদী সাধুসন্তদের নাম বল।

২। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :—

(ক) সিন্ধুতে আরবী অভিযানের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফল কি হয়েছিল?

(খ) স্থলতান মামুদ কি উদ্দেশ্যে ভারত অভিযান করেন এবং তিনি সফল হয়েছিলেন কেন?

(গ) মামুদ ও ঘোরীর অভিযানের মধ্যে মূল পার্থক্য কি?

(ঘ) ইলতুৎমিসের প্রধান সমস্যাগুলি কি ছিল এবং কিভাবে তিনি সেগুলির সমাধান করেন?

(ঙ) বলবন কিভাবে রাজকীয় ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন?

(চ) খিলজী সাম্রাজ্যবাদ কথাটির তাৎপর্য কি?

(ছ) বাহমনি রাজ্যের মন্ত্রী মামুদ গাওয়ানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

(জ) রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে বিজয়নগরের রাজ্য সীমা কতটা প্রসারিত হয়েছিল?

(ঝ) বিজয়নগরের সাংস্কৃতিক উন্নতি কেন সবার প্রশংসা অর্জন করেছিল?

(ঞ) হিন্দুমুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ে বাংলার হুসেনশাহ ও কাশ্মীরের জৈনউল আবেদিনের পৃষ্ঠপোষকতা কিভাবে সহায়তা করেছিল?

(ট) সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দুমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে ও কতটা হয়েছিল ?

(ঠ) ভক্তিবাদের মর্ম কথা কি ?

(ড) চৈতন্যদেবের বাণীর সারমর্ম কি ?

(ঢ) সমাজ ও সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব কতটা পরিলক্ষিত হয় ?

(ণ) হিন্দুমুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সুফীবাদ কিভাবে ও কতটা প্রভাব ফেলে ?

(ত) উর্দু ভাষার কিভাবে উদ্ভব হয় ?

৩। **সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ—**

(ক) ভারতে মধ্যবর্তীকালের ইতিহাসকে মুসলিম যুগে ভারত না বলে কেন মধ্যযুগে ভারত বলা যুক্তিযুক্ত ?—এ সম্বন্ধে তোমার মতামত লিপিবদ্ধ কর।

(খ) সুলতানী যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(গ) সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের ফলাফল আলোচনা কর।

(ঘ) ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতা সম্পর্কে অল্ বিরুণীর অভিমত ব্যক্ত কর।

(ঙ) মহম্মদ ঘোরীর কৃতিত্ব আলোচনা কর।

(চ) ইলতুৎমিস ও বলবনের তুলনামূলক কৃতিত্ব বিচারে কাহাকে তুমি শ্রেষ্ঠ মনে কর ?

(ছ) আলাউদ্দিন খিলজীর প্রশাসনিক কার্যাবলীর আলোচনা কর।

(জ) মহম্মদ তুঘলকের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে তাঁর সম্বন্ধে তোমার নিজস্ব ধারণা বুঝিয়ে বল।

(ঝ) ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

(ঞ) সুলতানী সাম্রাজ্য পতনের কারণ আলোচনা কর।

(ট) ইলিয়াস শাহী যুগের বাংলার সাংস্কৃতিক সাফল্য আলোচনা কর।

(ঠ) বিজয়নগরের গৌরব সম্বন্ধে বিদেশী পর্যটকগণ কি বলেছেন ?

(ড) হিন্দুমুসলিম সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথে ভক্তিবাদী আন্দোলন কিভাবে সহায়ক হয়েছিল ?

নবম অধ্যায়

১। **মুখে মুখে উত্তর দাও ঃ**

(ক) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (খ) পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ কার কার মধ্যে হয় কত খ্রীঃ ? (গ) খানুয়ার যুদ্ধে কে পরাজিত হয় ? (ঘ) ভারতে বাবরের শেষ যুদ্ধ কোনটি ? (ঙ) বাবরনামা কি ? (চ) শেরশাহের শৈশবের নাম কি ? (ছ) তিনি কোন্ রাজপথটি নির্মাণ করিয়েছিলেন ? (জ) তাঁর প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন ?

(ঝ) হুমায়ুন কথাটির অর্থ কি ? (ঞ) হুমায়ুনের খ্যাতিমান পুত্রের নাম কি ? (ট) আকবর কর্তৃক চিতোর অবরোধে কে কে বীরত্ব পূর্ণ বাধা দেন ? (ঠ) আকবরের সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট ধর্মের নাম কি ? (ড) তাঁর সাম্রাজ্য কয়টি সুবায় বিভক্ত ছিল ? (ঢ) আবুল ফজল কে ছিলেন ? (ণ) আকবরের পর কে মুঘল সিংহাসনে বসেন ? (ত) জাহাঙ্গীরের পুত্র খুররম কি উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন ? (থ) কোন ইংরেজ দূত জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন ? (দ) কোন্ মুঘল সম্রাটের রাজত্বকালকে স্বর্ণযুগ বলা হয় ? (ধ) আওরঙ্গজেব কত খ্রীঃ মুঘল সিংহাসনে বসেন ? (ন) শায়েস্তা খাঁ কে ছিলেন ? (প) আওরঙ্গজেব কোন শিখ গুরুর প্রাণদণ্ড দেন ? শিবাজী কত খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন ? (ফ) তাঁর মাতা ও পিতার নাম কি ? (ব) ভারতে বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক সংস্থার নাম কি ? (ভ) মুঘলযুগে তিনজন ইউরোপীয় পর্যটকের নাম কর ? (ম) তুলসীদাস কি ভাষায় পুস্তক রচনা করেন ?

২। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :—

(ক) পানিপথে বাবরের জয়ের কারণ কি ?
(খ) হুমায়ুনের ব্যর্থতা এসেছিল কেন ?
(গ) শেরশাহের সাফল্যের পেছনে কি কি কারণ রয়েছে বলে তুমি মনে কর ?
(ঘ) পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কাদের মধ্যে হয়েছিল ?
(ঙ) উত্তর ভারতে আকবর কোন্ কোন্ রাজ্য জয় করেন ?
(চ) জাহাঙ্গীরের প্রধান সাফল্য কি ছিল ?
(ছ) ভারতের ইতিহাসে শাহজাহানের বিশেষ অবদান কি ছিল ?
(জ) আওরঙ্গজেব দক্ষিণাত্যে কতটা সফল হয়েছিলেন ?
(ঝ) মারাঠানায়ক শিবাজীর আমলে তাঁর রাজ্যের বিস্তৃতি কতটা হয়েছিল ?
(ঞ) শিবাজীর শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক রবিনসন কি বলেছেন ?
(ট) শিবাজীর নৌবাহিনী কিরূপ ছিল ?
(ঠ) জায়গীর কথার তাৎপর্য কি ?
(ড) মুঘলযুগে শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?
(ঢ) মুঘলযুগে সাংস্কৃতিক সাফল্যের মধ্যেও কি কি দুর্বলতা ছিল ?

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক রচনাধর্মী প্রশ্নমালা :—

(ক) মুঘলযুগের বিভিন্ন উৎস সূত্রের বিবরণ দাও।
(খ) শেরশাহের শাসনব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?
(গ) আকবরকে কি জাতীয় সম্রাট বলা যায় ?
(ঘ) আকবরের দরবারী বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
(ঙ) আকবরের ধর্মমত কতটা মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতার ঊর্দ্ধে উঠেছিল বলে তুমি মনে কর ?
(চ) আকবরকে কি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত নির্মাতা বলা যায় ? যুক্তিসহ বিচার কর।

(ছ) হিন্দু, রাজপুত ও ধর্মনীতির ক্ষেত্রে আকবর ও আওরঙ্গজেবের অনুসৃত নীতির পার্থক্য আলেচেনা কর।

(জ) শাহজাহানের শিল্পকীর্তি আলোচনা কর।

(ঝ) আওরঙ্গজেব কর্তৃক বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অভিযানের উপর শিবাজীর উত্থানের কি প্রভাব পড়েছিল ?

(ঞ) শিবাজীর শাসনপদ্ধতি আলোচনা কর। ইতিহাসে শিবাজীর স্থান নিরূপণ কর।

(ট) আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি তাঁর সাম্রাজ্যের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলে ?

(ঠ) শাসকও রাষ্ট্রনীতিবিদ রূপে আওরঙ্গজেবের মূল্যায়ন কর।

(ড) ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর নীতি ও পদ্ধতি আলোচনা কর।

(ঢ) মুঘলযুগে জায়গীর সংকট কিভাবে সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণরূপে দেখা দেয় ? (ণ) মুঘলযুগে শিল্পোন্নতির বিবরণ দাও।

দশম অধ্যায়

১। মুখে মুখে বল :—

(ক) ইতিহাসের মৌলিক সত্য কি ?

(খ) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে রাজনৈতিকভাবে কি অবস্থা দেখা দেয় ?

(গ) আওরঙ্গজেবের ভ্রান্ত নীতি ঐ অবস্থাকে ভাল করেছে না আরও মন্দ করেছে ?

(ঘ) আমীর-ওমরাহদের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল ?

(ঙ) নাদির শাহ কোথাকার সম্রাট ছিলেন ? কখন তিনি ভারত আক্রমণ করেন ?

(চ) মুঘলসাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের উপর কি কি খণ্ড রাজ্যের উদ্ভব হয় ?

(ছ) কত খ্রীঃ-তে শিবাজী স্বাধীনভাবে মারাঠা রাজ্যের সিংহাসনে বসেন ?

(জ) কত খ্রীঃ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয় ?

(ঝ) ভাস্কো-দা-গামা কি ছিলেন ?

(ঞ) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ কখন হয় ?

(ট) পলাশীর যুদ্ধ কখন ও কাদের মধ্যে হয় ?

(ঠ) কত খ্রীঃ ইংরেজরা দেওয়ানী লাভ করেন ?

(ড) ফারুকশিয়রের ফারমান ইংরেজরা কত খ্রীঃ লাভ করেন ?

(ঢ) বক্সারের যুদ্ধ কত খ্রীঃ সংগঠিত হয় ?

(ণ) 'অধীনতামূলক মিত্রতা'-র নীতি কে চালু করেন ?

(ত) টিপু সুলতান কিভাবে মৃত্যুবরণ করেন ?

(থ) 'স্বত্ববিলোপ নীতি' কে চালু করেন ?

(দ) 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' কে চালু করেন ?

(ধ) 'বিশ্বের কর্মশালা' বলতে কোন্ দেশকে বুঝায় ?

(ন) 'সম্পদের বহির্গমন' কথাটির অর্থ কি ?

(প) কলকাতা মাদ্রাসা ও বারাণসী সংস্কৃত কলেজ কবে স্থাপিত হয় ?

(ফ) রামমোহন কে ছিলেন ?

(ব) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কে ছিলেন ?

(ভ) 'ফরাজী' কথাটির অর্থ কি ?

(ম) দামিন-ই-কো কি ?

(য) 'হুল' কি ?

(র) দুজন সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়কের নাম কর।

(ল) সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান নেতৃত্বে কারা ছিলেন ?

(ব) কত খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয় ?

২ ঃ অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নমালা ঃ

(ক) মুঘলসাম্রাজ্যের পতনে আওরঙ্গজেবের অনুসৃত নীতিগুলি কিভাবে দায়ী ছিল ?

(খ) নাদির শাহের ভারত আক্রমণের ফলাফল কি ?

(গ) শিখ শক্তির উত্থানে শিখ গুরু নানক থেকে দশম গুরু পর্যন্ত সবার নাম বল।

(ঘ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলাফল কি ?

(ঙ) ভারতের সাথে বহির্বাণিজ্যের প্রাচীন পথগুলি কি ছিল ?

(চ) কর্ণাট যুদ্ধে ফরাসী শক্তির ব্যর্থতার কারণ কি ?

(ছ) ফারুকশিয়রের ফার্মানকে ইংরেজদের বাণিজ্যের 'ম্যাগনাকার্টা' বা মহাসনদ কেন বলা হয় ?

(জ) পলাশীযুদ্ধকে কি 'তামাসাযুদ্ধ' বলা যায় ?

(ঝ) দেওয়ানী লাভের ফলে ইংরেজ কোম্পানীর ক্ষমতা কিভাবে বৃদ্ধি পায় ?

(ঞ) ইংরেজ কোম্পানীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আদিপর্বে কি কি বিষয়ে ইংরেজরা অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা লাভ করেন ?

(ট) ভারতবর্ষে শাসন প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইংরেজ মনোভাব কিরূপ ছিল ?

(ঠ) 'অধীনতামূলক মৈত্রী' নীতির তাৎপর্য কি ?

(ড) শিখশক্তির উত্থানে রণজিৎ সিংহের অবদান কি ?

(ঢ) 'স্বত্ববিলোপ' নীতির তাৎপর্য কি ?

(ণ) দ্বৈতশাসন বলতে কি বুঝ ?

(ত) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল কি হয়েছিল ?

(থ) ভারত থেকে 'সম্পদের বহির্গমন' সম্বন্ধে দাদাভাই নৌরজী কি বলেছেন ?

(দ) ভারত থেকে সম্পদের বহির্গমন সম্বন্ধে মাদ্রাজ রাজস্ব বোর্ডের সভাপতি সিভার্স কি বলেছেন ?

(ধ) ভারতে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দেশজ শিক্ষা কিরূপ ছিল ?

(ন) ভারতের আধুনিক শিক্ষার গোড়া পত্তনে উডের দলিলের তাৎপর্য আলোচনা কর।

(প) পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও নবজাগরণের প্রকৃতি আলোচনা কর।

(ফ) ভারতে ধর্মসংস্কার আন্দোলনে মন যাঁদের ভূমিকা সংক্ষেপে বল।

(ব) ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতার লক্ষ্য ও আদর্শ কি ছিল?

(ভ) কোল উপজাতি বিদ্রোহের কারণ কি?

(ম) সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান কারণগুলি কি কি?

(য) সাঁওতাল বিদ্রোহের তাৎপর্য বর্ণনা কর।

(র) ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের প্রধান কারণগুলি কি কি?

(ল) বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণগুলি কি কি?

(ব) মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে কি বলা হয়?

৩। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক রচনাধর্মী প্রশ্নমালা:**

(ক) আওরঙ্গজেবের পর মুঘলসাম্রাজ্যের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অবক্ষয় দেখা দেয়?

(খ) পেশোয়াদের শাসনে মহারাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের কারণগুলি আলোচনা কর।

(গ) দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটক যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?

(ঘ) পলাশী যুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা করে বাংলার স্বাধীন নবাবী শেষ হওয়ার পেছনে সিরাজের প্রধান ত্রুটি অনুসন্ধান কর।

(ঙ) ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্য স্থাপনে ইংরেজ শাসকদের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

(চ) লর্ড কর্ণওয়ালিশ কেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন?

(ছ) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার শিল্পে ও বাণিজ্যে ইংরেজ কোম্পানীর ঔপনিবেশিক স্বার্থ কিভাবে ক্ষতি করে?

(জ) উনিশ শতকের শেষার্ধে বৃটেনের শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারতকে কিভাবে কাঁচামাল যোগানকারী দেশ রূপে ব্যবহার করা হয়?

(ঝ) উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার গতি প্রকৃতি আলোচনা কর।

(ঞ) বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান উল্লেখ কর।

(ট) ওয়াহাবী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কি ছিল? এ বিষয়ে সৈয়দ আহম্মদের ভূমিকা আলোচনা কর।

(ঠ) ভারতে কোল বিদ্রোহীগণ কিভাবে বিদ্রোহের মাধ্যমে বিদেশী নির্মম শাসনের প্রতিরোধ করতে সামিল হয়?

(ড) সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান কারণগুলি কি কি?

(ঢ) ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের প্রকৃতি কি ছিল?

(ণ) সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে?

৪। শূন্যস্থান পূরণ করুন :—

ওয়াহাবী — ও সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল — এবং — সনে। লর্ড ক্যানিংএর — প্রবর্তনের ফলে অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহে বিহারের নেতা ছিলেন —।

আরও কিছু প্রশ্নমালা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্দিষ্ট পাঠক্রমে বিভিন্ন প্রকারের নৈব্যক্তিক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত উত্তর মূলক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়া মৌখিক পরীক্ষার ও প্রবর্তন করা হয়েছে। এইসব কারণে ইতিহাস বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় হলে তাঁদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ হবে। তাই এখানে বিভিন্ন ধরনের আরও কিছু প্রশ্নমালা দেওয়া হল :—

ইতিহাসের বিষয় অংশের উপর বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের নমুনা :—(Types of Questions on the Content portion of the Syllabus of History) :—

(ক) **শুদ্ধিকরণ মূলক অভীক্ষা (Correction Type Questions) :**

(১) গজনীর সুলতান মামুদ অনহিল ওয়াড়ার চালুক্যরাজ প্রথম ভীমকে পরাজিত করেন এবং তার রাজ্য অধিকার করেন—ভুল।

গজনীর সুলতান মামুদ অনহিল ওয়াড়ার চালুক্যরাজ প্রথম ভীমকে পরাজিত করেন, কিন্তু তার রাজ্য অধিকার করেননি—শুদ্ধ।

(২) দশম শতাব্দীতে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মোঙ্গলরা পারস্য থেকে এসে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে—ভুল।

দশম শতাব্দীতে শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত তুর্কীরা আফগানিস্থানের গজনী থেকে এসে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন—শুদ্ধ।

(৩) মহম্মদ বিন-তুঘলকের মূল্য নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে একটি অভিনব ব্যবস্থা —ভুল।

মহম্মদ বিন-তুঘলকের তামার নোটের প্রচলন নিঃসন্দেহে একটি অভিনব ব্যবস্থা —শুদ্ধ।

(৪) খানুয়ার যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহের সাফল্য পাঠান শক্তির উপর বিরাট আঘাত হানে—ভুল।

খানুয়ার যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহের পরাজয় রাজপুত শক্তির উপর বিরাট আঘাত হানে —শুদ্ধ।

(৪) বালখ ও বদক্সান অভিযানে শাহজাহানের সাফল্য মোঘল সামরিক বাহিনীর অপরাজেয় ক্ষমতাকে প্রমাণিত করল—ভুল।

বালখ ও বদক্সান অভিযানে শাহজাহানের ব্যর্থতা মোঘল সেনাবাহিনীর দুর্বলতাকে প্রমাণিত করল—শুদ্ধ।

(৬) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটল—ভুল।

সুলতানি সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটল—শুদ্ধ।

(৭) শিখনেতা রণজিৎ সিংহ ১৮১২ খ্রীঃ লাহোরের চুক্তি দ্বারা ইংরেজদের সাথে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়—ভুল।

শিখনেতা রণজিৎ সিংহ ১৮০৯ খ্রীঃ অমৃতসর সন্ধি দ্বারা ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্কে আবদ্ধ হল—শুদ্ধ।

(৮) পারস্যের শাহ দোস্ত মুহম্মদকে ইংরেজরা বন্দী রূপে কলকাতা এনেছিল—ভুল।

আফগানিস্থানের আমীর দোস্ত মহম্মদকে ইংরেজরা বন্দীরূপে কলকাতা এনেছিল—শুদ্ধ।

(খ) (১) বারাণসীর চালুক্য বংশীয়দের যুদ্ধে হর্ষবর্ধন বিজয়ী হয়েছিলেন—ভুল।

বাতাপীর চালুক্যবংশীয়দের (২য় পুলকেশী) হাতে হর্ষবর্ধন পরাজিত হয়েছিলেন—শুদ্ধ।

(২) প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে গজনীর মহম্মদের হাতে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হয়েছিলেন—ভুল।

তরাইনের ১ম যুদ্ধে (১১৯১) পৃথ্বীরাজ মোহম্মদ ঘোরীকে পরাজিত করেছিলেন—শুদ্ধ।

(৩) ফিরোজ তুঘলক আকবরের সহনশীলতা নীতির ক্ষেত্রে পূর্বসূরী ছিলেন—ভুল।

কাশ্মীরের জয়নাল আবেদিন আকবরের সহনশীলতা নীতির ক্ষেত্রে পূর্বসূরী ছিলেন—শুদ্ধ।

(৪) সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালে বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—ভুল।

মহম্মদ বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—শুদ্ধ।

(৫) ২য় আলমগীরের রাজত্বকালে নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন—ভুল।

সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন—শুদ্ধ।

(৬) ঔরংজেব চিতোর অধিকার করেন এবং পদ্মিনীকে হরণ করেন—ভুল।

আলাউদ্দিন চিতোর অধিকার করেন, কিন্তু পদ্মিনীকে হরণ করতে পারেননি—শুদ্ধ।

(৭) ৩য় পানিপথের যুদ্ধে ইরাণের আহম্মদ শাহ আবদালীর কাছে মুঘল সম্রাট পরাজিত হয়েছিলেন—ভুল।

৩য় পানিপথের যুদ্ধে আফগানিস্থানের আহম্মদ শাহ আবদালীর কাছে মারাঠা বাহিনী পরাজিত হয়েছিল—শুদ্ধ।

(৮) ৩য় মারাঠা যুদ্ধে লর্ড ওয়েলেসলির আমলে সর্বপ্রধান সামরিক কীর্তি—ভুল।

৩য় মারাঠা যুদ্ধ লর্ড হেস্টিংস বা লর্ড ময়রার (ওয়ারেন হেস্টিংস নন) আমলের সর্বপ্রধান সামরিক কীর্তি—শুদ্ধ।

(৯) পল্লব বংশের গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ব্যাক্ট্রীয় বা বহ্লিক গ্রীকদের পরাজিত—করেছিলেন—ভুল।

সাতবাহন বংশের গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী পল্লবদের পরাজিত করেছিলেন—শুদ্ধ।

(১০) আলাউদ্দিন খিলজী বিজাপুর রাজ্যের আসীর গড় দুর্গ অধিকার করেন—ভুল।

আকবর খন্দেশ রাজ্যের আসীর গড় দুর্গ অধিকার করেন—শুদ্ধ।

(১১) মুসলমান পর্যটক আলবিরুনী ১৩৬৫ খ্রীঃ বিজয়নগর পরিভ্রমণ করেছিলেন—ভুল।

মুসলমান পর্যটক আব্দুর রেজ্জাক ১৪৪২ খ্রীঃ বিজয়নগর পরিভ্রমণ করেছিলেন—শুদ্ধ।

(১২) আকবরের মধ্যএশিয়া জয়ের অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল—ভুল।

শাহজাহানের মধ্যএশিয়ায় বিজয় অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল—শুদ্ধ।

(১৩) ১৬৪৫ খ্রীঃ শাহজাহান কর্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকৃত হয়েছিল—ভুল।

১৬৮৭ খ্রীঃ ঔরঙ্গজেব কর্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকৃত হায়ছিল—শুদ্ধ।

(১৪) শিবাজীর মন্ত্রী পরিষদ দশজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এদের মধ্যে পেশোয়া ছিলেন সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—ভুল।

শিবাজীর মন্ত্রীসভার সদস্য সংখ্যা ছিল আটজন। এদের মধ্যে পেশোয়া ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি রাজ্যের সাধারণ স্বার্থ ও প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন—শুদ্ধ।

(১৫) ১৭৭২ খ্রীঃ সম্রাট তৃতীয় শাহ আলমের নিকট থেকে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলার দেওয়ানী লাভ করেন—ভুল।

১৭৬৫ খ্রীঃ ক্লাইভ সম্রাট ২য় শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন—শুদ্ধ।

(১৬) মালবের অধিপতি বাহ্লীক গ্রীক গণ্ডোফারনেস খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন—ভুল।

মালবের পহ্লব গ্রীক শাসক গণ্ডোফারনেসের সঙ্গে খ্রীষ্টের অন্যতম শিষ্য সেণ্ট টমাসের যোগাযোগ ঘটেছিল বলে কথিত আছে—শুদ্ধ।

(১৭) স্কন্দগুপ্ত শকদের পরাজিত করে কনৌজে সাম্রাজ্য অধিকার করেছিলেন—ভুল। স্কন্দগুপ্ত হূণদের বিতাড়িত করে গুপ্তসাম্রাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন —শুদ্ধ।

(১৮) পেশোয়ারের পৃথ্বীরাজ চৌহান সুলতান মামুদ কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন—ভুল। দিল্লীর পৃথ্বীরাজ চৌহান মোহম্মদ ঘোরীর হাতে তরাইনের ২য় যুদ্ধে (১১৯২) খ্রীঃ পরাজিত হয়েছিলেন—শুদ্ধ

(১৯) ১৫৬৫ খ্রীঃ পল্লব ও রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে তালিকোটার যুদ্ধ হয়েছিল—ভুল

১৫৬৫ খ্রীঃ তালিকোটা নামক স্থানে দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের সম্মিলিত বাহিনী [বেরার ভিন্ন] এবং বিজয়নগরের হিন্দুরাজা রামরায়ের বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল—শুদ্ধ।

(২০) ১৫৪০ খ্রীঃ শেরশাহ কর্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকৃত হয়েছিল—ভুল

১৬৮৭ খ্রীঃ আওরঙ্গজেব কর্তৃক গোলকুণ্ডা অধিকৃত হয়েছিল—শুদ্ধ

(২১) আওরংজেব কর্তৃক প্রেরিত মধ্য এশিয়ার বিজয় অভিযান ব্যর্থ হয়—ভুল

শাহাজান কর্তৃক প্রেরিত মধ্যে এশিয়ার বিজয় অভিযান ব্যর্থ হয়—শুদ্ধ

(২২) ২য় পেশোয়া বাজীরাও পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে রোহিলা আফগানদের হাতে পরাজিত হয়েছিল—ভুল

পেশোয়া বালাজী বাজীরাও পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে—আফগান সর্দার আহম্মদ শাহ আবদালীর বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন — শুদ্ধ

(খ) সত্য-মিথ্যা নিরুপণ অভীক্ষা (True False Test) :—হ্যাঁ বা না

(১) আকবরের রাজত্বকালের সর্বসময় দিল্লী তাঁর রাজধানী ছিল —না (২) হায়দর আলী হায়দ্রাবাদের সুলতান ছিলেন—না।

(১) সিন্ধু-সভ্যতা আর্য সভ্যতার পূর্ববর্তী — হ্যাঁ (২) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে ফা-হিয়েন ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন—না (৩) সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয়—হ্যাঁ (৪) গীত গোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব বল্লাল সেনের সভাকবি ছিলেন —না (৫) ইটালীয় পর্যটক নিকোলো কন্টি বিজয়নগরে এসেছিলেন—হ্যাঁ (৬) শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকারে বিভক্ত করেছিলেন —না (৭) ১৬০৫ খ্রীঃ আকবরের মৃত্যু হয়—হ্যাঁ (৮) লর্ড ডালহৌসি ছিলেন অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তক—না

সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা (Completion Test) :—

ব্রাকেটের মধ্যে শব্দটি মূল প্রশ্নে থাকবে না, ওখানে—চিহ্ন দেওয়া থাকবে]

(১) ধর্মপাল (চক্রায়ুধকে) কনৌজের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন (২) (২য় বাহাদুর শাহ) মুঘল বংশের শেষ সম্রাট ছিলেন (৩) পিটের ভারত আইন (১৭৮০ খ্রীঃ) পাশ হয়েছিল (৪) কবি বীরসেন ছিলেন (২য় চন্দ্রগুপ্তের) মন্ত্রী (৫) জাহাঙ্গীর নিজের বিদ্রোহী পুত্রকে (খসরু) অন্ধ করে দিয়েছিলেন (১) (কণিষ্ক) শকাব্দ প্রচলন করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়, (২) (সমুদ্রগুপ্ত, বা ধোয়ী) কবিরাজ উপাধি পেয়েছিলেন (৩) বাণভট্ট ছিলেন (হর্ষবর্ধনের সভাকবি) (৪) আকবরের রাজস্ব-নীতির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন (টোডরমল) (৫) (স্বত্ববিলোপ)

(ঘ) সঠিক উত্তর নির্ণয় অভীক্ষা :—

(উত্তর দেবার জন্য সঠিক শব্দটি মোটা অক্ষরে দেওয়া হল। মূল প্রশ্নে এভাবে থাকবে না)

(১) মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের **সাত**, নয়, এগারোটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। (২) আকবর ২০, ২৫, ৩৬ ৪৯ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। (৩) ভারতবর্ষের ১ম কুঠি স্থাপিত হয় কলকাতা, বোম্বাই, **সুরাট**, মাদ্রাজে, (৪) কণিষ্কের, রাজধানী ছিল তক্ষশীলা, মথুরা, **পুরুষপুর**, গান্ধার (৫) গৌড়ের রাজধানী ছিল তক্ষশীলা, সুবর্ণগিরি, **পুরুষপুর** উজ্জয়িনী। (৬) বুদ্ধচরিত গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন বিশাখদত্ত, বাণভট্ট, **অশ্বঘোষ**। (৭) প্রাচীনযুগের বিখ্যাত রাজা পুলকেশী ছিলেন পল্লব, **চালুক্য** রাষ্ট্রকূট, চোল বংশীয় (৮) বিখ্যাত কবি আমীর খসরু **গিয়াসুদ্দিন বলবন**

আলাউদ্দিন খিলজী, মোহম্মদ বিন তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। (৯) হলদিঘাটের যুদ্ধ হয়েছিল ১৫৫৭, ১৫৭৬ ১৭৬৪ খ্রীঃ (১০) সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল লর্ড ডালহৌসি, **লর্ড ক্যানিং**-এর শাসনকালে।

সময় জ্ঞানের অভীক্ষা :—

(কাল বা সময় অনুযায়ী পর পর সাজাতে হবে)

(১) আবুল ফজল, আমীর খসরু, ফিরদৌসী, মিনহাজ উদ্দিন [উত্তর—ফিরদৌসী মিনহাজউদ্দিন, আমীর খসরু আবুল ফজল] (২) ১ম ইঙ্গ শিখ যুদ্ধ, ১ম ইঙ্গ আফগান যুদ্ধ-১ম ইঙ্গ মহীশূর, যুদ্ধ, ব্রহ্ম যুদ্ধ, [উঃ ১ম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ, ১ম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ, ১ম ইঙ্গ আফগান যুদ্ধ, ১ম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ] (৩) বাণভট্ট, কালিদাস, হরিষেণ ও ভবভূতি (উঃ হরিষেণ, কালিদাস, ভবভূতি, বানভট্ট) (৪) হলদিঘাট, চৌসা, তালিকোটা, খানুয়ার যুদ্ধ (খানুয়া, চৌসা, তালিকোটা হলদিঘাট)। (১) ধর্মপাল, শশাঙ্ক, দেবপাল।

(উঃ কণিষ্ক, হর্ষবর্ধন, শশাঙ্ক, ধর্মপাল) (২) গিয়াসুদ্দিন বলবন, রাজিয়া, ইলতুতমিস, নাসিরউদ্দিন মামুদ (উঃ ইলতুৎমিস, রাজিয়া, নাসিরউদ্দিন মামুদ, গিয়াসুদ্দিন বলবন) (৩) স্বত্ব বিলোপ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অধীনতামূলক মিত্রতা, দেওয়ানীলাভ (উঃ দেওয়ান লাভ, চিরস্থারী বন্দোবস্ত, অধীনতামূলক মিত্রতা, স্বত্ববিলোপ নীতি) (৪) কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী (দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, অরবিন্দ)

সামঞ্জস্য নির্ণয়মূলক অভীক্ষা (Matching Test) :—

অবিন্যস্ত (প্রশ্ন)	**বিন্যস্ত (উত্তর)**
১। অশোক পিলার—কোণারক	১। অশোক পিলার লৌরিয়া-নন্দন গড়
মার্তণ্ড মন্দির—জাভা	মার্তণ্ড-মন্দির কোণারক
আংকোর ভাট—লৌরিয়ানন্দন গড়	আংকর ভাট—ক্যাম্বোডিয়া
বরবুদর—ক্যাম্বোডিয়া	বরবুদর—জাভা
২। আলাউদ্দিন খিলজী—দিলির খাঁ	২। আলাউদ্দিন খলজী—মালিক কাফুর
শেরশাহ—মালিক কাফুর,	শেরশাহ ব্রহ্মজিৎ-গৌড়,
আকবর—ব্রহ্মজিৎ গৌড়,	আকবর—মানসিংহ,
ঔরঙ্গজেব—মানসিংহ,	ঔরঙ্গজেব—দিলির খাঁ,

বিষয়ভিত্তিক সত্য-মিথ্যা বিচারের অভীক্ষা ডানদিকে শুধু 'হ্যাঁ' কিম্বা 'না' লিখতে হবে।

আর্যরা ষোড়শ মহাজনপদে বসতি স্থাপন করেছিলেন — অজাতশত্রু ছিলেন কোশলের রাজা। — চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় বিরাট দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। — দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে রাজস্ব ছিল শস্যের একচতুর্থাংশ। — মগধের পশ্চিমে ছিল বিশাল কলিঙ্গ রাজ্য। — পেশোয়ারে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গিতি বসিয়েছিলেন কণিষ্ক। বানভট্ট ছিলেন শশাঙ্কের সভাকবি। — খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন জালালউদ্দিন — ।

মালিক কাফুর রামেশ্বরে একটি মসজিদ বানিয়েছিলেন —। মহম্মদ গাওয়ান বাহমণি রাজ্যের তিনজন স্থলতানের অধীনে কাজ করেন। বিজয়নগরের দ্বিতীয় রাজবংশ ছিল তুঘলক বংশ —। ১৫৩০ সনে বাবরের মৃত্যু হয় —। আকবরের সাম্রাজ্য কমোরিন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল —। আকবরের পুরো রাজত্বকাল ধরেই রাজধানী ছিল দিল্লী —। কোন ইউরোপীয় ভারতে আসার আগেই আকবরের মৃত্যু হয় —। শাহজাহানের আমলে আসাম মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় —। মীরজুমলা ছিলেন বিজাপুর রাজ্যের মন্ত্রী —। বাংলাদেশে পর্তুগীজদের সাথে শাহজাহানের সদ্ভাব ছিল —। জুম্মা মসজিদ ও মোতি মসজিদ তৈরী করেন শাহজাহান। আওরঙ্গজেবই আলমগীর নামে পরিচিত —। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে শিবাজীর মৃত্যু হয় —। শিবাজীর প্রধান মন্ত্রীকে বলা হত ন্যায়াধীশ —। বাজীরাও ছিলেন দ্বিতীয় পেশোয়া —। আকবরের আমলে রালফ ফিচ্ ভারতে আসেন —। হায়দার আলি ছিলেন হায়দরাবাদের স্থলতান —। জব চার্ণক কলকাতা পত্তন করেন —। ফিলিপ ফ্রান্সিস্ এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস ছিলেন বন্ধু —।

সমাপ্তিকরণ অভীক্ষা (Completion Test)

জৈন ধর্মগুরুদের বলা হত —। বিম্বিসার ছিলেন — রাজা। চাণক্য ছিলেন— গ্রন্থের লেখক। স্মিথ — আখ্যা দিয়েছেন ভারতের নেপোলিয়ন রূপে। কবি বীরসেন ছিলেন — সভাকবি,। হর্ষাব্দ গণনা করা হয় — সন থেকে। ধর্মপাল — কে কনৌজের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। মহীপালের ভাই রামপাল দিব্যের উত্তরাধিকারী— কে হত্যা করেন। শৈলেন্দ্র রাজ্য ছিল — অঞ্চলে। 'দাস' বংশের শ্রেষ্ঠ স্থলতান ছিলেন —। খলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন —। মহম্মদ তুঘলকের পরে সিংহাসনে বসেন —। শেরশাহ — কে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। আইন — ই — আকবরী রচনা করেন —। জাহাঙ্গীর তাঁর বিদ্রোহী ছেলে — কে অন্ধ করেন। ১৬৫৮ সনে সামুগড়ের যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব — কে পরাজিত করেন। শাহজী ছিলেন — জাগিরদার। শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন —। পিটের ভারত শাসন আইন পাশ হয় — সনে। বড়লাট — মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ হয় — সনে।

সঠিক উত্তর নির্ণয়ের অভীক্ষা (Multiple Choice)

(সঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দিতে হবে)

বেদাঙ্গ হল—চার, ছয়, দশখানা।

আলেকজাণ্ডার জয় করেছিলেন—পাঞ্চাল, পাঞ্জাব, মগধ।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয় তক্ষশীলা, আলেকজান্দ্রিয়া, ব্যাবিলনে।

মেগাস্থেনিসের মতে ভারতে ছিল—পাঁচ, সাত, এগারটি সামাজিক শ্রেণী।

অশোকের রাজধানী ছিল—তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, তোসালী, পাটলিপুত্র।

কণিষ্কের রাজধানী ছিল—গান্ধার, মথুরা, পুরুষপুর।

মালবিকাগ্নিমিত্রের লেখক ছিলেন—হরিষেণ, অশ্বঘোষ, কালিদাস।

হূণ নেতা মিহিরকুলকে পরাজিত করেন—হর্ষবর্ধন, যশোধর্মন, চন্দ্রগুপ্ত।
হিউয়েন সাঙ্ ভারতে ছিলেন—১২, ১৩, ১৪ বছর।
বাংলার পাল রাজারা ছিলেন—শৈব, বৌদ্ধ, জৈন।
আলাউদ্দিনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন—কাফুর, নসরৎ, খিজির খান।
পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়—১৫৬৫, ১৫২৬, ১২৯০ সনে।
আকবরের সাম্রাজ্যে ছিল—১৩, ১৫, ১৮টি সুবা।
পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়—১৫২৬, ১৫৫৮, ১৭৬১ সনে।
ইংরেজদের প্রথম কুঠি হয়—বোম্বাই, কলকাতা, সুরাট।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়—কর্ণওয়ালিস, ডালহৌসী, ক্যানিংএর আমলে।

সময়ানুক্রমবোধের অভীক্ষা (Time Sequence) (সময়ানুক্রমে সাজাতে হবে)

বাণভট্ট, কালিদাস, হরিষেণ, ভবভূতি। রুদ্রদামন, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় পুলকেশী, দেবপাল। হর্ষবর্ধন, প্রভাকর বর্ধন, যশোধর্মন, লক্ষণ সেন, ইলতুতমিস, কুতুবউদ্দিন, মহম্মদ ঘোরি, রাজিয়া। ইব্রাহিম লোদি, ফিরোজ তুঘলক, শেরশাহ, বলবন আবুলফজল, আমীর খসরু, ফিরদৌসি, মিনহাজউদ্দিন, জাহানারা, রাজিয়া মেহেরউন্নিসা, মাহাম আনাখা, রাজারাম, শম্ভুজী, বালাজীবাজীরাও, বালাজী বিশ্বনাথ, আবদালী, নাদির শাহ, তৈমুর লঙ, চেঙ্গিস খান, লর্ড মিণ্টো, লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড হেষ্টিংস, ওয়ারেণ হেষ্টিংস।

তথ্যের মিলকরণ অভীক্ষা (Matching Test)

(বাঁদিকে শব্দের সাথে মিলিয়ে ডানদিকের শব্দগুলি পাশাপাশি লিখতে হবে।)

(ক) কোশল : রাজগৃহ
অবন্তী : কৌশাম্বী
বৎস : শ্রাবন্তী
মগধ : উজ্জয়িনী

(খ) মিনান্দার : মেঘবর্ণ
কণিষ্ক : গৌতমী পুত্র
সমুদ্রগুপ্ত : অশ্বঘোষ
রুদ্রদামন : মিলিন্দ পনহো

(গ) মেগাস্থিনিস : কাদম্বরী
কৌটিল্য : মেঘদূত
কালিদাস : ইণ্ডিকা
বাণভট্ট : অর্থশাস্ত্র

(ঘ) হলদিঘাটের যুদ্ধ : ১৮৫৭ সন
পলাশীর যুদ্ধ : ১৭৬১ সন
তৃতীয় পাণিপথ : ১৭৫৬ সন
সিপাহী বিদ্রোহ : ১৫৭৬ সন

(চ) শ্রীচৈতন্য : মালাবার
নানক : মহারাষ্ট্র
তুকারাম : পাঞ্জাব
শঙ্করাচার্য : বাংলাদেশ

(ছ) প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ : লর্ড হার্ডিঞ্জ
প্রথম শিখযুদ্ধ : লর্ড আমহার্ষ্ট
তৃতীয় শিখযুদ্ধ : লর্ড ক্যানিং
সিপাহী বিদ্রোহ : লর্ড ডালহৌসী

(জ) পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ঘোষণা : মহারানী ভিক্টোরিয়া
অধীনতামূলক মিত্রতা : কণিষ্ক
স্বত্ববিলোপ নীতি : ওয়েলেস্লি
সরকারী পদে
ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ঘোষণা : ডালহৌসী

কালানুক্রমিক ঘটনাবলী (Chronology)

ইতিহাসের বিষয়বস্তুর উপর দক্ষতা লাভের জন্যে কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জীর সমাবেশ করা হল। বিষয়বস্তুর আয়ত্তীকরণে এই অংশটি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের সময় তুলনামূলক আলোচনা, সময় তালিকা প্রণয়ণ, সময় রেখা তৈরী প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে সহায়তা করতে পারে। এছাড়া যুগ বৈশিষ্ট্য, বংশধারা বা প্রতিনিধি স্থানীয় বিষয়ের দিকে নজর রেখে ঘটনাগুলিকে পর পর সাজানো হয়েছে। এর ফলে ভারতের ইতিহাসের কোন বিষয় বা ঘটনার সময় জানবার পক্ষে এই অংশটি নিমেষে শিক্ষকশিক্ষিকা বা ছাত্রছাত্রীদের সহায়তা করবে।

ভারতের ইতিহাসের কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী

খৃষ্ট পূর্বাব্দ

৩,০০০—সিন্ধুসভ্যতার উদ্ভব।
২,০০০-১,৫০০—আর্যদের ভারতে বসতি স্থাপন।
৮১৭—পার্শ্বনাথের আবির্ভাব।
৫৬৭—বুদ্ধের আবির্ভাব।
৫২৭—মহাবীরের (জীনের) মৃত্যু।
৪৮৬—বুদ্ধের পরিনির্বাণ।
৩২৭-২৬—আলেকজাণ্ডারের অভিযান।
৩২৪-১৮৭—মৌর্য বংশের আমল।
১৮৩—সুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠা
১৭১—সিন্ধু উপত্যকায় পহ্লব শাসন।

খ্রীষ্টাব্দ

৪৩-৪৪—তক্ষশীলার পহ্লব রাজ্য।
৪৭—গণ্ডোফার্নিস।
৭৮—শকাব্দ।
১১৯ (১২৫ ?)—কণিষ্কের রাজত্বকাল।
১১৯-১২৪—নহপানের রাজ্যকাল।
৩২০-৪১৫—গুপ্ত সাম্রাজ্যের কাল।
৫৩০—যশোবর্মনের কাছে হূণরাজ মিহিরকুলের পরাজয়।
৫৭০—হজরত মহম্মদের জন্ম।
৬০৬—হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্ক।
৬২৯—হিউয়েন সাঙ্-এর ভারত যাত্রা।
৬৩২—হজরত মহম্মদের তিরোধান।
৬৩৪ (৬৪১)—হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে ২য় পুলকেশীর জয়।
৬৩৭—শশাঙ্কের মৃত্যু।
৬৪২—পুলকেশীর মৃত্যু।
৬৪৩—কনৌজের ধর্মসভা।
৬৫০—রাষ্ট্রকূট বংশের প্রতিষ্ঠা।
৬৪৭—হর্ষবর্ধনের মৃত্যু।
৭১৩—মহম্মদ-বিন-কাশিম।
৭৫০-৭৭০—গোপাল।
৭৭০-৮৫০—ধর্মপাল-দেবপাল।
৭৯৩-৮১৫—রাষ্ট্রকূট রাজ ৩য় গোবিন্দ।
৮১৪-৮৭৭—অমোঘবর্ম।
৮৩৬—মিহির ভোজের সিংহাসন লাভ।
৯৮৭-৯৮৮—সবুক্তগীণের ভারত অভিযান।
১০৩৮—দীপঙ্করের তিব্বত গমন।
১০০১-২৬—সুলতান মামুদের অভিযান।
১০৯৫-১১-৫৮—বিজয় সেনের রাজত্বকাল।
১১৫৮-১১৭৯—বল্লাল সেনের রাজত্বকাল।
১১৭৫-৯২—মোঃ ঘোরীর অভিযান।
১১৭৯-১২০৫—লক্ষণ সেনের রাজত্বকাল।
১১৯১—তরাইনের ১ম যুদ্ধ।
১১৯২—তরাইনের ২য় যুদ্ধ।
১১৯৪—কনৌজের পতন।
১২০৬—কুতুবউদ্দিনের সিংহাসন লাভ।

১২৯০—খিলজী রাজত্বের আরম্ভ।
১৩২০—তুঘলক রাজত্বের আরম্ভ।
১৩৩৬—বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৩৪৭—বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৩৯৮—তৈমুরের ভারত অভিযান।
১৪৯৮—ভাস্কো-দা-গামার ভারতে আগমন।
১৫২৬—পাণিপথে বাবরের জয়লাভ।
১৫২৭—খানুয়াতে বাবরের জয়লাভ।
১৫৪০-৪৫—শেরশাহ।
১৫৫৬—আকবরের সিংহাসনারোহণ।
১৫৬২—আকবরের স্বহস্তে শাসন গ্রহণ।
১৫৬৮—চিতোর জয়।
১৫৭৪—বাংলা জয়।
১৫৭৬—হলদিঘাটের যুদ্ধ।
১৫৮৬—কাশ্মীর অধিকার।
১৬০০—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোঃ গঠন।
১৬০৫—আকবরের মৃত্যু।
১৬০৮—ইংরেজদের সুরাট কুঠি।
১৬২৭ (৩০)—শিবাজীর জন্ম।
১৬৭৪—শিবাজীর রাজ্যাভিষেক।
১৬৮০—শিবাজীর মৃত্যু।
১৬৯০—কলকাতায় জবচার্ণক।
১৭০৫—বাংলার সুবেদার হিসাবে মুর্শিদ কুলি।
১৭০৭—ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু।
১৭৩৯—নাদির শাহের ভারত আক্রমণ।
১৭৪২—ডুপ্লে পণ্ডিচেরীর গভর্ণর।
১৭৪৪-৪৮—১ম কর্ণাটক যুদ্ধ।
১৭৫৬—সিরাজের কলকাতা অভিযান।
১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ।
১৭৬০-৮০—সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।
১৭৬১—পাণিপথের ৩য় যুদ্ধ।
১৭৬৪—বক্সারের যুদ্ধ।
১৭৬৫—দেওয়ানী লাভ।
১৭৬৭-৬৯—১ম মহীশূর যুদ্ধ।
১৭৭০—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।
১৭৭২—ওয়ারেণ হেষ্টিংস গভর্ণর।
১৭৭৩—রেগুলেটিং অ্যাক্ট।
১৭৭৫—নন্দকুমারের ফাঁসি।
১৭৭৫-৮২—১ম মারাঠা যুদ্ধ।
১৭৮০-৮৪—২য় মহীশূর যুদ্ধ।
১৭৮৪—পিটের আইন।
১৭৮৪—এশিয়াটিক সোসাইটি।
১৭৯০-৯২—৩য় মহীশূর যুদ্ধ।
১৭৯৩—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।
১৭৯৯—৪র্থ মহীশূর যুদ্ধ।
১৮০০—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা।
১৮০৩-০৫—২য় মারাঠা যুদ্ধ।
১৮০৯—অমৃতসরের সন্ধি।
১৮১৪-১৬—গোর্খা যুদ্ধ।
১৮১৫—রামমোহনের তত্ত্ববোধিণী সভা।
১৮১৭—পিণ্ডারা দমন, হিন্দু কলেজ।
১৮১৭-১৮—তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ।
১৮২৪-২৬—১ম ব্রহ্ম যুদ্ধ।
১৮২৪—ব্যারাকপুরের সিপাহি বিদ্রোহ।
১৮২৯—ব্রাহ্মসভা।
১৮২৯—সতীদাহ বিরোধী আইন।
১৮২৯-৩০—ঠগী দমন।
১৮৩১—ওয়াহাবী আন্দোলন শুরু।
১৮৩৫—পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন।
১৮৩৮-৪২—১ম আফগান যুদ্ধ।
১৮৩৯—রণজিৎ সিংহের মৃত্যু।
১৮৪৫-৪৬—১ম শিখ যুদ্ধ।
১৮৪৮-৪৯—২য় শিখ যুদ্ধ।
১৮৪৮—স্বত্ব বিলোপ নীতি।
১৮৫৫-৫৬—সাঁওতাল বিদ্রোহ।
১৮৫৭—বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।
১৮৫৭—সিপাহী অভ্যুত্থান।
১৮৫৮—ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা।